

বনফুল

রচনাবলী ০৩

বনফুল রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

সম্পাদনায়ঃ

ডঃ সরোজমোহন মিত্র

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম সংস্করণ। ১লা আশ্বিন, ১৩৮০। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

বিশেষ সংস্করণ। ১লা বৈশাখ, ১৩৮১। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৪

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে

যোগজীবন চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রাকর:

শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা

সুদীপ প্রিণ্টার্স

১১ নং তারক প্রামাণিক রোড

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ রূপায়ণে:

এম স্কোয়ার। কলকাতা-৫

সূচীপত্র


উপন্যাস

মৃগয়া

উৎসর্গ

মুঙ্গের কলেজের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সরকার এম. এ.

করকমলেষু

কালীবাবু,

আশা করি আপনার মনে আছে, 'মৃগয়া' লিখিবার বীজ আপনিই আমার মনে একদা বপন করিয়াছিলেন। আপনি সে সময়ে ভাগলপুরে না আসিলে হয়তো এ গল্প আমি লিখিতামই না।

'মৃগয়া'র জন্ম-ইতিহাসের এই স্মৃতিটুকু জাগরূক রাখিবার জন্য প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পুস্তকখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

ইতি

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ভাগলপুর

গ্রামে

হিরণপুর গ্রামে জেগেছে সাড়া,
বিপিন ঘোষ, হরু মণ্ডল, জগদেও পাঁড়ে থেকে সুরু ক'রে
ঝাংরু সর্দার, বাদল ডাক্তার, লাহিড়ী, তিনু চাটুজ্জে,
তালুকদার মশাই, হরিশ খুড়ো,
এমন কি ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত নিতাই পর্যন্ত
উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।
বস্তুত, না হয়ে উপায় নেই।
স্বয়ং জমিদারবাবুরা যখন উৎসাহিত হয়েছেন
এবং নানাভাবে তা প্রকাশ করছেন,
তখন
বাকি সকলকেও
বাধ্য হয়েই
জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে
উৎসাহ-ঐক্যতানে সুর মেলাতে হচ্ছে।
পুষ্করিণী আলোড়িত হ'লে
পুষ্করিণীবাসী শামুক, গুগলি, পানা, শ্যাওলা,
কমল, কুমুদ, কহ্লার—
সবাইকেই সামলাতে হয় সে আলোড়নের ধাক্কা।
সুতরাং রোগা নিতাই ভাণ করছে বীরত্বের।
বিভিন্ন শিকার-অভিযানে
বিভিন্ন রকম বিপদের সম্মুখবর্তী হয়ে
তার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও
স্বকীয় বীর্যবলেই কেবল
কার্যোদ্ধার করেছে কি ক'রে সে
শীর্ণ হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত ক'রে
তারই বর্ণনা করছে।

খাজনাপ্রপীড়িত অতিস্থূল ক্ষিপ্রতাবিলাসী তিনু চাটুজ্জে
হয়ে উঠেছেন ক্ষিপ্রতর।
মেদবহুল স্বেদলাঞ্ছিত বপুটি আস্ফালিত ক'রে
ক্ষত্রিয়সুলভ উল্লাসহকারে বলছেন তিনি,
নিশ্চয়ই,
যেতে হবে বইকি শিকারে,
আলবৎ যেতে হবে।
বাঘকে ভয় করলে মানুষের চলে!
উদাহরণ দিচ্ছেন হিটলার-মুসোলিনির।
কিন্তু তাঁর এই অতিমানবীয় উত্তেজনার অন্তরালে
নিতান্ত-মানবীয় যে মতলবটি ঢাকা আছে,
সেটির খবর জানেন কেবল নীলু দত্ত।

হরিশ খুড়োর কল্পনার
নব-পক্ষোদ্গম হয়েছে।
খুড়ো জীবনে কখনও বাঘ দেখেছেন কিনা সন্দেহ,
কিন্তু বাঘের থাবার, গোঁফের,
ডোরা ডোরা কালো দাগের
এমন নিখুঁত রকম বর্ণনা ক'রে চলেছেন যে,
টোকন, চাঁপা তো বটেই,
বড়বাবু পর্যন্ত মুগ্ধ।
দু হাতে কেরোসিন তেল মেখে
তালুকদার মশাই সাফ করতে লেগে গেছেন
তাঁর উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া
সাবেককালের গাদা বন্দুকটা।
একনলা বটে,
মরচেও পড়েছে,
কিন্তু আসল 'স্টিল'।
একালে নিতান্তই দুর্লভ।

বাদল ডাক্তার
শব্দ সহকারে কিছু বলছেন না বটে,
কিন্তু ভারী মুখখানাতে
ফুটিয়ে রেখেছেন এমন একখানা হাসি,
যার নীরব মুখরতা
সত্যই শিল্পীজনোচিত।

বুড়ো হরু মণ্ডল বর্শা শানাচ্ছে
এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলছে,
এই বর্শায় ভালুক গেঁথেছি, শুয়োর মেরেছি,
ঘায়েল করেছি ময়াল সাপকে,
পাগলা হাতীর মাথা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করেছি,
মানুষও নিস্তার পায় নি।
বাকি ছিল শুধু বাঘ,
জামাইবাবুর কল্যাণে সেটাও হবে এবার।
হরু মণ্ডলের কুচকুচে কালো রঙ,
প্রশস্ত ছাতি,
রক্তাভ টানা টানা চোখ,
পেশীবহুল দেহসৌষ্ঠব,
পুষ্ট পাকানো ধবধবে সাদা এক জোড়া গোঁফ,
কথায়
চোখে
বলিষ্ঠ পৌরুষ-ভঙ্গিমা।
তার কথায় খুশি হচ্ছিল সবাই,
কেবল একটি লোক ছাড়া,
সে তার তৃতীয় পক্ষের বালিকা বধূ কুসুম।
বড় ভীতু সে।
মসলা বাটতে বাটতে
ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে
সে চেয়ে চেয়ে বর্শা শানানো দেখছিল।

ভাবছিল,
বাপের বাড়িতে সবাই অপয়া বলত তাকে,
জন্ম হবামাত্রই মাকে খেয়েছে,
কিছুদিন পর বাপকে,
ভাইগুলিও নেই।
নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই
বিয়ে করেছে তাকে মণ্ডল।
শেষে কি—
আর সে ভাবতে পারলে না,
বহির্মুখী নিশ্বাসটাকে নিরুদ্ধ ক'রে
সে সবেগে ঘষতে লাগল কঠিন নোড়াটা
লঙ্কামাখা শিলের বুকে।
তার বড় বড় চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি
অবলুপ্ত হয়ে রইল
অবগুণ্ঠনের তলায়।
মুশকিলে পড়েছে ঝাংরু সর্দার।
সেই চিরন্তন মুশকিল!
ঝাংরুর চেহারাটিও দেখবার মত—
মাথায় বাবরি চুল,
বেঁটে, বলিষ্ঠ,
কষ্টিপাথরে কোঁদা চেহারা।
রক্তজবার প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ
কানে চুলে সর্বদাই জ্বলজ্বল করছে।
তালরস-রসিক।
কিন্তু ওর সাঁওতালত্ব নিখুঁত থাকতে পায় নি
সভ্যতার আওতায়।
চুকাতে আর তৃপ্তি হয় না,
বিড়ি খেতে হয়,
সিগারেটের প্রতিও মোহ আছে।
বাঁশী, মাদল এখনও বাজায় বটে,

কিন্তু গ্রামোফোন কেনবার শখ আছে প্রচুর,
পয়সা নেই ব'লেই কিনতে পারে না।
কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে ওকে মোহিনী গোহমুনা।
গোহমুনা মানে গোখরো সাপ,
গোখরো সাপের সঙ্গে সাদৃশ্যও আছে মেয়েটির।
মেটে মেটে রঙ,
রেগে গেলে
নীল চোখে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত ক'রে
পাতলা কোমরে হাত দিয়ে
গ্রীবা উদ্যত ক'রে যখন দাঁড়ায়,
তখন সত্যিই মনে হয় গোখরো সাপ ফণা ধরেছে।
জন্মেরও একটা ইতিহাস আছে।
মা থাঁটি মেথরানী,
বাপ থাঁটি সায়েব।
জন্মের সময় আঁতুড়-ঘরে গোখরো সাপ বেরিয়েছিল,
তাই ওর নাম গোহমুনা।
নামের মর্যাদা ও রক্ষা করেছে;
ওর বিষদন্তের তীক্ষ্ণ আঘাতে
মারা গেছে এবং জখম হয়েছে
হিরণপুর গ্রামের অনেকে।
জমিদারের বড় ছেলে,
ম্যানেজার,
নায়েব,
জমাদার,
পিয়াদা—
সকলকেই এক আধ বার ছুবলেছে গোহমুনা;
কিন্তু ধরা পড়ে নি কোথাও।
এমন সময় সাঁওতাল-পরগণার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে
হাজির হ'ল এসে ঝাংরু
ভ্রমরকৃষ্ণ কালো বাবরিতে জবাফুল গুঁজে

হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে
বাবুদের বাড়ির নতুন হাতীটার নতুন মাহুত-রূপে
ধরা পড়ল গোহুম্না,
গৃহস্থালীর চুপড়িতে গিয়ে ঢুকল বন্য সর্পিনী
বিষদন্তের বিষ
রূপান্তরিত হ'ল অমৃতে,
জাগল নূতন জগতে,
লাগল নূতন রঙ।
কিন্তু তবু গোহুম্না তো,
ফণা তোলা স্বভাবটা গেল না
মাঝে মাঝে ফণা তোলে,
ফোঁস ক'রে ওঠে।
ঝাংরু মনে মনে হাসে,
কিন্তু বাইরে ভাণ করে, ভয় পেয়েছে।
ভাণ না করলে উপায় আছে!
এলিয়ে পড়া মাথার খোঁপাটা দুহাতে জড়াতে জড়াতে
গোহুম্না বললে,
আমি যাব না।
যাবি না কেন?
আমি গিয়ে কি করব? শিকারের আমি কি বুঝি?
ঝাংরু হেসে জবাব দিলে,
তোর চেয়ে বড় শিকারী
আছে নাকি আর কেউ হিরণপুরে?
পা পড়ল পুচ্ছে,
ফোঁস ক'রে উঠল গোহুম্না,
গ্রীবাভঙ্গি ক'রে বললে, তার মানে?
ঢোক গিলে থতমত খেয়ে বললে ঝাংরু,
মানে, মন কেমন করবে।
কদিন থাকতে হবে বাইরে তার ঠিক নেই,
দূর তো কম নয়,

পাকা দশটি ক্রোশ।
কলমিপুরের মাঠ পেরিয়ে,
ময়না নদীর ওপারের সেই জঙ্গলটায় যেতে হবে।
পারব না তোকে ছেড়ে থাকতে এতদিন।
কোমর ঘুরিয়ে বলল গোহমনা,
আমায় নতুন শাড়ি কিনে দে তবে।
এই ময়লা শাড়ি প'রে আমি যাব না।
মুশকিলে পড়ল ঝাংরু।
ঝুলশিচাঁদের দোকানে ধার তো বেড়েই চলেছে।
দ'মে গেল মনে মনে,
তবু বললে, আচ্ছা দেব, তাই দেব।
আমি যাব কিসে চ'ড়ে?
তুই তো যাবি হাতীতে,
হাতীর পিঠে থাকবে বাবুরা,
আমি কি ল্যাজ ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে যাব নাকি?
হেসে লুটিয়ে পড়ল গোহমনা।
ঝাংরু বললে, তার জন্যে ভাবনা কি,
গরুর গাড়ি যাবে পঁচিশখানা।
তাঁবু,
বাসনকোসন,
আসবাবপত্তর—
সব যাবে তো!
তুই তারই একটাতে চ'ড়ে বসিস।
বিরিঞ্চিকে ব'লে দেব আমি।
নিজে যাবেন হাতীতে,
আমার বেলায় গরুর গাড়ি!
ইস, ভারী আমার—
যে কথাটি দিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করলে গোহমনা,
ভদ্রসমাজে তা প্রচলিত নয়।
ঝাংরু তখন মোক্ষম অস্ত্রটি হানলে,

গম্ভীর হয়ে গেল।
বার দুই আড়চোখে ঝাংরুর দিকে চেয়ে
ফিক ক'রে হেসে ফেলল গোছমুনা,
বললে,
ইস, পুরুষের রাগ দেখ না!
ঝাংরু তবু গম্ভীর।
যাব, যাব, যাব গো,
তোমার বিরিঞ্চির গাড়িতে চেপেই যাব,
তুমি একটু হাস দিকিনি।
হেসে ফেললে ঝাংরু।

পাঁজির পাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি
ব'সেছিলেন নীলাম্বর দত্ত,
ভুরু কুঁচকে।
বার্তা শুভ নয়।
কিন্তু আজকালকার বাবুরা,
বিশেষ ক'রে ওই বিলেত-ফেরত জামাইবাবুটি,
মানবেন না পাঁজির বারণ।
ত্র্যহস্পর্শের তীব্রতা
স্পর্শ করতে পারবে না ওঁদের হৃদয়কে।
যখন ঠিক করেছেন,
তখন নির্ঘাৎ ওই দিনেই বেরুবেন,
এবং নীলু দত্তকেও হতে হবে সহযাত্রী।
নীলু দত্ত শিকারী নন—মুহুরী।
শিকারীরা করবেন শিকার,
নীলু দত্তকে করতে হবে আয়োজন।
লোকও এক-আধজন নয়,
সবসুদ্ধ মিলে শতখানেকের কাছাকাছি যাবে।
এত লোকের খাবার আয়োজন,
শোবার আয়োজন,

স্নানের আয়োজন,
তা ছাড়া
বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু, প্রত্যেকের জন্তেই
'বিশেষ' একটু আয়োজন।
করতে হবে গোপনে গোপনে।
সব ভার নীলু দত্তের ওপর।
কিন্তু পাজির দিকে চেয়ে
চিন্তিত হয়ে পড়লেন দত্ত মশাই।
একদিন আগেই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়!
বড়বাবুকে বুঝিয়ে বললে
আপত্তি করবেন না বোধ হয় তিনি।
তাঁবুটাবু গাড়াতে হবে,
মাচান তৈরি করাতে হবে,
যোগাড় করতে হবে একটা মোষের বাচ্চা,
একদিন আগে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।
যুক্তির সূর্যকে কিন্তু আবৃত ক'রে রেখেছে
ছোট একখানি মেঘ।
একদিন আগে গেলে
লাহিড়ীটা অব্যাহতভাবে গ্রাস ক'রে থাকবে বড়বাবুকে।
অতিশয় কষ্টদায়ক চিন্তা।
অথচ পাঁজিকেও—
নীলু দত্তের ভুরু আরও কুঁচকে গেল।
পাশের ঘরে ভাইপো দুটো হুড়োহুড়ি করছিল,
রোজই করে,
আজ কিন্তু তা অসহ্য হয়ে উঠল;
উঠে গিয়ে
ঠাস ঠাস ক'রে চড়িয়ে দিলেন তাদের।
তারপর হঠাৎ তাক থেকে পাড়লেন
খেরো-বাঁধানো চটি একখানা খাতা,
কি খানিকক্ষণ দেখলেন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে,

তারপর উঠে পড়লেন ;
পায়ে দিলেন ময়লা ক্যাম্বিসের জুতোটা,
তালি-দেওয়া ছাতাটা বগলে ক'রে
বেরিয়ে পড়লেন খাতাটা নিয়ে।
নীলাম্বর এককালে সুদর্শন ছিলেন
এবং সেজন্য গর্বও ছিল তাঁর মনে মনে।
কিন্তু পরিহাস-রসিক বিধাতা
পরিহাস করলেন।
যদিও একটু স্থূলগোছের,
কিন্তু দত্তের পক্ষে মর্মান্তিক।
হঠাৎ মাথায়, দাড়িতে, গোঁফে
খাবছা খাবছা টাক প'ড়ে গেল।
কামিয়ে ফেলতে হ'ল সব।
বৃহৎ নাকটা বৃহত্তর হয়ে গেল,
স্পষ্টতর হ'ল মুখের বলিরেখা,
অনাবৃত হ'ল মুহুরিয়ানা চোখের দৃষ্টিতে,
শরীরটা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।
তবু বাবুরা প্রসন্ন আছেন আজও—
এইটুকুই ভরসা নীলু দত্তের।
বাবুদের অনুগ্রহে সে কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না,
না, লাহিড়ীকেও নয়।
হ'লই বা সে বড়বাবুর বন্ধুর ভায়রাভাই
এবং এম.এ. পাস।
খেরোর খাতা বগলে ছুটতে লাগলেন নীলাম্বর দত্ত
বাবুদের বাড়ির দিকে।
এই শিকার-অভিযানের জন্য যা যা দরকার
এবং কত রকম যে দরকার
এবং কত-রকমভাবে তার বন্দোবস্ত করতে হবে,
তা সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি
খেরোর খাতাখানায়।

সেটা বাবুদের দেখাতে হবে বইকি।
দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় ক'রে
ছুটতে লাগলেন নীলাম্বর দত্ত।

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী
এ বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন আত্মীয়তার দাবিতে,
কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন মোসায়েবের পদবীতে
দিলদরিয়া বড়বাবুর আসরে।
বড়বাবু যে তাঁর জাতি-নির্ণয়ে অসমর্থ হয়েছিলেন তা নয়,
মদ্য-পিপাসু ব্যক্তিটির স্বরূপ ঠিক চিনেছিলেন তিনি
এবং সেইজন্যেই
অসীম করুণাভরে সহ্য করতেন তাঁকে।
লাহিড়ীর যোগ্যতাও ছিল কিঞ্চিৎ,
শুধু যে সুকান্তি, সুকণ্ঠ, সুবিদ্বান তাই নয়,
সুপারিষদও।
গলায় কাপড় দিয়ে, হাতজোড় ক'রে
হেঁ হেঁ করেন না তিনি।
যখন খোশামোদ করেন,
চট ক'রে বোঝা যায় না যে খোশামোদ করছেন।
ভর্ৎসনা, অনুযোগ, বিস্ময়, নীরব হাস্য, আক্ষেপ,
নানা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে তাঁর খোশামোদ।
এই শিকার ব্যাপারে।
বড়বাবুর ভগ্ন স্বাস্থ্য,
নিদারুণ গরম,
নতুন হাতীটার বদমেজাজ
এবং আরও অনেক রকম কারণ দেখিয়ে
আপাতদৃষ্টিতে তিনি নিরুৎসাহিত করছেন সকলকে।
কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বড়বাবু
এই ছদ্মবেশী হিতৈষণার অন্তরালে
প্রত্যক্ষ করছেন অসহায় লাহিড়ীকে—

ষড়রিপুবিধ্বস্ত আদর্শচ্যুত বিদ্বান ব্যক্তিটিকে,
যার সখ আছে, কিন্তু শক্তি নেই,
যে গলগ্রহ হয়েও
প্রাণপণে চেষ্টা করছে আত্মসম্মানের মুখোশটা আঁকড়ে থাকতে,
যার বিকশিত দন্তের অত্যুচ্ছ্বসিত প্রাণহীন হাসি
ঢেকেও ঢাকতে পারছে না অন্তরের অন্তহীন ক্রন্দনকে।
উপভোগ করছেন বড়বাবু
লাহিড়ীর এই হিতোপদেশ-জারিত খোশামোদ।
সেই চিরন্তন খোশামোদ,
যা চিরকাল খুশি ক'রে এসেছে
উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মন।

বুড়ো জগদেও পাঁড়ে
এই শিকার ব্যপদেশে
বীরত্ব প্রকাশ করেছে শুধু টোকনের কাছে,
তাও অতি নিভৃতে।
বুড়ো জগদেও পাঁড়েকে
উর্দিটুর্দি পরলে খানিকটা জমকালো দেখায় বটে,
কিন্তু সাজ-পোষাক খুলে নিলে
পালক-ছাড়ানো হাঁসের মত অবস্থা তার।
লিকলিকে রোগা,
নিদারুণ লম্বা,
মুখখানাতেই একটু যা জাঁকজমক আছে এখনও।
দ্বিধা-বিভক্ত পাকা দাড়ি
গুম্ফ সহযোগে
এখনও কর্ণ পরিক্রমা করছে বটে,
কিন্তু সাবেককালের সে জলুস আর নেই।
সেকালের কৃষ্ণকুঞ্চিত বিভীষিকা
রূপান্তরিত হয়েছে
শুভ্র সুন্দর প্রশান্তিতে।

চোখের দৃষ্টিতে যৌবনকালের সিংহসুলভ দীপ্তি আর নেই।
তার বদলে
একটা সকৌতুক ছেলেমানুষি হাসি
চিকমিক করছে সর্বদা।
জগদেও পাঁড়ে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি,
চারদিকে গজিয়েছে এখন সবুজ ঘাস।
কেউ আর মানে না তাকে।
কিন্তু এখনও
এই জগদেও পাঁড়ে
কারও হাত যদি একবার চেপে ধরে,
ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব।
সরু সরু আঙুলগুলোতে এখনও আছে
বজ্রের মত শক্তি।
স্বর্গীয় কর্তা মশাই,
অর্থাৎ বর্তমান বাবুদের পিতাঠাকুর,
বাহাল করেছিলেন জগদেওকে।
এ বাড়ির অনেক নিমক ও ধমক
পরিপাক ক রে
জগদেও বর্তমানে পরিপাক করছে পেন্‌শন।
ওর স্থানে
বড়বাবু
বাহাল করেছেন যে নাবালকটিকে,
তার নানাপ্রকার অপটুতা
অনুকম্পার চক্ষে দেখে জগদেও।
এই কিশোর সিংকেই কাজকর্মে ওয়াকিবহাল ক'রে দেবার ছুতোয়
জগদেও
দেউড়ি আঁকড়ে প'ড়ে আছে এখনও।
আসলে,
এতকালের পুরোনো দেউড়ি ছেড়ে যেতে প্রাণ চায় না।
প্রথম যৌবন থেকে সুরু ক'রে

সারা জীবনটাই তো এইখানে কাটল।
চম্পারণ জেলায় কে চেনে তাকে!
আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই,
সব ম'রে-হেজে গেছে;
এইখানেই শতবন্ধনে সে জড়িয়েছে নিজেকে।
বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু—
তার সামনেই বড় হ'ল সবাই।
ওদের নানা বয়সের
কত দৌরাত্ম্যই না সহ্য করেছে সে।
এই জগদেও পাঁড়েই বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে সকলের।
বহু-মায়ীদের পালকির পেছনে পেছনে
সগর্বে এসেছে লম্বা লাঠি ঘাড়ে ক'রে।
তাদের মেয়ে হ'ল, ছেলে হ'ল,
তারাও আবার দৌরাত্ম্য করতে লাগল পাঁড়ের ওপর।
উষা দিদির বিয়েও সে দেখলে।
তারও আবার ছেলে হবে,
সে-ও হয়তো একদিন এসে চড়বে
জগদেও পাঁড়ের কাঁধে,
টানবে দাড়ি ধ'রে।
ভারী ভাল লাগে ছোট ছেলেদের।
ভাব তাদের সঙ্গেই,
ছোটবাবুর ছোট ছেলে টোকনের সঙ্গে বিশেষ ক'রে।
তাকেই সে গোপনে বলেছে,
বাঘকে হাতের কাছে পেলে
তার পুছড়ি পাকড়ে
এইসা এক পটকান দেবে
যে, জান নিকলে যাবে বাছাধনের।
টোকন শিশুমহলে
চোখ বড় বড় ক'রে
প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে বার্তাটা।

বিপিন ঘোষ
গ্রামের সরকারী ঠাকুরদা।
আবালবৃদ্ধবনিতা
সকলের সঙ্গেই ইয়ার্কি আদান-প্রদান করেন,
এমন কি স্বকীয় বৃদ্ধা গৃহিণীর সঙ্গেও।
হাজির হলেন তিনি মেজবাবুর বৈঠকখানায়।
বললেন,
তোমাদের জামাই-হিট্‌লারের ভয়ে
ব্যাঘ্রসমাজ চেম্বার্‌লেন পাঠিয়েছেন আমার কাছে।
তোমার ঠানদি বুঝতে পারেন নি বটে,
আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম।
মেজবাবু বললেন, কি রকম?
কাল থেকে
একদম অচেনা একটা রোগা বেড়াল এসে জুটেছে
ভিজে ভিজে ভাব,
মাঝে মাঝে সকরুণভাবে চাইছে।
আমার বিশ্বাস,
ব্যাঘ্রসমাজের দূত ও,
আমার মারফৎ সন্ধির প্রস্তাব করতে চায়।
তোমাদের জামাইয়ের কাছে।
আমি হয়তো রাজিও হয়ে যেতুম,
কিন্তু কাল একটু যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি,
টপ ক'রে মাছটি তুলে নিয়েছে পাত থেকে।
সুতরাং অ-ক্ষম হয়ে পড়েছি,
ও পাষণ্ডদের আর ক্ষমা করতে পারব না।
এমন কি মনস্থ করেছি,
আমিও তোমাদের অভিযানে যোগদান করব।
মেজবাবু বললেন, ঠানদি?
তাঁর জন্যেই যাচ্ছি তোমার দাদার কাছে।
হেলে দুলে হাসতে হাসতে গেলেন ঠাকুরদা

বড়বাবুর কামরায়।
বললেন,
দেখ ভায়া,
আমিও যাচ্ছি,
কিন্তু হাতীতে, ঘোড়াতে অথবা গরুর গাড়িতে যাব না,
আমার চাই পালকি।
অর্থাৎ তোমার ঠানদিও যেতে চাইছেন,
পতিব্রতা নারীকে ঠেকানো মুশকিল।
বড়বাবু হেসে বললেন, বেশ তো।
গলার স্বর একটু খাটো ক'রে বললেন ঠাকুরদা,
সুবিধেও হবে।
তোমাদের ঠানদিকে চেনো তো ?
রিজার্ভ ফোর্স।
তোমাদের জামাইয়ের বন্দুক ফেল করলেও করতে পারে,
তোমাদের ঠানদি ফেল করবেন না কখনও।
ওইটুকু ছোট্ট মানুষ তো,
কিন্তু একবার গাছকোমর বেঁধে দাঁড়ান যদি,
বাঘেরও আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।
বড়বাবু তাঁর স্বাভাবিক দরাজ কণ্ঠে
অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন।
ঠাকুরদা গেলেন তারপর ছোটবাবুর কাছে।
ছোটবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন,
ভায়া,
তোমাদের নীলু দত্তকে ব'লে দিও,
একটু নিরিমিষ-টিরিমিষের ব্যবস্থাও যেন রাখে।
তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে
বাগান-বাড়িতে লুকিয়ে চুরিয়ে যা-ই করি,
সকলের সামনে ম্লেচ্ছাচরণ করতে পারব না।
বিশেষত,
তোমাদের ঠানদিও সঙ্গে যাচ্ছেন যখন

কোশাকুশি তাম্রকুণ্ড প্রভৃতি নিয়ে।
দেখো ভায়া,
ডুবিও না আমাকে যেন শেষকালে।
ছোটবাবু বললেন,
ঠানদিকেও আমরা দলভুক্ত ক'রে নেব,
ভাবছেন কেন আপনি!
ঠাকুরদা হেসে বললেন,
ঠানদি তোমাদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন হয়তো,
কিন্তু আমাকে তোমাদের দলভুক্ত দেখলে
খুশি হবেন না একটুও।
বাইরে থেকে আমার দুরবস্থাটা
তোমাদের নয়নগোচর হবে না ভাযা,
কিন্তু গজভুক্ত কপিত্থবৎ
আমার শূন্যতাটা অনুভব করতে থাকব আমিই কেবল।
ছোটবাবু চক্ষু দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে বললেন,
এত ভয় করেন আপনি ঠানদিকে?
ঠাকুরদা বললেন,
বিয়ে করেছ তরঙ্গিণীকে,
ক্ষেমঙ্করীর খবর জানবে কি ক'রে, বল?
মোট কথা,
বিপদে ফেলো না আমায ভাই।
হেলে দুলে চ'লে গেলেন ঠাকুরদা।
নাতিদীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি,
নগ্নগাত্র,
বুকময় কাঁচাপাকা চুল,
দক্ষিণ বাহুমূলে একটি রুদ্রাক্ষ,
পরনে থান,
পায়ে চটি।
অন্তঃপুরেও চঞ্চলতা জেগেছিল।
বৃদ্ধা গৃহিণী সেকেলে মানুষ,

মনে মনে তিনি সমর্থন করছিলেন না
মেয়েদের এই হুজুক-প্রবণতা।
বর্তমান যুগের মেয়েদের ওপরই
কেমন যেন অপ্রসন্ন তিনি।
তাদের আদিখ্যেতা,
বেহায়াপনা,
তাদের খুরওলা জুতো,
সুরওলা কথা,
তাদের কাঁধকাটা জামা,
নানা ছাঁদের শাড়ি,
অ্যাটাচি কেস, সুট কেস, ব্লাউজ কেস, ভ্যানিটি ব্যাগ,
ক্রীম, স্নো, রুজ, পাউডার,
যখন তখন গুনগুনিয়ে গান গাওয়া,
খুকীপনা,
ন্যাকামি,
ধিঙ্গির মতন ঘুরে বেড়ানো—
কিছুই ভাল লাগে না তাঁর।
সব যেন বদলে যাচ্ছে।
তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছিল—
সংস্কৃত মন্ত্র, লাল চেলী, পুজো-হোমের আবহাওয়ায়,
একজোড়া ঢাকী এসেছিল,
একজোড়া ঢুলী,
রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, নহবৎ, যাত্রা, ঢপ,
বরযাত্রী কন্যাযাত্রীতে মারামারি হয়েছিল,
লোক খেয়েছিল এক মাস ধ'রে,
চারটে বড় বড় হাঁড়া,
ছখানা পরাৎ
হারিয়েই গেছল গোলমালে।
এখন সেসব উঠে যাচ্ছে নাকি!
সোমত্ত সোমত্ত মেয়েরা

চুপিচুপি বিয়ে ক'রে আসছে আদালতে নাম সই ক'রে।
কালে কালে কতই যে হবে!
এই তো নিজের নাত্‌নী উষা,
তাকে কলেজেও পড়াতে হ'ল,
বিয়েও দিতে হ'ল এক বিলেত-ফেরতের সঙ্গে।
তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছিল ন বছরে
কুল, গোত্র, কুষ্ঠি বিচার ক'রে।
এর বিয়ে হ'ল উনিশ বছরে
কিচ্ছু বিচার না ক'রেই।
সবাই দেখলে কেবল ছেলের উপার্জন-ক্ষমতাটা।
ভাগ্যের উপর নির্ভর করে না কেউ,
নিজেরাই সব দেখে শুনে দিতে চায়।
অন্য কিছু দেখে না কিন্তু আজকাল,
দেখে কেবল টাকার দিকটাই।
কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ সবাই দেখছে টাকা,
টাকা না হ'লে বিয়ে হবে না।
ওই যে উষার কলেজী বন্ধুটি এসেছে,
তার এখনও বিয়ে হয় নি,
অথচ একটা মাগী!
নামেরই বা কি ছিরি
—মীনা!
বীণা হ'লেও বা মানে বোঝা যেত।
নাতজামাই বাঘ শিকার করতে আসছে,
আসুক না!
গুষ্টিসুদ্ধর যেতে ওঠবার কি আছে তাতে!
আগেও তো কর্তারা শিকারে যেতেন,
বড় বড় বাঘও মেরেছেন কত,
কিন্তু কই,
মেয়েরা কখনও তাঁদের সঙ্গী হতে চায় নি তো!
শিকারে সঙ্গী হওয়া দূরে থাক,

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত
ঘোমটা খোলবারই সাহস হ'ত না কারও ।
মেয়েদের জগতই ছিল আলাদা ।
জা, ননদ, শাশুড়ী, ছেলে, মেয়ে,
দূরসম্পর্কের পোষ্য-আত্মীয়ের দল,
পাড়া-পড়শী,
অতিথি-ভিকিরি,
পুজো-পার্বণ,
এদেরই কেন্দ্র ক'রে জীবন কাটত ।
পুরুষদের বার-মহলের খবর
মাঝে মাঝে পৌছত এসে বটে অন্তঃপুরে,
কখনও আবছাভাবে,
কখনও অতিরঞ্জিত হয়ে,
আন্দোলিতও করত মনকে,
কিন্তু ওই পর্যন্তই ।
সেকালের মেয়েরা
পুরুষদের সঙ্গে
এমন ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে,
এমন লেপটে থাকতে পারত না ।
তারা অবলা অশিক্ষিতা ছিল হয়তো,
কিন্তু তাদের এমন একটা যৌন মর্যাদা ছিল,
যা একালের মেয়েদের নেই ।
এরা মুখে বাহাদুরি করে বটে,
আমরা তোয়াক্কা করি না পুরুষদের,
আমরা স্বাধীন,
আমরা স্বাবলম্বী ;
কিন্তু ওটা যে শুধু ওদের মুখেরই কথামাত্র,
তা ওদের চোখের দৃষ্টিতে লেখা রয়েছে ।
ছুং ছুং ক'রে বেড়াচ্ছে যেন সব ।
আমাদের কালে

পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ ব'লে একটা কথা ছিল বটে,
কিন্তু পেটে ক্ষিধে মুখে অক্ষিধের আস্ফালন,
এটা নতুন ব্যাপার।
বৃদ্ধা গৃহিণী
ঠাকুরঘরে ব'সে ব'সে
হরিনামের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে
এই সব চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।
এমন সময়
ছোট বউ তরঙ্গিণী এসে বললেন,
ও মা, শুনছেন—
সুরেন চিঠি লিখেছে,
আপনাকে সুদ্ধু যেতে হবে শিকারে,
আপনি না গেলে ও যাবেই না লিখেছে,
এই নিন চিঠি।
বৃদ্ধা গৃহিণী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ,
তারপর বললেন,
ক্ষ্যাপা, না পাগল!
সবাই কি ক্ষেপে গেলি নাকি তোরা
আমি বুড়ো মানুষ কোথায় যাব!
তরঙ্গিণী মুখ টিপে একটু হেসে চ'লে গেলেন।
গৃহিণী ব'সে ব'সে ঘোরাতে লাগলেন মালা,
কিন্তু তাঁর অন্তরের নিভৃত প্রদেশে
ঘুম ভেঙে জেগে উঠল
বেণী-দোলানো এক খুকী
যে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে
বায়না করত নাগরদোলায় চড়বার জন্যে,
মেলায় যাবার জন্যে,
যাত্রা শোনবার সময় আসর ঘেঁষে বসবার জন্যে,
যে নাক বেঁধাতে আপত্তি করে নি নোলক পরবার জন্যে,
যে পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত,

ঝড় উঠলে আমবাগানে ছুটত,
সামান্য পুঁতির জন্যে লালায়িত হ'ত,
পুতুলের সংসার নিয়ে মেতে থাকত,
দাদার সঙ্গে লুকিয়ে আচার চুরি করত—
সেই খুকী।
কোথায় ছিল এ ?
বিধবা বৃদ্ধা গৃহিণীর
মরচে-পড়া কড়া-পড়া মনের তলায়
ঘুমিয়ে ছিল বুঝি এতদিন,
কঠিন বীজের ভিতর কচি অঙ্কুরের মত।
অনুকূল আলো-বাতাসে
কচি কচি পাতা দুটি মেলে
আকাশের দিকে তাকাল আজ।
নাত-জামাইয়ের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনে
বৃদ্ধা গৃহিণী চেয়ে দেখলেন নিজের মনের দিকে,
কুচকুচে কালো কচি এক জোড়া চোখ
আনন্দে উৎসাহে ভাষাময় হয়ে উঠেছে।
অবাক হয়ে গেলেন তিনি মনের কাণ্ড দেখে,
প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলেন সবেগে
হরিনামের মালাটা।

ছোট বউ তরঙ্গিণী,
সত্যিই যেন তরঙ্গিণী।
কথায়-বার্তায়
হাব-ভাবে
এমন একটা তরল প্রাণোচ্ছলতা বড় দেখা যায় না
হাসিতে গিটকিরি আছে,
হাসতে গেলে গালে টোল পড়ে,
মুখ টিপে মুচকি হাসে যখন,
তখন আরও বেশি ক'রে পড়ে।

চলনে আছে ভঙ্গিমা,
বলনে রঙ্গিমা,
ছিপছিপে দোহারা গড়ন,
টিকোলো নাক মুখ চোখ,
টকটকে রঙ,
মাথায় চওড়া সিঁদুর,
পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি,
ঠোঁট দুটি পানের রঙে টুকটুক করছে সর্বদাই।
পঁচিশ বছর বয়স হ'ল, -
তবু এখনও কাঁচপোকার টিপটি পরা চাই।
বছর আষ্টেক আগে টোকন হয়েছিল,
আর ছেলেপিলে হয় নি।
তরঙ্গিণী
মেজ-জা হিরণ্ময়ীর মহলে গিয়ে উঁকি দিলেন।
বললেন,
মেজদি, মাকে দিয়ে এলুম খবরটা।
মুখে যদিও আপত্তি করলেন,
কিন্তু মুখ দেখে মনে হ'ল নিমরাজি।
খুব মোক্ষম বুদ্ধিটা বার করেছিলে যা হোক!
উষাটাকে কিন্তু সামলে রেখো—
যা বকর বকর করে ও,
সব কথা ফাঁস না ক'রে দেয় শেষকালে!
কলেজে পড়লে কি হবে,
কিচ্ছু বুদ্ধি নেই ওর!
ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারটায় চাবি দিতে দিতে
হিরণ্ময়ী বললেন,
তুই নিজেকে সামলে রাখ দিকি।
উষাকে আমার তত ভয় নেই,
যত ভয় তোকে।
ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে

চ'লে গেলেন তরঙ্গিণী নিজের ঘরে।
ঘরে গিয়ে
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিতে নিতে
কল্পনায় দেখতে লাগলেন
প্রকাণ্ড একটা মাঠ,
তাতে তাঁবু
তাঁবুর ভেতর আর কেউ নেই,
কেবল——।
মুচকি হাসি ফুটে উঠল মুখে,
টোল পড়ল গালে।
হিরণ্ময়ীর গায়ে অন্যান্য বউদের মত
সোনার গয়না অবশ্য প্রচুর ছিল,
কিন্তু গায়ের রঙে ছিল না সুবর্ণ-দ্যুতি।
হিরণ্ময়ী শ্যামাঙ্গিণী।
চোখ-মুখও যে অসাধারণ রকম সুন্দর
তা নয়,
সাদামাটা।
বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।
ছেলেপিলে হয় নি,
সুতরাং ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনীও।
বড় বনিয়াদী বংশের মেয়ে।
একদা
যে বংশের দৌলতে
রূপের অনটন সত্ত্বেও
এ বাড়ির বধূপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন,
এ যাবৎ তিনি
সে বংশের মর্যাদা
রক্ষা ক'রে এসেছেন সগৌরবে।
এ বাড়ির সকলেরই তিনি মা।

নিজের স্বামীর প্রতিও তাঁর যে স্নেহ
তা অপত্যস্নেহ।
বাড়ির ঝি চাকর থেকে সুরু ক'রে
বড়বাবু পর্যন্ত
সকলেই তাঁর দাক্ষিণ্যভোগী।
বড়বাবুর সমস্ত পাঞ্জাবি
মেজমার হাতের তৈরি।
আহারাদির পর
মেজমার হাতের তৈরি খিলি চারেক পান না খেলে
তৃপ্তিই হয় না তাঁর।
বৃদ্ধা গৃহিণীও
মেজ বউয়ের হাতের রান্না খাবার জন্ত লোলুপ।
তাঁর মতে এ বাড়িতে
অমন সুক্ত আর কেউ নাকি রাঁধতে পারে না।
বাড়ির যত ছোট ছেলেমেয়ের আশ্রয়
মেজমা।
টোকনকে,
বড় জার ছেলে খোকনকে—
মেজমা-ই মানুষ করেছেন।
খোকন কলকাতায় আইন পড়ছে,
আসবে না সে এখন ;
এজন্য মেজমার মন একটু খুঁত খুঁত করছে।
ভেবেছিলেন,
স্থরেনকে লিখে দেবেন সঙ্গে ক'রে আনতে,
কিন্তু বড়দির ভয়ে পারেন নি।
বড় কড়া মেজাজের মানুষ বড়দি।

আশ্রিতারূপে
দূরসম্পর্কের এক ননদ এসেছেন বাড়িতে,
বড় মাটো বেচারী।

মেজমা না থাকলে
বড়দির প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করা
অসম্ভব হ'ত তার পক্ষে
তার পাঁচ বছরের ছেলে জিতু
(এখন সে গেছে তার এক মাসীর কাছে)
যখন এখানে থাকে,
মেজমার কাছেই শোয় রাত্তিরে।
বড়দির মেয়ে উষার যাবতীয় দুষ্কৃতি
মেজমাই চাপাচুপি দিয়ে এসেছেন এতকাল।
কলকাতায় যখন পড়তে গেল উষা,
প্রতি মাসেই তার খরচের অঙ্ক
বরাদ্দ টাকার অঙ্ককে ডিঙিয়ে যেত,
পূরণ করতে হ'ত মেজমাকে
গোপনে গোপনে।
ভাগ্যে বিয়ে হয়েছে
বড়লোকের ছেলে বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টারের সঙ্গে!
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন মেজমা।
ভাগ্যের কথা বলা তো যায় না,
যদি গরিবের ঘরে পড়ত উষা,
কি দুর্দশাই যে হ'ত ওই খরুচে মেয়ের!
সে দুর্ভাবনাটা গেছে বটে,
কিন্তু আর একটা নতুন দুর্ভাবনা জুটেছে।

তরঙ্গিণীর এক দূরসম্পর্কের ভাই—
হীরেন
এসেছে ছুটিতে বেড়াতে।
উষার সম্পর্কে মামা হয়,
কিন্তু বয়স বেশি নয়।
বড় জোর
উষার চেয়ে বছর তিন চার বড় হবে।

ব্যাড্‌মিণ্টন খেলতে গিয়ে
কি যে কাণ্ড করে উষা তার সঙ্গে!
হাসাহাসি, হুড়োহুড়ি, ব্যাট-কাড়াকাড়ি—
বিশ্রী দৃষ্টিকটু ব্যাপার!
দিদি এতদিন এটা লক্ষ্য করেন নি,
সেদিন কে যেন তাঁর কানে তুলে দিয়েছে কথাটা,
রেগে আগুন হয়ে উঠেছিলেন তিনি।
মেজমাও পছন্দ করেন না এসব,
তবু উষার হয়ে সাফাই গাইতে হ'ল তাঁকে।
ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজটা বন্ধ ক'রে
বেরিয়ে এলেন মেজমা,
তাঁর খাস ঝি কাদম্বিনীকে ডেকে বললেন,
কই, কোথায় ময়রা-বউ?
ডেকে দে তাকে।
কালো-কোলো ময়রা-বউ এল একটু পরে
সসঙ্কোচে।
তার নাকে প্রকাণ্ড নথ,
নথে টানা,—
লাগাম টেনে সামলে রেখেছে যেন নথটাকে।
মেজমা বললেন,
ময়রা-বউ,
আমার জন্যে সের দশেক কাঁচাগোল্লা
তৈরি ক'রে দিতে হবে দুদিনের মধ্যে
আলাদা ক'রে।
তারপর একটু হেসে বললেন
চুপি চুপি,
পারবি তো?
ঘাড় কাত ক'রে ময়রা-বউ জানালে, পারবে
দাম তোর আগাম দিয়ে দিচ্ছি, নে,
জিনিস কিন্তু ভাল চাই।

সসঙ্কোচে বললে ময়রা-বউ,
দাম পরে নোব মেজমা,
জিনিস হোক আগে।
শুনলেন না মেজমা সে কথা,
বললেন,
কি দরকার বাপু তার!
সেবারকার মত
গোলেমালে শেষটা ভুলে যাব আমি,
তোরাও চেয়ে নিবি না মনে ক'রে।
একরকম জোর ক'রেই
দামটা গুঁজে দিলেন তার হাতে।
ব'লে দিলেন বারবার ক'রে,
জিনিস ভাল হওয়া চাই কিন্তু।
পুলকিত ময়রা-বউ
বেরিয়ে গেল খিড়কি-দুয়ার দিয়ে
টাকা ক'টি আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে।
মেজমা নিশ্চিন্ত হলেন।

শিকারে যদি যেতেই হয়,
ওই মাঠের মাঝখানে
নিজের আয়ত্তের মধ্যে কিছু খাবার না থাকলে
কিছুতে স্বস্তি পাবেন না তিনি।
ছেলে-পিলে,
চাকর-বাকর,
দাই-ঝি,
সবাই যাবে;
তাছাড়া মেজবাবুর মিষ্টি না হ'লে মুশকিল,
একটি বেলা চলবার উপায় নেই।
ওখানে পাঁচ ভূতের কাণ্ড,
নিজের সঙ্গে কিছু মিষ্টি না থাকলে চলে?

শিকারে যাবার হুজুকটি তুলেছে
ছোট বউ, উষা আর মীনা।
কলমিপুর অঞ্চলে
বাঘ বেরিয়েছে একটা।
উষা সেই খবরটি দিয়েছে স্থরেনকে
(দেবার মতন আর খবরও পায় নি মেয়ে !)
স্থরেন উৎসাহিত হয়ে উঠেছে,
শিকার করতে হবে বাঘটাকে।
শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, সবাইকে চিঠি লিখেছে,
উষাকে লিখেছে তোমাদেরও যেতে হবে।
বিলেতে মেয়েরা
হামেশাই এমন গিয়ে থাকে,
তোমরাই বা যাবে না কেন ?
এখন
'তোমরা'-নামক বহুবচন সর্বনামটি
স্থরেন গৌরবে ব্যবহার করেছিল কি না,
তা নির্ধারণ না ক'রেই
তরঙ্গিণী উচ্ছুসিত হয়ে উঠল
এবং উচ্ছুসিত ক'রে তুলল মীনাকে।

মীনা মেয়েটি
একটা চাপা গম্ভীর স্বভাবের,
চট ক'রে চাপল্য প্রকাশ করে না;
কিন্তু তরঙ্গিণীর তরঙ্গ আঘাতে
সেও বিচলিত হ'ল।
উষা বলতে লাগল,
নিশ্চয়ই,
সব্বাই মিলে যাব আমরা,
যাব না তো কি !
কলমিপুরের মাঠে

মজা ক'রে
তাঁবু ফেলে সব থাকা যাবে একসঙ্গে।
সমস্ত শুনে মেজমা বললেন,
কিন্তু একটা 'কিন্তু' আছে এর মধ্যে।
বড়দি রাজি হ'লেও হতে পারেন,
জামাইয়ের অনুরোধ
হয়তো গ্রাহ্য করলেও করতে পারেন তিনি
(যদি মেজাজ ঠিক থাকে),
কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হবেন না।
আর মাকে ফেলে আমাদের যাওয়াটা
ভাল দেখাবে না।
অন্তত
আমি যেতে পারব না।
তরঙ্গিণী আবদারের সুরে বললে,
তোমাকে যেতেই হবে মেজদি,
তুমি না গেলে কেউ যাব না আমরা।
তুমি গিয়ে মাকে একটু বল না,
তোমার কথায় তো উনি ওঠেন বসেন !
স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন মেজমা ;
তারপর বললেন,
তা হ'লে এক কাজ কর তুই উষা,
সুরেনকে লেখ,
মাকে যেন নেমন্তন্ন করে আলাদা ক'রে।
নাতজামাই পীড়াপীড়ি করলে
হয়তো রাজি হয়ে যেতে পারেন।
মা মনে মনে বেশ হুজুকে আছেন এদিকে,
সেবার মনে নেই,
সমস্ত রাত ব'সে যাত্রা শুনলেন—অভিমন্যুবধ ?
বড়দিকেও আলাদা একটা চিঠি লিখতে বলিস।
বড়দিকে রাজি করাও সহজ নয়,

কথন যে কি মেজাজে থাকেন ঠিক নেই,
জামাইয়ের খাতিরেই যদি রাজি হন।
মেজমার কথামত
উষা চিঠি লিখলে সুরেনকে,
ঈপ্সিত ফলও ফলল।

বড়দি রাজি হয়েছেন,
মাও নিমরাজি।
মেজমা নীচে নেবে যাচ্ছিলেন,
এমন সময় পেছন দিক থেকে এসে
জাপটে ধরলে তাঁকে টোকন।
মেজমা, আমাকেও একটা এয়ার-গান কিনে দাও,
আমিও জামাইবাবুর সঙ্গে বাঘ মারব
মাচায় উঠে ব'সে।
মেজমা বললেন,
তোমার জগদেও পাঁড়ে তো বলেছে,
আছড়ে মারবে বাঘকে,
বন্দুকের আর দরকার কি?
টোকন তার বড় বড় চোখ দুটো
আরও বড় ক'রে বললে,
জান মেজমা,
সমস্ত শুনে-টুনে জগদেও পাঁড়েও ভয় পেয়েছে?
চাঁপা যখন বললে,
বাঘকে আছাড়ে মারা সোজা নাকি?
হালুম ক'রে একবার যদি তেড়ে আসে,
পালাতে পথ পাবে না তুমি।
শুনে পাঁড়ের মুখ
ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেল।
তারপর আমাকে চুপি চুপি বললে,
চাঁপা যা বলছে তা ঠিক,

একটা বন্দুকই তুমি যোগাড় কর ভেইয়া।
আমাকে একটা বন্দুক কিনে দাও মেজমা,
আট্যিদের দোকানে আছে—
আমি দেখে এসেছি।
মেজমা বললেন, আচ্ছা, সে হবে এখন,
আমাকে এখন ছাড় দিকি তুই।
পাঁড়েটার মতিচ্ছন্ন ধরছে যেন দিন দিন!
মেজমা ছদ্ম কোপে গর গর করতে করতে
নেবে গেলেন নীচে।
বাড়ির যিনি বড় বউ,
তাঁর যে এককালে ডাকনাম ছিল অনু.
তা আজকাল প্রায় সকলেই বিস্মৃত হয়েছে,
এমন কি তিনি নিজেও বোধ হয়।
এখন তিনি বড় বউ,
বিকল্পে—বড়দি।
মিষ্টি অনু নামটা হারিয়ে গেছে।
অনু নামটা অবশ্য
গুরু-গম্ভীর অনন্তময়ীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।
কাকতালীয়বৎ
মানুষ মাঝে মাঝে
এমন দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয় যে,
অবাক হতে হয়।
অনুর যেদিন জন্ম হ'ল,
সেদিন পুরোহিত মশাই ওর নামকরণ করিলেন—
অনন্তময়ী।
কারণ
সেদিন ছিল অনন্তচতুর্দশী।
কিন্তু নামটি যে
এমন হুবহু খাপ খেয়ে যাবে
মেয়েটির চরিত্রের সঙ্গে,

তা কেউ তখন ভাবে নি।
অদ্ভুত খাপ খেয়ে গেছে কিন্তু,
বড বউ সত্যিই অনন্তময়ী।
বয়স চল্লিশের কাছাকাছি,
এই বাড়িতেই কাটল প্রায় পঁচিশ বছর,
কিন্তু কেউ এখনও তাঁর অন্ত পায় নি,
কেউ ধরতে পারে নি তাঁর ঠিক রূপটি কি।
বাইরের রূপ
এখনও যেন ফেটে পড়েছে।
এত বয়সেও লাবণ্য এতটুকু কমে নি।

আরও আশ্চর্য,
একই রূপ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হয়!
যখন পুজোর ঘরে থাকেন,
তখন নিষ্ঠাবতী পূজারিণী;
সেই মানুষই আবার প্রসাধন-কক্ষ থেকে বেরোন যখন,
তখনই অভিসারিকা।
আদেশ করেন সম্রাজ্ঞীর মত,
আদেশ পালনও করেন পরিচারিকার মত বিনা বাক্যে।
রেগে গেলে যিনি আগ্নেয়গিরি,
প্রসন্ন হ'লে তিনিই স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা
অদ্ভুত অভিনেত্রী
একই মুখে কমলার কমনীয়তা
এবং চামুণ্ডার বিভীষিকা ফোটাতে পারেন।
সুধামুখী নিমেষে রূপান্তরিত হতে পারে
উল্কামুখীতে।
পেলব পুষ্পহার
কখন যে ভুজঙ্গিনী হয়ে উঠবে,
কেউ বলতে পারে না।
সবাই তাই ভয় করে,

কেবল একজন ছাড়া,
তিনি বড়বাবু।
বড়বাবু বড় বউয়ের দিকে
ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার অবসরই পান নি জীবনে.
চেষ্টাও করেন নি।
বড়বাবু
দিলদরিয়া জমিদারের
দিলদরিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র।
নানা রঙ্গমঞ্চে তাঁর গতায়াত,
গৃহ-রঙ্গমঞ্চেও যে
প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর আবির্ভাব হতে পারে
সে খেয়াল করেন নি।
বিয়ে করেছেন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী,
সালঙ্কারা বউকে এনে স্থাপন করেছেন গৃহে—
একটা আসবাব
কিম্বা বড় জোর একটা বিগ্রহের মত।
আসবাবের তদারকের
অথবা বিগ্রহের সেবার
যথারীতি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।
একটা আসবাব অথবা বিগ্রহ নিয়ে
উন্মত্ত হয়ে ওঠবার মত
হ্যাংলামি ছিল না তাঁর।
বড়বাবুর পরিচিত বহু নরনারীর মধ্যে
বড় বউও একজন,
তার বেশি আর কিছু নয়।
হয়তো বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারতেন বড় বউ,
প্রসাধন-বৈচিত্র্যময়ী অভিনেত্রীর অন্তরালে
হয়তো সত্যিকারের প্রিয়া একদিন দেখা যেত,
কিন্তু ঘটনাচক্রে
ব্যবধানটা আরও বেড়ে গেল।

বাইরে মদ খেয়ে
স্ত্রীর ভয়ে এলাচ লবঙ্গ চিবুতে চিবুতে
চোরের মত অন্দর-মহলে ঢোকেন যাঁরা,
বড়বাবু সে জাতের লোক নন।
যথারীতি
ঈষৎ মত্তভাবেই
প্রবেশ করতেন অন্তঃপুরে।

বড় বউ একদিন আপত্তি জানালেন কুঞ্চিত নাসায়।
বড়বাবু বললেন,
দেখ বড়বউ,
তুমি পান দিয়ে দোক্তা খাও, না জরদা খাও,
কুমড়ো-ডাঁটা অথবা পুঁই-ডাঁটা
কোন্‌টা তোমার প্রিয়তর,
কি ধরনের শাড়ির পাড় তোমার পছন্দ,
তোমার গলায়
হার না চিক
কোন্‌টা ঠিক মানায়,
দোতলার জানলা দিয়ে পর-পুরুষের দিকে চেয়ে থাকতে
তোমার ভাল লাগে, কি লাগে না—
এসব নিয়ে কোন দিন তো মাথা ঘামাই নি আমি!
ইচ্ছেই হয় না।
তোমার হঠাৎ এই নীচ প্রবৃত্তি কেন?
I was given to understand,
তুমি আমার সহধর্মিণী।
কোন উত্তর দিলেন না বড় বউ,
চুপ ক'রে ব'সে রইলেন নাসা কুঞ্চিত ক'রে।
বড় বউয়ের নাকের পানে
কিছুক্ষণ ঢুলু-ঢুলু নয়নে চেয়ে থেকে
বড়বাবু বললেন, অল্ রাইট।

আর মদ খেয়ে তোমার সমীপস্থ হব না।
যখন তখন এবং যে কোন অবস্থায়
সমীপস্থ হবার রাইট আছে ব'লেই হব না
I am a gentleman, madam,
অকারণে একজন লেডির নাসারন্ধ্রকে
বিক্ষুব্ধ করতে চাই না।
তুমি তোমার নানা রকম শাড়ির বাণ্ডিল
আর নানা রকম গয়নার বোঝা নিয়ে
সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।
সেই দিন থেকে আর মদ খেয়ে
অন্দর-মহলে আসতেন না তিনি।
যখন আসতেন, অত্যন্ত অবিচলিতভাবে আসতেন,
অবিচলিতভাবে থাকতেন,
অবিচলিতভাবে চ'লে যেতেন।
এবং এই ক'রেই জন্মাল
নীলু দত্তের ভ্রান্ত ধারণাটা।
নীলাম্বর দত্তের বিশ্বাস—
বড়বাবু বাইরে মদ খান
বড় বোয়ের ভয়ে।
হায় রে, নীলু দত্ত,
বড়বাবুর খোসামোদ কর বটে তুমি,
কিন্তু বড়বাবুর সমঝদার তুমি নও।
তাই
লাহিড়ীর কাছে বারম্বার পরাস্ত হচ্ছ।
বড়বাবুর মদ খাওয়ার একটু বৈশিষ্ট ছিল,—
যখন খেতেন,
তখন একটানা দু'তিন দিন খেতেন,
অর্থাৎ 'সেশন্‌স' চলত।
যখন খেতেন না,
তখন খেতেন না।

বড়বাবু যে ইংরেজী জানেন,
তা বোঝা যেত মদ পেটে পড়লে,
এবং তিনি যে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ ,
তা কোন কালেই বোঝা যেত না ।
শুধু যে স্ত্রীর প্রতিই তাঁর ঔদাসীন্য ছিল তা নয়,
আত্মীয়স্বজন,
বন্ধুবান্ধব,
জমিদারি, কলিয়ারি,
এমন কি ছেলেমেয়ের সম্বন্ধেও
তিনি উদাসীন।
পদ্মপত্রের মত তাঁর মনখানি,
কত শিশিরবিন্দুই যে তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে !
নতুন জামাই বাঘ শিকার করতে চেয়েছে ?
বেশ তো, আসুক ।
জয়দ্রথবধ কিম্বা অভিমন্যুবধ শোনবার জন্যে
যদি সারারাত্রি সামিয়ানার তলায় কাটানো সম্ভব হয়,
শার্দুলবধ উপলক্ষে
কলমিপুরের মাঠেই বা একরাত্রি কাটাতে আপত্তি কি !
ঢালা হুকুম দিয়েছেন নীলু দত্তকে,
চলুক আয়োজন ।
বড় বউ কিন্তু উৎসাহিত হয়েছেন অন্য কারণে,
এবং সে কারণটা
আপাতদৃষ্টিতে এত ছেলেমানুষি
এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এত নিগূঢ়
যে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে
পণ্ডিতমহলে হাতাহাতি হবার সম্ভাবনা ।
বড় বউ যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন,
তাক লাগিয়ে দিতে চান সকলকে ।
এই তাক লাগানো প্রবৃত্তিটা
তাঁর বংশগত ।

যে বাড়ির মেয়ে তিনি,
সে বাড়ির সবাই
একটু উদগ্র রকমের আধুনিক।
দুজন ক্রিশ্চান হয়েছেন, দুজন ব্রাহ্ম,
আত্মহত্যা করেছেন একজন,
বাড়িতে শুধু বিলেত-ফেরত নয়,
জাপান-ফেরত লোকও আছেন।
সেকালের হিসেবে একটু বেশি বয়সেই,
অর্থাৎ পনরো বছরে
বিয়ে হয়েছিল অনন্তময়ীর।
কিন্তু ওই পনরো বছরের মধ্যেই
দাদাদের উৎসাহে,
গৃহশিক্ষকের সহায়তায়,
বাংলা ইংরেজী নভেল নাটক পড়বার বিদ্যেটা
আয়ত্ত করেছিলেন তিনি।
আধুনিক অনাধুনিক
সুপাচ্য দুষ্পাচ্য
নানাবিধ উপ এবং রূপ-ন্যাস
একদা ভারাক্রান্ত করেছিল তাঁর মানসিক পাকস্থলীকে।
উদ্গারের জ্বালায়
আধুনিকমনা দাদারা পর্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তেন;
কণ্ঠস্বর সত্যিই অনিন্দনীয় ছিল।
প্রাক্‌বিবাহযুগে,
ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে
তাক লাগিয়ে দিতেন সকলের।
কিন্তু ভাগ্যবিধাতাও
তাক লাগাতে কম ওস্তাদ নন।
এই তন্বী আধুনিকাকে বানিয়ে ছাড়লেন
সনাতনপন্থী জমিদার-বাড়ির বড় বউ।
সরম-মন্থর পদক্ষেপে

তীক্ষ্ণভাষিণী রাশভারী শাশুড়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই
জীবনের লক্ষ্য হ'ল।
তিনি যে আধুনিকা,
সেটা এ বাড়িতে গৌরবের বস্তু হ'ল না,
সেটাকে লজ্জায় চাপা দিতে হ'ল ঘোমটার তলায়।
সনাতনী হিন্দুবাড়ির বড় বধূর ভূমিকাতেও
অনন্তময়ী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।
এমন কি,
মাঝে মাঝে ভুলেও যেতেন যে, অভিনয় করছেন।
এই ভাবেই দিন কাটছিল;
স্তরের ওপর স্তর প'ড়ে
অবলুপ্ত ক'রে ফেলেছিল
নিত্যনবায়মানা আধুনিকাকে।
সহসা যৌবনের শেষ প্রান্তে
নিজের কলেজে-পড়া নবোদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ের সংস্পর্শে এসে
অন্তঃসলিলা ফল্গু উদ্বেল হয়ে উঠল।
বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার জামাই
মেয়েকে নিয়ে শিকারে যেতে চায়।
হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন,
জীবনটা বৃথাই গেছে।
হঠাৎ ঈর্ষা হ'ল—
মেয়ের ওপরই ঈর্ষা হ'ল।
সুরেনের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা কোলের ওপর প'ড়ে ছিল,
স্তব্ধ হয়ে ব'সেছিলেন তিনি,
ভাবছিলেন, যাব, কি যাব না,
হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললেন, যাব, নিশ্চয় যাব,
ওদের তাক লাগিয়ে দিতে হবে।
কলমিপুরের মাঠে
এমন একখানা অভিনয় করতে হবে,
যা শুধু সুরেন উষাকেই নয়,

বড়বাবুকেও বিস্মিত করবে।
চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন তিনি,
কি করবেন,
কোন্ শাড়িখানা পরবেন !
প্রৌঢ়া বড় বউয়ের পক্ষে এ আচরণ অশোভন ?
হয়তো।
উষার বয়স যদিও উনিশ হয়েছে,
শরীরে যৌবন সুপরিস্ফুট,
আই. এ. পাস করেছে,
তবু সে এখনও বালিকা—
ছটফটে, আদুরে, অসংসারী।
দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়,
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়,
ঠোঁট তো ফুলেই আছে !
একটু ধমক দিয়ে কথা বললে
এখনও চোখ ছলছল করে মেয়ের।
কোথায় কোন্ কথা কি ভাবে বলা উচিত,
অপ্রিয় সত্যকে
কি ক'রে একটু ঘুরিয়ে প্রিয় করতে হয়,
কখন চোখ নামানো উচিত,
কাপড় সামলানো উচিত—
কিচ্ছু জানে না।
অত জোরে কথা কওয়া,
অত চেঁচিয়ে হাসা,
অমন ছমছমিয়ে চলা যে অশোভন,
সে জ্ঞান হয় নি এখনও ভাল ক'রে।
মন প্রস্তুত হবার আগেই
যৌবনটা এসে গেছে দেহে
অকালবসন্তের মত।
দেহটা যত নিটোল হয়েছে,

মনটা তত নিটোল হয় নি,
মনের এখনও অনেক পুরতে বাকি।
মনের গাম্ভীর্য আসে নি,
নিগূঢ়তা ঘনায় নি,
গোপনলোক আবিষ্কৃত হয় নি।
যা মনে আসে হাউ হাউ ক'রে বলে,
স্বামীর চিঠি সবাইকে দেখায়,
কোন সঙ্কোচ নেই।
কোন কিছু রেখে-ঢেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।
বস্তুত
সে প্রয়োজনই ঘটে নি ওর।
মনের যে পরিণতি হ'লে
মন গোপনতা-বিলাসী হয়,
সে পরিণতিই হয় নি।
ও যদি আর একটু গম্ভীর হ'ত,
তা হ'লে এই ব্যাপার নিয়ে
এমন ক'রে পাড়া গাবিয়ে বেড়াত না।
এই শিকার-অভিযানে
ওই যে কেন্দ্রবর্তিনী,
ওর স্বামীই যে এই অভিযানের নেতা—
তা ও নিজেও ভুলছে না,
কাউকে ভুলতেও দিচ্ছে না।

একমুখ পান খেয়ে
পাড়ায় পাড়ায়
নিজের মনের খুশির ঢাকটা পিটিয়ে বেড়াচ্ছে।
বকবকানির চোটে
সাদা কাপড়ে লেগেছে পানের ছোপ খানিকটা,
সাদা গালেও—
ভির্বকভাবে,

অসাবধানে ঠোঁট পুঁছতে গিয়ে।
মীনা মেয়েটি,
গাণিতিক নিয়ম অনুসারে
উষার সমবয়সী।
কিন্তু আসলে মীনা ঢের বেশি বড়।
তার প্রমাণ—
ওর সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে,
মৃদু কথাবার্তায়,
সংযত গমনভঙ্গিমায়।
নিজেকে বিজ্ঞাপিত করবার কোন চেষ্টা তো নেই-ই,
অবলুপ্ত করতে পারলে যেন বাঁচে ;
এবং সেইজন্যই সম্ভবত
আরও বেশি করে প্রত্যক্ষ-গোচর।

যখন যেখানে থাকে,
চুপ ক'রেই থাকে,
কিন্তু পূর্ণ ক'রে রাখে সমস্ত স্থানটা।
ওর সসঙ্কোচ মৌনতা
মুখরতম বিজ্ঞাপনের চেয়েও আকর্ষক।
অর্থাৎ
মীনা সত্যিই যুবতী।

রূপসী কি না,
সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে,
আছেও।
বিয়ের বাজারে
জ্যামিতি-পরিমিতিজ্ঞ
যেসব রংরেজ সমঝদারেরা
নাকের মাপ, চোখের পরিধি,
ঠোঁটের স্থূলতা, বর্ণের ঘনত্ব মেপে বেড়ান,

তাঁরা
মীনাকে পাস-মার্কা দেন নি।
পাঁচ সাত বার
পাঁচ সাত দল লোক দেখে গেছেন,
কেউ পছন্দ করেন নি।
বিধাতার এই সৃষ্টিটিতে
নানা রকম খুঁত দেখতে পেয়েছেন তাঁরা।
কেরানি, ডাক্তার, উকিল, মাস্টার,
দালাল, দোকানদার,
এমন কি বেকার পাত্রেরও
পাণিপীড়ন করবার সামাজিক অনুমতি
মীনা পায় নি।
মাপ-জোকে অনেক খুঁত ধরা পড়েছে।
রঙ কালো,
চোখ ছোট,
নাক থাঁদা,
চুল কম।
শ্রী?
ওটা তো মাপা যায় না,
সেইজন্যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।
তা ছাড়া,
কালো রঙ, ছোট চোখ, থাঁদা নাক, কম চুলকে
অর্থপূর্ণ করতে পারতেন যে অর্থবান পিতা,
তিনিও নেই।
তিনি মীনার বাল্যকালেই মারা গেছেন।
মা লেখাপড়া জানতেন,
তাই
পরের গলগ্রহ হতে হয় নি।
শিক্ষয়িত্রীগিরি ক'রে মানুষ করেছেন মেয়েকে;
স্কুলের কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন,

বি. এ. পাস করলে
মীনাকেও বাহাল ক'রে নেবেন ইস্কুলে।
এই ভবিষ্য জীবনের অনুপাতেই
নিজেকে প্রস্তুত করেছে মীনা।
তার অসংযত আশা
অশোভন মত্ততায়
আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে নি কখনও।
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সে সন্তুষ্ট ছিল।

উষার বাড়িতে এসে,
তাদের ঐশ্বর্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে
আরও কেমন যেন বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে সে।
সর্বদাই সশঙ্কিত—
পাছে কেউ কিছু মনে করে,
পাছে কেউ মনে করে,
এ বাড়িতে সে বেমানান আগন্তুক,
এ বাড়ির উঁচু-পর্দায়-বাঁধা চালচলনের সঙ্গে
চলতে পারছে না তাল রেখে,
পাছে তার অনাভিজাত্য আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলে।
তাই,
মনে মনে সশঙ্কিত হয়ে থাকলেও
মীনা বাইরে সপ্রতিভ।
এবং এই সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখবার জন্যেই সে
কৃত্রিম একটা উৎসাহ প্রকাশ করছে
এই শিকার-বিষয়ে।
আসলে সে নির্জনতাপ্রিয়,
ভালবাসে
ঘরের কোণে
চুপ ক'রে একখানা বই নিয়ে প'ড়ে থাকতে।
হৈ-চৈ ভিড় মোটেই ভালবাসে না।

কিন্তু
কেউ যদি মনে মনে ভাবে,
মাস্টারনীর মেয়ে তো হাজার হোক,
এ সবের মর্ম ও আর কি বুঝবে !
তাই,
অতিশয় মেকি একটা উৎসাহকে
চোখে মুখে ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে সে—
মর্মান্তিক বেদনাকে ঢাকবার জন্যে
লোকে যেমন হাসে,
অনেকটা তেমনই ।

অন্তঃপুরের অন্যান্য পরিজনেরা
খুব যে একটা উৎসাহ প্রকাশ করছিলেন তা নয় ,
করবার কথাও নয় ।
বৃদ্ধা পিসীমা হাঁপানি নিয়েই ব্যস্ত,
বুকে পিঠে পুরোনো ঘি মালিশ ক'রে
অতি কষ্টে দাওয়ায় এসে বসেন সকালবেলায় ,
পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যায় ।
গিন্নীর দূরসম্পর্কের বিধবা বোন-ঝি
প্রাণপণে বৈধব্য পালন করেন,
নিয়মের পান থেকে এতটুকু চুন খসবার জো নেই,
মাথার চুল বেটাছেলের মত ছাঁটা,
নানা ওজুহাতে প্রায়ই উপবাস করেন,
একাদশীর উপবাসটা এমন নিদারুণ রকম নির্জলা যে
নিষ্ঠীবন পর্যন্ত গলা দিয়ে গলতে দেন না,
সারাদিন ব'সে থুতু ফেলেন ।
মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়স,
কিন্তু কৃচ্ছ্র-ক্লিষ্ট কি কঠোর মুখমণ্ডল !
তিনি এ অভিযানে যোগদান করবেন কি না,
সে প্রশ্নই ওঠে না ।

আর একজনের সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে না,
সে শিবুর মা।
বাড়ির অনেক কালের পুরোনো ঝি—
বড়বাবুকে হতে দেখেছে।
সে কক্ষনও কোথাও যায় না।
শনের মত সাদা মাথার চুল
পীতাভ হয়ে এসেছে,
জরার প্রকোপে মুখখানা হয়েছে পোড়া বেগুনের মত,
হাতের লোল চর্মের তলায় দেখা যাচ্ছে মোটা মোটা শিরাগুলো,
মাথা কাঁপে,
গলার স্বরও কাঁপে,
কুঁজো হয়ে গেছে,
দু চোখে পিচুটি ভরা।
শিবুর মা কক্ষনও কোথাও যায় না,
বলে, একেবারে যমের বাড়ি যাব।
যমও কিন্তু ভুলে আছে।
কত লোকের মরণই যে দেখলে শিবুর মা,
আরও হয়তো কত দেখতে হবে!
অদৃষ্টে যা আছে রোধ করবে কে!
কিন্তু সে ভিটে ছেড়ে কোথাও নড়বে না,
সবাই যেখানে যাবার যাক,
শিবুর মা ভিটে আগলে প'ড়ে থাকবে
আর বকর বকর করবে আপন মনে।

জিতুর মা,
অর্থাৎ দূরসম্পর্কের সেই মাটো ননদটি
যাবে।
হয়তো যেত না,
(বিধবারা আবার সখ ক'রে কোথায় যায়!)
কিন্তু বুড়ো গিন্নীমা যাবেন,

শুদ্ধাচারে তাঁর রান্নাবান্না করার জন্ত
একজন চাই তো !
আজকাল জিতুর মা-ই সব করে।
মাটো স্বভাবের জন্ত বকুনি খায় সকলের কাছ থেকে,
কিন্তু বেচারী নীরবেই কাজ ক'রে যায়
চুপটি ক'রে
মুখটি বুজে।
জিতুর মা ছাড়া আর যাবে
তিন বউয়ের তিনজন খাস চাকরানী,
আর তিন বাবুর তিনজন খাস চাকর।
চাকরানীদের মধ্যে
লছমনিয়ারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।
কারণ তার বয়স সবচেয়ে কম।
বড় বউ
নিজের বাপের বাড়ি পাটনা থেকে
আনিয়েছেন লছমনিয়াকে।
ওর স্বামী ভিকুও চাকরি করে এ বাড়িতে,
ছোটবাবুর খানসামা সে।
লছমনিয়া বেহারিনী,
কিন্তু বাংলা বলে চমৎকার,
এত চমৎকার যে ধরা শক্ত।
রঙানো ফুলপাড় পাতলা শাড়িটি প'রে
মাথার চুলটি পরিপাটি ক'রে বেঁধে
সর্বদাই ছিমছাম ;
ছিপছিপে চেহারা,
ভারী খরখরি,
দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।
ভিকুও যাবে।
ভিকু বেচারী ভালমানুষ গোছের লোক,
লছমনিয়ার মত স্ত্রীকে নিয়ে

সর্বদাই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়,
লছমনিয়ার সঙ্গে জোড় মেসে নি।
কিন্তু আপাতদৃষ্টিটাই কি সব ?
সব যবনিকাই কি স্বচ্ছ ?

মেজমার চাকরানী কাদম্বিনী—
সংক্ষেপে কাদু,
এই গ্রামেরই মেয়ে।
চার পাঁচ ছেলের মা,
ভারিক্কি চেহারা,
হাতে কপালে উল্কি,
বাহুমূলে থলথল করছে চর্বি,
সর্বদাই একমুখ হাসি,
ভারী মিষ্টভাষিণী।
প্রত্যহ
প্রকাণ্ড গামলায় ক'রে ভাত,
এক জামবাটি ডাল,
তদুপযুক্ত তরকারি নিয়ে
সে বাড়ি যায় দুপুরে
ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে।
স্বামীটিও অকর্মণ্য,
এককালে গাড়োয়ানি ক'রে কিছু উপার্জন করত,
কিছুদিন থেকে বাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছে।
মেজমার দাক্ষিণ্যেই সংসার চলছে।
মেজমার সঙ্গে যেতে হবে শুনে
কাদম্বিনীর চিন্তা হ'ল,
ছেলেমেয়েদের আর স্বামীকে দেখবে কে !
মেজমা বললেন,
তার ব্যবস্থা করবেন তিনি মেজবাবুকে ব'লে।

করলেনও।
মেজবাবু ছোটবাবুকে বলেছেন
এবং ছোটবাবু আদেশ করেছেন নীলু দত্তকে।
ছোটবাবুর আদেশ শুনে
নীলু দত্তের মনে হ'ল,
আঃ, ফ্যাসাদ এক রকম!
বাইরে অবশ্য অন্য ভাব দেখালেন,
কুঞ্চিত কপাল থেকে ঘামটা মুছে ফেলে বললেন,
ওর জন্যে আর ভাবনা কি,
এক্ষুণি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।
বলে দিলেন অতিথিশালার পাচককে,
কাদম্বিনীর বাড়িতে যেন রোজ ভাত দিয়ে আসা হয়।
তবু কাদম্বিনীর মন খুঁতখুঁত করছে—
কোলের ছোট ছেলেটা কি ছেড়ে থাকতে পারবে?
অত দূরে টেঙিয়ে টেঙিয়ে নিয়ে যাওয়াও তো মুশকিল।
বড় মেয়ে সদুর কাছেই রেখে যেতে হবে,
তা ছাড়া আর উপায় কি!

তরঙ্গিণীর চাকরানী কালীর মা।
বিধবা,
কৈবর্তের মেয়ে।
বিধবা ব'লেই যে শ্রীহীন তা নয়,
গড়নই ওই রকম।
লম্বা শুকনো কাঠ-কাঠ চেহারা,
সর্বাঙ্গে
মাংসের চেয়ে হাড়ই বেশি,
চক্ষু কোটরগত,
হাসলে দাঁতের চেয়ে বেশি দেখা যায় মাড়ি।
কালীর মাকে দেখে
চেষ্টা ক'রেও মুগ্ধ হওয়া শক্ত।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে
তরঙ্গিণীর অন্তরঙ্গিণী।
তার কারণ
সে চমৎকার ঘর পুঁছতে পারে,
চমৎকার সাবান কাচে,
পরিষ্কার বাসন মাজে,
বিছানা করে পরিপাটিরূপে—
একটু কোথাও কুঁচকে থাকে না,
টেবিল, দেরাজ, আয়নায় জমতে দেয় না ধূলো।
কালীর মার কল্যাণে
তরঙ্গিণীর ঘর-দোর, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন
তকতকে, ধপধপে, ঝকঝকে।
অথচ মুখে রাটি নেই,
চুরি করে না,
হাতে তুলে যা দাও তাতেই সন্তুষ্ট।
ভগবান রূপের অভাব পূর্ণ করেছেন গুণ দিয়ে।
শিকারে যাবার কথা শুনে
সে আনন্দিত হ'ল, কি দুঃখিত হ'ল, কি বিস্মিত হ'ল.
কিচ্ছু বোঝা গেল না।
কারণ, কথা সে বড় একটা বলে না,
মুখও তার ব্যঞ্জনাবিহীন।

বড়বাবুর খানসামা নীলমণিও নির্বিকার।
বড়বাবুর সঙ্গে সে এত জায়গায় ঘুরেছে
এবং এত জিনিস দেখেছে
যে,
এই সব ছোটোখাটো ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাটা
সে আত্মমর্যাদাহানিকর ব'লেই মনে করে।
নীলমণির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি,
রঙটি কালো,

জুলপির চুলগুলিতে পাক ধরেছে,
গোঁফও কাঁচাপাকা।
গায়ে পরিষ্কার সাদা ফতুয়া,
কাঁধে একটি ঝাড়ন।
চোখ-মুখে
বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্ট, কিন্তু নীরব।
সব জানে,
সব বোঝে,
কিছু বলে না।
অকারণে অনাবশ্যকভাবে
কখনও প্রকট করে না নিজেকে,
প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন কথা বলে না
এবং প্রাণ গেলেও এমন কিছু করে না,
যা বড়বাবুর বিরক্তিকর।
বড়বাবু বাইরে যাবেন শুনে
সে নির্বিকারভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।
মেজবাবুর খানসামা বিশ্বম্ভর
একটু রুদ্রপ্রকৃতির লোক,
কথায় কথায় লোকের মাথা ফাটাতে উদ্যত হয়।
মেজবাবু সর্বদাই তাকে সামলে চলেন।
মেজবাবুর ভাবটা অনেকটা এই রকম—
পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই প্রহারযোগ্য তা জানি,
তুমি যা বলছ তা ঠিকই,
কিন্তু শান্তিতে বাস করাও তো দরকার!
ছুঁচো কি এক আধটা, যে মেরে শেষ করবে!
কাঁহাতক হাত গন্ধ করবে তুমি,
চ'লে এস'
বিশ্বম্ভর সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসে,
ওই একটি মস্ত গুণ তার।
শিকারের কথা শুনে

সে সর্বাগ্রে
তার তৈলপক্ক বাঁশের বেঁটে মোটা লাঠিটা পেড়ে
তেল মাখাতে লাগল তাতে।
মেজবাবু লোকটিও শোনা যায়,
যৌবনকালে পরাক্রান্ত ছিলেন।
খুব হাত চলত,
প্রায়ই লেগে থাকত একটা না একটা ফৌজদারি।
শায়েস্তা করতেন
বড় বড় দুরন্ত ঘোড়া, প্যাগলা হাতী।
সময় কাটত কুস্তির আখড়ায়।
কিন্তু হঠাৎ একবার পদস্খলিত হয়ে
কেমন যেন মুষড়ে গেছেন।
দুরারোগ্য প্রমেহ ব্যাধিতে,
শারীরিক যতটা না হোক,
মানসিক প্রাবল্যটা লোপ পেয়েছে।
বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা—
শালপ্রাংশুমহাভুজ ব্যক্তি,
নিতান্ত ভালমানুষটি হয়ে গেছেন আজকাল।
নিজের সমস্ত দুষ্কৃতির কথা অকপটে স্বীকার ক'রে
মেজমায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন মেজবাবু,
এবং তাঁরই স্নেহাঞ্চলের ছায়ায়
বাস করছেন নির্বিরোধে।
এই শিকার ব্যপদেশে উৎসাহিত হয়েছেন
মেজমারই উৎসাহে,
সূর্যের আলোকে প্রদীপ্ত চন্দ্রের মতন।

ছোটবাবু কিন্তু
এখনও আছেন বেশ জবরদস্ত।
বড়বাবু খামখেয়ালী উদাসীন,
মেজবাবু নির্বাপিত,

ছোটবাবুই আসলে জমিদার।
দাদাদের মতন বিরাটকায় নন যদিও,
কিন্তু চেহারাটা তাঁর চেয়ে দেখবার মত।
ধপধপে রঙ,
কস্‌মেটিক-লাগানো স্বচ্যগ্র কালো কুচকুচে গোঁফ,
চওড়া ঘনকৃষ্ণ জ্র,
আরক্ত আয়ত চক্ষু দুটি
শ্রী ও শালীনতায় জ্বলজ্বল করছে।
অধরে চিবুকে
শক্তি ও সংযমের সমন্বয়।
সমস্ত মুখমণ্ডলে
অভিজাতসুলভ দর্প প্রদীপ্ত অথচ প্রচ্ছন্ন।
ছোটবাবুকে কেন্দ্র ক'রে
হিরণপুর গ্রামে
নানা গুজব আবর্তিত হয় নানা রসনায়।
চিরকালই হবে।
কারণ,
এমন একটা কন্দর্পকান্তি জমিদারপুত্র
নিষ্কলঙ্কচরিত্র—
বিশ্বাস করা কঠিন।
সুতরাং
কল্পনাকুশল বহু 'প্রত্যক্ষদর্শী'
বহুরকম কাহিনী বিবৃত করেন গোপনে গোপনে।
ভয়ও করেন সকলে ছোটবাবুকে,
চেহারাটা দেখলেই মনে হয় কড়া মেজাজের লোক।
আসলে কিন্তু
অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির লোক তিনি।
দাদাদের পুরোভাগে রেখে
তিনিই পরিচালনা করেন সমস্ত।
প্রাচীন ম্যানেজার সীতানাথবাবু

(প্রশস্ত টাক, পাকা ভুরু)
নির্ভরযোগ্য একজন মনিব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন
নায়েব চৌধুরী
কিন্তু খুশি হন নি মোটেই।
ছোটবাবু যতদিন
লেখাপড়া নিয়ে ছিলেন কলকাতায়,
ততদিন মান-খাতির ছিল চৌধুরীর।
দিলদরিয়া বড়বাবু,
শিবতুল্য মেজবাবু
কক্ষনও চৌধুরীর কথার ওপর কথা কন নি,
চৌধুরী যা করতেন তাই হ'ত,
সীতানাথবাবুও মানতেন তাঁর কথা।
কিন্তু ছোটবাবু আসাতে
বদলে গেল সব।
ছোটবাবু নিজেই মহালে মহালে ঘোরেন,
প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্তা কন,
বিচার-ব্যবস্থা করেন;
সীতানাথবাবুও
অবস্থা বুঝে সায় দেন তাতে।
চৌধুরী হয়ে পড়েছেন কেরানি মাত্র।
তাই
হরিদ্বার-ফেরত কুঞ্জলালের দল
যখন চৌধুরীকে গিয়ে ধরলে,
আমরাও শিকারে যাব নায়েব মশাই;
চৌধুরী বললেন,
আমি কিছু জানি না ভাই,
যাও ছোটবাবুর কাছে।
আজকাল আমাদের কথার মূল্য নেই,
তাই
নিজের মান বাঁচাবার জন্যে

কোন কথাতেই থাকি না আমরা।

কুঞ্জলাল বললে,

ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে বললে কেমন হয় ?

চৌধুরী ঈষদুষ্ণ হলেন, .

একটু মুখবিকৃতি ক'রে পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটা,

ম্যানেজারবাবুকে বললে কি হয় !

যা বললাম তাই করগে যাও।

ম্যানেজারবাবু নেইও এখানে,

দিনাজপুরে গেছেন সাক্ষী দিতে

থাকলেও—হুঁ :—

সম্পূর্ণ করলেন না তিনি কথাটা,

তবে বোঝা গেল স্পষ্ট,

স্বয়ং চৌধুরীই যখন অপারক,

তখন ম্যানেজার থাকলেই বা কি করতেন !

কুঞ্জলাল গেল অবশেষে ছোটবাবুর কাছেই.

একটু ভয়ে ভয়ে।

নিশ্ছিদ্র চরিত্রের লোককে সবাই ভয় করে।

ছোটবাবু কিন্তু খুশি হলেন।

বললেন, নিশ্চয়, যাবে বইকি।

হরিদ্বার থেকে ফিরলে কবে সব ?

আজ সকালে।

ক'জন আছ তোমরা ?

জন পাঁচেক—

হাবুল, পাঁচু, বীরেন, বঙ্কু আর আমি।

বেশ, যেও সব,

কাল ভোরেই আমরা বেরুব—

ভোর চারটের।

জামাই আজ রাত্রেই এসে পৌঁছবে।

কিন্তু হাতীতে তো কুলোবে না সকলের।

তোমরা—

একটু ইতস্তত করতে লাগলেন ছোটবাবু।
কুঞ্জলাল বললে,
আমরা গরুর গাড়িতেই যাব সবাই,
হেঁটেও যাব খানিকটা।
বেশ, তা হ'লে তো কথাই নেই।
হৃষ্ট কুঞ্জলাল ছুটল খবর দিতে।
হাবুল, পাঁচু, বীরেন, বঙ্কু এবং কুঞ্জলাল
সেই বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত,
যা বাংলা দেশে বেকার নামে প্রখ্যাত।
টাকা রোজগার করতে পারে না যদিও,
কিন্তু নির্গুণ নয়।
মাথায় বাবরি,
শ্যামবর্ণ, বেঁটে কুঞ্জলাল
ওস্তাদ বংশীবাদক।
শুধু তাই নয়,
গ্রামের অ্যামেচার থিয়েটার-পার্টির
ও-ই আত্মাস্বরূপ।
নানা অসুবিধার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে থিয়েটারটিকে।
জমিদারবাবুরা সেইজন্যেই বিশেষ ক'রে
স্নেহ করেন কুঞ্জলালকে।
বঙ্কুর হাসাবার ক্ষমতা আছে,
অর্থাৎ লোকে বঙ্কুকে দেখলেই হাসে।
চলিত ভাষায় যাকে বলে গন্না-কাটা,
বঙ্কু তাই।
ইংরেজীতে বলে 'হেয়ার-লিপ'।
অর্থাৎ খরগোসের মতন
ওপর ঠোঁটের মাঝামাঝি
নাকের নীচেই খানিকটা নেই,
এবং সেই ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে
হলদে রঙের গোটা দুই দাঁত।

তালুতেও নাকি একটা ছিদ্র আছে,
চন্দ্রবিন্দুসমন্বিত হয়ে পড়ে তাই কথাগুলো।
বন্ধুদের মনে হাস্যরস সৃষ্টি করবার পক্ষে
বিধাতার এই কারুকার্যটুকুই তো যথেষ্ট ছিল,
এর ওপর বঙ্কু কেন যে
ছাগলের মত খানিকটা দাড়ি
এবং কুৎসিত এক জোড়া গোঁফ রেখেছে,
তা বঙ্কুই জানে।
বঙ্কু পারতপক্ষে কথা বলে না,
হাসে না,
কোথাও যেতে চায় না,
কিন্তু বন্ধুদের দল নাছোড়।
তারা যেখানে যাবে, বঙ্কুকে টেনে নিয়ে যাবেই
এবং চেষ্টা করবে চটিয়ে দিতে।
চ'টে গেলে বঙ্কু নাকি মূর্তিমান হাস্যরস হয়ে ওঠে।
হাবুলের নানা খ্যাতি।
স্বাস্থ্যবান সুন্দর যুবক।
ভাল গোল বাঁচাতে পারে,
'ফিমেল' পার্ট করতে পারে,
পরিবেশন করতে পারে,
মড়া পোড়াতে পারে,
আরও অনেক কিছু পারে।
কিন্তু প্রত্যেক কার্যটি করবার সময়
এমন একটা 'তেরিয়া' ভাব নিয়ে থাকে,
সাদা বাংলায় যার অর্থ—
বেশি ঘাঁটিও না আমায়,
ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।
দুটো মিষ্টি কথা ব'লে
কাজ আদায় করতে হয় তার কাছ থেকে।

বীরেন হচ্ছে এদের মধ্যে কৃতবিদ্য।
বি এ. পাস,
নানা রকম খবর জানে,
রাখে,
বিতরণ করে।
গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর নিগূঢ় কারণ কি,
জ্যানেট গেনারের বয়স কত,
আগামী বারে কে মেয়র হবে,
অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে কে কত রান করলে,
শরৎবাবু 'প্রবাসী'তে কেন লিখতেন না,
আধুনিক কোন্ লেখকের কি কি দোষ,
রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থা কেমন,
জাপানীরা জিনিস সস্তা করে কি উপায়ে,
ডি ভ্যালেরা, ম্যাক্সিম গোর্কি, ইসাডোর ডান্‌কান,
মারোয়াড়ীদের পলিসি,
পি. সি. রায়ের উদ্দেশ্য,
হরিজন,
সাফ্রাজেট্‌স,
কো-এডুকেশন,
শিশির ভাদুড়ী—
বীরেনের জ্ঞান-ভাণ্ডারও যেমন অফুরন্ত,
শ্রোতাদের ধৈর্যও তেমনই অফুরন্ত।
বীরেন অবশ্য ঠিক এ দলের উপযুক্ত নয়,
ওর পালক ভিন্ন জাতের।
কিন্তু যতদিন একটা চাকরি না জুটছে
এবং উদারতর আকাশে না পাখা মেলতে পারছে,
ততদিন বক-সমাজেই বাস করতে হচ্ছে হংসকে।
পাঁচু বেচারার প্রদর্শন করবার মত
কোন গুণ নেই যদিও,
কিন্তু ওকে ছাড়া চলবারও উপায় নেই।

ইংরেজীতে যাকে বলে—ইউস্‌ফুল।
বিছানা বাঁধতে বল,
গাড়ি ডাকতে বল,
রাত দুপুরে বিড়ি কিনে আনতে বল,
মশারি খাটাতে বল,
এমন কি পা টিপে দিতে বল,
সবেতেই রাজি।
ফাইফরমাস খাটতে অদ্বিতীয়,
হাসিমুখে
নির্বিচারে
সব করবে।
অর্থাৎ
পাঁচু অলঙ্কার নয়,
অপরিহার্য
কিন্তু বন্ধুর ও মহাশত্রু।
কাকের পিছনে ফিঙের মতন
সবদাই লেগে আছে।

জমিদার-বাড়ির এই মৃগয়া-অভিযানে
যোগদান করতে পেয়ে
উৎফুল্ল হ'ল সবাই।
হরিদ্বারের রেশটা কাটতে না কাটতেই
বাঘ শিকার!
কলমিপুরের মাঠে যেতে হবে!
দূর ব'লেই মজাটা আরও বেশি।
কলমিপুরের মাঠ কি এখানে?
হিরণপুর ছাড়িয়ে নতুনগঞ্জ,
তারপর চাটুজ্জেদের হাট,
চাটুজ্জেদের হাট পেরিয়ে রতনদীঘি,
রতনদীঘির পর বাতাসপুর

(বিখ্যাত গুড়ের পাটালি হয় যেখানে),
বাতাসপুর ছাড়িয়ে আর একটু গেলেই
বিখ্যাত জলঙ্কর বিল।
সেই বিলের ধার দিয়ে দিয়ে
প্রায় ক্রোশখানেক যাবার পর
কালভৈরবের মাঠ
(এককালে মানুষ ঠেঙিয়ে মারত নাকি সেখানে),
মাঠটাও ক্রোশখানেক।
মাঠ পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই
ঘেঁষাঘেঁষি তিনটে গ্রাম।—
প্রথমে নালতে,
নালতের গায়েই শঙ্করা
(বাবুদের একটা কাছারি আছে সেখানে),
তারপর ছাতিমপুর।
ছাতিমপুর ছাড়িয়েই কাঁকন নদীটা,
এখন অবশ্য শুকিয়ে গেছে,
বর্ষাকালে কাঁকন কিন্তু খরস্রোতা।
কাঁকনের পর রাজহাট,
তারপর তপসেডাঙা,
তপসেডাঙার পর কলমিপুর।
কলমিপুর আমের কলমের জন্য বিখ্যাত,
আশেপাশে কেবল আমবাগান।
কলমিপুর গ্রাম থেকে ক্রোশখানেক দূরে
একটা শালবন।
শালবনের ওধারে কলমিপুরের মাঠ,
মাঠের ওপাশ দিয়ে বয়ে গেছে ময়না নদী,
নদীর ওপারে আবার বন,
সেই বনে এসেছে বাঘ।

পথে

॥ ১ ॥

নীলু দত্ত কাজের লোক। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মতে যাহা কর্তব্য, তাহা সর্বাগ্রেই কর্তব্য। শেষ মুহূর্তে অকূল পাথারে পড়িয়া হাঁসফাঁস করে বেকুবেরা। ওই তেপান্তর মাঠে এতগুলি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম চাহিদা মিটাইতে হইলে সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্বাহ্ণেই না করিলে চলে? সুতরাং শুধু ত্র্যহস্পর্শের ভয়েই নয়, দায়িত্বের তাড়াতেই এবং লাহিড়ী-সম্পর্কিত খুঁতখুঁতানি সত্ত্বেও দত্ত মহাশয় [illegible]খানা গরুর গাড়িতে তাঁবু প্রভৃতি আসবাবপত্র বোঝাই করিয়া সাইক্ল [illegible]যোগে আগের দিনই রওনা হইয়া গিয়াছেন। বাকি দশখানা গরুর গাড়ি আজ যাইতেছে।

এই গাড়িগুলিতে অল্পস্বল্প জিনিসপত্র আছে, লোকজনও আছে। বাড়ির চাকর-চাকরানীরা, হরু মণ্ডল, তিনু চাটুজ্জে, তালুকদার মশাই, হরিশ খুড়ো, রোগা নিতাই, গোহমূনা, কুঞ্জলালের দল—সকলেই গরুর গাড়িতে চলিয়াছে। হাতী, পালকি, ঘোড়া আগাইয়া গিয়াছে। অগ্রবর্তী গাড়িটি বিরিঞ্চির। সে গাড়িতে গোহমূনা ছাড়া আর কেহ নাই, বিরিঞ্চি আর কাহাকেও বসিতে দেয় নাই। গোহমূনা আপন মনে বসিয়া চিনাবাদাম-ভাজা ছাড়াইয়া খাইতেছে এবং স্মিতমুখে বিরিঞ্চির আবোল-তাবোল শুনিয়া যাইতেছে। নূতন কেনা নীল রঙের শাড়িখানিতে চমৎকার মানাইয়াছে তাহাকে।

দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন স্থূলকায় তিনু এবং রোগা নিতাই। এরূপ বেমানান যোগাযোগের কারণ উভয়েই স্বজাতি এবং তাম্রকূটবিলাসী। স্বভাবের খানিকটা মিল আছে। নিতাই কৃশতাসত্ত্বেও বীরত্বাভিমানী, তিনু স্থূলতা সত্ত্বেও ক্ষিপ্রতাবিলাসী। তিনু কখনও মন্থর গজেন্দ্রগমনে হাঁটেন না, হনহন করিয়া হাঁটাই তাঁহার রীতি। সামনে ছোটখাটো নালা-নর্দমা দেখিলে লাফাইয়া পার হইবার চেষ্টা করেন, আমগাছের নীচু ডালের

দোদুল্যমান আমটা লাফাইয়া না পাড়িতে পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। অর্থাৎ তিনি যে মোটা বলিয়া অকেজো, এ কথা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিবার অবকাশ তিনি কাহাকেও দিতে চান না। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করার পর হইতে তাঁহার চটপটে ভাবটা আরও যেন একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

নিতাই হুঁকাটিতে দীর্ঘ শেষ টানটি দিয়া তাহার মুখটি মুছিয়া তিনুর হাতে দিল।

আছে কিছু অবশিষ্ট?

দেখই না টেনে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনু টান দিলেন। বেশ ধোঁয়া বাহির হইল। ভ্রূ পুনরায় মসৃণ হইয়া গেল, তিনি প্রসন্ন চিত্তে টানিতে লাগিলেন। নিতাই আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের এক কোণে স্তূপীকৃত ধোনা তুলোর মত বিরাট একটা স্তূপ মেঘ পড়িয়া আছে। একটা শকুনি বহু ঊর্ধ্বে চক্রাকারে উড়িতেছে।

তৃতীয় গাড়িতে ছিলেন গাদা-বন্দুক-হস্তে তালুকদার মশাই এবং [illegible] বন্ধু হরিশ খুড়ো। হরিশ খুড়োর গল্প শুনিতে রাজি হইলেই হরিশ খুড়োর সহিত সৌহার্দ্য জন্মিয়া যায়। তালুকদার তাঁহার গল্প-শুনিয়ে বন্ধু। এমন মনোযোগী শ্রোতা হিরণপুরে দুর্লভ। এখন যদিও তালুকদার ঠিক মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি খুড়ো নিরস্ত হন নাই। খুড়ো কল্পনাবান ব্যক্তি। এতক্ষণ নানারূপ বাঘের ভীষণ রূপ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিতেছিলেন যে, যেন তিনি বহু বাঘ বহুবার ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, গাদা বন্দুকই ব্যাঘ্র শিকারের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র।

তালুকদারের দৃষ্টি কিন্তু চতুর্থ গাড়িতে নিবদ্ধ।

খুড়ো বলিতেছিলেন, রাইফেল-মাইফেল অনেক রকম বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তোমার ও অস্তরের কাছে কেউ লাগে না। বনেদী ক্ষীরের কাছে কনডেন্সড মিল্ক লাগে কখনও? দাও, একটা বিড়ি দাও।

চতুর্থ গাড়িতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই তালুকদার হাফপ্যান্টের পকেটে হাত চালাইয়া বিড়ির কৌটাটি বাহির করিলেন। খুড়োকে একটি দিলেন, নিজেও ধরাইলেন।

তালুকদারের অঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত খাপ না খাইলেও যে পোষাক তিনি

পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা শিকারেরই উপযোগী। কালো রঙের হাফপ্যান্ট, খাকি রঙের হাফশার্ট, বাদামী রঙের বুট। তালুকদারের গলাটা একটু অস্বাভাবিক রকম লম্বা ও ছিনে বলিয়া শোলার হ্যাটটা তেমন মানায় নাই। তা না মানাক, রোদ ঠিক আটকাইতেছিল। খিড়িটি ধরাইয়া তালুকদার পুনরায় চতুর্থ গাড়ির দিকে চাহিলেন।

চতুর্থ গাড়িতে ছিল লছমনিয়া, কাদম্বিনী, কালীর মা। ভিকুও এই গাড়িটার পিছনে পিছনে হাঁটিয়া আসিতেছিল। প্রায় শেষের দিকের একখানা গাড়িতে নীলমণিও বিশ্বম্ভরের সহিত বসিয়া কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছিল না। অত দূরে কি থাকা যায়!

তালুকদারের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া লছমনিয়া মুচকি হাসিয়া কাদম্বিনীর কানে কানে কি যেন বলিল।

কাদম্বিনী ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল, বউ ম'রে গিয়ে অবধি হ্যাংলা হয়ে উঠেছে মুখপোড়া।

কালীর মা একবার লছমনিয়া এবং একবার তালুকদারের মুখের পানে চাহিল। তাহার মনে কোন ঈর্ষা ঘনাইয়া উঠিল কি না, বোঝা শক্ত। কারণ মনের ভাব মুখে প্রতিফলিত হইবার মত মুখ তাহার নয়। তবু অকারণে সে তাহার থান কাপড়ের ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া গায়ে কাপড়-চোপড় টানিয়া সরিয়া বসিল।

পঞ্চম গাড়ি জিনিসপত্রে বোঝাই।

ষষ্ঠ গাড়িতে ছিল গোটা দুই বিছানার বাণ্ডিল এবং তাহার উপর বসিয়া ছিল হরু মণ্ডল বর্শা-হস্তে। হরুর মাথায় লাল শালুর প্রকাণ্ড পাগড়ি, দেহ অনাবৃত। তাহার ক্ষীণ কটি, পেশীসমৃদ্ধ উরস্ সত্যই দেখিবার মত বস্তু। পরনের কাপড়খানি পরিষ্কার এবং বেশ আঁটসাঁট করিয়া পরা। দক্ষিণ-বাহুতে একটা মোটা রূপার তাগা। পাকা পুষ্ট গোঁফজোড়াতে তা দিতে দিতে হরু মণ্ডল গাড়োয়ান রহমনের সহিত চাষবাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, আর এক পশলা বৃষ্টি না হ'লে তো সব গেল হে রহমন!

সে কথা আর বলতে!—রহমন গরু দুইটির পেটের তলায় পা চালাইয়া দিয়া হরু মণ্ডলের মুখের পানে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল।

হরু মণ্ডল তাহার সে হাসি দেখিতে পাইল না। সে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। রৌদ্রের প্রখর তাপে মাটি যেন ফাটিয়া

যাইতেছে। সহসা একটা ছোট মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চতুর্দিক স্নিগ্ধ ছায়ায় ভরিয়া উঠিল।

সপ্তম গাড়িও জিনিসপত্রে ভর্তি।

অষ্টম গাড়িতে ছিল নীলমণি ও বিশ্বম্ভর।

আপন আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নীলমণি সম্ভবত চুপ করিয়া একধারে চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিল। চোখ খুলিয়া থাকিলেই বিশ্বম্ভরটার সহিত বকর বকর করিতে হইবে। ঘুমের ভাণ করাই ভাল। তাহা ছাড়া এক চটকা যদি ঘুমাইয়া লইতে পারা যায়, লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। কলমিপুরের মাঠে বড়বাবু সারারাত যে কি কাণ্ড করিবেন, তাহা অনিশ্চিত। হয়তো সারারাত ঘুমানোই যাইবে না।

বিশ্বম্ভর গাড়োয়ানটার সহিত বচসা বাধাইবার চেষ্টায় ছিল। তখুনি বললাম তোমাকে, এগিয়ে নাও গাড়িখানা! ধুলো খেতে খেতে চলতে হবে এখন সারা পথটা! যেমন গরু, তেমনই গাড়োয়ান! গরুগুলোকে খেতে-টেতে দাও কিছু, না খাটিয়েই চলেছ কেবল দিন রাত!

দীনু গাড়োয়ান খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। অতিশয় নরম কণ্ঠেই জবাব দিল, খেতে দিই বইকি।

বিশ্বম্ভর উচ্চতর কণ্ঠে বলিল, খেতে দাও! মিছে কথা বলবার আর জায়গা পাও নি তুমি? খেতে দিলে গরুর অমন পাঁজরা বেরোয়?

দীনু কোন জবাব দিল না। কারণ বিশ্বম্ভরকে সে চিনিত। এবং নীলমণি দীনুকে চিনিত বলিয়া বিশ্বম্ভরকে লইয়া দীনুর গাড়িটাতেই চড়িয়াছে। নীলমণি একধারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া সব শুনিতেছিল।

শেষ গাড়ি দুইখানা অধিকার করিয়াছিল কুঞ্জলালের দল।

বীরেন নানা অসুবিধার মধ্যেও আগের দিনের খবরের কাগজখানা পড়িতেছিল। খবরের কাগজ না পড়িলে তাহার চলে না। গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে সে চেকোস্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল।

কুঞ্জ বাজাইতেছিল বাঁশী।

সূর্য মেঘাচ্ছন্ন, চতুর্দিক ছায়াময়। পথে একটা বুড়ী গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারের একটা গাছ হইতে হলুদ রঙের সুন্দর একটা পাখী উড়িয়া গিয়া মাঠের ঘনপত্রাচ্ছাদিত একটা গাছের ভিতর আত্মগোপন করিল।

হাবুল বলিল, কি সুন্দর একটা হলদে পাখী উড়ে গেল, দেখলি ?

কি পাখী বল তো ওটা ?

বীরেন পাখীটা দেখে নাই ; তবু বলিল, দোয়েল ।

পাঁচু বলিল, কই, আমি দেখতে পেলাম না তো !

হাবুল হাসিয়া জবাব দিল, তুই বঙ্কুর পানে চেয়েই তন্ময় হয়ে আছিস, অন্য কিছু দেখবার আর কি অবসর আছে তোর ?

পাঁচু বঙ্কুর দিকে চাহিয়া বলিল, মাইরি বঙ্কু, তোকে দেখে পদ্য লিখতে ইচ্ছে করছে—

বঙ্কুবিহারী চলিয়াছে চাপিয়া গরুর গাড়ি,
ফুরফুরে হাওয়াতে উড়িতেছে ছাগল-দাড়ি ।

কুঞ্জ বাঁশী থামাইয়া বলিল, দাড়ি কত রকমের আছে জানিস ? হিন্দিতে ভারী চমৎকার একটা শ্লোক আছে দাড়ির ।

কুঞ্জর মামা মজঃফরপুরে চাকরি করেন । কুঞ্জ সেখানে কিছুদিন ছিলও । সুতরাং তাহার কথার মূল্য আছে ।

হাবুল বলিল, কি শ্লোক, শুনি না !

কুঞ্জ বলিল, এক দাড়ি চুটুক পুটুক, এক দাড়ি তক্কো
এক দাটি মন্‌মহেশ এক দাড়ি বভ্‌ভো !

এর মানে ?

মানে তো সোজা । চুটুক পুটুক মানে ছিটেফোঁটা, এখানে একগাছা ওখানে একগাছা । তক্কো মানে ছোট্ট ছাগল-দাড়ি, যেমন আমাদের বঙ্কুর । মন্‌মহেশ হচ্ছে—বেশ গালভরা ঘন দাড়ি, কিন্তু বে-এক্তার নয়, আর বভ্‌ভো হচ্ছে একেবারে—

কুঞ্জ ঠিক উপযুক্ত কথাটা খুঁজিয়া পাইতেছিল না ।

বীরেন খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি রাখিযাই বলিল, এপিক ব্যাপার, অর্থাৎ অ-নাভি ।

ঠিক বলেছিস । গোঁফেরও একটা শ্লোক আছে—

দই চপচপ কেলা মোচা
ভঁইসা শিঙ্গা উপর খোঁচা
মধ্যে শূন্য নেয়াপাতি
পাঁচটি প্রকার গোঁফের জাতি ।

কুঞ্জ এই শ্লোকটিরও হয়তো বিশদ ব্যাখ্যা করিত, কিন্তু পাঁচুর জ্বালায় হইল না।

সে বলিয়া বসিল, আমার আবার একটা মিল মনে এসেছে।—হে বন্ধু চক্কো, দাড়ি তব তক্কো।

বন্ধু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে, কিছুতে চটিবে না। তবু তাহার উপরের অসম্পূর্ণ ঠোঁটটা একটু কুঞ্চিত হইল এবং তাহা দেখিয়া হাবুল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেন খবরের কাগজের একখানা পাতা উল্টাইয়া বলিল, ওহে, আবার একটা মেয়ে লেকে ডুবেছে।

হাবুল বলিল, এবার কলকাতায় গেলে লেকের জল খানিকটা নিয়ে আসব মাইরি বোতলে পুরে। আমাদের পাড়ার মন্টিটার মাঝে মাঝে ফিট হয়, লেকের জল মাথায় ছিটোলে হয়তো সেরে যেতে পারে।

বীরেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, জলে অ্যামোনিয়ার যতটা কন্সেনট্রেশন হ'লে ফিট ছাড়ে, লেকের জলে ততটা এখনও হয়নি বোধ হয়। মড়া পচবার তো আর অবসর দিচ্ছে না, তুলে ফেলছে কিম্বা ভেসে উঠছে।

হাবুল কৌতুকটার রাসায়নিক অংশটা ঠিক ধরিতে পারিল না। তবু বলিল, যতটা হয়েছে তাই যথেষ্ট।

কুঞ্জ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

উর্দিটুর্দি পরিয়া জগদেও পাঁড়ে ও কিশোর সিং সকলের পিছনে লাঠি কাঁধে করিয়া আসিতেছিল। উভয়ে নিম্নস্বরে কি কথাবার্তা বলিতেছিল, ঠিক শোনা যাইতেছিল না। কিন্তু তরুণ যুবক কিশোর সিংয়ের সমস্ত মুখে একটা সশ্রদ্ধ অবহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যেন কোন তরুণ ছাত্র প্রবীণ অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছে।

সহসা পিছনের গাড়ির গাড়োয়ানটাকে লক্ষ্য করিয়া জগদেও পাঁড়ে আদেশ করিল, গাড়ি বাঁয়ে করো। যানে দো ই লোককো।

কতকগুলি সাঁওতাল ও সাঁওতাল-রমণী যাইতেছিল। একজন সাঁওতালের কাঁধে একটা বাঁক। বাঁকের এক ধারে একটা চুপড়িতে জিনিসপত্র এবং অন্য ধারে একটি ছোট ছেলে। ছেলেটি বেশ নির্ভয়ে বাঁকে দুলিতে দুলিতে চলিয়াছে।

হাবুল কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। দুইটি সাঁওতাল-মেয়ে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আগাইয়া গেল।

বীরেনের হঠাৎ মনে পড়িল, বাদল ডাক্তারকে তো দেখা যাইতেছে না! সে কি তাহা হইলে—

বীরেন কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া পাঁড়েজিকে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু কি হাতীতে গেছেন?

জগদেও প্রথমে হিন্দিতেই বলিল, ডাক্‌টারবাবু ফটকটিয়ামে সওয়ার হো কর বাতাসপুর গয়ে হেঁ রোগী দেখনেকে লিয়ে। তাহার পর কি মনে করিয়া বাংলাতে বক্তব্যটা শেষ করিল, সেইখানসে হামাদের সং লিবেন।

বীরেন এই বার্তায় খুশি হইল। সে গরুর গাড়িতে যাইতেছে, অথচ ডাক্তারবাবু হাতীতে গিয়াছেন—এই বার্তা বীরেনের পক্ষে কষ্টকর হইত। তাহার অপেক্ষা অনেক ছোট এক মাসতুতো ভাইয়ের সহপাঠী এই ডাক্তারটি। ডাক্তার বলিয়াই এত প্রতিপত্তি, তাহা না হইলে—

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে বীরেন পুনরায় কাগজে মন দিল।

আকাশের যে মেঘখানা সূর্যকে আবৃত করিয়াছিল, সেটা সরিয়া গেল, চতুর্দিক আবার রৌদ্রালোকিত হইয়া উঠিল।

॥ ২ ॥

রতনদীঘির পাড়ে মেজ মায়ের পালকি নামানো হইয়াছে। গিন্নীমা এবং বড়বউ পালকি থামান নাই, সোজা চলিয়া গিয়াছেন। গিন্নীমার সহিত জিতুর মার পালকিটাও গিয়াছে। মেজমা কিন্তু পারিলেন না। বেয়ারাগুলির ঘর্মাক্ত কলেবর এবং নিদারুণ রৌদ্র দেখিয়া রতনদীঘির পাড়ে বটগাছটার তলায় পালকিটা নামাইতে বলিলেন। বেচারীরা ঠাণ্ডায় একটু বিশ্রাম করিয়া লউক, এই কাঠফাটা রোদে তাতিয়া পুড়িয়া একেবারে ঝলসাইয়া গিয়াছে যেন সকলে।

রতনদীঘির পানে চাহিয়া মেজমা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রকাণ্ড দীঘি। কাকচক্ষু স্বচ্ছ কালো জল টলমল করিতেছে, চাহিয়া থাকিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ওপারের ঘাটটায় একজন বধূ স্নান করিতেছে, ঘাটের উপর

চকচকে পিতলের কলসীটি বসানো রহিয়াছে। ওধারের ঢালু সবুজ পাড়টায় একদল ছাতারে পাখী কলরব করিতে করিতে লাফাইয়া লাফাইয়া আহার সংগ্রহ করিতেছে। আরও ওদিকে ফাঁকা মাঠে রৌদ্রতপ্ত শূন্যটা যেন কাঁপিতেছে, সেতারের তারে জোরে ঝঙ্কার দিলে তারগুলা যেমন কাঁপিতে থাকে, অনেকটা তেমনই।

সহসা মেজমার হুঁস হইল, টোকনটা কোথায় গেল? গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ওই যে, ছেলে শিকার করিতেছে। ফড়িং শিকার হইতেছে।

বটগাছটার ওধারে ছোট একটু মাঠের মত, সেখানে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ নানা বিচিত্র রঙের ফড়িং ঠিক ছোট ছোট এরোপ্লেনের মত উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাঠটা চোরকাঁটায় ভর্তি; শুকনো শুকনো মরা মরা আরও কি যেন অসংখ্য গাছ রহিয়াছে। ফড়িংগুলা তাহাদের ডালে বসিতেছে, আবার উড়িয়া যাইতেছে। এক একটা আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়াও থাকিতেছে। কিন্তু কেহই টোকনের নাগালের মধ্যে আসিতেছে না, বন্দুকের লক্ষ্য ঠিক হইতে না হইতেই উড়িয়া যাইতেছে। টোকন পা টিপিয়া আগাইয়া গিয়া উপবিষ্ট একটা ফড়িংকে টিপ করিতেছিল, এমন সময় মেজমা ডাকিলেন, ওরে, যেখানে সেখানে কাঁটাবনে যাস নি তুই, এদিকে আয়।

টোকনের হাত কাঁপিয়া গেল, ফড়িং উড়িয়া গেল। টোকন বন্দুক-সুদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া মেজমার গলা জড়াইয়া মাটিতে পা ঠুকিতে লাগিল, কেন তুমি ডাকলে, উড়ে গেল ফড়িংটা!

আর রোদে রোদে ঘুরতে হবে না, পালকির ভেতর ব'স এসে। মেজমা একরূপ জোর করিয়াই টোকনকে টানিয়া ভিতরে বসাইলেন। কী ভীষণ রোদ! এইটুকুর মধ্যেই ছেলের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, টোকনের প্যাণ্ট হইতে চোরকাঁটাগুলি ছাড়াইয়া দিয়া মেজমা বলিলেন, টোকন, শম্ভু সিংকে জিজ্ঞেস কর তো, বাবুদের হাতী কতক্ষণ আগে চ'লে গেছে!

শম্ভু সিং নামক বিরাটকায় সশস্ত্র সিপাহীটি পালকির তত্ত্বাবধায়করূপে অশ্বপৃষ্ঠে সঙ্গে আসিয়াছে। প্রত্যেক পালকির সঙ্গেই একজন করিয়া অশ্বারোহী সশস্ত্র সিপাহী আছে। শম্ভু সিং অদূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জিরাইতেছিল। টোকনের কথা শুনিয়া সে বলিল, এক ঘণ্টা আগে হাতী চলিয়া গিয়াছে। মেজমা একটু চিন্তিত হইলেন। বদ-মেজাজী নূতন হাতীটার পিঠে মেজবাবু চড়িয়াছেন। তাঁহার সহিত আবার চাপাটাও

আছে। হাতীটা মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যায়। কি যে হইল, জানিবার জন্ত তাঁহার মনটা উসখুস করিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, বেয়ারাগুলাকে ডাকাইয়া পালকি উঠাইতে বলেন; কিন্তু আবার তখনই মনে হইল, অন্ত পালকিগুলি পিছাইয়া রহিয়াছে, তাহাদের ফেলিয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে! ভগবান তাঁহাকে তো আর বড়দির মত নিশ্চিন্ত মন দেন নাই! উষা, মীনা, তরঙ্গিণী তিনজনই সমান। উহাদের পিছনে ফেলিয়া গিয়া কি মেজমা কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন! জামাই এবং হীরেন অবশ্য ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া উহাদের পিছু পিছুই আসিতেছে। কিন্তু উহারাও তো ছেলেমানুষ এবং সব কয়টিই হুজুগে। একটা পালকিতে প্রবীণ ঠাকুরদা এবং ঠানদি আছেন অবশ্য, কিন্তু তাঁহারা কি উহাদের সামলাইতে পারিবেন!

সুতরাং মেজমা চিন্তিত মুখে অপর পালকিগুলির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন।

টোকন আবার বোধ হয় ফড়িং শিকারের চেষ্টায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দেখ, দেখ মেজমা, ওটা কি?

মেজমা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, বেশ বড একটা বহুরূপী। সমস্ত দেহটা কুচকুচে কালো, কেবল গলার কাছটা টকটকে লাল। একটা ছোট ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সামনের পায়ে ভর দিয়া গলাটা উঁচু করিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতেছে।

মেজমা বলিলেন, ও গিরগিটি।

টোকন সভয়ে বিস্ময়ে মেজমার কাছ ঘেঁষিয়া জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

কামড়ায়?

না। ফের যাচ্ছিস তুই ওদিকে? না, মারতে হবে না ওকে। টোকনকে টানিয়া পুনরায় তিনি পালকির ভিতর বসাইলেন ও আঁচল দিয়া মুখটা মুছাইয়া দিলেন।

এমন সময় ঠাকুরদা ও ঠানদির পালকি আসিয়া হাজির হইল। পালকি নামাইতেই ঠানদি বাহির হইয়া মেজমার পালকির নিকট আসিয়া বলিলেন, কি ভাই, ব'সে আছ যে?

আপনাদের অপেক্ষায়। ওরা সব কই?

ওরা কি আর আমাদের মত, আমগাছে উঠেছে ওরা।

আমগাছে, বলেন কি ? কে কে উঠেছে ?

হীরেন আর উষা তো উঠেছে দেখে এলাম, মীনাকে ওঠাবার জন্যে সাধাসাধি করছে।

আর তরঙ্গিণী ?

সে খিলখিল ক'রে হাসছে আর আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে আছে গাছতলায়।

মেজমা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, সত্যি, এরা যেন সব কি ! একটু যদি হস্‌সি-দিগ্‌ঘি জ্ঞান আছে কারুর বাপু !

ঠানদি বলিলেন, ওরা সব আর জন্মে বাঁদর ছিল, এ জন্মে নেজটি খসেছে খালি।

আপনি নিয়ে এলেন না কেন ওদের ধরে ?

আমার কথা শুনলে তো ! তা ছাড়া আমি একটু তাড়াতাড়িই চ'লে এলুম রত্নদীঘিতে নাইব ব'লে। একটা ডুব দিয়ে না নিলে মাথা ধ'রে যাবে আমার। চিরকাল সকালে নাওয়া অভ্যেস তো ! ওগো, আমার পুঁটুলিটা কোথা, দাও তো, নেয়ে নিই।

এই যে।

ত্রস্ত ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরদা সকলের কাছে ঠানদিকে যেরূপ ভয়াবহরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন, ঠানদি মোটেই সেরূপ নহেন। ছোটখাটো মানুষটি, চওড়া চওড়া গড়ন, পাড়ার ফাজিল ছেলেমেয়েরা আড়ালে নাম দিয়াছে—গুটকু। ধপধপে ফরসা রঙ, কপালের ঠিক মাঝখানটিতে টিপের আকারে ছোট্ট নীল একটি উলকি। মাথার চুলগুলি যদিও সব পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখে এখনও জরার চিহ্ন নাই। ঠানদি এককালে অপরূপ রূপসী ছিলেন ; পাকা আমটির মত এখনও যেন টুকটুক করিতেছেন। অথচ বেশ রাশভারী !

পুঁটুলি লইয়া ঠানদি বলিলেন, তেলের শিশিটা দাও।

ঢোক গিলিয়া ঠাকুরদা বলিলেন, তেলের শিশি কি আমাকে দিয়েছিলে ?

বাঃ, তোমার হাতে দিনুম না ! ফেলে এসেছ নাকি ?

ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিলে তিনি দ্বিধা হইবেন না, সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া ঠাকুরদা পালকির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। বাহিরের বারান্দার তাকটার উপরই যে তেলের শিশিটা রহিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি

ছাড়া আর কে বেশি জানে! তথাপি পালকির ভিতরে পিছন ফিরিয়া বসিয়া খুঁজিবার ভাণ করিতে লাগিলেন। কিছু তো একটা করিতে হইবে। দৃষ্টিটা তো এড়ানো যাক আপাতত।

পালকির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ঠানদি বলিলেন, তোমার হাতে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। এতকাল ধ'রে দেখছি তোমায়, তবু আমার জ্ঞান হ'ল না।

ঠাকুরদা পালকির ভিতর বসিয়া ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

রুখু নাইলে তো এখুনি মাথা ধ'রে যাবে আমার।

মেজমা টোকনকে বলিলেন, শম্ভু সিংকে বল তো ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে চাটুজ্জেদের হাট থেকে নারকোল-তেল নিয়ে আসুক খানিকটা। এই টাকাটা ভাঙিয়ে দাম দিয়ে দিতে বলিস, কেড়ে-কুড়ে না আনে যেন।

ঘোড়া ছুটাইয়া শম্ভু সিং রওনা হইয়া গেল।

ঠানদি মেজমার পালকির নিকট বসিয়া আজ পর্যন্ত ঠাকুরদা কত জিনিস হারাইয়াছেন এবং নষ্ট করিয়াছেন, তাহারই একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদা পালকির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজের সম্বন্ধে নানারূপ অত্যুক্তি স্বকর্ণে শুনিয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। বরং এমন একটা ভাব ধারণ করিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, যেন তিনি বধির, কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না।

অল্প সময়ের মধ্যেই শম্ভু সিং তেল আনিয়া হাজির করিল। মাথায় তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ঠানদি পালকিটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমিও তেল মেখে চান ক'রে নাও না।

গলাটা বাড়াইয়া ভালমানুষটির মত ঠাকুরদা বলিলেন, আমাকে বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে নয় তো আর কাকে বলব? আমসির মত শুকিয়ে থাকতে ভালও তো লাগে! চান ক'রে নাও।

এই যে নিই।

ঠাকুরদা বাহির হইয়া আসিলেন।

ঠানদি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, খুঁড়িয়ে হাঁটছ যে?

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের গাঁটটায় একটু ব্যথা হয়েছে।—অত্যন্ত

সকরুণ দৃষ্টিতে ঠাকুরদা ঠানদির মুখের পানে চাহিলেন। ভাবটা যেন, দোহাই তোমার, আর কিছু বলিও না।

ঠানদি ক্ষণকাল ঠাকুরদার কুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, হবে না! কাল রাত্তিরে পই পই ক'রে মানা করলাম, পুব দিকের জানালাটা খুলে শুয়ো না। বেতো শরীরে কি ওসব সয়? দরকার নেই চান ক'রে।

ঠাকুরদা সুট করিয়া পালকির মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন।

ঠানদি স্নান সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় হৈ হৈ করিয়া উষা মীনা তরঙ্গিণীর পালকি এবং তাহাদের পিছনে পিছনে অশ্বপৃষ্ঠে সুরেন হীরেন আসিয়া পড়িল। দুইজনেরই পিঠে বন্দুক বাঁধা এবং পরনে ব্রিচেস প্রভৃতি সাহেবী পরিচ্ছদ।

সুরেন ছেলেটি প্রিয়দর্শন, কিন্তু কালো। মুখখানি কচি-কচি। গোঁফদাড়ি পরিষ্কার কামানো থাকাতে আরও কচি দেখায়। তাহার চালচলন কথাবার্তায় সহসা বুঝিবার উপায় নাই যে, সে বিলাতফেরত এবং ব্যারিস্টার। অর্থাৎ সুরেন সেই শ্রেণীর চতুর বিলাতফেরত, যাহারা কথায় কথায় নাসাকে কুঞ্চিত হইতে দেয় না। নাকের উপর রীতিমত 'কনট্রোল' আছে। তাহার যে কোন চাল নাই, এই প্রশংসনীয় ধারণাটা লোকের মনে জাগরূক রাখিবার জন্য সে অহরহ সচেষ্ট। তাহার অতিশয় সাদাসিধা দেশী ব্যবহারটা যে স্বাভাবিক নয়, তাহা একটু নজর করিলেই ধরা পড়ে।

যখন তখন যাহার তাহার বাড়িতে গিয়া আড্ডা দেওয়া, মুড়ি মুড়কি গুড়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, চৌকনের সহিত কারণে অকারণে খুনসুড়ি করা, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, যেখানে সেখানে ধপ করিয়া বসিয়া পড়া, শাশুড়ীদের কাছে ছেলের মত আবদার করা, শ্বশুরদের সম্মুখে সিগারেট না খাওয়া, ঠাকুরঘরে প্রণাম করা এবং ঠাকুমার দেওয়া ষষ্ঠীপূজার টিপটা কপালে ধারণ করিয়া সকলের সম্মুখে উন্নত মস্তকে ঘুরিয়া বেড়ানো প্রভৃতি আধুনিক অব্যারিস্টারসুলভ আচরণ সুরেন সেইরূপ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করে এবং সেইরূপ নিখুঁতভাবে করিতে চেষ্টা করে, যেরূপ নিষ্ঠার সহিত ও নিখুঁতভাবে

সে একদা সাহেবিয়ানা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহার এই চালহীনতাটাও একটা চাল। ব্যারিস্টার সমাজের ডিনার-পার্টিতে যে এই ব্যক্তিই নিখুঁতভাবে কাঁটা চামচ ধরিয়া নিখুঁত পদ্ধতিতে আহার সমাধা করিতে পারে, অতিশয় ঔদাসীন্যভরে অতিশয় দামী মদ অতিশয় মুখরোচক বুকনি সহযোগে পান করিতে পারে, টাই কলার শার্ট হ্যাট মোজা জুতার অতি-আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে এই ব্যক্তিটিরই নখদর্পণে অর্থাৎ এই হ্যালাক্যাপা গোছের জামাইটিই যে স্বসমাজে পুরাদস্তুর সাহেব, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। অন্তরের অন্তস্তলে সে সাহেব না বাঙালী, তাহা সে নিজেও বোধ হয় ঠিক জানে না। যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও এখনও ঘটে নাই। যখন যেখানে যাহা মানায়, তাহাই ঠিকভাবে করিয়া যাওয়াটাই এখন জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যান', সুরেন তাহাই। সুরবোধ আছে, বেসুরা অথবা বেফাঁস কিছু করিবার ছেলে সে নয়।

হীরেন ছোকরাটি ঠিক ইহার বিপরীত। অনাবৃত চালিয়াৎ। সুরেনের মত অকারণে একটা আবরণের বোঝা বহিতে সে প্রস্তুত নয়। সে যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ, সে যে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সে যে বড়লোকের ছেলে, সে যে রূপবান, সে যে ভাল খোলোয়াড—অর্থাৎ গল্পের আদর্শ নায়ক হইবার সমস্ত যোগ্যতাই যে তাহার আছে, তাহা অনর্থক লুকাইযা রাখিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে না। হীরেন যে ঘোড়সওয়ার, তাহা সকলেই অনেক আগে জানিত, কিন্তু সুরেনও যে ঘোড়ায় চড়িতে পারে এবং হীরেনের অপেক্ষা ভাল করিয়া পারে, তাহা জানা গিয়াছে আজ সকালে। সুরেনের হাতীতেই যাইবার কথা ছিল, কিন্তু হীরেন ঘোড়ায় যাইবে শুনিয়া সেও ঘোড়ায় আসিয়াছে। ঊষার প্রতি হীরেন যে আকৃষ্ট, তাহা লুকানো নাই। কিন্তু ঊষার প্রতি সুরেনের সত্য মনোভাবটা যে কি, তাহা কেহ ঠিক জানে না, এমন কি ঊষাও না। যেরূপ সহৃদয় কর্তব্য-পরায়ণতার সহিত ঊষার সর্বপ্রকার সখ ও দাবি সুরেন মিটাইয়া দেয়, তাহাতে অন্য কিছু মনে করা অসম্ভব। তা ছাড়া স্বামীর মনোলোকের নিগূঢ় খবর লইবার মত মননশীলতা ঊষার এখনও হয় নাই। স্বামীর ঐশ্বর্য ও বাহ্যরূপ লইয়াই ঊষা মত্ত।

পালকি নামাইতেই উষা, মীনা এবং তরঙ্গিণী আসিয়া মেজমার পালকি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উষার দামী ঢাকাইখানা খোঁচ লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তরঙ্গিণীর কোঁচড়ে এক কোঁচড় আম। মীনার চোখ মুখ হাস্যপ্রদীপ্ত, কিন্তু তাহার বেশবাস বিস্রস্ত হয় নাই, সুরেনের উৎসাহ সত্ত্বেও সে গাছে চড়ে নাই।

দামী কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়া উষা খুব যে দুঃখিত, তাহা মনে হইতেছে না। বরং খুশিতে তাহার চোখ মুখ ঝলমল করিতেছে। আসিয়াই হাত মুখ নাড়িয়া মেজমাকে বলিতে সুরু করিয়া দিল, উঃ মেজমা, তুমি যদি দেখতে, রাস্তার ধারে একটা গাছে সে কি আম! পেড়ে এনেছি আমরা।

মেজমা চটিয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তা ছাড়া সুরেন কাছেই ঘোড়ার উপর রহিয়াছে, হয়তো কি মনে করিবে! তাই তিনি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া বলিলেন, বেশ করেছ! এইবার চল সব, এখনও ঢের দূর যেতে হবে।

তরঙ্গিণী কোঁচড় হইতে আম বাহির করিল। মেজমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দেখাইয়া বলিল, কেমন চমৎকার দেখতে দেখ মেজদি, যেন টুকটুক করছে।

মেজমা প্রলুব্ধ হইলেন না, প্রলুব্ধ হইল টোকন। সে দুই হাতে দুইটা আম লইয়া পালকির ওপাশে চলিয়া গেল। সুরেন ঘোড়াটা একটু আগাইয়া লইয়া গিয়া ঠানদির সহিত আলাপ সুরু করিয়া দিল।

ঠানদি, আপনি চ'লে এলেন, তা না হ'লে আরও আম আনতে পারতুম আমরা। বললাম, চড়ুন আপনি গাছে। এসব কি এদের কর্ম, পিঁপড়ের ভয়ে পালিয়ে এল সব।

নিজের দল ভারী হওয়াতে ঠাকুরদা সম্ভবত কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, আমি এর প্রতিবাদ করছি। পিঁপড়েরা পর্যন্ত উপেক্ষা করবে, এতটা নীরস এখনও হন নি তোমাদের ঠানদি।

ঠানদি পুঁটুলি হইতে ছোট কাঠের আয়নাটি ও সিঁদুরের কৌটা বাহির করিয়া পাকা চুলে সিঁদুর পরিতেছিলেন। সিঁদুরটি পরিপাটিরূপে পরিয়া সুরেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখন আমার সময় গেছে ভাই, যা খুশি ব'লে যাও, হাতী দঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মেরে যায়। চল্লিশ বছর আগে

যদি আসতে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতুম। এখনও তার সাক্ষী আছে একজন, জিজ্ঞেস কর।

যে ব্যক্তি গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখিয়াছে, গিরিশ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তাহার যেমন মুখভাব হয়, ঠানদির যৌবন-প্রসঙ্গে ঠাকুরদাও তেমনই একটা গদ গদ মুখভাব করিয়া স্মিত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

ঊষা আসিয়া বলিল, ঠাকুরদা, আম খাবেন?

উল্লসিত ঠাকুরদা বলিলেন, নিশ্চয়, সেই আশাতেই তো ব'সে আছি ভাই।

ঠানদি বক্র কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন, এখন আবার অসময়ে আম খাওয়া কেন? অত্যাচার কত্ত ব'লেই তো—

ঠাকুরদা যেন নিবিয়া গেলেন।

আচ্ছা, তবে থাক।

ঊষা আর মীনার চোখে চোখে কি একটা কথা হইয়া গেল। ঊষা সরিয়া পড়িল। সকলেই ইহা জানিয়া ফেলিযাছে, কোন যুবতী মেয়ের কাছে ঠানদি সহজে ঠাকুরদাকে ঘেঁষিতে দেন না। সম্পর্ক এবং ওজুহাত যাই হোক, কম-বয়সী মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখিলেই ঠানদির মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

হীরেন ঘোড়া হইতে নামিয়া একটু দূরে ঘোড়ার পিঠের উপর ডান-হাতটা রাখিয়া আপন মনে শিস দিতেছিল এবং ঊষার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

সুরেন একটু সরিয়া যাওয়াতে মেজমা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরা কি বল দিকি! গাছে চড়েছিলি সব! তোর বয়েস দিন দিন কমছে না বাড়ছে? তুই সম্পর্কে শাশুড়ী না?

তরঙ্গিণী এমন একটা মুখভাব করিল, যেন সে নিরীহতার প্রতিমূর্তি।

আমি তো চড়ি নি, আমি তো বরং মানা করলুম ওদের। ঊষাকে তুমিই আদর দিয়ে এমন মাথায় চড়িয়েছ যে, এখন শোনে নাকি কারও কথা? তা ছাড়া সুরেনই তো তুললে হুজুকটি; আমি কি করব?

তোমাকে যেন চিনি না আমি। ছোটবাবুকে ব'লে দিচ্ছি দাঁড়াও গিয়ে—

বা রে, ওরা চড়ল গাছে আর দোষ হ'ল আমার?

মেজমা পালকির ভিতর ঢুকিয়া পালকির ওধারে আম্র-ভক্ষণ-নিরত টোকনকে ধমক দিলেন, আমের রসে জামা-টামা সব এক করলে তো!

তরঙ্গিণী পাতলা ঠোঁট দুইটি কুঞ্চিত করিয়া অন্তরালবর্তিনী মেজ জাকে একটু ভেঙাইল। তাহার পর কোঁচড় হইতে মনোমত একটি আম বাছিয়া বাহির করিল এবং বোঁটার উলটা দিকে দাঁত দিয়া ছোট একটি ছিদ্র করিয়া চুষিতে লাগিল।

মীনা মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কেমন যেন একটা ভাষাহীন অস্বস্তি। তাহার অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল, যখন সুরেন তাহার কাছে আসিয়া বলিল, চল তো, আমরা দুজনে চুপি চুপি দীঘির ওধারটায় গিয়ে দেখে আসি, টুপ টুপ ক'রে ডুব দিচ্ছে ওগুলো পানকৌড়ি, না পাতিহাঁস।

মীনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্য করিল এবং বলিল, যাবার দরকার নেই, ওগুলো পানকৌড়িই।

হাঁস হতে বাধা কি?

মীনা উত্তর দিল না, শুধু একটু মুচকি হাসিল।

মেজমা মেজবাবুর জন্য মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পালকি উঠাইতে আদেশ করিলেন।

পানকৌড়ি-হাঁস-সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গেল।

সকলে আবার যাত্রা শুরু করিলেন।

॥ ৩ ॥

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

দীর্ঘ পথ বিসর্পিত রেখায় দিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত প্রকৃতি আচ্ছন্ন। বড় বউ পালকির মধ্যে একা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পালকি-বাহকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে। গিন্নীমা ও জিতুর মা

আগাইয়া গিয়াছেন। বড় বউ একা চলিয়াছেন—একেবারে একা। চারিদিকে কোথাও কেহ নাই। মাঠও জনশূন্য।

বড় বউ জীবনে এতক্ষণ ধরিয়া এমন একা আর কখনও থাকেন নাই। সারা জীবন ভিড়ের মধ্যে কাটিয়াছে, এমন নির্জন অবসর জীবনে আর কখনও আসে নাই। নিজের একক সত্তার নিঃসঙ্গ দৈন্যের পানে চাহিয়া বড় বউ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, কোথায় যাইতেছি আমি, কি করিতে যাইতেছি? অভিনয় করিতে? কাহার সম্মুখে? তাক লাগাইয়া দিব? কাহাকে? কেন? কি লাভ হইবে? অভিনয়-নৈপুণ্যে তাক লাগাইয়া দেওয়াটাই কি জীবনের পরমার্থ? সমস্ত জীবনটাই তো রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে কাটিয়াছে। নিত্যনূতন পাদ-প্রদীপ, নিত্যনূতন দর্শক, নিত্যনূতন প্রসাধন, নিত্যনূতন ঐক্যতান, নিত্যনূতন ভূমিকা। কি লাভ হইয়াছে? অভিনয় হয়তো সফল হইয়াছে, দর্শকেরা হয়তো বিস্ময় মানিয়াছে, কিন্তু অন্তরবাসিনী ভিখারিণীর শূন্য ভিক্ষাপাত্র আজও তো শূন্য। কবে তাহা পূর্ণ হইবে? কে তাহা পূর্ণ করিবে? এই শূন্যতা আর কতকাল বহন করিতে হইবে?

পালকি-বাহকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বড় বউ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিতেছে, ভিখারিণীর মত যদি ভিক্ষা করিতে পারিতে, হয়তো তোমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া উঠিত। আত্মসম্মানের স্বর্ণ অলঙ্কারে সারা জীবন নিজেকে রাজেন্দ্রাণী সাজাইয়া রাখিয়াছ। সকলে বাহবা দিয়াছে, ঈর্ষা করিয়াছে। কেহ ভালবাসে নাই, কেহ করুণা করে নাই। করিবে কি করিয়া? রাজেন্দ্রাণীকে কেহ কখনও করুণা করিবার সাহস করে? ভিখারিণী তো কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। ভিখারিণীর স্বরূপটা অবলুপ্ত করাই যে জীবনের সাধনা ছিল। আবার অভিনয়? আবার তাক লাগাইয়া দিবার চেষ্টা?

সহসা তাঁহার মনে হইল, তিনি আজীবন উপবাস করিয়া আছেন, ক্ষুধায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কেন? কিসের অভাব তাঁহার? হাত বাড়াইয়া লইলেই তো হয়। লজ্জা করে? অনাহারে পিপাসায় সমস্ত অন্তর হাহাকার হইয়া গেল, তবু লজ্জা? তবু অভিনয়? জীবনের কত পরম লগ্ন আসিল ও চলিয়া গেল। আর কয়টাই বা আসিবে? এখনও অভিনয়?

. আবার হঠাৎ কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। না, পারিব না। উঁচু মাথাটা ধূলায় লুটাইয়া দিতে কিছুতেই পারিব না। অভিনয়ই করিতে হইবে।

অন্তরদ্বার খুলিয়া দিলেই কি সে সেখানে প্রবেশ করিবে? নিশ্চয়তা কি? দ্বার খুলিয়া বসিয়া বসিয়া যদি রাত পোহাইয়া যায়? সে অপমান, সে লজ্জার অপেক্ষা দ্বার বন্ধ রাখাই ভাল। সত্যই যদি আসে, দ্বারে করাঘাত করুক।

বড় বউ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। চতুর্দিকে রিক্তশস্য শূন্য মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। প্রখর রৌদ্র নির্মম হইয়া উঠিয়াছে। দূরে, অতি দূরে কোথায় যেন একটা ঘুঘু ডাকিতেছে।

অতি সকরুণ মিনতি।

কাহাকে মিনতি করিতেছে?

বড় বউ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

॥ ৮২ ॥

গরুর গাড়ির সারি চলিয়াছে।

প্রথমেই গোহম্নাকে লইয়া বিরিঞ্চির গাড়িখানা আসিতেছিল। কিন্তু এখন প্রথমে যে গাড়িখানা আছে, তাহা বিরিঞ্চির নয়। দ্বিতীয় গাড়িখানিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কড়া রোদ উঠাতে স্থূলকায় তিনুর কষ্ট হইতেছে। তিনি ছাতা খুলিয়াছেন, একটি ভিজানো লাল গামছা টাকের উপর রাখিয়াছেন এবং এতৎসত্ত্বেও নিদারুণ রকম ঘামিতেছেন। মাথা হইতে গামছা নামাইয়া বারম্বার মুখ মুছিতে হইতেছে, কিন্তু মোছার সঙ্গে সঙ্গেই কপালে নাকে চিবুকে পুনরায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিতেছে। রোগা নিতাই ঘাড়টাকে একটু বাঁকাইয়া তিনুর ছাতার তলায় আশ্রয় লইয়াছে।

মুখটা গামছা দিয়া আর একবার মুছিয়া লইয়া স্থূলকায় তিনু বলিলেন, গাড়িতে চড়াই আমাদের দুর্বুদ্ধি হয়েছে। হেঁটে গেলেই হ'ত। এ দশ ক্রোশ ইচ্ছে করলে ঘণ্টা চারেকে কাবার ক'রে দেওয়া যায়। টিকিস টিকিস ক'রে কতক্ষণে যে পৌঁছব!

নিতাই বলিল, তোমার বোধ হয় চার ঘণ্টাও লাগে না।

তিনু মনে মনে হৃষ্ট হইলেন। বলিলেন, আজকাল আর অতটা স্পীড নেই ভায়া। বয়স তো হচ্ছে।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, নিতাই ইহার প্রতিবাদ করিবে। কিন্তু নিতাই একেবারে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

শিকার-টিকারের ব্যবস্থাটা কি রকম হয়েছে, শুনেছ? নীলু দত্ত তো আমাদের কিছু করতে দেবে না, নিজেই হাঁমরাই হয়ে সব করছে।

তিনু মুখ মুছিয়া বলিলেন, মরুকগে।

আমার ইচ্ছে ছিল, মাচা-টাচাগুলো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব করাব। মাচা মজবুত না হ'লে মহা বিপদে পড়তে হয় মাঝে মাঝে। বাঘ নিয়ে কারবার, বুঝছ না?

তিনু হয়তো বুঝিলেন, কিন্তু উদ্বিগ্ন হইলেন না। বলিলেন, তামাক সাজ আর এক ছিলিম।

কলিকায় তামাক ভরিতে ভরিতে নিতাই আবার বলিল, সেবারে সিংহি বাবুদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। মধ্যমবাবু আর আমি ছিলাম একটি মাচাতে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। মধ্যমবাবু কি রকম ভারী ওজনের লোক জান তো? মাচাই গেল ভেঙে। দুজনায় ঠিক পড়লাম একেবারে বাঘের মুখটিতে। মধ্যমবাবু তো একেবারে ফিট। ভাগ্যে আমি ছিলাম, টক ক'রে উঠে মাটিতে দাঁড়িয়েই দিলাম দেগে এক গুলি বাছাধনের বুকে। বিকট গর্জন ক'রে পড়লেন নালাটার ওপর উলটে।

নিতাইয়ের এসব কথা তিনু চাটুজ্জে কখনও বিশ্বাস করেন না, এখনও করিলেন না। মধ্যমবাবুর স্থূলতার উল্লেখে মনে মনে একটু চটিলেনও। নিজে কাঠির মত রোগা কিনা, তাই স্বাস্থ্যবান লোক দেখিলে মোটা বলিয়া ঠাট্টা করা হয়! বাঘের মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন, অথচ বাঘ উঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে! দিতেও পারে, খাইবার মত উহার শরীরে কি-ই বা আছে! বড় জোর খড়কে হইতে পারে।

কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কিছু বলিলেন না, আর একবার মুখ মুছিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

নিতাই টিকা ধরাইতে ধরাইতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, নীলু দত্ত কি রকম ব্যবস্থা করেছে, শুনেছ কিছু?

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনু অবশেষে বলিলেন, গোটা তিনেক মাচা তৈরি করাবে আর একটা মোষের বাচ্চাও নাকি বেঁধে রাখবে, এই তো বলেছিল আমাকে।

নাও, ধরাও।

তিনুর হাতে হুঁকাটা দিয়া চিন্তিত মুখে নিতাই বলিল, গেলেই হ'ত নীলুর সঙ্গে। আনাড়ি লোক তো, কি করতে, কি ক'রে ব'সে আছে হয়তো!

সম্মুখের মাঠটার উপর এক ঝাঁক টিয়াপাখী চক্রাকারে উড়িয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া তিনু চাটুজ্জে নীরবে তাম্রকূট সেবা করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। তিনি মাচা লইয়া মোটেই মাথা ঘামাইতেছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন বাকি খাজনাটার কথা। এতগুলা টাকা কি ছোটবাবু ছাড়িয়া দিতে রাজি হইবেন? আগে চৌধুরীটাকে দুই চারি টাকা দিলেই কাজ হইয়া যাইত। এখন ছোটবাবুর আমলে সেসব হইবার উপায় নাই। ছোটবাবুকে কোন রকমে তোসাজ করিবার জন্য শিকারে আসা। অকারণে এই ছেলে-ছোকরাদের দলে মিশিয়া হৈ হৈ করিতে কোন দিনই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষত আজকালকার ছোড়াগুলার রকম-সকমই বেয়াড়া ধরণের। মানীর মান রাখিয়া চলিতে জানে না। হয়তো ফস ফস করিয়া নাকের সামনে সিগারেটই টানিয়া দিবে। কিন্তু কাজের নাম বাবাঠাকুর। তুলো বাহান্ন টাকা এগারো আনা—সহজ কথা নয় তো! নীলু দত্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই হুজুকের মুখে ছোটবাবু আইনের কঠিন গ্রন্থি হয়তো একটু শিথিল করিতে পারেন এবং কলমিপুরের মাঠে তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া ধরিলে হয়তো কাজটা উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে। নীলু দত্তের আর একটা কথা মনে পড়াতে তিনু চাটুজ্জে ঘাড় বাঁকাইয়া তৃতীয় গাড়িটার দিকে একবার নজর করিলেন। হাঁ, ওই গাড়িতেই তো লছমনিয়া ছুঁড়িটা রহিয়াছে। নীলু দত্তের কথা সত্য হইলে ওই ছুঁড়িটাকে হাত করিতে পারিলেও কার্যোদ্ধার হইতে পারে। নীলুর মতে, উহার স্বামী ভিকুকে গভীর উদ্দেশ্য লইয়াই নাকি ছোটবাবু খানসামা-পদে বাহাল করিয়াছেন। ট্যাক হইতে গামছা নামাইয়া চাটুজ্জে মশাই আর একবার মুখ ও বগল মুছিলেন, আর একবার আড়চোখে (হুঁকায় মুখ রাখিয়া) লছমনিয়াকে দেখিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, সহজভাবে

যদি কার্যোদ্ধার না হয়, শেষটা বাঁকা পথই ধরিতে হইবে। মেয়েটাকে গোটা দশেক টাকা খাওয়াইলেই চলিবে বোধ হয়।

দশটা টাকা কিছু নয়, কিন্তু ওসব নোংরামির মধ্যে যাইতেই কেমন গা ঘিনঘিন করে চাটুজ্জে মশাইয়ের। কিন্তু কাজের নাম বাবাঠাকুর।

নিতাই ভাবিতেছিল, মাচা তিনটায় কে কে বসিবে?

একটাতে জামাই, আর একটাতে হীরেন, আর একটাতে? তালুকদারটা তো বন্দুক উঁচাইয়া সঙ্গে আসিয়াছে, ওই নিশ্চয় বসিতে চাহিবে। কিন্তু শিকারের কি জানে ও? গাদা বন্দুকটার অহঙ্কারে গেল লোকটা। হয়তো উহারই সহিত তৃতীয় মাচাটায় বসিতে হইবে আমাকে। বসিব, কিন্তু অসহ্য।

এখন সে গাড়িটা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে তালুকদার বেশ একটু চিন্তিত হইয়াই বসিয়াছিলেন। যদিও তিনি তৃতীয় গাড়িতেই বেশি মন্তব্য বাধিতেছিলেন এবং লছমনিয়ার হলুদ রঙের শাড়ি-খানার প্রতি ভাজটি প্রায় আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছিলেন, গোছমুনি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। গোছমুনিকে লইয়া ঝিরিঞ্চিটা মাঠ ভাঙিয়া হঠাৎ কোথায় উধাও হইল? বলিয়া গেল বটে, মাঠটার ওপারেই দৌলতপুরে তাহার বাড়ি এবং সে বাড়ি হইতে নিজের কাপড় গামছা আনিতে যাইতেছে। কিন্তু ঝিরিঞ্চিকে কে না চেনে! ও ব্যাটার অসাধ্য তো কিছুই নাই। তালুকদার অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আর একবার লছমনিয়ারই পানে চাহিলেন।

হল্লনাথান হরিশ-খুড়োর হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান ছিল না। আবার তিনি বাঘের গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি তালুকদার তাঁহার গল্প শুনিতেছিল কি না, তাহাও আর তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন না। এইবার তিনি নানা রকম অসাধারণ বাঘের প্রসঙ্গ পাড়িয়াছিলেন। বাঘ অনেক সময় আবার সাধক হয়, তা জানো তো? মানে মানুষকেও হার মানিয়ে দেয়। একটি বাঘের কথা জানি আমি, কনখল অঞ্চলে আছে সেটি, অদ্ভুত সে বাঘ। বাইরের চেহারাতেই বাঘ, কিন্তু ভেতরে সে পরমহংস। দুটি বেলা গঙ্গায় নেমে আহ্নিক করে, থাবা তুলে জপ করে, মাছ মাংস খায় না, একেবারে বিশুদ্ধ

ফলাহারী। একবার হয়েছে কি, বাঘটা গঙ্গায় নেমে সূর্যের দিকে চেয়ে থাবায় ক'রে জল তুলে তুলে অর্ঘ দিচ্ছে, এমন সময় তা পুলিশ-সায়েবের নজরে প'ড়ে গেল। আর কথা আছে! বন্দুক তুলেই দিলেন ফায়ার ক'রে। সায়েবের লক্ষ্য অব্যর্থ, গুলিও গিয়ে ঠিক বিঁধল মাথায়, কিন্তু বাঘ পড়ল না। ঠিক সামনে ব'সে ব'সে অর্ঘ দিয়ে যেতে লাগল। সায়েব তো অবাক। বাঘ অর্ঘ দেওয়া শেষ ক'রে দুটি থাবা জুড়ে সূর্যপ্রণাম করলে, তারপর সায়েবের দিকে এক নজর চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেল। পাণ্ডা ব্যাটারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, এতক্ষণ কিছু বলে নি। বাঘটা চ'লে গেলে সায়েবকে সব কথা খুলে বললে। সমস্ত কথা শুনে সায়েব হ্যাট তুলে বাঘের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানালেন। আসল সায়েব-বাচ্চা কিনা, গুণের কদর জানে।

খুড়ো চুপ করিলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন. কোন শাপভ্রষ্ট যোগী-টোগী সম্ভবত। তালুকদার একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন. লছমনিয়াটা তাঁহার দিকে অমন করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল কেন? খুড়ো একটি বিড়ি ধরাইলেন এবং স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বিড়িতে একটা টান দিয়া পুনরায় শুরু করিলেন, আর এক প্রকার বাঘ আছে, বুঝেছ তালুকদার?

হ্যাঁ বল, সব শুনে যাচ্ছি আমি।

আর এক প্রকার বাঘ আছে, যারা বহুরূপী। যখন যা ইচ্ছে রূপ ধারণ করতে পারে। সে বড় সঙিন ব্যাপার, বুঝেছ।

লছমনিয়া আবার ফিরিয়া বসিল।

তালুকদার নির্নিমেষ হইয়া গেলেন, খুড়োর কথায় সায় পর্যন্ত দিতে পারিলেন না।. কিন্তু খুড়োর এখন এমন অবস্থা, কোন কিছুর আর অপেক্ষা রাখেন না তিনি। তিনি বলিয়া চলিলেন, সে বড় সঙিন ব্যাপার হে! মানুষের রূপ ধ'রে দিনের বেলা লোকালয়ে আসে, কিচ্ছু চেনবার জো নেই, একেবারে হুবহু মানুষ। কিন্তু নিষুতি রাত যেই হ'ল, অমনই নিজমূর্তি ধারণ করলেন। সামনে যাকে পেলেন, ক্যাঁক করে ধরলেন, মট ক'রে ঘাড়টি মুচড়ে আহারটি সমাধা করলেন, আবার দিনের বেলায় মানুষের রূপ ধ'রে সাফ বেরিয়ে গেলেন। ধরবার-ছোঁবার জো নেই, বুঝলে?

বলে যাও না, সব শুনছি আমি।

মাঝে মাঝে মানুষ ছাগল গরু ভেড়া যে না-পাত্তা হয়ে যায়, আমার

মনে হয়, এই-ই তার কারণ। অথচ পুলিশ এর কিছুই খবর রাখে না, জানেই না।

খুড়ো বিড়িতে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, আর এক রকম বাঘ আছে, যারা কীটের রূপ ধারণ ক'রে বেড়ায়। ইংরিজীতে ছারপোকাকে তো বাঘ ব'লে জানই, কিন্তু ছারপোকাই যে শুধু বাঘ, তা নয়। মশা, এঁটুলি, উকুন, জোঁক—সব বাঘ। তা ছাড়া আরও কত আছে, বাঘের মহিমার কি শেষ আছে!

খুড়ো বিড়িতে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়া পুনরায় কল্পনায় তা দিতে লাগিলেন।

লছমনিয়া মুশকিলে পড়িয়াছিল। এদিকে ভিকু, ওদিকে তালুকদার। ভিকুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতে লজ্জা করে, তালুকদারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসা তো আরও অসম্ভব। মুখপোড়ার ড্যাবডেবে চোখ দুইটা যেন গিলিতে আসিতেছে।

কাদম্বিনী ঢুলিতেছিল।

কালীর মা আধ-ঘোমটা টানিয়া নির্বিকারভাবে পিছনের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল।

ইহার পরের গাড়িটা মালপত্রে বোঝাই।

তাহার ছোকরা গাড়োয়ানটা হয়তো লছমনিয়া কর্তৃক অভিভূত হইয়াই অসময়ে গলা ছাড়িয়া একটা হোলির গান ধরিয়াছে। তাহার পরের গাড়ি অর্থাৎ পঞ্চম গাড়িতে হরু মণ্ডল বর্শা-হস্তে উন্নত মস্তকে সিধা বসিয়াছিল। মেরুদণ্ড এতটুকু বাঁকিয়া যায় নাই, সুগঠিত দেহটির কোথাও এতটুকু শৈথিল্য নাই। সামান্য লাল শালুর পাগড়িটা রৌদ্রকিরণে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম গাড়িতে নীলমণি একাই শুইয়া ছিল।

দীনু গাড়োয়ানকে কিছুতেই উত্তেজিত করিতে না পারিয়া বিরক্ত বিশ্বম্ভর অবশেষে গাড়ি হইতে নামিয়া গিয়াছে। চুপচাপ নিরুত্তেজিতভাবে মন্থরগতি গরুর গাড়িতে বসিয়া থাকা অপেক্ষা রোদে হাঁটিয়া যাওয়া ঢের ভাল। তবু খানিকটা গরম হওয়া যায়। ওই দীনুটা কি মানুষ! ওটাও গরু।

কুঞ্জলালের দল কিন্তু জমাইতেছিল।

নিদারুণ রৌদ্র সত্ত্বেও কুঞ্জলাল বাজাইতেছিল—মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে।

বঙ্কু ছাড়া বাকি সকলেই কোরাসে গান ধরিয়াছিল, এমন কি গম্ভীর প্রকৃতির বীরেন পর্যন্ত। বঙ্কু চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সুরের মোহিনীশক্তি আছে, বঙ্কু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হঠাৎ মাথা নাড়িয়া অন্যমনস্ক-ভাবে মুখভঙ্গি করিতে করিতে হাঁটুতে তবলা বাজাইতে শুরু করিয়া দিল। হাবুল আর পাঁচুর চোখে চোখে একটা ইসারা হইয়া গেল, এবং সহসা সকলে একযোগে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বঙ্কু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেল।

জগদেও পাঁড়েও গানটা উপভোগ করিতেছিল। হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়াতে সে ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, বোন্ কোরলেন কেন? ফিন্‌সে শুরু করুন।

কুঞ্জ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

হাবুল বলিল, এই বঙ্কা, ফের বাজা!

রাগে বঙ্কুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে ঠিক করিয়াছে কিছুতে রাগিবে না। তাই মুখ গোঁজ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ হাবুল বলিল, দেখ দেখ।

সকলে দেখিল, একদল পাড়ার মেয়েরা কলসী লইয়া দূরের আলপথটা ধরিয়া মাঠের মাঝখানে একটা পুকুরের দিকে চলিয়াছে। তাহাদের পিছন পিছন একদল বাজনদার বাজনা বাজাইয়া যাইতেছে।

পাঁচু বলিল, জল সইতে যাচ্ছে সব, বিয়ে বোধ হয় কারও বাড়িতে।

কুঞ্জলাল বলিল, হ্যাঁ রে বঙ্কা, তোর বিয়েতেও জল সইতে গেছল সব এমনি করে?

বিস্ময়ের সুরে হাবুল প্রশ্ন করিল, এ কথা জিজ্ঞেস করবার মানে? বঙ্কা বিয়ে করছে বলে জল সইতে যাবে না কেউ? কি যে বলিস তার ঠিক নেই!

পাঁচু মুখে হাত দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতেছিল।

বঙ্কু চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার চোখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল।

॥ ৫ ॥

ফাঁকা মাঠ।

বিরিঞ্চির গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। ভাল তেজী বয়েল ঘোড়ার মতন ছুটিতেছে। গোহমুনা তখনও নির্বিকারভাবে চিনাবাদাম চিবাইতেছিল,

একটি কথা বলে নাই। শেষ চিনাবাদামটি পরিপাটি রূপে ছাড়াইয়া এবং সেটি মুখে ফেলিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে গোহমনা একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরিঞ্চির দিকে চাহিল। বিরিঞ্চি দেখিতে পাইল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে গরু দুইটাকে হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

গোহমনা চিনাবাদামটি সম্পূর্ণরূপে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, এইবার বল দেখি, কোথায় চলেছিস তুই? কাপড়-গামছার কথা যে মিছে, তা তো গোড়াতেই বুঝেছি। গাড়ির ঝুলিতে তোর কাপড় গামছা রয়েছে, তাও দেখতে পাচ্ছি। মতলব কি তোর?

বিরিঞ্চি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া গোহমনার দিকে চাহিল, কোন উত্তর দিল না। কেবল একটু ঝুঁকিয়া গরু দুইটার শিরদাড়ার উপর দুই হাত দিয়া সুড়সুড়ি দিয়া তাহাদের গতিবেগ বাড়াইয়া দিল।

জবাব দিচ্ছিস না যে?

বিরিঞ্চি আর একবার হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, জবাব দিল না।

গোহমনা তখন একটু আগাইয়া গিয়া বিরিঞ্চির পিছনের দিকের চুল ধরিয়া এক টান দিল।

শিগগির বল, কোথা নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?

বিরিঞ্চি এবারও কোন জবাব দিল না। কেবল প্রাণপণে বলদ দুইটাকে হাঁকাইতে লাগিল।

রৌদ্রতপ্ত নির্জন মাঠে হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে, গোহমনার নীল শাড়ির আঁচলখানা হাওয়ায় উড়িতেছে, তেজী বলদ দুইটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে, বিরিঞ্চি উন্মাদের মত তাহাদের হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

॥ ৬ ॥

জলন্ধর বিলের ধার দিয়া যে রাস্তাটা কালভৈরবের মাঠ পার হইয়া নালতে গ্রামে গিয়া পৌছিয়াছে, সেই রাস্তায় মোটর-বাইক হাঁকাইয়া ফট ফট ফট ফট শব্দ করিতে করিতে প্রচুর ধূলা উড়াইয়া বাদল ডাক্তার চলিয়াছেন। বাতাসপুর হইতে রোগী দেখিয়া তিনি ফিরিতেছেন। সকলের সঙ্গে ভোরবেলা ডাক্তারবাবু বাহির হইতে পারেন নাই। বাতাসপুরের রোগীই

অবশ্য তাহার একমাত্র কারণ নহে, আরও একটা নিগূঢ় কারণ ছিল—সকালের ডাকটা। সকালের ডাকটা কিছুদিন হইতে ডাক্তারবাবুর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ডাকটা না দেখিয়া বাহির হইলে কিছুতে স্বস্তি পান না। ডাকটা দেখিয়া কিন্তু তাঁহার অস্বস্তি আজ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। যে চিঠিটা নিশ্চয় আসিবে মনে করিয়াছিলেন, সেইখানাই আসে নাই। আসিয়াছে কতকগুলো বাজে বিজ্ঞাপন আর পিসীমার একখানা চিঠি। মায়ার চিঠি আসে নাই।

মায়া নাম্নী মেয়েটি (এখন অবশ্য মহিলাটি, কারণ তিনি এম. এ পাস এবং কিছুদিন হইতে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন) বাদল ডাক্তারের মামাতো দাদার বড় শালী। দাদার শালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সামাজিক অধিকার সকল ভ্রাতারই আছে এবং সে অধিকারের সুযোগ লইতে বাদল ডাক্তার কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু অধিকারমদে মত্ত হইয়া একটি প্রয়োজনীয় সত্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নিদারুণ বজ্রাঘাতের মত সে সত্যটি সহসা একদিন তাঁহার সচেতন সত্তার নিকট আত্মপ্রকাশ করিল। উভয়েরই গোত্র এক। দুইজনেই মুখোপাধ্যায় বংশসম্ভূত। পঞ্চবাণের পাঁচটা বাণই ভোঁতা হইয়া গেল।

গোত্র সম্বন্ধে সচেতন হওয়া অবধি মায়ার মনও কেমন যেন গুটাইয়া গিয়াছে। বিপদের সম্ভাবনায় শামুক অথবা কাছিম যেমন মুখ গুটাইয়া লয়, অনেকটা তেমনই। নিকটে থাকিলে সংযত, শোভন এবং অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা মায়া আজকাল আর বলে না। আগেও যে খুব বেশি বলিত, তাহা নয়; তবুও যাহা বলিত, তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু রঙ থাকিত। আজকাল সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ফ্যাকাসে ধরণের হইয়া গিয়াছে। চিঠিপত্র যাহা লেখে, তাহা না লিখিলেও চলিত। অর্থাৎ মায়ার বঁড়শিতে যে মাছটি ধরা পড়িয়াছিল, শাস্ত্রে তাহা খাইতে মানা। সুতরাং বঁড়শিটি খুলিয়া সে মাছটিকে আবার জলে ছাড়িয়া দিয়াছে। মাছ কিন্তু বঁড়শিটাকে ভুলিতে পারিতেছে না। মারাত্মক ক্ষতটা এখনও জ্বালা করিতেছে।

মায়ার অতি সাধারণ আমি-ভাল-আছি-আপনি-কেমন-আছেন গোছ চিঠির জন্যই বাদল ডাক্তার এখনও সমুৎসুক। বাদল ডাক্তারের চরিত্রে আর একটি মহৎ দোষ আছে। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লেখেন।

নিতান্ত মন্দ লেখেন না, অন্তত মায়াকে মুগ্ধ করিয়া দিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট ভাল।

জলন্ধর বিল প্রকাণ্ড বিল। খানিকটা শুকাইয়া এখন ডাঙা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে এটুকুও ডুবিয়া যায়। ডাঙার উপর গরু ভেড়া ছাগল শালিক একসঙ্গে চরিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূরে কয়েকটি হনুমানও একটা গাছে খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত। একটা নিভৃত অংশে কয়েকটি বক নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছে। বিলে মাছ খুব, মাঝে মাঝে দুই একটা লাফাইয়া উঠিতেছে। ওপারে একজোড়া মাণিকজোড় লম্বা লম্বা পা ফেলিযা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর এক অংশে সারস-জাতীয় প্রকাণ্ড একটা পাখী এক পায়ের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক তাহার মাথার উপরে একটা শঙ্খচিল উড়িয়া বেড়াইতেছে, সে দিকে তাহার খেয়াল নাই। বিলের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা কুমীর গা ভাসাইয়া নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে; না জানিলে মনে হইবে, একটা কাঠ ভাসিতেছে বুঝি। ঠিক তাহারই পাশে ভাসিতেছে প্রকাণ্ড সাদা একটা মেঘের ছায়া। দূরে জেলেদের জাল শুকাইতেছে। ছোট ছোট মাছ ধরিবার জন্য এক জায়গায় সারি সারি আড়া পাতা। তাহার কাছে জেলেরা নিজেদের প্রয়োজনে সারি সারি কয়েকটা বাঁশ পুঁতিয়াছে। তাহার একটাতে একটা ফিঙা এবং আর একটাতে একটা মাছরাঙা পাখী বসিয়া আছে।

নিদাঘ-মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত প্রাখর্য জলন্ধর বিলে একটু যেন প্রশান্ত হইয়া আসিয়াছে। কোথায় যেন একটা চিল ডাকিতেছে। আর ডাকিতেছে ফটিক-জল—ফটি-ক জল। পাখীটিকে দেখা যায় না, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠস্বর রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরকে তন্দ্রাতুর করিয়া তুলিয়াছে। বিশালকায় জলন্ধর বিলের বিচিত্র সৌন্দর্য কিন্তু বাদল ডাক্তারকে মোটেই আকৃষ্ট করিতেছে না। এইমাত্র যে মুমূর্ষু রোগীটি তিনি দেখিয়া আসিলেন, তাহার কথাও তাঁহার মনে নাই। বাদল ডাক্তার ভাবিতেছিলেন, এবার মায়াকে কবিতায় একটা চিঠি লিখিলে কেমন হয়? হয়তো উত্তর দিতে পারে। বেশ সরস ছোট্ট একটি কবিতা। কবিতার প্রথম লাইনটা কি হইবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন।

ফোঁস্‌স—

কল্পলোক হইতে সহসা কঠিন বাস্তবলোকে বাদল ডাক্তারকে নামিয়া আসিতে হইল। প্রকাণ্ড একটা সাপ পাশের একটা ঝোপ হইতে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জলন্ধর বিলকে উপেক্ষা করিয়া অন্যমনস্ক লোকটা চলিয়া যাইতেছে বলিয়া জলন্ধর বিলের আহত আত্মমর্যাদা যেন সক্রোধ গর্জন করিয়া উঠিয়াছে।

বাইকের গতিবেগ আরও বাড়াইয়া দিয়া ঝড়ের মতন বেগে বাদল ডাক্তার জলন্ধর বিল পার হইয়া গেলেন। বাদল ডাক্তার বলিষ্ঠ লোক। প্রচুর খাইয়া এবং দুপুরে ঘুমাইয়া যদিও একটু মোটা হইয়াছেন, কিন্তু একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়েন নাই। ঢিলা-হাতা লংক্লথের পাঞ্জাবি পরিতে ভালবাসেন। এখনও তাহাই পরিয়া আছেন। পাঞ্জাবিতে হাওয়া ঢুকিয়া পিছন দিকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাদল ডাক্তার দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। আহা, এ সময় পাশে যদি মনা থাকিত! 'সাইড্‌কার'-টা খালিই রহিয়াছে।

জলন্ধর বিল পার হইলেই কালভৈরবের মাঠ, মাঠটা পার হইলেই নালতে গ্রাম। নালতে গ্রামে হরিচরণ মাস্টার আছে, তাহার নিকট হইতে কাগজ যোগাড় করিতে হইবে। ফাউন্টেন পেন সঙ্গেই আছে।

॥ ৭ ॥

বিরিঞ্চির গাড়ি যখন নালতে গ্রামে ঢুকিল, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঢুকিতেই যে ডোবাটা আছে, তাহাতে গোটা কয়েক মহিষ কাদা মাখিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তীরে গোটা দুই রাখাল বালক ডাং-গুলি খেলিতেছে। নালতে গ্রামের বিলু বাগ্দী কাঁধে জাল ফেলিয়া জলন্ধর বিলে মাছ ধরিতে যাইতেছিল, সে বিরিঞ্চিকে চিনিত, তাহারই মুখে বিরিঞ্চি শুনিল যে, বাবুরা ঠিক ইহার পরের গ্রাম শঙ্করাতে অবস্থান করিতেছেন। জমজম নামক বদমেজাজি হাতীটার নাকি সত্যসত্যই মাথা গরম হইয়া গিয়াছে। ঝাংরু গ্রামের পুষ্করিণীতে হাতীটাকে নামাইয়া স্নান করাইতেছে। মেজবাবুকে নামিতে হইয়াছে। শঙ্করা-কাছারিতে ছোটবাবুর কাজ ছিল, তিনিও নামিয়াছেন। ভাইদের পিছনে ফেলিয়া বড়বাবু একা যাইতে রাজি হন নাই বলিয়া তিনিও নামিয়া পড়িয়াছেন।

পোদ্দারের দোকানটা খোলা আছে হে ?

বিলু বলিল, আছে।

বিরিঞ্চি গাড়ি হাঁকাইয়া নালতে গ্রামের বিলাস পোদ্দারের দোকান অভিমুখে যাত্রা করিল। বিলু চলিয়া গেল।

গোহমৃনা চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

তাহার ডান গালটা রোদ লাগিয়াই সম্ভবত লাল হইয়া উঠিয়াছে। বেশবাস বিস্রস্ত। নীল চোখ দুইটা জ্বলিতেছে।

বিলু চলিয়া গেলে বিরিঞ্চি ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, ঝাংরুকে কিছু বলিস না, কেমন ? তোর চুড়ি আমি কিনে দিচ্ছি এখনই। বলবি না তো ?

গোহমৃনা নীরব।

বিরিঞ্চি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, কটা চুড়ি ভেঙেছে তোর ?

চারটে।

এখুনি কিনে দিচ্ছি আমি, ওই যে পোদ্দারের দোকান খোলাই আছে দেখছি।

আর একটু আগাইয়া রাস্তার পাশের ছোট মনিহারি দোকানটার সামনা-সামনি গিয়া বিরিঞ্চি গাড়ি থামাইল।

গোহমৃনার হাতে যে চুড়িগুলি অবশিষ্ট ছিল, তাহা দেখাইয়া বিরিঞ্চি প্রশ্ন করিল, এমনি ধারা চুড়ি তোমার আছে নাকি হে পোদ্দার ?

পোদ্দার বিরিঞ্চির বন্ধুলোক। গোহমৃনার দিকে এক নজর চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, আছে বই কি, কত চাই ?

বেশি নয়, গোটা চারেক।

পোদ্দার হাসিমুখে দুই তিন রকম মাপের লাল রেশমী চুড়ি বাহির করিল। গোহমৃনা তাহার ভিতর হইতে চারটি বাছিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হাতে পরিয়া ফেলিল। ডান হাতে তিনটি এবং বাঁ হাতে একটি চুড়ি ভাঙিয়া গিয়াছিল।

বিরিঞ্চি বলিল, দাম কত ?

দাম !

বিলাস পোদ্দার সম্মুখের সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া এবং আর একবার গোহমৃনার পানে চাহিয়া বলিল, ও চারগাছা চুড়ির আর কি দাম নোব তোমার সেঙাতনীর কাছ থেকে ? সেটা কি ভাল দেখায়, কি বল তুমি ?

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল, তবে নিওনা। তাহ'লে এবার চলি আমি।

আরে ভাই, একটু তামুক-টামুক খেয়ে যাও, নামই না!

না ভাই, বড দেরী হয়ে গেছে। ফিরবার পথে নামব।

ভুলো না কিন্তুক।

আচ্ছা।

বিরিঞ্চি গাড়ি হাকাইতে লাগিল।

গোহমুনা নীরবে বসিয়া রহিল।

নালতে গ্রাম পার হইয়া ছোট একটা মাঠ, তাহার পরই শঙ্করা গ্রাম। নালতে গ্রামের সীমান্তে কয়েকটা বড বড় আমগাছ পথটাকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। গাছের তলায় তলায় বিরিঞ্চির গাড়ি চলিয়াছে। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই।

হঠাৎ গোহমুনা বলিল, গাড়ি থামা, নামব আমি।

কেন?

জল পিপাসা লেগেছে আমার।

গোহমুনা গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল।

বিরিঞ্চি গাড়ি থামাইয়া বলিল, এখানে জল পাবি কোথা?

তুই একটুকু দাড়া, আমি গাঁয়ের ভেতর থেকে এক ছুটে খেয়ে আসি। পালাস না যেন!

পালাব কেন?

না, পালাবি না! পুরুষ জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি! দেখি তোর গামছাখানা।

বিস্মিত বিরিঞ্চি বলিল, কেন?

দেখি না।

বিরিঞ্চি কোমর হইতে গামছাখানা খুলিয়া দিল।

এইবার তোর হাত দুটো দেখি।

বিরিঞ্চিকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া গোহমুনা গামছা দিয়া বিরিঞ্চির হাত দুইখানা বাঁধিয়া ফেলিল।

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল, এ কি?

আমার নিজের গামছা দিয়ে তোর পা দুটোও বাঁধব। পুরুষ লোককে বিশ্বাস আছে? চোখের আড়াল হ'লেই পালিয়ে যায়!—বলিয়া সে সত্য-

সতাই নিজের ছোট পুঁটুলিটি খুলিয়া গামছা বাহির করিল এবং বিরিঞ্চিকে আদেশের সুরে বলিল, নে, পা দুটো জড়ো কর শিগগিরি !"

বিরিঞ্চির মজা লাগিতেছিল। সে হাসিয়া পা দুইটাও একসঙ্গে জড়ো করিয়া বসিল। গোহমুনা বেশ করিয়া তাহার পা দুইটাও বাঁধিল।

উঃ উঃ, লাগছে যে, কত জোরে বাঁধছিস ?

বেশ করিয়া গেরোর উপর গেরো দিয়া গোহমুনা বলিল, বসে থাক চুপ ক'রে।

তাহার নীল চক্ষু দুইটি সাপের চক্ষুর মত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে।

বিরিঞ্চি বলিল, এমনি ক'রে ব'সে থাকব নাকি ?

থাক না, মজা পাবি—বলিয়া গোহমুনা একটা ইঁট কুড়াইল এবং সেটা সজোরে গাছের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

গাছে প্রকাণ্ড একটা ভীমরুলের চাক ছিল।

শঙ্করা গ্রামের কাজল দীঘি পুকুরে ঝাংরু জমজমকে নামাইয়াছিল। কয়েক দিন স্নান করানো হয় নাই বলিয়াই হাতীটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘণ্টাখানেক জলে পড়িয়া থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। ঝাংরু হাতীর কাঁধ হইতে নামে নাই। সে ডাঙশ লইয়া নিজের স্থানটিতে ঠিক বসিয়াছিল। ঘাড়ে সওয়ার হইয়া বসিয়া থাকিলে হাতীর বাবার সাধ্য আছে তাহাকে ফেলিয়া দেয়! এঁটুলি যেমন করিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, ঝাংরু ঠিক তেমনিই ভাবে তাহার ঘাড়ে বসিয়াছিল। হাতী ডুবিয়া যাইবার মত জল কাজল দীঘিতে ছিল না। জমজম শুঁড়ে করিয়া জল লইয়া নিজের মাথায় এবং ঝাংরুর সর্বাঙ্গে ছিটাইতেছিল। তাহার ফোঁসফোঁসানি যদিও এখনও কমে নাই, কিন্তু জলে নামিয়া সে পূর্বাপেক্ষা অনেকটা শান্ত হইয়াছে। মজা দেখিবার জন্য তীরে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ভিড় দেখিলে জমজম পাছে আবার ক্ষেপিয়া উঠে, এইজন্য ঝাংরু তীরে কাহাকেও দাঁড়াইতে দেয় নাই। ঝাংরুর মানা সত্ত্বেও দুই চারিটা ছোড়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোন মজার সন্ধান না পাইয়া তাহারাও একে একে সরিয়া পড়িয়াছে। তীর এখন নির্জন। অদূরে সারি সারি কয়েকটা তালগাছ দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া সশব্দে তাহাদের পাতাগুলিকে নাড়া

দিয়া যাইতেছে। পাশের একটা ঝোপ হইতে একটা নেউল বাহির হইল, এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল আবার ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বাহির হইল এবং সেটাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। কয়েকটা বড় বড় প্রজাপতি ওধারের ঘেঁটুবনটায় উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। জলের ধারে কতকগুলি ঘলঘসে ফুলের গাছ। শুঁড়ের মতন বাঁকানো ডালের উপর সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ঠিক তাহাদেরই কাছে ঘাস পাতার জঙ্গলে জাল পাতিয়া একটি বিচিত্র রঙের মাকড়সা শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া আছে। অদূরে জীর্ণ শিবমন্দিরটার দুয়ার বন্ধ। কেহ কোথাও নাই। জমজম ক্রমাগত শুঁড়ে করিয়া জল তুলিয়া তুলিয়া মাথায় ঢালিতেছে। ঝাংরু তাহার কানে ডাঙশটা ঝুলাইয়া রাখিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া তাহার মাথাটা পরিষ্কার করিয়া দিতেছে এবং হস্তীবোধ্য ভাষায় তাহার সহিত কি কথা বলিতেছে।

জমজম সহসা খুব জোরে কোঁস করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গোহমনা পিছন দিক হইতে ঝাংরুকে জড়াইয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোহমনা জলে নামিয়া পিছন দিক হইতে চুপিচুপি কখন হাতীতে চড়িয়াছে, ঝাংরু বুঝিতেও পারে নাই।

এ কি, তুই কোথা থেকে এলি ?

পালিয়ে এলাম।

কোথা থেকে ?

সিরিঝির গাড়ি থেকে।

কেন ?

বাবা রে বাবা, সে ভীমরুল সেখানে।

ভীমরুল !

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ভীমরুল। নালতে পেরিয়ে একটা আমগাছের তলা দিয়ে আসছি আমরা, এমন সময় তোমার সিরিঝি জাতি তুলে সেই তার গরু হাঁকাতে গেছে, কি জাতি গিয়ে লাগল এক ভীমরুলের চাকে, গাছের নিচু ডালটায় বাসা ছিল তাদের।

তোর গালে কিসের দাগ ?

আমার গালে একটা বসেছিল এসে, আর একটু হলেই হুলটা ফুটিয়ে দিত।

ঝাংরু চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, তুই বিরিঝি বেচারাকে অমন বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে এলি ? আচ্ছা লোক তো তুই !

ভীমরুলকে আমি বড্ড ভয়াই বাপু।

গোছমনা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ব্যাংরুও হাসিল।

জয়জয় আর একবার ফোঁস করিয়া উঠিল।

॥ ৮ ॥

শঙ্করা-কাছারিতে যে কাজটির জন্ত ছোটবাবু নামিয়াছিলেন, সে কাজটি বেশ একটু জটিলগোছের। কিছুদিন পূর্বে জগাই ক্যাপা নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ শঙ্করা গ্রামে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছেন। এমন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, শঙ্করা-কাছারির গোমস্তা দ্বারিক ঘোষাল সংবাদটা সদরে দাখিল না করিয়া পারেন নাই।

ছোটবাবু খবর পাঠাইয়াছিলেন যে, কলমিপুরে যাইবার মুখে তিনি শঙ্করায় নামিবেন এবং উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া যথোচিত বন্দোবস্ত করিবেন।

সিদ্ধ-পুরুষটির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুইটি দল খাড়া হইয়াছে। এক দলের মতে সিদ্ধপুরুষ সত্যই সিদ্ধ-পুরুষ, নানারূপ গন্ধ বাহির করিয়া, ভবিষ্যৎবাণী [illegible] এবং আরও নানা রকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করিয়া তিনি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন; সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বিপক্ষ দলে গ্রামের সমস্ত যুবকবৃন্দ জুটিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, পুরুষটি হাফ-বয়েলড বা হার্ড-বয়েলড, যাহাই হউন, উহার মতলব সুবিধার নয়। মেয়েদের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিবার হেতুটা কি! বাছিয়া বাছিয়া যুবতী মেয়েদের দ্বারাই গা হাত পা টিপাইবার আধ্যাত্মিক অর্থ তো তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। বুঝিতে চাহেও না। জমিদারবাবুরা যদি ইহার একটা বিহিত না করেন, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই ইহার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। মারের চোটে সিদ্ধপুরুষকে একেবারে 'স্তাকোট' করিয়া ছাড়িয়া দিবে।

সমস্যা গুরুতর! দ্বারিক ঘোষালের মুখে যাহা শুনা যাইতেছে, তাহাতে সিদ্ধপুরুষটি সত্যই একটু বিচিত্র ধরনের লোক। কুচকুচে কালো রঙ, ষণ্ডামার্কা চেহারা, কিন্তু স্ত্রীলোকের মত পোষাক পরিয়া থাকেন। মাথায় লম্বা চুল, নাকে নোলক, কাছা নাই, বুকে সর্বদাই আঁচল টানিতেছেন। সখী ভাব!

যুবকেরা ইহার প্রতি বিরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ প্রাচীন মাতব্বর ব্যক্তিই ইহার স্বপক্ষে। এমন কি ছাতিমপুর গ্রামের নামজাদা ঘুষখোর দারোগাটি পর্যন্ত ভক্তিতে গদগদ। সমস্ত শুনিয়া ছোটবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চট করিয়া কিছু একটা করিয়া বসা তাঁহার স্বভাব নয়। যদিও তিনি যাহা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে বড়বাবু, মেজবাবু কেহই একটি কথা বলিবেন না, তবু নিজের দায়িত্বে চট করিয়া একটা হুকুম তিনি দিতে পারিলেন না। ঘটনাটা বড়বাবুর গোচর করিলেন।

বড়বাবু সটকায় একটা টান দিয়া বলিলেন, কারও স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। ওই হিজড়ে-মার্কা সিদ্ধপুরুষ যদি এখানে থেকে সুখ পায় থাকুক, কেউ যদি স্বেচ্ছায় ওকে বাড়িতে স্থান দেয় দিক, কোন মেয়ে যদি ওর পা টিপে সুখ পায় পাক, আর ছোকরারা যদি সে জন্যে ওকে ধ'রে পিটতে চায় পিটুক, আর তুমিও যদি এ বিষয়ে কিছু একটা করতে চাও কর। আমার কাছে সবই সমান।—এই বলিয়া তিনি সটকায় পুনরায় একটা টান দিলেন।

নিকটেই লাহিড়ী বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ভোট নাও। এই ডেমোক্র্যাসির যুগে সবই তো ভোট দিয়ে ঠিক হচ্ছে।

বড়বাবু বলিলেন, ভোট! খুব সহজ বুদ্ধি বাতলালে তো! গাঁ-সুদ্ধ লোকের ভোট নিয়ে বেড়াতে হবে এখন! তখুনি তোমাকে বললুম দু পেগ চড়িয়ে নাও, কি রকম যেন মিইয়ে পড়েছ আজ সকাল থেকে।

লাহিড়ী এই কথায় এমন একটা হাসি হাসিলেন, যাহার অর্থ—আপনি যে এ কথা বলিবেন, তাহা আগেই জানিতাম এবং আপনি ছাড়া এমন কথা কে-ই বা আর বলিতে পারে!

মুখে কিন্তু তিনি বলিলেন, সহজ বুদ্ধি একটা বাতলান তা হ'লে। আমাদের ছোটবাবু যে ফাঁপরে পড়েছেন।

সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে ব্যাপারটা ছোটবাবুর হাতেই ছেড়ে দেওয়া।

বড়বাবু আবার সটকা তুলিয়া লইলেন। ছোটবাবু একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গেলেন মেজবাবুর কাছে। মেজবাবু কাছারি-বাড়ির শীতলতম ছোট ঘরটিতে তাকিয়া ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। কোলের কাছে টোকনের বান্ধবী এবং হরিশ খুড়োর নাতনী চাঁপা বসিয়াছিল। এই ফুটফুটে মেয়েটি মেজবাবুর বড় প্রিয়। তাঁহার সহিত হাতীতে চড়িয়া আসিয়াছে।

টোকনও আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মেজমা ওই দুরন্ত ছেলেকে হাতীর পিঠে আসিতে দেন নাই। মেজবাবু মুশকিলে পড়িয়াছেন, চাঁপা টোকনের জন্ত ছটফট করিতেছে। কাছে থাকিলে যদিও দুইজনে ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি ছাড়া আর কিছুই করে না, কিন্তু ছাড়াছাড়ি হইবারও উপায় নাই। এ বিপদ যে ঘটিবে, তাহা মেজবাবু জানিতেন। সেইজন্ত টোকনকেও হাতীতে লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মেজ গিন্নির কথার উপর—

ছোটবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আনুপূর্বিক সমস্ত শুনিয়া মেজবাবুর যৌবনকালের মেজাজটা ক্ষণিকের জন্ত ফিরিয়া আসিল। তিনি তাকিয়া ছাড়িয়া বিরাট দেহ লইয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, দ্বারিককে ...ল হাঁকিয়ে দিক ব্যাটাকে। ওসব বুজরুকি ফুজরুকি চলবে না এখানে। ...াপের ওপর নোলক ঝুলিয়ে ধর্মের নামে ভেলকি দেখাবার জায়গা এ নয়। ...র ক'রে দাও ব্যাটাকে।

ছোটবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, মেজবাবু আবার ডাকিলেন, শোন শোন। তুমিই যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর গিয়ে! যত সব জোচ্চরের আড্ডা এখানে!

ছোটবাবু চলিয়া গেলেন।

চাঁপা পুনরায় প্রশ্ন করিল, টোকন এখনও আসছে না কেন?

স্নিগ্ধকণ্ঠে মেজবাবু বলিলেন, এই এসে পড়ল ব'লে।

এত স্নিগ্ধকণ্ঠে যে, কে বলিবে এই লোকটারই মেজাজ একটু আগে সপ্তমে চড়িয়াছিল!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ছোটবাবু শেষে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। দ্বারিক ঘোষালকে বলিলেন, এক কাজ কর তুমি, সিদ্ধ-পুরুষটিকে আমাদের সদরে নাটমন্দিরে চালান ক'রে দাও। সেখানে ভাল থাকবেন উনি। একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে কালই পাঠিয়ে দাও সেখানে। ওঁকে গিয়ে বল যে, আমরা ওঁর খ্যাতি শুনে মুগ্ধ হয়েছি এবং দেখা করতে চেয়েছি। এ কথা শুনলে উনি যেতে আপত্তি করবেন না। কলমিপুর থেকে ফিরে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আমি চক্রবর্তী মশাইকেও ব'লে দিচ্ছি।

বাহিরের বারান্দাতে প্রবীণদলের মুখপাত্র চক্রবর্তী মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ছোটবাবু তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, আমাদের সকলেরই

ইচ্ছে যে, আমাদের নাটমন্দিরে বাবা একবার পদধূলি দেন। এখন তো তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ ঘটল না, দ্বারিককে তাই ব'লে দিলাম, আমাদের ওখানে যাবার সব ব্যবস্থা যেন ও ক'রে দেয়। নাটমন্দিরে থাকবার কোন অসুবিধে হবে না। আমাদের নায়েব চৌধুরীও মহা ভক্ত লোক। সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে ওঁর। কালই একবার পাঠিয়ে দেবেন ওঁকে দয়া করে।

চক্রবর্তী সোৎসাহে বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়. মহাপুরুষ লোক উনি, নিয়ে যাবেন বই কি আপনারা। মানী না হ'লে মানীর মান রাখবে কে ?

চক্রবর্তী ছাতা ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেলেন এবং নিজের দলকে গিয়া খবর দিলেন, বাবুরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন ওঁকে নিজেদের নাটমন্দিরে।

বিপরীত দিকের বারান্দায় ছোকরাদের মুখপাত্র বিপ্‌নে অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র আস্তিন গুটাইয়া ছিল। ছোটবাবু তাহাকে গিয়া বলিলেন, কালই ও গ্রাম থেকে চ'লে যাবে, সে ব্যবস্থা করেছি। তোমরা আর কিছু ব'ল না ওকে।

যে আজ্ঞে।

পুলকিত বিপিনও নিজের দলে গিয়া বিজয়বার্তা জ্ঞাপন করিল। বলিল, ছোটবাবু বললেন, কালই ব্যাটাকে কান ধ'রে গ্রাম থেকে বার ক'রে দেবেন।

হুম ব্রো, হুম ব্রো, হুম ব্রো—

মেজমা, তরঙ্গিণী, ঊষা. ঠানদি, ঠাকুরদা সকলের পালকি আসিয়া পড়িল। অশ্বপৃষ্ঠে হীরেনও আসিল। কিন্তু সুরেনের আর মীনার পাত্তা নাই। পালকির শব্দ পাইয়া মেজবাবু ও ছোটবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। চাঁপা ছুটিয়া গিয়া টোকনের গলা জড়াইয়া ধরিল। মেজমা মেজবাবুকে নিরাপদ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তরঙ্গিণী ছোটবাবুর প্রতি একবার আড়চোখে চাহিয়া একটু হাসিয়া পালকির অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন। ছোটবাবুর মুখে নয়, চোখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মেজমা মেজবাবুকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু সুরেন মীনার জন্য পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

হীরেন বলিল, কালভৈরবের মাঠে একটা খরগোস দেখে সুরেন তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে। সে এসে পড়বে এখুনি।

ঊষা বলিল, মীনাও এল ব'লে। ভয় কি, তার সঙ্গে তো নেহাল সিং আছে।

মেজমা চিন্তিত মুখে বলিলেন, পরের মেয়ে, ভালয় ভালয় এসে পৌছলে বাঁচি। যা রোদ উঠেছে, বেয়ারাগুলো হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আস্তে আস্তে আসছে।

ছোটবাবু ছদ্ম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আহা সত্যি, বড় কষ্ট বেচারাদের! বড্ড ভুল হয়ে গেছে, বেয়ারাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এক দল পাংখা-বরদার ঠিক করলেই হ'ত, বেয়ারাগুলোকে হাওয়া করতে করতে আসত।

মেজমা কোপ-প্রকাশ করিয়া বলিলেন, নিজেদের যদি বইতে হ'ত কাঁধে ক'রে, ঠাট্টা করা বেরিয়ে যেত তা হ'লে।

ছোটবাবু কাছারির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ঊষা পালকি হইতে বাহির হইয়া হীরেনের সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

মেজবাবু ঠাকুরদার পালকির নিকট গিয়া বলিলেন, ঠাকুরদা, আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে যেন!

আমার মতন অবস্থায় পড়লে তোমাকেও দেখাত।

কেন, কি হ'ল?

আমার একমাত্র গৃহিণীর একমাত্র কোমর বিপন্ন।

মেজবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, এর ভেতরেও আপনি ঠানদির কোমর তদারক করবার অবসর পেয়েছেন? আশ্চর্য!

ঠানদি হাসিয়া বলিলেন, তার চেয়েও আশ্চর্য যে, তোমরা এতদিনেও তোমাদের ঠাকুরদাটিকে চিনতে পারলে না!

মেজবাবু বলিলেন, হ'ল কি আপনার কোমরে?

পালকিতে ব'সে ব'সে কোমরে খিল ধ'রে গেছে ভাই। কোমরের সে জোর কি আর আছে?

তার জন্যে ভাবনা কি, আপনাদের দ্বারিকও বেতো মানুষ, ওর কাছে নিশ্চয় মহামাস-টাস কিছু একটা আছে। দিচ্ছি যোগাড় ক'রে দাঁড়ান।

ঠাকুরদা ব্যগ্রতার ভান করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, দাও তো ভাই, কলমিপুরের মাঠে গিয়ে একটু মালিশ ক'রে দোব না হয়।

মেজবাবু হাসিয়া কাছারির দিকে চলিয়া গেলেন।

ছোটবাবু পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং আড়চোখে একবার মেজমায়ের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন।

মেজমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, বড়দিরা কি চ'লে গেছেন ?

হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ আগেই গেলেন তাঁরা। মা তো রাস্তায় জলগ্রহণ করবেন না, সেখানে গিয়ে ময়না নদীতে নেয়ে আহ্নিক ক'রে তবে খাবেন কিছু। সেইজন্যে ওদের আর আটকালাম না। ওই যে গরুর গাড়িগুলোও এসে গেল দেখছি।

দূরে রাস্তায় গরুর গাড়ি দেখা গেল। বিরিঞ্চির গাড়ি ছাড়া বাকি নয়খানা গাড়ি আসিতেছে।

মেজমা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, নতুন হাতীটা রাস্তায় কোন বদমায়েসি ক'রে নি তো ?

মেজবাবু বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই জবাব দিলেন, করেছিল একটু আধটু। ঝাংরু সেটাকে নাওয়াতে নিয়ে গেছে কাজল দীঘিতে। মাথায় জল-টল পড়লেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বোধ হয়।

ছোটবাবু বলিলেন, তবু ওতে আর তোমার যাওয়া চলবে না. তুমি আমার হাতীতেই এস। চাঁপা না হয় কোন একটা পালকিতে উঠুক।

মেজমা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ছোটবাবুর মুখের পানে চাহিলেন।

মেজবাবু কোনদিন ছোটবাবুর কথায় প্রতিবাদ করেন না, নির্বিকারভাবে বলিলেন, বেশ॥

মেজমা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, টোকন নাই।

টোকন কোথা গেল ?

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওই যে কাঠবেড়ালি-শিকার হচ্ছে।

কাছারি বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছটায় অসংখ্য কাঠবিড়ালি লেজ ফুলাইয়া কিচ কিচ শব্দ করিতে করিতে পরস্পরকে তাড়া করিতেছিল। তাহারই একটাকে টোকন এয়ারগান দিয়া লক্ষ্য করিতেছে। নিকটেই চাঁপা পাকা গিন্নীর মত ওষ্ঠ-ভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভাবটা যেন—তুমি যা মারিতে পারিবে, তা আমি জানি। বরং বন্দুকটা আমায় দাও, কি করিয়া টিপ করিতে হয় দেখাইয়া দিতেছি।

মেজমা হাসিয়া বলিলেন, তোমার শিকারী ছেলের জ্বালায় গেলাম বাবু।

ইহার উত্তরে ছোটবাবু কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ঝড়ঝড়ে বাইকে চড়িয়া ব্যস্তসমস্তভাবে নীলু দত্ত আসিয়া হাজির।

মেজমা ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া পালকির ভিতর অন্তর্হিতা হইলেন।

নীলু দত্ত বলিলেন, ভারী ভুল হয়ে গেছে একটা, লণ্ঠনের কথা মনেই ছিল না। দ্বারিক কোথা?

দত্ত মহাশয় বাইক হইতে নামিয়া বাইকটা ঠেলিতে ঠেলিতে দ্বারিকবাবুর সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কি দাঁড়াইবার অবসর আছে! একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, এখানে আছে গোটাচারেক লণ্ঠন, ছাতিমপুরেও গোটা দুই পেয়েছি, দেখি নালতেতে যদি পাই কয়েকটা।

নীলাম্বর পুনরায় বাইকে সওয়ার হইতেছিলেন এমন সময় ছোটবাবু বলিলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও।

নীলাম্বর দাঁড়াইলেন।

ওখানকার আর সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কটা তাঁবু গাড়লে সবসুদ্ধ?

নটা। আপনাদের তিনটে, গিন্নীমার একটা, জামাইবাবুর একটা, হীরেনবাবুর একটা, চাকরানিদের একটা—

চাকরানিদের তাঁবুটার উল্লেখ করিয়া নীলু দত্ত চকিতে একবার ছোটবাবুর মুখের পানে চাহিলেন এবং বলিতে চাহিলেন, চাকরানিদের তাঁবুটা তাঁহার তাঁবুর কাছেই দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কি মনে করিয়া আবার চাপিয়া গেলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, মোষের বাচ্চাটার কি হ'ল?

সেটাকে মেরেছে।

অ্যাঁ, বল কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকজন পাহারা বসিয়ে দিয়েছি সেখানে। মাচানও বাঁধিয়েছি তিনটে। আমি এবার যাই বাবু, অনেক কাজ বাকি এখনও—

ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি বাইকে উঠিয়া পড়িলেন।

দুই দিন কামানো হয় নাই, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। মাথার মুখে খাবছা খাবছা চুল উঠিয়া টাকটা আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। রোদে সমস্ত মুখখানা যেন পুড়িয়া গিয়াছে। নিদারুণ পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, অনিয়মে একদিনেই যেন নীলু দত্ত আরও দশ বৎসরের বুড়া হইয়া গিয়াছেন। খাটিয়া খাটিয়া তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল, এ দিকে লাহিড়ীটা দিব্যি বসিয়া

দাঁত বাহির করিয়া ইয়ার্কি দিতেছে! লোকটার লজ্জাও নাই! মনে মনে লাহিড়ীর চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে নীলু দত্ত সবেগে নালতে অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। অন্তত আরও গোটা চারেক লণ্ঠন যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার ভিতরই ফিরিতে হইবে।

খানিকক্ষণ পরে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না।

অশ্বপৃষ্ঠে সুরেন এবং মীনা!

দুইটি পা একদিকে ঝুলাইয়া সঙ্কুচিত মুখে মীনা সামনে বসিয়া রহিয়াছে এবং সুরেনের বাম বাহুটি পিছনের দিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। নিকটে আসিয়াই মীনা নামিয়া পড়িল। সুরেনও নামিল। সহিসের হাতে লাগামটা দিয়া সুরেন আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে এই যুগল আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা দিল, তাহাতে সকলেই খুশি হইলেন। ধাবমান শশকের পশ্চাতে কিছুদূর ছুটিয়া সুরেনকে অবশেষে হার মানিতে হইয়াছিল। কালভৈরবের মাঠে শশকটা মরীচিকার মত কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহা সুরেন ধরিতেই পারে নাই।

সুরেন বলিতে লাগিল, ফিরছি, কিছুদূর এসে ওই আপনাদের নালতে গ্রামটা পেরিয়েই কতকগুলো আমগাছ আছে, তার তলায় দেখি, মীনার পালকি। কাছে একটা গরুর গাড়িও রয়েছে। শুনলাম, গাছে নাকি একটা ভীমরুলের চাক ছিল, কি ক'রে তাতে খোঁচা লেগেছে, গাড়ির গাড়োয়ানটাকে কামড়েছে, মীনার পালকির দুজন বেয়ারাকেও কামড়েছে।

ছোটবাবু বলিলেন, বল কি? নেহাল সিং কোথা?

সে বেচারা ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে স'রে গেছল ব'লে বেঁচে গেছে, তাকে কামড়াতে পারে নি। সে আসছে পেছু পেছু।

মেজবাবু বলিলেন, তারপর?

আমি এসে দেখি এই অবস্থা। গাড়ির গাড়োয়ানটা তো অজ্ঞান-প্রায়, বেয়ারা দুটো ছটফট করছে, মীনা পালকির দরজা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছে।

মেজমা বলিলেন, কি বিপদ দেখ দিকি!

সুরেন বলিতে লাগিল, ভাগ্যিস আমি গিয়ে পড়লুম, তা না হ'লে মহা মুশকিলে পড়ত মীনা। তাও আবার ঘোড়ায় উঠতে চায় না কিছুতে। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তবে নিয়ে এলাম।

সুরেন হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে মীনার পানে চাহিল। মীনা সঙ্কুচিত হইয়া একধারে দাঁড়াইয়া ছিল, আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

ঊষা এবং হীরেনও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বামীর এই কৃতিত্বে ঊষা যেন অহঙ্কারে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মীনার দিকে চাহিয়া বলিল, ঘোড়ায় চড়তে ভয় করে নাকি তোর? আচ্ছা ভীতু তো! আমাদের ও ঘোড়াটা খুব ট্রেন্‌ড, টোকন পর্যন্ত চড়ে ওর পিঠে।

মেজমা প্রশ্ন করিলেন, গাড়োয়ানটা আর বেয়ারাগুলোর কি হ'ল?

সুরেন বলিল, তারা আসছে। গাড়ির পেছনের দিকে পালকিটা চড়িয়ে দিয়েছি, গাড়োয়ানটা তারই ভেতর শুয়ে পড়েছে। সে বেচারাকে ভয়ানক কামড়েছে। একজন বেয়ারাই গাড়িটাকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বাকি বেয়ারাগুলো হেঁটেই আসছে, নেহাল সিং সঙ্গে আছে।

মেজমা বলিলেন, আহা বেচারিরা!

ছোটবাবু তাড়া দিলেন, যাক সে, যা হবার হয়েছে, চল, এইবার আমরা বেরিয়ে পড়ি। মিছে দেরি ক'রে আর লাভ কি?

তাহার পর সুরেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ওহে, তোমার 'কিল' হয়ে গেছে। এখুনি খবর পেলুম।

সুরেন সোৎসাহে বলিল, তাই নাকি?

সকলে কলমিপুর মাঠের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মীনা আর ঊষা একটা পালকির ভিতর ঢুকিল।

॥ ৯ ॥

নালতে গ্রামে বন্ধু হরিচরণ মাস্টারের বাসায় বাদল ডাক্তার সত্যই একটি সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।—

নিদারুণ গ্রীষ্মকালে, আকাশেতে জ্বলিতেছে চিতা,
ঘর্মাক্ত-কলেবরা হে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী দেবি,
ঘূর্ণ্যমান পাংখাতলে, জানি আমি, তুমি নিপীড়িতা
কঠিন কর্মের ভারে অথবা মর্মের ভারে may be!
ক্লাস, ঘণ্টা, ছাত্রী, ফোন, মিটিং, রুটিন, সেক্রেটারি,
পরীক্ষার প্রশ্নাবলী, গার্জেনরা, কেরানি, চাপরাশি

রুদ্ধ করি মুক্ত বায়ু দাঁড়াইয়া আছে সারি সারি ;
ভিড় বাড়াইতে, দেবি, নাহি ইচ্ছা তার মাঝে আসি।
আমিও ঘর্মাক্ত-দেহ, আর্দ্র ভুঁড়ি শ্লথ নীবিবাস,
ঘর্ম-বিচর্চ্চিকাগুলি চুলকাইয়া কাটাই দিবস ;
তথাপি চিন্তিত আমি—(নহে, দেবি, নহে পরিহাস)
না পাইয়া কোন বার্তা চিত্ত মম সত্যই বিবশ।
চতুষ্পার্শ্বে জানি তব নানা কর্ম করে গিজগিজ,
তবু ক্ষুদ্র অনুরোধ, দু লাইন চিঠি লিখো—Please !

নিকটেই হরিচরণ উবু হইয়া বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। গ্রামের মাইনর স্কুলের মাস্টার তিনি, অর্থাৎ সেই জাতীয় লোক, যাঁহারা স্কুলপাঠ্য জ্যামিতি, ইতিহাস, সাহিত্য-সন্দর্ভ জাতীয় বই এবং স্কুলের ইন্সপেক্টর, সেক্রেটারি জাতীয় লোক ছাড়া আর বিশেষ কোন কিছুর খবর রাখিবার অবসর পান না।

হরিচরণ নিরীহ ভালমানুষ লোক। বাদল ডাক্তার বিনা পয়সায় তাঁহার বাড়িতে চিকিৎসা করেন বলিয়া বাদল ডাক্তারের বিশেষ ভক্ত। তাঁহার মনের খবরটিও জানেন। বাদল ডাক্তারের মনের খবর দুইজন লোক জানেন, —হরিচরণ মাস্টার এবং ছোটবাবু।

হরিচরণ কবিতাটি শুনিয়া গিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং একমুখ হাসিয়া বলিলেন খাসা হয়েছে।

তাহার পর হুঁকাটি কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া চীৎকার করিলেন, ওরে মেধো, কোথা গেলি তুই ? আঃ, একটা নেবু আনতে যুগ কাটাচ্ছে !

হরিচরণ বাহির হইয়া গেলেন। বাদল ডাক্তারকে শরবৎ না খাওয়াইয়া কিছুতেই তিনি ছাড়িলেন না। কিছুক্ষণ পরে দুই গ্লাসে শরবৎ চালাচালি করিতে করিতে তিনি পুনঃপ্রবেশ করিলেন। মেধো নামক ছাত্রটিও পিছনে পিছনে লেবু-হস্তে প্রবেশ করিল। শরবৎ পান করিয়া বাদল ডাক্তার নিজের হাত-ঘড়িটা একবার দেখিলেন। কি সর্বনাশ, চারিটা যে বাজে ! আর তো বসিয়া থাকা চলে না। সন্ধ্যা নাগাদ কলমিপুরের মাঠে না পৌঁছিতে পারিলে ছোটবাবু কি মনে করিবেন !

হরি, তোমার কাছে একটা খাম আছে ভাই !

আছে।

দাও তো, এইখানেই পোস্ট ক'রে দিই চিঠিটা।

খামের উপর মায়ার ঠিকানাটা লিখিয়া বাদল সযত্নে কবিতাটি তাহার মধ্যে পুরিয়া ফেলিলেন। যাইবার সময় পোস্ট-অপিসে স্বহস্তে পোস্ট করিয়া যাইতে হইবে। অবিলম্বে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

॥ ১০ ॥

সন্ধ্যা হয় হয়।

সমস্ত দিনের গরমের পর ঝির ঝির করিয়া স্নিগ্ধ একটা হাওয়া উঠিয়াছে। নির্মল নীল আকাশ। ঝাংরু গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে জমজমকে লইয়া কাঁকন নদী পার হইতেছে। পাগলা ঠাণ্ডা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে 'কাঁক' করিয়া শব্দ করিযা গানের তালে তালে ঠিক তাল দিতেছে। গোহমনা ঝাংরুর পিছনে বসিয়া তাহার পিঠে গাল রাখিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার সুরে সুর মিলাইয়া দুই এক কলি গানও গাহিতেছে। মুখে অতি মৃদুমধুর একটি হাসি, চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত।

পূর্বাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে।

প্রান্তরে

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[কলমিপুরের মাঠে বড়বাবুর তাঁবু। তাঁবুটি বেশ বড়। দুইটি কক্ষ আছে, কক্ষ দুইটির মধ্যবর্তী দ্বার পর্দাবৃত। বড়বাবু যে কক্ষটিতে বসিয়া আছেন, তাহাতে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। গোটা দুই ক্যাম্প-চেয়ার, প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া, দুইটি তেপায়া। একটি তেপায়ার উপর একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এক কোণে গোটা তিনেক স্যুটকেস আবছাভাবে দেখা যাইতেছে। তাঁবুর সম্মুখের দরজাটা এবং দক্ষিণ দিকের বড় বড় বাতায়ন তিনটি উন্মুক্ত। দরজা দিয়া জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীর খানিকটা অংশ, কিছু দূরে দুইটি তাঁবু এবং আরও খানিকটা দূরে একটা জটলার মত দেখা যাইতেছে। বেহারা, মাহুত, গাড়োয়ান প্রভৃতি ভৃত্যগণ সেখানে গোল হইয়া বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। মাদলের আওয়াজ ও বাঁশির সুর ভাসিয়া আসিতেছে। বড়বাবু কেমন যেন একটু উন্মনা হইয়া একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি কার্পেটের উপর বসিয়া লাহিড়ী হার্মোনিয়াম সহযোগে "আমার দখিন দুয়ার খোলা"—গানটি আবেগভরে গাহিতেছেন। একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে নীলমণি প্রবেশ করিল এবং গড়গড়ার মাথায় কলিকাটি বসাইয়া নলটি বাবুর হাতে ধরাইয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল। বড়বাবু গান শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্কভাবে একটা টান দিলেন। কুঞ্চিত-ভ্রূ নীলু দত্ত দ্বারপ্রান্তে সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া গেল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। লাহিড়ীর গান ক্রমে শেষ হইয়া আসিল।]

লাহিড়ী। [হার্মোনিয়ামটা ঠেলিয়া দিয়া] নাঃ,' এখন বিটোফেনের মুন্‌লাইট সোনাটা ছাড়া আর কিছুতে জমবে না। অর্গানটা আনলেই হ'ত।

[বড়বাবু গড়গড়াতে কয়েকটা টান দিলেন।]

বড়বাবু। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, খাঁটি দুধ প্রচুর রয়েছে, কেবল মুন্‌লাইট সোনাটা নামক দম্বলটির অভাব ?

[বড়বাবু কথাটাকে এভাবে লইবেন, তাহা লাহিড়ী বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, মুন্‌লাইট সোনাটা বড়বাবুর প্রিয় জিনিস, সেইজন্যই কথাটা বলিয়াছিলেন। বড়বাবুর মন্তব্য শুনিয়া বুঝিলেন, কথাটা এখন বেফাঁস হইয়াছে। সারিয়া লইবার জন্য সবজান্তাগোছ একটা হাসি হাসিলেন।]

লাহিড়ী। খাঁটি জিনিস থাকলে আর ভাবনা কি ? তেঁতুল দিয়েও জমিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে।

[বড়বাবু গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন।]

বড়বাবু। খাঁটি জল জমাবার প্রক্রিয়া কিন্তু অন্য রকম শুনেছি।

[লাহিড়ী চকিতে একবার বড়বাবুর মুখের পানে চাহিলেন। বড়বাবুর কথাবার্তা আজ কেমন যেন বাঁকা ধরনের মনে হইতেছে।]

লাহিড়ী। [সহাস্যে] ঠিক ধরেছেন আপনি। সমাজ বলুন, পলিটিক্‌স বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই জলে জলময়।

বড়বাবু। [সহসা] বিটোফেন কালা এবং মিল্টন অন্ধ হয়ে গেছলেন, কেন জান ?

[এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য লাহিড়ী প্রস্তুত ছিলেন না। কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বড়বাবু নিজেই উত্তর দিলেন।]

ভগবান ওঁদের সহায় ছিলেন।

লাহিড়ী। [হার্মোনিয়ামটা টানিয়া লইয়া] এবার কি গাইব, বলুন ? রবিবাবু তো হ'ল, নিধুবাবু ধরব একটা ?

বড়বাবু। ও ভদ্রলোককে আর কষ্ট দেওয়া কেন ?

লাহিড়ী। তা হ'লে—

বড়বাবু। এই ফাঁকা মাঠে এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় একটা প্যাঁকপেঁকে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে বস্তাপচা কতকগুলো গান গাওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করবার ইচ্ছে হচ্ছে না তোমার ? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তো ওই কার্য ক'রে চলেছ, এখানেও ওই করবে ?

লাহিড়ী। [স্মিতমুখে] সবই তো বুঝি, কিন্তু কি করব বলুন ?

বড়বাবু। [সবিস্ময়ে] ও, কি করবে—তাও আমাকে বাতলে দিতে হবে! স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনব ধরনে আনন্দ প্রকাশ করবার তাকত তোমার নিজের নেই!

[লাহিড়ী চমৎকার একটি সঙ্কুচিত ধরনের হাসি হাসিলেন। ভাবটা—সত্যই নাই। বড়বাবু বলিয়া চলিলেন।]

যেতে ওঠ। এই বিশাল মাঠে, অনাবিল জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে যাও। একটি ফোঁটা মদ না খেয়েও নেশায় চুর হয়ে পড়, তবে না বুঝব, জ্যোৎস্না-রসিক তুমি। এমন সময় তাঁবুর ভেতর ব'সে হার্মোনিয়াম প্যাঁক প্যাঁক করার কোন মানে হয় তোমাদের বয়সে—অমন ফাঁকা মাঠ থাকতে?

[ইহার মধ্যে একটা ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করিয়া লাহিড়ী উঠিয়া পড়িলেন এবং বড়বাবু ঠিক যেন তাঁহার মনের কথাটা ধরিতে পারিয়াছেন, এমনই একটা মুখভাব করিলেন।]

লাহিড়ী। আমিও এতক্ষণ জাস্ট ওই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, যা ইচ্ছে করে, সব সময়ে তা করা যায় না, লজ্জা করে।

বড়বাবু। কি ইচ্ছে করছে তোমার? উলঙ্গ হতে? হও না।

লাহিড়ী। [সমস্ত দন্ত বিকশিত করিয়া] ঠিক তা নয়। ময়না নদীতে নৌকো বাইলে হ'ত; মানে—

বড়বাবু। বেশ তো, যাও না। নৌকো তো আছে শুনেছি একটা।

লাহিড়ী। [উল্লসিত হইয়া] আপনি আসছেন?

বড়বাবু। না। আমারও একটা স্বতন্ত্র যা-খুশি আছে এবং তা জল-বিহার করতে রাজি নয় আজ। তুমি যেতে চাও যাও।

[একটু হাসিয়া লাহিড়ী চলিয়া গেলেন। লাহিড়ী যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলু দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন বাহিরে ওত পাতিয়া ছিলেন।]

নীলু দত্ত। [একটু ইতস্তত করিয়া] পেছন দিকের ছোট তাঁবুটায় সব ঠিক আছে।

বড়বাবু। কি ঠিক আছে?

নীলু দত্ত। [অপর কক্ষের পর্দাটার পানে সচকিত দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রায় চুপিচুপি] আমি আসবার সময় বাইকের পেছনে বেঁধে কয়েকটা শ্যাম্পেন এনেছিলাম। ভাবলাম—

বড়বাবু। ও। আচ্ছা, নীলমণিকে বল, এইখানেই নিয়ে আস্থক।

নীলু দত্ত। [আর একবার পর্দাটার পানে চাহিয়া] এইখানেই ?

বড়বাবু। হ্যাঁ।

[বিস্মিত নীলু দত্ত চলিয়া যাইতেছিলেন, বড়বাবু তাঁহাকে ডাকিলেন।]

শোন, ক বোতল এনেছ ?

নীলু দত্ত। তা আছে কয়েক বোতল—গোটা ছয়েক।

বড়বাবু। লাহিড়ীকে ডেকে এক বোতল দিয়ে দাও। ময়না নদীর দিকে বেড়াতে গেছে ওরা।

[নীলু দত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবু গড়গড়ায় দু'একটা টান দিয়া স্বগতোক্তি করিলেন।]

নিছক জ্যোৎস্নায় ওর কিছু হবে ব'লে মনে হয় না। অথচ সে কথা বলবার সাহস নেই।

নীলু দত্ত। [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] হুজুর কি লাহিড়ীকে এক বোতল দিতে বলছেন ?

বড়বাবু। হ্যাঁ, দাও ওকে একটা বোতল।

নীলু দত্ত। [একটু ইতস্তত করিয়া] মানে, কাল দুপুর পর্যন্ত তো এখানে থাকতে হবে। বেশি তো আনি নি, মাত্র ছটি বোতল।

[বড়বাবু গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া নীলু দত্তের পানে একবার চাহিলেন। এ দৃষ্টির অর্থ নীলু দত্তের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অত্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া তিনি বলিলেন।]

যে আজ্ঞে, দিয়ে দিচ্ছি তা হ'লে।

[অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে ত্রস্ত নীলু দত্ত চলিয়া গেলেন। বড়বাবু গড়গড়ায় আরও দু'একটা টান দিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। দুই কক্ষের মধ্যবর্তী পর্দাটা সরাইয়া লছমনিয়া উঁকি দিল। বড়বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণপরেই পর্দা সরাইয়া বড় বউ প্রবেশ করিলেন। সাজসজ্জাবিলাসিনী বড় বউয়ের এই আবির্ভাবে বড়বাবুর মুখে একটু বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। আজ বড় বউয়ের সাজসজ্জা একটু নূতন ধরনের। পরনে অতি সাধারণ সুতির একখানা শাড়ি। অঙ্গে সোনার অলঙ্কার একখানিও নাই। হাতে সোনার চুড়ির বদলে লোহা এবং মোটা

মোটা শাঁখা। গলাতেও শাঁখের হার। হাতে একটা পানের ডিবা, সেটি অবশ্য রূপার এবং কারুকার্যখচিত। বড় বউ প্রবেশ করিয়া আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিলেন। বড়বাবু নীরব বিস্ময়ে বড় বউকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।]

বড় বউ। [আর একটু জরদা মুখে দিয়া] লছমনিয়া, জামাইবাবুর তাঁবুতে গিয়ে খবর দে আসছি আমি এখুনি।

[লছমনিয়া বাহির হইয়া গেল।]

বড়বাবু। [বড় বউয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] হঠাৎ ঢাকনাটা খুললে যে ?

বড় বউ। কিসের ঢাকনা ?

বড়বাবু। তোমার নিজের। এতদিন গয়না-কাপড়ের তলায় যেন চাপা পড়েছিলে, দেখতেই পাই নি তোমায় !

[বড় বউ কোন উত্তর দিলেন না। বড়বাবু আবার বলিলেন।]

তোমার যে এত রূপ ছিল, চোখেই পড়ে নি তা এতদিন !

বড় বউ। [গম্ভীরভাবে] তোমার চোখের বাহাদুরি সেটা।

বড়বাবু। বুঝতে পারলাম না।

বড় বউ। রূপ তো চোখে পড়বার জন্যে অহরহ-উন্মুখ, রূপ চোখে পড়বার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন ভগবান ; চোখ যদি এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে চ'লে থাকে, সেটা তার বাহাদুরি বইকি !

[ঈষৎ হাসিয়া]

আজ তা হ'লে তো মুশকিল হ'ল, রূপটা চোখে প'ড়ে গেল ! করকর করছে নাকি ? জল এনে দোব একটু, ধুয়ে ফেলবে ?

বড়বাবু। [হাসিয়া] সব জিনিস কি আর জল দিয়ে ধোওয়া যায় ?

বড় বউ। ও, ভুলে গেছলাম। নির্জলা জিনিস নিয়েই যে তোমার কারবার।

[বড়বাবু স্মিতমুখে কিছুক্ষণ বড় বউয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।]

বড়বাবু। তোমার এ কথায় আমার চ'টে যাওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই চটতে পারছি না তো !

[উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। চাকরেরা যেখানে জটলা

করিতেছিল, সেখানকার বাঁশীর আওয়াজটা সহসা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তু—]

বড় বউ। যাই এবার আমি।

বড়বাবু। জামাইয়ের তাঁবুতে যাচ্ছ কেন?

বড় বউ। যদি নিয়ে যায় আমাকে, আমিও গিয়ে মাচাতে বসব। হীরেন শুনছি যাবে না, সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে রোদ্দুরে এসে তার শরীরটা খারাপ হয়েছে। তার মাচাটা খালি আছে, তার বন্দুকটাও পাব।

বড়বাবু। [সবিস্ময়ে] তুমি বন্দুক চালাতে পার নাকি?

বড় বউ। পারি একটু একটু, অন্তত পারতাম এককালে। ছেলেবেলায় দাদাদের সঙ্গে শিকারে গেছি অনেকবার, তখন আমার লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। [মুচকি হাসিয়া] উড়ন্ত পাখীও মারতে পারতাম।

বড়বাবু। শুনি নি তো এখনও এ কথা। [একটু থামিয়া] প্রমাণও পাই নি।

বড় বউ। [বিস্ময়ের ভান করিয়া] এ বাড়িতে তার প্রমাণ দেব কি ক'রে? লাউ-কুমড়ো-শশা-সিমের জন্যে তো বন্দুকের দরকার নেই।

[বড়বাবু ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, এ কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ঈষৎ-বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে ব্যঙ্গ, বিস্ময়, কৌতুক মূর্ত হইয়া উঠিল।]

বড়বাবু। ও, এ বাড়িতে টিপ করবার মত আমিষ কোন কিছু পড়ে নি বুঝি তোমার চোখে! ভারী দুঃখের বিষয় তো!

বড় বউ। [গম্ভীরভাবে] শুধু চোখে পড়লে কি হবে, রেন্‌জের মধ্যেও পড়া চাই।

বড়বাবু। বড় বড় শিকারীদের শুনেছি বন্দুকের রেন্‌জও বড়। বাঘ সিংহ মারতে হ'লে পাখী-মারা বন্দুকে চলে না তাদের।

বড় বউ। আমার বাঘ সিংহ মারতে ইচ্ছে করে না কোন কালে, পুষতে ইচ্ছে করে।

বড়বাবু। পুষলেই পার, সে আর বিচিত্র কি?

বড় বউ। পাই কোথায়?

[আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। আবার বাঁশীর আওয়াজটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তুতুর

তুয়া, তু—। [বড় বউ আর এক খিলি পান ও আর একটু জরদা মুখে দিলেন।]

বড় বউ। এবার যাই আমি।

বড়বাবু। এখুনি বললে, বাঘ মারতে ইচ্ছা করে না তোমার, অথচ রাইফেল নিয়ে মাচানে বসতে যাচ্ছ, ব্যাপার কি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বড় বউ। নিজের হাতে বাঘ মারতে প্রবৃত্তি নেই, বন্দুকটা নিচ্ছি আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু বাঘ-শিকার দেখবার একটা কৌতূহল আছে। বলিষ্ঠ হিংস্র জানোয়ারটা গুলি খেয়ে কেমন শেষ আর্তনাদটা ক'রে ওঠে, সেইটে শোনবার লোভ আছে। আর কিছু নয়।

[বড়বাবু নীরবে কিছুক্ষণ বড় বউকে নিরীক্ষণ করিলেন।]

বড়বাবু। তোমার যদি ছেলেমেয়ে না হ'ত তা হ'লে তোমার নারীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করতাম।

বড় বউ। ঝান্সির রাণী, রিজিয়া, এলিজাবেথ, ক্লিওপেট্রা—এদের কি তুমি নারী ব'লে মনে কর না?

[বড়বাবু কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে নীলমণি গলাখাঁকারি দিল। বড় বউ পর্দা সরাইয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন। নীলমণি একটি কাঠের ট্রেতে এক বোতল শ্যাম্পেন, কয়েকটি ছোট কাচের গ্লাস প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিল এবং ট্রেটি তেপাযার উপর রাখিযা বড়বাবুর মুখের পানে চাহিল।]

বড়বাবু। থাক, এখন দরকার নেই।

[নীলমণি নীরবে বাহিরে চলিয়া গেল। বড় বউ পর্দা সরাইয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন।]

মাচানে ব'সে শিকার করতে যাচ্ছ, অথচ নীলমণিকে দেখে লজ্জা!

বড় বউ। অনাবশ্যকভাবে আমি কখনও আত্মপ্রকাশ করি না কারও কাছে।

[অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে ঊষা আসিয়া প্রবেশ করিল।]

ঊষা। বাবা, নীলুকাকা কোথায়?

বড়বাবু। একটু আগে তো এসেছিল এখানে, কেন?

ঊষা। ওই বটগাছটায় দোলনা টাঙিয়ে দেবে।

বড়বাবু। দোলনা এখানে পাবে কোথা সে?

উষা। হাতীর হাওদা একটা টাঙিয়ে দিলেই তো হবে।

বড়বাবু। [হাসিয়া] বেশ বুদ্ধি বার করেছিস্ তো।

বড় বউ। সুরেন কি করছে ?

উষা। জানি না।

বড় বউ। শিকারে যাবি না তুই ?

উষা। না।

বড় বউ। চল্ না, একসঙ্গে সবাই গিয়ে একটা মাচায় বসা যাক। মীনা কোথা ?

উষা। কি জানি, নদীর ধারে না কোথায় বেড়াচ্ছে। আমি শিকারে যাব না। ওতে আর মজা কি ? সারারাত মাচায় মুখটি বুজে চুপটি ক'রে ব'সে থাক। তার চেয়ে নীলুকাকাকে ব'লে ওই বটগাছটায় একটা দোলনা টাঙাই গিয়ে। বেশ মজা ক'রে দোলা যাবে। নীলুকাকা কোথা ?

বড়বাবু। এই বাইরেই কোথাও আছে, দেখ না !

[প্রায় ছুটিয়া উষা বাহির হইয়া গেল।]

বড়বাবু। [হাসিয়া] উষা উষাই র'য়ে গেল দেখছি, সকাল আর হ'ল না।

বড় বউ। আমিও যাই তা হ'লে।

বড়বাবু। যাও।

বড় বউ। আমাকে বাঘের মুখে পাঠিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করছ না তো ?

বড়বাবু। [হাসিয়া] ইতস্তত ক'রে তোমার গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে নেই আমার।

বড় বউ। তুমি কি বলতে চাও, আজীবন তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমি চলেছি ?

বড়বাবু। তাই বা বলি কি ক'রে। অন্তত আজকের রাত্রে সে কথা বলা চলে না।

বড় বউ। মানে ?

বড়বাবু। মানে, তোমার চকচকে কাপড় আর ঝকঝকে গয়নার বোঝাগুলো আজ আমারই পছন্দ অনুসারে সরিয়ে রেখেছ—এই ভেবে চিত্ত আমার খানিকটা বিনোদিত হচ্ছে। ধারণাটা যদি ভুল হয়, ভেঙে দিও না সেটা।

বড় বউ। চকচকে কাপড় আর ঝকঝকে গয়না যে তুমি পছন্দ কর না, তা তো বল নি কোন দিন মুখ ফুটে!

বড়বাবু। মুখ ফুটে যেখানে বলতে হয়, সেখানে না বলাই ভাল। তা ছাড়া সত্যিকারের আভিজাত্য যার আছে, সে মুখ ফুটে কখনও কিছু চায় না। [কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন] কিন্তু আজ জ্যোৎস্না মনোহারিণী, তোমাকেও ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, আভিজাত্যের আগলটা তাই একটু আলগা হয়ে গেল হঠাৎ।

[বড় বউ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এইবার ক্যাম্প-চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন।]

বড়বাবু। বসলে যে?

[বড় বউ নির্নিমেষ নেত্রে বড়বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না।]

বসলে যে, যাবে না?

বড় বউ। (গাঢ় স্বরে) না। (একটু পরে) চল, আমরাও উষার মত একটা দোলনা টাঙিয়ে দুলি গিয়ে।

বড়বাবু। (হাসিয়া) সে আর হয় না বড় বউ। অপরাহ্ণ হাজার চেষ্টা করলেও আর উষা হতে পারে না।

[একটু চুপ করিয়া রহিলেন।]

কিন্তু অপরাহ্ণেরও একটা সৌন্দর্য আছে। আমাদের স্থান এখন ভিড়ের মধ্যে নয়, নিভৃতে। একান্তে ব'সে রোমন্থন করাও কি কম বিলাস? এখানে বসতে যদি চাও, চেয়ারটা আর একটু টেনে আন, আলোটা নিবিয়ে দাও।

[বড় বউ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর আলোটা নিবাইয়া দিলেন। একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া উভয়ের কোলের উপর পড়িল। দুইজনে নীরবে পাশাপাশি বসিয়া রহিলেন। দূরে বাঁশী বাজিতে লাগিল।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[কলমিপুর মাঠের একটি অংশ। এই স্থানটি তাঁবুগুলি হইতে বেশ একটু দূরে, এখান হইতে ময়না নদী দেখা যায় না। যতদূর দেখা যায়, ধূ ধূ করিতেছে মাঠ। কেবল খানিকটা দূরে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত বিরাট একটা বটগাছ অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই কাছে হাতী তিনটাও বাঁধা আছে। হাতীগুলি বটগাছের ডাল ভাঙিয়া খাইতেছে, ডাল ভাঙার মটমট শব্দ পাওয়া যাইতেছে। জ্যোৎস্নালোকে বিরাটকায় দাঁতাল হাতীটার প্রকাণ্ড দাঁত দুইটা অদ্ভুত দেখাইতেছে। এই অংশে একটি সুপরিসর শতরঞ্জি বিছানো, কয়েকখানা টিনের চেয়ারও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একটি চেয়ারে বসিয়া নীলু দত্ত তামাক খাইতেছেন। সম্মুখের একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর তিনি একটা পা তুলিয়া দিয়াছেন। নিকটেই অপর একটি চেয়ারে স্থূলকায় তিনু চাটুজ্জেও বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তেও হুঁকা। গোলগাল মুখমণ্ডল চিন্তাকুল। বাম জানুর উপর দক্ষিণ পদটি তুলিয়া দিয়া পায়ের পাতাটি তিনি ঘন ঘন নাড়িতেছেন। সুন্দর হাওয়া বহিতেছে, চতুর্দিক জ্যোৎস্নাবিষ্ট।]

তিনু। দাও হে এবার কলকেটা।

নীলু। দাঁড়াও হে বাপু, সমস্ত দিনের মধ্যে কি আর তামাক খেতে পেয়েছি, না পা মুড়ে বসতে পেয়েছি! এই তো একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি কেবল। [গোটা কয়েক টান দিলেন] তাও আবার ঊষা ঠাকরুণ দোলনা টাঙাবার এক ফরমাস দিয়েছেন।

তিনু। দোলনা? দোলনা এনেছ নাকি?

নীলু। হাতীর হাওদা একটা টাঙিয়ে দিতে বলছে বটগাছে। বুদ্ধিও জোটে এদের মাথায়!

তিনু। [আঙুল দিয়া দেখাইয়া] ওই বটগাছটায়? ওখানে তো হাতী বাঁধা রয়েছে দেখছি।

নীলু। আরে না না, ওখানে নয়, ওদিক পানে আর একটা ছোটগোছের বটগাছ আছে। কিন্তু কাকে বলি এখন বল তো! [কয়েকটা টান দিয়া]

চাকরবাকরগুলো সব মাদল নিয়ে মেতেছে, গোহমুনা ছুঁড়িটা নাচছে। এখন কাউকে বললে কি নড়বে সেখান থেকে কেউ!

[বেশ জোরে আরও গোটা দুই টান দিলেন।]

ভিকুটা বোকাসোকাগোছের আছে, দেখি, যদি সে ব্যাটাকে রাজি করাতে পারি! এই নাও।

[তিনুকে কলিকাটা দিলেন এবং পা সরাইয়া হুঁকাটা পাথরের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিলেন।]

তিনু। [কলিকাটি হুঁকায় বসাইতে বসাইতে] আজকাল ছোটলোকেরাই সুখেতে আছে ভাই, বোয়েছ? ভদ্দরলোকদের আর ভদ্রস্থ নেই।

[যেন অত্যন্ত মূল্যবান একটি উক্তি করিয়াছেন—এইরূপ মুখভাব করিয়া তিনি হুঁকায় একটি টান দিলেন।]

নীলু। ভদ্দরলোকই বা কটা আছে আজকাল? সব শালাই চামার। [হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া] ওই লাহিড়ীটাকে তুমি ভদ্দরলোক বল? তুই বেটা যে বড়বাবুর সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে শ্যামপেন খেতে চাস, এর আগে শ্যামপেন দেখেছিলি কখনও বাপের জন্মে?

[তিনুর হুঁকায় ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন।]

তিনু। অ্যাঁ, বল কি, শ্যামপেন খেতে চাইছে!

নীলু। চেয়েছে নিশ্চয়ই, তা না হ'লে বড়বাবু দিতে বললেন কেন? কেউ কিছু চাইলে বড়বাবু 'না' বলতে পারেন না, এ কথা তো সবাই জানে। তাই ব'লে সব জিনিস চাইতে হবে?

[তিনু পুনরায় হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন।]

নিজেরও তো আক্কেল থাকা উচিত একটা! তোর পেটে বোমা মারলে পান্তাভাত পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি বেরিয়ে পড়বে, তুই চাইলি শ্যামপেন খেতে!

[তিনু চক্ষু বুজিয়া তন্ময় হইয়া তামাক টানিতেছিলেন, সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।]

তিনু। বোঝ।

[উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ।]

নীলু। আমাদের বড়বাবুর যে রকম দরাজ হাত, ছোটবাবুর হাতে জমিদারি না পড়লে উনি সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেন। অমন কাছাখোলা হ'লে জমিদারি থাকে!

[তিনু চক্ষু খুলিলেন।]

তিনু। হাঁ্যা, ভাল কথা মনে করেছ ভাই। আমি এসে থেকে তক্কে তক্কে ঘুরছি, কিন্তু ছোটবাবুর নাগাল তো পাচ্ছি না। বড়বাবুকেই ধরব নাকি শেষ অবধি গিয়ে?

নীলু। সে পথও বন্ধ। বড়বাবু আজ রাত্রে কারও সঙ্গে দেখা করবেন না—হুকুম দিয়েছেন। তাঁর তাঁবুর সামনে নেহাল সিং কিরিচ বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তিনু। বড় ফ্যাসাদে পড়লাম তো তা হ'লে হে! শেষ পর্যন্ত তা হ'লে কি লছমনিয়াটাকেই তোয়াজ করতে হবে না কি? সে ছুঁড়িরও তো কোন পাত্তা পেলাম না। এই একটু আগেই দেখলাম, সে বড়বাবুর তাঁবু থেকে বেরিয়ে জামাইবাবুর তাঁবুর দিকে গেল, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ছোটবাবুর তাঁবুর কাছে গিয়ে কি একটু ঘুজঘুজ করলে, তারপর এল এইদিক পানে। আমিও পেছু পেছু এলাম। কি করি, কাজের নাম বাবাঠাকুর! ভাবলাম, আড়ালে একটু আভাস দিয়ে রাখি কথাটার। কিন্তু এখানে এসে ফট ক'রে কোথায় যে গা-ঢাকা দিলে, ধরতে পারলাম না। ওই তো এক ফোঁটা ছেলেমানুষ মেয়ে, দিব্যি চোখে ধুলো দিয়ে স'রে পড়ল!

[হুঁকায় টান দিলেন। ধোঁয়া বাহির হইল না। কলিকায় ফুঁ দিয়া পুনরায় টানিতে লাগিলেন।]

নীলু। [বিজ্ঞভাবে হাসিয়া] ছেলেমানুষ হ'লে কি হয় ভায়া, মেয়েমানুষ তো! সংস্কৃত শোলোকে আছে—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা! এই ধর না, এতকাল ধ'রে এই স্টেটে চাকরি ক'রে চুল পাকিয়ে যে ধারণাটি পাকা-পোক্ত ক'রে রেখেছিলুম, আজ এখানে এসে সেটি বিসর্জন দিতে হ'ল। দেখলাম, সবই ভুয়ো।

তিনু। কি রকম?

নীলু। এতকাল ধারণা ছিল, বড়বাবু বড় বউকে লুকিয়ে মদ খান। বড় বউ কড়া মেজাজের লোক, ওসব পছন্দ করেন না। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, বড়বাবু বড় বউয়ের সামনেই মদ নিয়ে যেতে বললেন, বড় বউ ছাড়া আর সকলকে, এমন কি নীলমণিকে পর্যন্ত, তাঁবু থেকে বার ক'রে দিলেন এবং হুকুম দিলেন তাঁর তাঁবুর সামনে নেহাল সিংকে পাহারা দিতে, যেন আর কেউ না যায় সেখানে। অথচ বড়বাবু যাতে একটু গোপনে মদ

খেতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে আমাকে কি কম নাকালটা হতে হয়েছে!

তিনু। [হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া] এর মানে কি?

নীলু। মানে আবার কি, বড় বউয়ের লীলা! ওই যে বললাম—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা। মেজবাবু-ছোটবাবুর সম্বন্ধে ঠিক একই ধরনের ঘা খেতে হ'ল আমাকে।

তিনু। কি রকম?

[হুঁকাতে গোটা দুই টান দিলেন, ধোঁয়া বাহির হইল না।]

নীলু। মেজবাবু রোজ সন্ধ্যেবেলা এক গেলাস ক'রে সিদ্ধি খান। বিশ্বম্ভরটা চিরকাল বৈঠকখানায় তৈরি করে, মেজবাবুও চিরকাল বৈঠকখানায় ব'সেই খান। আমার ধারণা ছিল, বুঝি মেজমাকে লুকিয়েই খান। এখানেও সেই রকম ব্যবস্থাই রেখেছিলাম আমি। ওমা, এখানে এসে মেজমা-ই সিদ্ধির সরঞ্জাম চেয়ে পাঠালেন! কাদম্বিনী এসে বললে, মেজমা শিল, নোড়া, সিদ্ধি, বাদাম, পেস্তা, গোলাপ-জল—সব চাইছেন, নিজের হাতেই আজ সিদ্ধি তৈরি করবেন তিনি। বোঝ একবার কাণ্ডটা, নিজের হাতেই তৈরি ক'রে দেবেন!

[তিনু ধোঁয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ দূরে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।]

তিনু। কে যেন আসছে হে এদিকে!

[নীলুও চাহিয়া দেখিলেন।]

নীলু। তালুকদার বোধ হয়।

তিনু। আর ছোটবাবুর সম্বন্ধে কি জানলে?

নীলু। ছোটবাবুর তাঁবুর সামনাসামনি চাকরানীদের তাঁবুটা দিয়েছিলাম, কারণ আমার জানা ছিল—

তিনু। হ্যাঁ, সে তো জানি।

নীলু। ছোটবাবু এসেই আমাকে প্রচণ্ড এক ধমক। আমার তাঁবুর সামনে চাকরানীদের তাঁবু কেন? ওদের অন্য তাঁবুতে দাও, ঠাকুরদা ঠানদি ওখানে থাকবেন, আর ঠিক পাশের তাঁবুটায় থাকবেন বাদল ডাক্তার। [চোখ বড় বড় করিয়া] যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

তিনু। আসল ব্যাপারটা তা হ'লে কি? এ যে দেখি, সবই গোলমাল ক'রে দিলে তুমি!

[খুব জোরে জোরে টান দিয়াও যখন আর ধোঁয়া বাহির করিতে পারিলেন না, তখন বিরক্ত মুখে হুঁকাটি নামাইয়া পাথরে ঠেসাইয়া রাখিলেন।]

নীলু। খুব সম্ভবত কিছু খিটিরমিটির হয়েছে ছুঁড়িটার সঙ্গে। মেয়ে-মানুষের ব্যাপার—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা!

তিনু। ওর সঙ্গে খিটিরমিটির হ'লে আমি যে অকূল পাথারে পড়লাম হে! তা হ'লে—

[এমন সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত তালুকদার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে গাদা-বন্দুক, পরনে শিকারীর বেশ।]

নীলু। তুমি এখনও যাও নি যে?

[তালুকদার ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া চতুর্দিকটা একবার দেখিয়া লইলেন। তাহার পর উত্তর দিলেন।]

তালুকদার। না, যাই নি এখনও, মানে—[সহসা] আচ্ছা, লছমনিয়াটা এসেছে এদিকে, দেখেছ?

তিনু। তোমারও খাজনা বাকি নাকি?

তালুকদার। খাজনা বাকি মানে?

নীলু। কেন, লছমনিয়াকে কি দরকার তোমার?

তালুকদার। মানে, গরুর গাড়িতে আসবার সময় আমার বন্দুকের খোলটা প'ড়ে গেছল, সে নাকি কুড়িয়ে রেখেছে। একবার খোঁজ করলে হ'ত।

নীলু। সে কাল সকালে খোঁজ ক'র। এখন বন্দুকের খোলের কি দরকার?

তালুকদার। না, মানে—

[তালুকদার আবার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।]

নীলু। শিকারে যেতে চাও তো এখুনি বেরিয়ে পড়।

তালুকদার। তাই যাই। কিন্তু—, আচ্ছা থাক, পরে হবে।

[ইতস্তত করিয়া অবশেষে তিনি চলিয়াই গেলেন।]

তিনু। জামাই কি শিকারে বেরিয়ে গেছেন?

নীলু। বন্দুক কাঁধে ক'রে তো বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন ভাগবানই জানেন।

তিনু। আর কে কে গেল?

নীলু। নিতাই আর হরু মণ্ডল আর বিলটা গেছে। তালুকদারও যাচ্ছে।

তিনু। বিলটা আবার কে?

নীলু। ও আমাদের এখানকারই একজন প্রজা, শিকারে ভারী ঝোঁক। ওকে একটা বন্দুক দিয়েছি, দেবদারুগাছে গিয়ে চড়েছে সে। [হাসিলেন] কিন্তু যেখানে 'কিল' হয়েছে সেখানে বসে নি। ময়না নদীর চরের দিকে যে দেবদারুগাছটা আছে, সেইখানে বসেছে। ও বলছে, বাঘ আসবার ওইটেই রাস্তা।

তিনু। নিতাই বন্দুক পেলে কোথা? ওর নিজের তো এক মুখ ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। মুখেই রাজা উজির বাঘ গণ্ডার মারছে। কিন্তু সত্যিকার বাঘ তো আর মুখ দিয়ে মারা যাবে না!

নীলু। এস্টেটেরই বন্দুক দিলাম ওকেও একটা। অত উৎসাহ ক'রে এসেছে বেচারী। তবে নিতাইই বল, তালুকদারই বল, আর জামাইবাবুই বল, বাঘ মারতে পারবেন না কেউ। যদি কেউ পারে, ওই হরু মণ্ডলই পারবে। মাচান বন্দুক কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না সে। নিজের চকচকে বর্শাটি নিয়ে সোজা গিয়ে শিমুলগাছে উঠে বসেছে। বাঘও আবার একটা নয় শুনছি, এখানকার সাঁওতালগুলো বলছিল, একজোড়া আছে। একটা বাঘ আর একটা বাঘিনী।

তিনু। ওরে বাবা! এ অঞ্চলে এসে পড়বে না তো হে একটা ছিটকে মিটকে?

নীলু। [হাসিয়া] তোমার আর ভয় কি, সাতটা বাঘেও তোমার কিছু করতে পারবে না।

তিনু। কেন, আমি মোটা ব'লে বলছ? [একটু চুপ করিয়া রহিলেন] ছুটতে পার আমার সঙ্গে তুমি? এই কলমিপুরের মাঠটা আমি এক দমে এক ছুটে পার হয়ে যেতে পারি, তা জান?

[নীলু দত্ত কিছু বলিলেন না, স্মিত মুখে নিজের মাথার টাকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দূরে শোনা গেল, কুঞ্জলালের দল গান গাহিতে গাহিতে এই দিকে আসিতেছে।]

তাহাদের গান ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল—

জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে

তখন স্মরণে বাজে কাহার মৃদুল মধুর বাণী
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

নীলু। পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ।

তিনু। তা বটে।

[কুঞ্জলালের দল নিকটবর্তী হইতেই তিনু চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িলেন এবং কাপড়ের কসিটা গুঁজিলেন।]

তিনু। আমি চললাম ভাই। ওসব ছেলেছোকরাদের কাছ থেকে স'রে থাকাই ভাল। নিজের মান নিজের কাছে।

নীলু। হ্যাঁ চল, আমিও যাই। আমাকে আবার দোলনাটা টাঙাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্যাসাদ কি এক রকম!

[উভয়ে চলিয়া গেলেন। কুঞ্জলালের দল গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া পড়িল। এবং গান থামাইয়া কেহ চেয়ারে কেহ শতরঞ্জিতে বসিয়া পড়িল। বঙ্কু শতরঞ্জির উপরই একটু দূরে গিয়া বসিল।]

হাবুল। আর গান নয় মাইরি, প্রচুর চেঁচানো হয়েছে।

বীরেন। কি জিনিস লক্ষ্য করলি ?

কুঞ্জ। কি ?

বীরেন। আমরা আসতেই তিনু চাটুজ্জে আর নীলু দত্ত উঠে গেল।

কুঞ্জ। ভারী ব'য়ে গেল আমাদের।

বীরেন। তা তো বটেই, সে কথা বলছি না; কিন্তু এই খোলা মাঠে এসেও সবাই মিলে মিশে যে একটু ফূর্তি করবে, সে মেণ্টালিটি কারও নয়। এখানেও সবাই নিজের নিজের গণ্ডি আঁকড়ে প'ড়ে আছেন। আমাদের ডাক্তারবাবুটিও তাঁবুতে ঢুকেছেন।

পাঁচু। ইচ্ছে করলে আমরাও একটা তাঁবু পেতে পারতাম। চাকররা যে তাঁবুটা নিয়েছে, ছোটবাবুকে বললে ওটা ঠিক আমাদেরই দিয়ে দিতেন।

বীরেন। ও রকম তাঁবু পাওয়ার চেয়ে খোলা মাঠে প'ড়ে থাকা ঢের ভাল।

[শতরঞ্জির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।]

কুঞ্জ। নিশ্চয়।

হাবুল। আচ্ছা বীরেন, সূর্যের আলো গায়ে লাগলে সেদিন তুই বলছিলি কি যেন—

বীরেন। আলট্রাভায়োলেট রে।

হাবুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলট্রাভায়োলেট রে নাকি শরীরের খুব উপকার করে? চাঁদের আলোতে সে রকম কিছু নেই? যদি থাকে তো বল, গেঞ্জিটা খুলে বসি।

বীরেন। তুই আলট্রা-ইডিয়ট, তাই এ কথা জিজ্ঞেস করলি। চাঁদের কি নিজের কোন আলো আছে?

হাবুল। ও, নেই নাকি? থাক, তা হ'লে গেঞ্জিটা আর খুলব না।

পাঁচু। চাঁদের নিজের আলো থাক আর নাই থাক, ফিনিক ফুটিয়ে ছেড়েছে কিন্তু মাইরি।

হাবুল। কুঞ্জ, তুই তোর বাঁশীটা বার ক'রে সেই ভীমপলশ্রীখানা আলাপ কর, বেড়ে জমবে এখন।

পাঁচু। হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, এইখানেই সব জমায়েত হয়ে বসা যাক মাইরি, অন্য কোথাও আমাদের ঠিক খাপ খাচ্ছে না। চাকর-বাকরদের ভেতরও গিয়ে বসা যায় না, বাবুদের তাঁবুতেও ঢোকা যায় না, এইখানেই ভাল। জায়গাটিও বেশ নিরিবিলি আছে।

হাবুল। বীরেন রাজি হ'ল না, কিন্তু চাকর-বাকরদের মধ্যে বসলে সময়টা কাটত ভাল। গোহমুনাটা যা নাচছে, দারুণ।

বীরেন। বড ভলগার টেস্ট হয়ে গেছে তোর হেবলো।

[হাবুল দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল।]

পাঁচু। দেখ দেখ, বঙ্কা কেমন মুগ্ধ হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে!

কুঞ্জ। বেচারীর বউয়ের জন্যে মন কেমন করছে বোধ হয়।

পাঁচু। [আবৃত্তির সুরে]

হে বঙ্কু, আকাশে চেয়ে ভাবিতেছ কি তাকে?
পায়ে যার লাল আলতা, নোলক দোলে নাকে?

[বঙ্কু পাচুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।]

হাবুল। এই পাঁচা, বিরক্ত করছিস কেন ওকে? না না বঙ্কা, তুই ভাব। কুঞ্জ, তুই সুরু কর।

[পাঁচু মুখে কাপড় চাপা দিয়া খিক খিক করিয়া হাসিতে লাগিল। কুঞ্জ বাঁশীতে ফুঁ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীমপলশ্রী জমিয়া উঠিল, সদলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল।]

হাবুল। [সহসা] ওটা কি বল তো—দেখ দেখ?

পাঁচু। কই ?

হাবুল। ওই যে রে বটগাছের কাছটায়—ওই আবার ঢুকে পড়ল।

বীরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বল দেখি ওটা ?

[কুঞ্জ মুখ হইতে বাঁশী নামাইল।]

কুঞ্জ। বটগাছের ভেতর ঢুকে পড়ল, বলিস কি ?

হাবুল। মাইরি বলছি, কি যেন একটা সাদাগোছের !

কুঞ্জ। ভূত-টুত নয় তো ? এই বঙ্কা, এদিকে স'রে এসে ব'স। মাত্র সেদিন বিয়ে করেছিস তুই, তোর কিছু হ'লে মনস্তাপের সীমা থাকবে না আমাদের। এদিকে স'রে আয়।

হাবুল। ঠাট্টা নয় মাইরি, সত্যি আমি দেখলাম, কি যেন একটা ঢুকে পড়ল।

বীরেন। আমিও দেখেছি।

পাঁচু। আমি দেখতে পেলাম না মাইরি, গিয়ে দেখে আসব ?

হাবুল। [ভ্যাঙাইয়া] গিয়ে দেখে আসব ! হুজুকে কোথাকার !

কুঞ্জ। যাক না, দেখে আসুক না ব্যাপারটা কি ?

পাঁচু। যাই। হাবুল, তুই সুদ্ধু চ ভাই।

হাবুল। আমাকে ঘাঁটিও না ব'লে দিচ্ছি।

বীরেন। তুই একাই যা না। তুই তো সব পারিস।

[পাঁচু উঠিয়া পড়িল এবং যাইবার মুখে বঙ্কুর মাথায় একটা ঠোকর দিয়া বটগাছটার দিকে আগাইয়া গেল। সকলে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। একটু পরেই পাঁচুকে আর দেখা গেল না, গাছটার নিকটে গিয়া অন্ধকারে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।]

বীরেন। অদ্ভুত জ্যোৎস্না আজ !

হাবুল। দেখছিস না, বঙ্কা পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে ! বঙ্কুকে ঘায়েল করা একটু আধটু জ্যোৎস্নার কর্ম নয়।

বীরেন। কুঞ্জ, তুই বাজা, থামলি কেন ?

কুঞ্জ। কি বাজাব, ফের ভীমপলশ্রী ?

বীরেন। না। "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" বাজা।

[কুঞ্জ "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" বাজাইতে সুরু করিল। একটু পরে এমন জমিয়া উঠিল যে, হাবুল মুখ সূচালো করিয়া শিস দিতে

লাগিল, বন্ধুর ঈষৎ-কুঞ্চিত ভ্রূ ও মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সেও গানটা মনে মনে গাহিতেছে। বীরেন গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে উন্মনাভাবে সুদূরপ্রসারী মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক স্বপ্নাতুর। পাঁচুর কথা সকলে যখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, এমন সময় দূরে পাঁচুকে দেখা গেল, সে বেশ দ্রুতপদেই আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল।]

পাঁচু। ওরে, ও গানটা নয়, "এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস" বাজা।

[কুঞ্জ বাঁশী থামাইল।]

কুঞ্জ। কিছু দেখতে পেলি ?

হাবুল। কি দেখলি ?

পাঁচু। [হাবুলের প্রতি] এখন 'কি দেখলি', বলব কেন তোকে ? তখন ডাকলাম, আসা হ'ল না!

হাবুল। দেখ পাঁচা, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

[পাঁচু হঠাৎ বঙ্কুকে আবেগভরে দুই হাতে জড়াইয়া শতরঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল।]

পাঁচু। উঃ, মাইরি মাইরি, বঙ্কু রে, তুই যদি দেখতিস।

কুঞ্জ। কি দেখলি, বল না ?

পাঁচু। বটগাছের ঝুরির ভেতর ফুলঝুরি।

কুঞ্জ। ভূত নয় ?

পাঁচু। ভিকু আর লছমনিয়া।

হাবুল। বলিস কি ?

পাঁচু। মাইরি বলছি।

[এমন সময় ঝড়ঝড়ে বাইক করিয়া নীলু দত্ত হঠাৎ আসিয়া হাজির হইলেন।]

নীলু। ভিকু চাকরটা এদিকে এসেছে ? দেখেছ তোমরা কেউ ?

পাঁচু। আজ্ঞে না।

নীলু। কোথা গেল ব্যাটা তা হ'লে ?

কুঞ্জ। এই খানিক আগে সে তো ছোটবাবুর তাঁবুর দিকে গেল দেখলাম।

নীলু। আরে, সেইখান থেকেই তো আসছি আমি।

কুঞ্জ। আমি কিন্তু দেখলাম, সে ওই দিকেই গেল।

নীলু। ঠিক দেখেছ তুমি ?

কুঞ্জ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নীলু। পাগল ক'রে মারলে ব্যাটারা আমাকে ! এই দিগন্ত মাঠে কে যে কোথায় স'রে পড়েছে, ধরতেই পারছি না কাউকে !

[নীলু দত্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাইক করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি একটু দূরে গেলে সকলে সমস্বরে হো হো করিয়া হসিয়া উঠিল।]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[মেজবাবুর তাঁবু। এ তাঁবুটিও বড়বাবুর তাঁবুর মত দুই কক্ষবিশিষ্ট। ইহার উন্মুক্ত দ্বার দিয়া শুধু জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীটাই নয়, নদীর উপর পালতোলা ছোট একখানি নৌকাও দেখা যাইতেছে। চাকরেরা যেখানে জটলা করিতেছে, সে অংশটা অপেক্ষাকৃত নিকটতর হইলেও দেখা যাইতেছে না। কারণ সেদিকের বাতায়নগুলি সমস্ত বন্ধ। তথাপি নাচের মাদলের এবং বাঁশীর আওয়াজ বেশ শোনা যাইতেছে। শ্রোতাদের কলরবগুঞ্জনও কিছু কিছু ভাসিয়া আসিতেছে। তাঁবুর ভিতর মেজমা একটি ছোট টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া একটি শ্বেত পাথরের গ্লাসে সিদ্ধি ঢালিতেছেন। টেবিলে একটি চকচকে পানের বাটা, একটি প্লেটে অনেকগুলি সন্দেশ এবং একটি গ্লাস-ঢাকা ছোট কুজা রহিয়াছে। অপর কক্ষের দ্বারে একটি পর্দা টাঙানো। পিছনের একটা দ্বার দিয়া তোয়ালেতে মাথা মুছিতে মুছিতে মেজবাবু প্রবেশ করিলেন। এইমাত্র তিনি স্নান সমাপন করিয়াছেন।]

মেজবাবু। কই, আমার গেঞ্জিটা দাও।

মেজমা। [চেয়ারের হাতল হইতে গেঞ্জিটা লইয়া দিলেন] এই যে, নাও। দাঁড়াও দাঁড়াও, প'র না এখন, পিঠময় যে জল, মুছিয়ে দিই।

[মেজবাবুর হাত হইতে তোয়ালেটা লইয়া পিঠ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন এবং মেজবাবু পিঠ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

নাও এইবার।

[মেজবাবু গেঞ্জিটা পরিলেন ও একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন ।]

মেজবাবু। আঃ, চান ক'রে বাঁচা গেল ! কি প্রচণ্ড গরমই ছিল আজ !

[মেজমা একটি অ্যাটাচি কেস হইতে চিরুনি বাহির করিলেন ও মেজবাবুর চিবুক ধরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন। মেজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।]

মেজমা। গরম বলে গরম, সমস্ত পৃথিবী যেন পুড়ে গেছে আজ ! তার ওপর তুমি এসেছ হাতীতে !

[মেজবাবু কোন উত্তর দিলেন না। মেজমা পরিপাটীরূপে মাথাটি আঁচড়াইয়া দিয়া টেবিলের নিকটে গেলেন ও সিদ্ধির গ্লাসটি আনিয়া হাতে দিলেন।]

খেয়ে দেখ দিকি, তোমার বিশ্বম্ভরের মত পেরেছি কি না ?

মেজবাবু। [এক চুমুক পান করিয়া] চমৎকার! ওর চেয়ে ঢের ভাল হয়েছে।

মেজমা। [সহাস্যে] আর যাই কর, বুড়ো বয়সে মিছে কথাটা আর ব'ল না।

মেজবাবু। না না, সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

[ঢকঢক করিয়া সমস্তটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন ।]

মেজমা। [তোয়ালেটা আগাইয়া দিয়া] মুখটা মোছ।

[মেজবাবু মুখটা মুছিলেন, গোঁফজোড়াতে তা দিলেন এবং মেজমার মুখপানে চাহিয়া হাসিলেন।]

নাও, এইবার এগুলো খেয়ে ফেল।

[সন্দেশের প্লেটটা আগাইয়া-দিলেন ।]

মেজবাবু। অতগুলো পারব না, পাগল নাকি !

মেজমা। খেতে কত রাত হবে তার ঠিক আছে ! এখনও পোলাও চড়ে নি।

মেজবাবু। তা না চড়ুক, তবু অতগুলো পারব না।

মেজমা। যা পার খাও না, কটাই বা আছে ওতে !

[মেজবাবু আর প্রতিবাদ না করিয়া খাইতে সুরু করিলেন ।]

ওরে কাদু !

[পাশের ঘর হইতে পর্দা সরাইয়া কাদম্বিনী বাহির হইল।]

ঊষা, টোকন আর চাঁপাকে ডেকে নিয়ে আয়।

কাদম্বিনী চলিয়া গেল, মেজবাবু নীরবে আহার করিতে লাগিলেন, মেজমা চুপ করিয়া রহিলেন। বাহিরের নাচের শব্দটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। গোহমুনার পায়ের ঘুঙুর বাজিতেছে—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম, ঝমর ঝম। মাদল এবং বাঁশীও পুরাদমে চলিয়াছে।]

মেজমা। উঃ, কি গুলতানিই করছে ওরা!

[মেজবাবু স্মিত মুখে মেজমার মুখের পানে চাহিলেন।]

মেজবাবু। চল, আমরাও কিছু একটা করি।

মেজমা। কি করবে?

[মেজবাবু একটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া দিয়া মেজমার মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, যেন মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগিয়াছে।]

মেজমা। বলছ না যে?

মেজবাবু। চল, দুজনে জমজমের পিঠে চ'ড়ে একটা চক্কোর দিয়ে আসি।

মেজমা। পাগল নাকি, আমি হাতীতে চডতে পারব না।

মেজবাবু। হাতীতে চড়া কি আর এমন মুশকিল, সিঁড়ি দিয়ে তো হাওদায় চডবে!

মেজমা। না না, ছি, সে কি হয়! মা, বটঠাকুর—এঁরা সব রয়েছেন, জানতে পারলে কি বলবেন!

[এইরূপ উত্তরই যে মেজবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, মুখভাবে তাহা প্রকাশ করিলেন ও আর একটি সন্দেশ মুখে ফেলিলেন। মেজমা কুজা হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া মেজবাবুর নিকট রাখিলেন এবং পানের বাটা খুলিয়া পান সাজিতে লাগিলেন। বাহিরের আনন্দকলরব আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল।]

মেজমা। হাতীতে যে চডতে বলছ, মাহুতরা তো সব হল্লোড় করছে, নিয়ে যাবে কে?

মেজবাবু। কেন, আমি! এ অঞ্চলে আমার চেয়ে ভাল মাহুত আর কেউ আছে নাকি? ভুলে গেলে সব?

মেজমা। ভুলেছি বইকি!

[তিনি সস্নেহে বিরাটকায় বলিষ্ঠদেহ মেজবাবুর দিকে হাসিমুখে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন।]

তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্য কি কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আমাকে! কিন্তু এ বয়েসে আর ওসব নয়।

[মেজবাবু কিছু বলিলেন না, আর একটি সন্দেশ তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন।]

তা ছাড়া ও পাগলা হাতীর পিঠে কে চড়বে বাপু?

মেজবাবু। পাগলা ব'লেই তো মজাটা আরও বেশি। ভাব তো একবার, বিরাট মাঠে বিরাট জ্যোৎস্নায় বিরাট জমজমের পিঠে চ'ড়ে চলেছি দুজনে। তোমার সর্বদাই ভয় করছে, এই বুঝি ফেলল, আমি নির্বিকার ব'সে আছি, কারণ আমি জানি পাগলা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মেজমা। পাগলা বুঝি আবার ঠাণ্ডা হয়?

মেজবাবু। হয় না? প্রমাণ পাওনি তুমি তার?

[স্নিগ্ধ হাসিতে মেজমার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল।]

মেজমা। না, দরকার নেই। বড় ভয় করে আমার।

[কাদম্বিনী আসিয়া প্রবেশ করিল।]

কাদম্বিনী। ওরা কেউ আসছে না মা, উষাদিদি আর হীরেনবাবু দোলনাতে দুলছেন, টোকন আর চাঁপা জগদেও পাঁড়ের কাঁধে চেপে কোথায় বেড়াতে গেল, কিছুতেই এল না।

মেজমা। [সক্রোধে] পাঁড়েটার কি রকম আক্কেল, ওদের না খাইয়ে নিয়ে চ'লে গেল বেড়াতে! তুই আবার যা, উষাকে আর হীরেনকে ডেকে নিয়ে আয়, বল গে, মেজমা ভয়ানক রাগ করছেন।

[কাদম্বিনী চলিয়া গেল।]

অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, না আছে লজ্জা, না আছে সরম। মা যা বলেন, তা ঠিকই। তরঙ্গিণীর ভাইটিও জুটেছে তেমনই।

[মেজবাবু কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে একটির পর একটি সন্দেশ গম্ভীরভাবে আহার করিতে করিতে হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, প্লেটে আর একটিও সন্দেশ নাই। গম্ভীর মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। প্লেটটি সরাইয়া দিয়া মেজমার মুখের পানে চাহিলেন। প্লেট শূন্য দেখিয়া মেজমার মুখখানিও প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।]

এই যে বললে, খেতে পারব না?

মেজবাবু। তোমাকে খুশি করবার জন্তে না পারি কি ?

[জলের গ্লাসটা তুলিয়া লইলেন। হঠাৎ বাহিরের কলরবটা বাড়িয়া উঠিল। ঘুঙুর, বাঁশী এবং মাদলের শব্দ ছাপাইয়া একটা বিশ্রী গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মেজবাবু গ্লাস হাতেই উঠিয়া পড়িলেন ও জানালার পর্দাটা সরাইয়া দিলেন। দূরে জ্যোৎস্নালোকে নৃত্যপরা গোহমনাকে দেখা গেল। এক হাত কোমরে এবং এক হাত মাথায় দিয়া নাচিতেছে। খোঁপার বেলফুলের মালাটা যে বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে খেয়াল নাই, তাহার ডান দিকে ভিড়ের মধ্যে যে বিশ্বম্ভর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, সেদিকেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বিশ্বম্ভর কিন্তু খুব চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিতেছে এবং চার পাঁচ জন তাহাকে ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। মেজবাবু বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিলেন।]

এই বিশ্বম্ভর, এদিকে আয়।

[পর্দাটা ফেলিয়া দিলেন ও একনিশ্বাসে জলটা পান করিয়া ফেলিলেন। ওদিক দিয়া ঘুরিয়া বিশ্বম্ভর আসিয়া প্রবেশ করিল।]

ওখানে কি করছিলি ?

বিশ্বম্ভর। গোহমনা ছুঁড়িটা হুজুর, আমাকে ভেংচে দিলে। মেরে ধুনে দোব ওকে আমি।

মেজবাবু। চুপ করে ব'সে থাক বাইরে। সব জায়গায় গুণ্ডামি !

[বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ নিরীহ ভালমানুষটির মত বাহিরের দরজার পাশে চুপ করিয়া বসিল।]

মেজমা। এই নে, একটু সন্দেশ খা, কেন যে গোঁয়াতু'মি করিস !

[খানিকটা সন্দেশ তাহাকে দিলেন, সে হাত পাতিয়া লইল ও কোণের দিকে মুখ ফিরাইয়া খাইতে লাগিল।]

মেজমা। পর্দাটা ফেলে দিলে কেন ? তুলে দাও, দেখি ওদের নাচ। এই নাও পান।

[বাটা হইতে পান বাহির করিয়া মেজবাবুকে দিলেন, মেজবাবু পানটা মুখে ফেলিয়া দিয়া পর্দাটা তুলিয়া দিলেন। গোহমনা আত্মহারা হইয়া নাচিতেছে। তাহার ঘুঙুরের ঝমর ঝম ঝমর ঝম ঝমর ঝম, মাদলের ধিতাং তিনা, ধিতাং তিনা, এবং বাঁশীর তুতুর তুয়া সমস্ত

জ্যোৎস্নাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। মেজমা চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মেজবাবু একটা ক্যাম্প-চেয়ার টানিয়া তাহাতে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। দ্বারপথে দেখা গেল, ঊষা ও হীরেন আসিতেছে, পিছনে কাদম্বিনী। হীরেন হাতের সিগারেটটায় গোটা দুই টান মারিয়া সেটা ফেলিয়া দিল। নাচ, বাঁশী ও মাদলের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। একটু পরেই ঊষা, হীরেন ও কাদম্বিনী আসিয়া প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী আসিয়াই পর্দা সরাইয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেল।]

ঊষা। মেজমা, ডাকছ তুমি আমাদের ?

মেজমা। [ফিরিয়া] হ্যাঁ, দয়া ক'রে খেয়ে আমাকে রেহাই দাও মা।

[আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হীরেনকে দেখিয়া থামিয়া গেলেন।]

ঊষা। এখন খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

মেজমা। না ইচ্ছে করলেও খাও, তোমার আবার কবে খেতে ইচ্ছে করে ! [হীরেনের প্রতি] তুমিও ভাই, খাও দুটো।

হীরেন। [স্মিত মুখে] দিন।

ঊষা। যখনই মেজমা সন্দেশের হাঁড়ি এনেছেন, তখনই জানি, না শেষ হওয়া পর্যন্ত কারও নিস্তার নেই।

মেজমা। (সন্দেশ বাহির করিতে করিতে) বেশ বেশ, তোকে খেতে হবে না, তুই যা।

ঊষা। বারে, আমি খাব না বললাম বুঝি, আমি তো শুধু বললাম, খেতে ইচ্ছে করছে না।

[ঊষা ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেজমা তাহার পানে রোষকটাক্ষে একবার চাহিয়া এক প্লেট সন্দেশ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। হীরেনকেও এক প্লেট দিলেন। ঊষা গপগপ করিয়া নিমেষে শেষ করিয়া ফেলিল এবং হীরেনকেও তাড়া দিল।]

শিগগির খেয়ে নিন। দোলনা খালি পেলে কেউ না কেউ দখল ক'রে বসবে। ছোটমা একবার খবর পেলে হয় !

মেজমা। কাদু !

[কাদম্বিনী বাহির হইয়া আসিল।]

ছোটবাবুর তাঁবুতে দিয়ে আয় কিছু মিষ্টি, এই নে।

[একটি প্লেটে করিয়া মিষ্টি দিলেন, কাদম্বিনী তাহা লইয়া চলিয়া গেল।]

হীরেন। (প্লেটটা নামাইয়া দিয়া) এ দুটো আর পারব না মেজদি, অনেক দিয়েছিলেন।

মেজমা। সুরেন কি শিকারে বেরিয়ে গেছে?

হীরেন। এখনও ঠিক মাচানে গিয়ে ওঠেনি বোধ হয়। ওই যে, ওই নৌকোটায় বেড়াচ্ছে ওরা।

[নদীবক্ষে যে পাল্‌-তোলা পানসিটা ভাসিতেছিল, সেইটা দেখাইয়া দিল।]

মেজমা। ওরা মানে, কে কে?

হীরেন। মীনাও আছে। সুরেন তো উষাকেও নিতে চাইলে, কিন্তু উষা কিছুতে গেল না।

উষা। নৌকোয় চুপচাপ ব'সে থাকতে ভাল লাগে বুঝি? তার চেয়ে দোলনা ঢের ভাল।

হীরেন। মীনাকে একটু ঘুরিয়ে নামিয়ে দিয়ে তারপর সুরেন মাচানে গিয়ে বসবে বোধ হয়। ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা তো সব চ'লে গেছে। এখুনি একটু আগে তালুকদার মশাইও গেলেন।

মেজমা। তুমি যাবে না?

হীরেন। আমার শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। দেখি, এক কাপ কফি খেয়ে যদি ভাল লাগে, যাব। বাঃ, এখানে এরা বেশ জমিয়েছে তো!

[খোলা জানালাটার কাছে আগাইয়া গিয়া নাচ দেখিতে লাগিল। মেজমাও তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

উষা। (মেজবাবুর গায়ে হাত দিয়া) মেজকা, ঘুমোচ্ছ?

মেজবাবু। (চোখ খুলিয়া, স্মিত হাস্য সহকারে) না।

উষা। চমৎকার দোলনা টাঙিয়েছি আমরা।

[মেজবাবু আর একটু হাসিলেন। উষা হীরেনের হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে লাগিল।]

কই, আপনি চলুন, এখানেই যে দাঁড়িয়ে পড়লেন!

হীরেন। দাঁড়াও না, একটু দেখে নিই।

উষা। তবে আপনি থাকুন, আমি যাই।

[রাগে গরগর করিতে করিতে উষা চলিয়া গেল। উষা চলিয়া গেলে একটু হাসিয়া হীরেনও তাহার অনুসরণ করিল। মেজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া চেয়ারে চোখ বুজিয়া রহিলেন। মেজমা তাঁহার দিকে চকিতে একবার চাহিয়া আবার জানালায় দাঁড়াইয়া গোহমুনার নাচ দেখিতে লাগিলেন। নাচ, বাঁশী এবং মাদল উদ্দাম সুরে চড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মেজমা আর একবার মেজবাবুর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন। মেজবাবু ঠিক তেমনই ভাবে শুইয়া আছেন।]

মেজমা। কই, হাতীতে বেড়াতে যাবে বললে যে?

[মেজবাবু নীরব]

ঘুমোচ্ছ নাকি?

মেজবাবু। না, ঘুমোই নি।

মেজমা। হাতীতে বেড়াতে যাবে বললে যে?

মেজবাবু। তোমার যখন ইচ্ছে নেই, তখন থাক।

মেজমা। বেশ তো, চল না, যাই।

[মেজবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সমস্ত মুখ প্রশান্ত হাসিতে ভরিয়া গেল

মেজবাবু। এই বিশ্বম্ভর, জমজমের পিঠে হাওদা দিয়ে নিয়ে আসতে বল। সিঁড়ি আনতে বলিস, আর ঝাংরুকে বল তার ডাঙশটা আমাকে দিয়ে যেতে। আমিই চালাব। তুইও লাঠিটা নিয়ে সঙ্গে চল।

বিশ্বম্ভর। যে আজ্ঞে।

[সোৎসাহে উঠিয়া চলিয়া গেল।]

মেজবাবু। আমি জানতাম, তুমি ঠিক রাজি হবে।

[আদুরে আবদেরে ছেলের অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিয়া জননী যেমন প্রসন্ন মুখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, মেজমা ঠিক তেমনই করিয়া মেজবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[ময়না নদীর তীরে প্রস্তরাকীর্ণ একটা অংশ। ছোট বড় নানা আকারের কালো কালো পাথর ইতস্তত ছড়ানো আছে। প্রকাণ্ড চ্যাটালো চওড়া একখানা পাথর এক ময়না নদীর উপরই রহিয়াছে। ময়না নদীর স্রোত ছলাৎ ছলাৎ করিয়া তাহাতে লাগিতেছে। হরিশ খুড়ো একাকী নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। নদীর বাঁকের মুখে জ্যোৎস্নাকিরণ অপূর্ব স্বপ্নালোক সৃজন করিয়াছে। সেই দিকেই চাহিয়া খুড়ো তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। বন্ধু তালুকদার শিকারে চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার গল্প শুনিবার লোক কেহ নাই। তাই তিনি আপন মনে একা নদীর তীরে বসিয়া কল্পনার জাল বুনিতেছেন। এমন সময় জগদেও পাঁড়েকে দেখা গেল। তাহার এক কাঁধে টোকন এবং আর এক কাঁধে চাঁপা। পাঁড়ে উচ্চৈস্বরে ভজন গাহিতে গাহিতে আসিতেছে।]

হরি দরশনকি পিয়াসী (আঁখিয়া)
দেখন চাহত কমল নয়ন
নিশরাতদিন উদাসী—(আঁখিয়া)
কেশর তিলক মোতিয়নকি মালা
বৃন্দাবনকে বাসী (আঁখিয়া)
সুর শ্যাম প্রভু আশ চরণকি
লইহো করবট কাশী (আঁখিয়া)
কেউ কা মন হায় কেউ না জানতু
লোগনকে মন হাসি (আঁখিয়া)

[পাঁড়ে হরিশ খুড়োকে দেখিয়া থামিল এবং চাঁপাও টোকনকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া নিকটবর্তী একটি পাথরে উপবেশন করিল।]

পাঁড়ে। খুড়াজি, এখানে এস্কারা কি হোচ্ছে ?

হরিশ। চুপচাপ ব'সে আছি ভাই।

চাঁপা। (টোকনকে জনান্তিকে) দাদু খুব ভাল গপ্পো বলতে পারে। তুই গিয়ে বল না, তুই বললে ঠিক বলবে, আমি বললে ধমক দেবে।

[টোকন আগাইয়া গেল]

টোকন। একটা গপ্পো বল না দাদু!

চাঁপা। (আগাইয়া আসিয়া) দাদুকে বিরক্ত করছিস কেন? দেখছেন দাদু, টোকনের স্বভাব?

পাঁড়ে। হাঁ হাঁ, ছোড়েন একঠো মজেদার গপসপ।

চাঁপা। দাদুর যদি ইচ্ছে হয়, তবে দাদু বলবে, কি বল দাদু?

[আঙুলে কাপড়ের আঁচলটা জড়াইতে জড়াইতে আড়চোখে দাদুর দিকে চাহিতে লাগিল।]

হরিশ। (স্মিত মুখে) গল্প? কিসের গল্প?

পাঁড়ে। বাঘ, ভাল, রাছস—আপনি তো কেতো জানেন, ছোড়েন কোই একঠো।

[হরিশ জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীর পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।]

হরিশ। আচ্ছা, শোন তবে। ভাল ক'রে ব'স সব।

[সকলে হরিশ খুড়োকে ঘিরিয়া উদগ্রীব হইয়া বসিল।]

হরিশ। অনেক অনে—ক দিন আগে এক দেশে এক রাজকন্যে ছিল। রাজকন্যে তো রাজকন্যে! কি তার রূপ! টুকটুকে রঙ, কুচকুচে কালো একমাথা চুল, ছোট ছোট সাদা মুক্তোর মত দাঁত, পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা টানা চোখ—

চাঁপা। কি নাম ছিল তার?

হরিশ। তবেই তো বিপদে ফেললে দিদি, নাম তো ঠিক মনে নেই।

টোকন। নাম দিয়ে কি হবে, রাজকন্যে নামই তো বেশ নাম।

চাঁপা। (হাসিয়া উঠিল) রাজকন্যে বুঝি আবার নাম হয় কারও? কিচ্ছু বুদ্ধি নেই টোকনটার, দেখছেন দাদু?

হরিশ। তা তো দেখছি, নাম তার ছিলও একটা, দাঁড়াও ভাবি. (ভাবিয়া) মনে পড়েছে, নাম ছিল তার চম্পাবতী।

টোকন। তারপর?

হরিশ। তারপর—দাঁড়াও, বিড়িটা ধরাই আগে।

[বিড়ি ধরাইলেন।]

পাঁড়ে। দিন হামাকে ভি একঠো।

[হরিশ খুড়ো জগদেওকেও একটা বিড়ি দিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া দিলেন।]

চাঁপা। তারপর ?

হরিশ। তারপর একদিন হ'ল এক কাণ্ড!

টোকন। কি ?

হরিশ। রাজকন্যে চম্পাবতী ভোরবেলা উঠে নিজের বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, আর ঠিক সেই সময় পূব দিক রাঙা ক'রে সূর্যদেব উঠছেন। দুজনে চোখাচোখি হয়ে গেল। সূর্যদেব অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, কি আশ্চর্য, মানুষেরও এমন রূপ হয়, এমন দুধে আলতায় গোলা রঙ, এমন টুকটুকে, এমন ফুটফুটে—চমৎকার তো! ভাব করতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন ডিউটির সময়, আকাশ থেকে নেবে আসা মুশকিল।

[হরিশ খুড়ো খুব চিন্তিত মুখে বিড়িতে একটি টান দিলেন।]

টোকন। সূর্যদেব আকাশ থেকে নাববে কি ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে ?

[চাঁপা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

চাঁপা। টোকনটার বুদ্ধি দেখেছেন দাদু, আকাশ থেকে নাবতে দেবতাদের বুঝি সিঁড়ির দরকার হয়!

টোকন। না হ'লে নাববে কি ক'রে ?

পাঁড়ে। দেওতারা সব কুছ পারে ভাই।

টোকন। তারপর ?

হরিশ। তারপর সেদিন সমস্ত দিন তো কেটে গেল, সূর্যদেব আকাশ থেকে নাবতে পারলেন না। কিন্তু মনটি প'ড়ে রইল তাঁর পৃথিবীর দিকে। রাত্তিরে করলেন এক মজার কাণ্ড।

চাঁপা। কি ?

[হরিশ বিড়িতে আবার একটি টান দিলেন।]

হরিশ। রাত্তিরে রাজকন্যে চম্পাবতী দুধের মত সাদা ধপধপে বিছানাটিতে শুয়ে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে ছিল। সেদিন ঠিক এই আজকের মত জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নায় দশ দিক ভেসে যাচ্ছে। বাগানের প্রকাণ্ড পুকুরটায় অসংখ্য কুমুদফুল ফুটেছে, জানালার নীচে জুঁইফুলের ঝাড়টায় ফুলের সে কি ভিড়! হঠাৎ চম্পাবতীর মনে হ'ল, ভয়ানক গরম লাগছে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় এত গরম কেন? ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল চম্পাবতী।

টোকন। [রুদ্ধশ্বাসে] কেন ?

চাঁপা। আঃ, চুপ কর না তুই।

পাঁড়ে। হাল্লা মৎ মাচাও ভাই, শুনো না !

[হরিশ খুড়ো চিন্তিত মুখে বিড়িতে টান দিলেন।]

হরিশ। ঘরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল চম্পাবতী। পশ্চিম দিকের জানালাটায় টাঙানো ছিল নীল রেশমের একটা পর্দা, আর ঠিক সেইখানটাতেই জ্বলছিল সোনার পিলসুজে স্ফটিকের একটা প্রদীপ। চম্পাবতী দেখলে, প্রদীপের লম্বা শিখাটা হয়ে গেছে পয়সার মত গোল, আর তার থেকে বেরুচ্ছে টকটকে লাল জ্যোতি—ঠিক যেন নীল পর্দাটার গায়ে ছোট্ট একটা সূর্য উঠেছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল চম্পাবতী।

চাঁপা। তারপর ?

হরিশ। তারপর সূর্যদেব কথা কইলেন। বললেন, ভয় পেও না রাজকন্যে চম্পাবতী, আমি আকাশের সূর্য, তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি। চম্পাবতী বললে, তুমি সূর্য! তা হ'লে অতটুকু কেন ? সূর্য তো অনেক বড়। সূর্য বললে—

ছোট্ট তুমি চম্পাবতী রাজকন্যে লো
ছোট্ট হয়ে তাই এসেছি তোর জন্যে লো।

এস, দুজনে ভাব করি। আমিও টুকটুকে, তুমিও টুকটুকে। চম্পাবতী বললে, তোমার সঙ্গে ভাব করব না। সূর্য বললে, কেন ? চম্পাবতী বললে, তুমি এলেই জ্যোৎস্না চ'লে যায়, জ্যোৎস্না আমার ভারী ভাল লাগে। এখন কেমন বাইরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। তুমি এলেই তো সব ফুরিয়ে যাবে। তুমি এস না, এখন তুমি যাও।

টোকন। রাজকন্যেটা তো ভারী দুষ্টু !

চাঁপা। বারে, দুষ্টু কেন হতে যাবে ? ওর যদি ওর সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে না হয়, জোর ক'রে ভাব করতে হবে তবু ? কি বলেন দাদু ?

পাঁড়ে। আরে শুনো না ভাই চুপসে সব। খালি কলর বলর কলর বলর !

হরিশ। সূর্যও বললে, ও কথা বলতে নেই রাজকন্যে চম্পাবতী, অতিথিকে অমন ক'রে তাড়িয়ে দিতে আছে ! ছি ! চম্পাবতী একটু ভাবলে, তারপর বললে, বেশ, তা হ'লে আমাদের অতিথিশালায় চল তুমি, অতিথিরা সেইখানে থাকেন। সূর্য বললে, তোমার পুতুলরা যেইখানে আছে, সেইখানে নিয়ে

চল না আমায়। চম্পাবতী বললে, তা হ'লেই হয়েছে, তুমি গেলেই তো সব উঠে পড়বে, যা কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি ওদের! সূর্য তখন বললে, বেশ, তা হ'লে অন্য কোন নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে চল আমাকে। তোমাদের অতিথিশালায় যাব না, সেখানে কত দেশের রাজা-রাজড়া অতিথি রয়েছেন, হোমরা-চোমরা লোক দেখলে বড্ড ভয় করে আমার।

টোকন। তারপর ?

[হরিশ বিড়িতে একটি টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন।]

হরিশ। তারপর চম্পাবতীর মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। বললে, বেশ, খুব নিরিবিলি জায়গাতেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, চল। এই না ব'লে রাজকন্তে চম্পাবতী স্ফটিকের প্রদীপটি তুলে নিয়ে নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলের আড়ালে ঢেকে এক চোরকুঠরিতে গিয়ে ঢুকল। চোর-কুঠরির কোণে প্রদীপটি রেখে বললে, তুমি এইখানে থাক, আমি আসছি এক্ষুণি। এই ব'লে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে শেকল তুলে চোর-কুঠরিটি বন্ধ ক'রে দিলে। সূর্যদেব হয়ে রইলেন বন্দী।

চাঁপা। তারপর ?

হরিশ। রাত আর পোয়ায় না। রাজকন্তে চম্পাবতী তার ধপধপে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

টোকন। তারপর ?

হরিশ। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

পাঁড়ে। উস্‌কা বাদ কি হোলো ?

হরিশ। তারপর ওই—মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না। ওই যে, দেখ না!

[হরিশ খুড়ো আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন—দূরে ময়না নদীর বুকে জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে।]

চাঁপা। রাজকন্তে চম্পাবতী কই ?

হরিশ। চোখ বুজে ফেল, তা হ'লেই দেখতে পাবে।

[হরিশ খুড়ো চোখ বুজিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।]

রাজকন্তে চম্পাবতী তার ধপধপে বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

[টোকন, চাঁপা, জগদেও তিনজনেই চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল।]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[ছোটবাবুর তাঁবু। এ তাঁবুটিও অন্য তাঁবুগুলির মত। গোহমুনাদের নাচের আসর এ তাঁবুটির আরও কাছে। এখন নাচ গান থামাইয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছে। মৃদু কলরব ছাড়া আর কিছু শোনা যাইতেছে না। সমস্ত জানালাগুলি, এমন কি তাঁবুর দ্বার পর্যন্ত বন্ধ বলিয়া বাহিরের কিছু দেখাও যাইতেছে না। এ তাঁবুতেও আসবাব-পত্র-অন্য তাঁবুগুলির মত, প্রচুর নয়, তবে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আছে। টেবিলের উপর বাতিটা জ্বলিতেছে, বেশ একটু জোরেই জ্বলিতেছে। তরঙ্গিণী একটা টিনের চেয়ারের উপর পা দুইটি তুলিয়া একটা ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার চোখে মুখে চাপা হাসি। ছোটবাবু মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছেন। বলা বাহুল্য, ঘরে আর কেহ নাই।]

তরঙ্গিণী। পায়ে হাত দিচ্ছ, পাপ হবে আমার কিন্তু।

ছোটবাবু। হোক গে, কিছু কিছু পাপ হওয়া ভাল।

তরঙ্গিণী। কেন?

ছোটবাবু। আমি তো নির্ঘাত নরকে যাব জানি। নরকে গিয়ে মহা ফাঁপরে প'ড়ে যাব, তোমাকে যদি না পাই সেখানে। গোড়ালিটা তোল।

[তরঙ্গিণী গোড়ালি তুলিলেন।]

তোমার নীলাম্বরী শাড়িখানা এনেছ তো?

তরঙ্গিণী। এনেছি। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি?

ছোটবাবু। আজ নিজের হাতে তোমাকে সাজাব।

তরঙ্গিণী। তারপর?

ছোটবাবু। দেখব।

তরঙ্গিণী। তারপর?

[মুখ টিপিয়া হাসিলেন, গালে টোল পড়িল।]

ছোটবাবু। [তাহার দিকে এক নজর চাহিয়া] তারপর কি করব আর ভাবতে পারছি না। গোড়ালিটা তোল না ভাল ক'রে!

তরঙ্গিণী। আর কত তুলব! এই তো তুলেছি!

[গোড়ালিটা আর একটু তুলিলেন, ছোটবাবু ঘাড়টা আরও নীচু করিয়া গোড়ালিতে আলতা পরাইয়া দিতে লাগিলেন।]

ছোটবাবু। এর পর কি করব, সত্যিই সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

তরঙ্গিণী। চল না, বেড়াইগে দুজনে।

ছোটবাবু। পায়ে হেঁটে?

তরঙ্গিণী। সবাই তো বেড়াচ্ছে।

ছোটবাবু। তুমি কি আর সবাইয়ের মত?

তরঙ্গিণী। আহা!

ছোটবাবু। বেড়াতে হ'লে ঘোড়া নিয়ে বেরোতে হয়। ধূ ধূ মাঠে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে পাশাপাশি দুজনে দুটো ঘোড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি!

তরঙ্গিণী। ঘোড়ায় চড়তে যে জানি না।

ছোটবাবু। তবে আর বেড়াবার সখ কেন? পায়ে হেঁটে হোঁচট খেতে খেতে বেড়ানোর কোন মানে হয় এমন রাতে? এমন রাতে বেড়াতে হ'লে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে হয়। কানের পাশ দিয়ে হু হু ক'রে হাওয়া ব'য়ে যাবে—

[তরঙ্গিণী হঠাৎ পা দুইটা গুটাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।]

ও কি?

তরঙ্গিণী। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

ছোটবাবু। কি?

তরঙ্গিণী। বাদল ডাক্তারের মোটর-বাইকটা নিয়ে চল যাই। ওর তো সাইড-কারও আছে।

ছোটবাবু। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কিন্তু ওর যা ফট ফট আওয়াজ, গাঁ সুদ্ধু লোক জেনে যাবে—ছোটবাবু ছোট বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।

তরঙ্গিণী। জানলেই বা।

ছোটবাবু। তোমার মত স্ত্রীকে নিয়ে ঢাক পিটিয়ে রাস্তায় বেরোনোটা উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রশংসা করারই সামিল তো! সেটা ভদ্রতায় বাধে।

তরঙ্গিণী। তা হ'লে আর একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

ছোটবাবু। কি?

তরঙ্গিণী। ব্যাটাছেলের পোশাক প'রে নিলে কি হয়? ধুতি, পাঞ্জাবি আর মাথায় পাগড়ি? কেউ চিনতে পারবে না!

ছোটবাবু। বাঃ, চমৎকার হয় তা হ'লে। তাই চল, যাওয়া যাক। আমার পাঞ্জাবি কি তোমার গায়ে হবে?

তরঙ্গিণী। পাঞ্জাবি একটু ঢিলে হ'লে কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া একটু ঢিলেও দরকার।

[মুচকি হাসিলেন, গালে টোল পড়িল।]

ছোটবাবু। কই, বার কর তো দেখি একটা পাঞ্জাবি।

তরঙ্গিণী। ওমা, আমাদের সুটকেসটা আবার মায়ের তাঁবুতে দিয়ে দিয়েছে ভুল ক'রে। আনতে বলব বলব ক'রে ভুলে গেলাম। তুমি তো কালীর মা, ভিকু সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলে, এখন আনে কে গিয়ে?

ছোটবাবু। আমি না হয় নিয়ে আসি।

তরঙ্গিণী। আহা!

[মুচকি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তরঙ্গিণী চলিয়া গেলে ছোটবাবু তাঁবুর দরজাটা ফাঁক করিয়া বাদল ডাক্তারকে ডাকিলেন পাশেই তাঁহার তাঁবু।]

ছোটবাবু। ওহে ডাক্তার!

নেপথ্যে বাদল। কি বলছেন?

ছোটবাবু। তোমার মোটর-বাইকটা নিয়ে একবার বেরুতে চাই।

নেপথ্যে বাদল। স্বচ্ছন্দে।

ছোটবাবু। তেল আছে তো?

নেপথ্যে বাদল। প্রচুর।

ছোটবাবু। কি করছ ? মনে হচ্ছে যেন—

নেপথ্যে বাদল। হ্যাঁ, লিখছি।

ছোটবাবু। সেম থীম ?

নেপথ্যে বাদল। হ্যাঁ, মিক্‌স্‌ড উইথ মুন-লাইট।

ছোটবাবু। মুন-লাইট, না মুন-শাইন ?

নেপথ্যে বাদল। দুইই।

ছোটবাবু। সাবাস! লেখ লেখ, বিরক্ত করব না তা হ'লে। একি, ঠানদি যে। আসুন আসুন।

[ঠানদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পরনে চওড়া লাল আঁশ-পেড়ে একখানি ঢাকাই।]

ঠানদি। তোমার ঠাকুরদা এখানে এসেছিলেন ?

ছোটবাবু। কই, না।

ঠানদি। কোথায় গেলেন তা হ'লে ?

ছোটবাবু। এ সময় আপনাকে ছেড়ে যাওয়া তো অন্যায়।

ঠানদি। দেখ তো ভাই।

ছোটবাবু। কতক্ষণ থেকে পাচ্ছেন না ?

ঠানদি। অনেকক্ষণ থেকে।

ছোটবাবু। তা হ'লে তো চিন্তার কথা। কলমিপুরের মাঠে ময়না নদীর ধারে ধারে পরীরা নাবে শুনেছি। কেউ উড়িয়ে-টুড়িয়ে নিয়ে গেল না তো!

ঠানদি। শুধু পরী নয়, কিন্নরও নাবে শুনেছি। তোমার পরীটি গেলেন কোথা, দেখতে পাচ্ছি না যে ?

ছোটবাবু। মায়ের তাঁবুতে গেছে।

ঠানদি। দেখো, উড়ে না যায়, তোমাদেরই ভয় বেশি। আমাদের বুড়ো হাবড়াকে কে আর পছন্দ করবে বল ? এখানে আসেন নি তা হ'লে ?

ছোটবাবু। না।

[ঠানদি চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ফিরিলেন।]

ঠানদি। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল, আমাদের তিনু চাটুজ্জে একটু আগে এসে ধরেছিল আমাকে, তার খাজনা নাকি সুদে আসলে দাঁড়িয়েছে অনেক, তোমাকে ব'লে ক'য়ে মাপ করিয়ে দিতে হবে।

ছোটবাবু। আপনি যদি হুকুম করেন, আমার সাধ্য আছে অমান্য করি ?

ঠানদি। (হাসিয়া) হুকুম করব কেন ভাই, তোমাদের জমিদারি ব্যাপারে আমাদের কথা কইতে যাওয়াই অন্যায়। তবে তিনু চাটুজ্জে ছাপোষা মানুষ, প্রথম পক্ষেরই চারটি মেয়ে পাঁচটি ছেলে, তার ওপর দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, আবার বিয়ে করে মরেছে, এ বউটারও নাকি ছেলে হবে আসছে মাসে।

ছোটবাবু। তা হ'লে তো কর্মিৎকর্মা লোক।

ঠানদি। তোমরা সবাই এক জাতের, দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে।

ছোটবাবু। আপনার মুখে এ কথা সাজে না ঠানদি। ঠাকুরদার তো আপনিই ধ্যান জ্ঞান।

ঠানদি। সব জানি গো, সব জানি। এখন তিনুকে কি বলব, বল?

ছোটবাবু। আপনি যখন ওর পক্ষ অবলম্বন করেছেন, তখন মাপ করতেই হবে। ব'লে দোব আমি চৌধুরীকে।

ঠানদি। আহা, বড় উপকার হয় তা হ'লে ব্রাহ্মণের। এবার তা হ'লে যাই ভাই, দেখি, আমার কিন্নরটি কার পাল্লায় গিয়ে পড়লেন!

[ঠানদি চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর একটি জানালার পর্দা একটু সরিয়া গেল এবং তাহার ফাঁক দিয়া ঠাকুরদা সন্তর্পণে বাহির হইতে মুণ্ড বাড়াইলেন।]

ছোটবাবু। (সবিস্ময়ে) একি, ঠাকুরদা যে!

ঠাকুরদা। (চুপি চুপি) তোমার ঠানদির গলার আওয়াজ পেলাম ব'লে মনে হ'ল!

ছোটবাবু। হ্যাঁ, তিনি আপনাকেই তো খুঁজছেন। ওখানে কি করছেন আপনি?

ঠাকুরদা। তোমার তাঁবুর আড়ালে আত্মগোপন ক'রে একটু নাচ দেখছি। ফাঁস ক'রে দিও না যেন। তোমাদের গোপন পরামর্শটিও শুনে ফেলেছি।

[হাসিলেন।]

ছোটবাবু। ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন।

ঠাকুরদা। পাগল! ওই আবার কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি!

[ঠাকুরদা মুণ্ড টানিয়া লইলেন। পাঞ্জাবি প্রভৃতি লইয়া তরঙ্গিণী প্রবেশ করিলেন।]

তরঙ্গিণী। ভারী একটা মজার জিনিস দেখে এলাম।

ছোটবাবু। (চুপি চুপি) যা বলবে, আস্তে বল। ঠিক পাশেই ঠাকুরদা আড়ি পেতে ব'সে আছেন।

তরঙ্গিণী। (নিম্নকণ্ঠে) তাই নাকি? গিয়ে দেখি, জিতুর মা অঘোরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মা তাঁবুর জানালাটি খুলে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রয়েছেন আর মালা ঘোরাচ্ছেন। আমি গিয়ে স্যুটকেস খুলে এই সব বার করলাম, টেরও পেলেন না। পা টিপে টিপে কাছে গেলাম, কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না, একেবারে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন জ্যোৎস্নার দিকে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, যে মালাটা ঘোরাচ্ছেন, সেটা হরিনামের মালা নয়, একটা শুকনো ফুলের মালা।

ছোটবাবু। সেকি?

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ, টোকন আসবার সময় যে মালাটা প'রে এসেছিল সকাল-বেলায়, সেইটে বোধহয় মায়ের তাঁবুতে ফেলে এসেছে। মা হরিনামের মালার বদলে সেইটে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন ব'সে ব'সে।

[বাহিরে গোহমুনা গান গাহিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী এবং মাদলও স্থরু হইয়া গেল।]

ছোটবাবু। এস, ওগুলো পরিয়ে দিই তোমায়।

তরঙ্গিণী। থাম, আগে একটু দেখি।

ছোটবাবু। ও জানালাটা খুলো না, ঠিক ওর তলাতেই ঠাকুরদা ব'সে আছেন।

[মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরঙ্গিণী আর একটি জানালার পর্দা একটু ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

তরঙ্গিণী। কোমরে হাত দিয়ে গা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচের কি বাহার মেয়ের—দেখ দেখ!

[ছোটবাবুও উঠিয়া আসিয়া ফাক দিয়া উঁকি দিলেন।]

আ ম'ল বিরিঞ্চিটাও এসে ওখানে বসেছে দেখছি যে! মুখ ফুলে তো ঢোল হয়েছে। ওমা, দেখ দেখ, গোহমুনা নাচতে নাচতে ওর থুতনিতে হাত দিয়ে দিয়ে আদর করছে! আচ্ছা, কি বেহায়া বাপু মেয়েটা!

ছোটবাবু। ওসব থাক এখন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল, তোমাকে ওগুলো আগে পরিয়ে দিই।

তরঙ্গিণী। ইস্, তোমাকে পরাতে দোব বইকি, আমি নিজে পরব।

[পর্দা সরাইয়া পাশের কক্ষে চলিয়া গেলেন। ছোটবাবু মুচকি হাসিয়া ক্যাম্প-চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন। বাহিরে বাঁশী ও মাদল খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গোহযুনার গান স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল—]

একা নাহি যাব যমুনায় লো—
যাইতে যমুনা জলে
শ্রীরাধা সখীরে বলে
কদমতলায়
কালিয়া দাঁড়ায় লো,
একা নাহি যাব যমুনায় লো।

বাদল ডাক্তার। [নেপথ্য হইতে] আসতে প্যারি ?

ছোটবাবু। এস এস।

[পর্দা ঠেলিয়া বাদল ডাক্তার প্রবেশ করিলেন। গায়ে ধপধপে ফরসা একটি গেঞ্জি, বাঁ হাতের কব্জিতে একটি সাদা রুমাল বাঁধা, কাপড় ঢিলাধরনে মালকোঁচা মারিয়া পরা। সর্বদাই বাইকে চড়িতে হয় বলিয়া এই ভাবে তিনি কাপড় পরিয়া থাকেন। পায়ে কাবুলি স্যাণ্ডাল। ভারী মুখখানাতে বুদ্ধিদীপ্ত স্মিত হাসি।]

বাদল। আপনি কি একাই বেরুবেন ?

ছোটবাবু। না, ঠিক একা নয়।

বাদল। আর কে ?

ছোটবাবু। আমার একটি গুজরাটি বন্ধু এসে হাজির হয়েছে কলকাতা থেকে। হিরণপুরে এসে আমাকে না পেয়ে একটা বাইক ক'রে এইখানে এসে পড়েছে। তাকেই নিয়ে ঘুরব একটু।

বাদল। ও !

ছোটবাবু। কবিতা লেখা হয়ে গেল ?

বাদল। [সহাস্যে] একটা সনেট হ'ল।

ছোটবাবু। সেই একই ধরনের ইংরেজী বাংলা মিশানো ?

বাদল। হ্যাঁ।

ছোটবাবু। কই, দেখি ?

বাদল। শুনবেন ?

ছোটবাবু। নিশ্চয়ই।

বাদল। নিয়ে আসি তা হ'লে।

[বাদল ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পাশের ঘর হইতে পর্দা সরাইয়া তরঙ্গিণী উঁকি দিল। চোখ মুখ হইতে হাসি যেন উপচাইয়া পড়িতেছে।]

তরঙ্গিণী। গুজরাটি বন্ধু!

ছোটবাবু। তা ছাড়া আর উপায় কি?

তরঙ্গিণী। আমি বুঝি গুজরাটির মতন দেখতে?

ছোটবাবু। চুপ চুপ, ডাক্তার আসছে।

[তরঙ্গিণী পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। বাদল ডাক্তার কবিতা লইয়া প্রবেশ করিলেন।]

বাদল। মহা মুশকিলে পড়া গেছে!

ছোটবাবু। কি?

বাদল। লাহিড়ীটা শ্যাম্‌পেন খেয়ে আমার বিছানায় এসে চিত হয়ে পড়েছে।

ছোটবাবু। থাক না, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি এসে আমার তাঁবুটায় থাক ততক্ষণ।

বাদল। আপনার স্ত্রী?

ছোটবাবু। তার শরীরটা খারাপ হয়েছে, তাকে মায়ের তাঁবুতে চালান ক'রে দিয়েছি।

বাদল। কি হল তাঁর?

ছোটবাবু। পেট ব্যথা করছে।

বাদল। তাই নাকি? ওষুধ দোব নাকি এক ডোজ? আমার ব্যাগে ওষুধ আছে।

ছোটবাবু। থাক তার দরকার নেই। কবিতাটা পড়, শুনি।

[বাদল ডাক্তার কাবুলী স্যাণ্ডাল সুদ্ধ বলিষ্ঠ একখানা পা টিনের চেয়ারের উপর রাখিয়া টেবিলে ভর দিয়া বসিলেন এবং একটু গলা-খাঁকারি দিয়া পড়িতে সুরু করিলেন।]

নির্জন প্রান্তরে বসি তব রূপ হেরি নির্নিমেষে,
কল্পনার কারাগারে করিয়াছি তোমারে বন্দিনী

অলীক আলেয়া তুমি ? মরীচিকাসম নাকি they say,
যুগে যুগে মানবেরে ভুলায়েছ হে ইভা-নন্দিনী ?
Granted—কিন্তু তুমি বন্দী মম মস্তিষ্কের খোপে,
যখন যতটা খুশি নেহারিব তোমার মাধুরী,
অনুভব করি যথা প্রতিদিন মোর Stethoscope-এ
পঞ্জর-পিঞ্জরে-বন্দী হৃদয়ের চাপল্য চাতুরী।
হে বন্দিনী, তোল মুখ, খোল আঁখি, কথা বল বল,
ক্ষমা কর হই যদি অনিবার্য, ক্ষিপ্ত নিরঙ্কুশ ;
সুনীল আকাশ-পাত্রে জোৎস্না-বিয় করে টলমল,
তাহারই প্রভাবে সখি, হয়তো কিছু loose !
কিন্তু হায়, ক্ষোভ শুধু, যেই জোৎস্না বিষবৎ to me,
হয়তো সে জ্যোৎস্নালোকে অতীব আনন্দে আছ তুমি।

[বাদল ডাক্তার চুপ করিলেন। ছোটবাবুও কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নীরব রহিলেন। বাহিরে বাজিতে লাগিল—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম, ঝমর ঝম।]

ছোটবাবু। চমৎকার হয়েছে !

[আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।]

বাদল। আমি তা হ'লে বাইকটা ঠিক করি গিয়ে ?

ছোটবাবু। হ্যাঁ।

[বাদল ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পর্দা সরাইয়া তরঙ্গিণী বাহির হইয়া আসিলেন। পাঞ্জাবি পরিয়াছেন, পাগড়িটা অর্ধেক বাঁধা হইয়াছে, বাকি অর্ধেকটা কাঁধ হইতে ঝুলিতেছে। কাপড়টাও ঠিকমত পরা হয় নাই।]

তরঙ্গিণী। ঠিক হচ্ছে না আমার, কাছা কোঁচা ঠিক করতে পারছি না।

ছোটবাবু। [হাসিয়া] বললাম, তুমি পারবে না। চল, ঠিক ক'রে দিই।

[উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন। অস্ফুটভাবে শোনা গেল, তরঙ্গিণী বলিতেছেন—আঃ আঃ, ও কি হচ্ছে ! বাহিরে গোহমুনার নৃত্য উদ্দাম হইতে উদ্দামতর হইয়া উঠিল।]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[ময়না নদীর ওপারে জঙ্গলের একটি অংশ। সারি সারি তিনটি মাচা দেখা যাইতেছে, দুইটি খালি। তৃতীয়টিতে তালুকদার ও রোগা নিতাই বন্দুক হস্তে বসিয়া আছে। তালুকদার ঢুলিতেছে। অদূরে একটি প্রকাণ্ড শিমুলগাছের উপর বলিষ্ঠ হরু মণ্ডল বর্শা হস্তে বসিয়া আছে। ভোর হইতেছে। দূরে বনানীশীর্ষে চন্দ্র অস্তোন্মুখ! অস্তোন্মুখ চন্দ্রের কিরণ হরু মণ্ডলের বর্শাফলকে পড়িয়া চকচক করিতেছে।]

নিতাই। [তালুকদারকে ঠেলা দিয়া] ক্রমাগত ঢুলছ যে হে!

তালুকদার। [হাসিয়া] কি আর করি!

নিতাই। জামাইবাবু, হীরেনবাবু, কেউ তো এল না হে!

তালুকদার। (হাই তুলিয়া) বাঘও তো এল না!

নিতাই। আশ্চর্য! অথচ মাঝরাত্রে বাঘের ডাকও শোনা গেল। শোন নি তুমি?

তালুকদার। শুনেছি বইকি।

নিতাই। অথচ এল না কেন বল তো?

তালুকদার। কি জানি!

নিতাই। এ দিকে ফরসাও তো হয়ে এল, শুকতারা উঠছে। সারারাত্ত মশার কামড় ভোগ করাই সার হ'ল আমাদের।

তালুকদার। আমি কিন্তু ঢুলতে ঢুলতে বেশ মজার একটা স্বপ্ন দেখলাম। আচ্ছা, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়, বলে না লোকে?

নিতাই। স্বপ্নটাই কি, শুনি না!

তালুকদার। স্বপ্ন দেখলাম, ছিপছিপে গড়নের একটা বাঘ ঠিক আমার মাচার সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেই বন্দুক তুলে গুলি করতে যাব, অমনই সে ফিক ক'রে হেসে বললে, চোখের মাথা খেয়েছ তুমি, দেখতে পাচ্ছ না, আমি যে লছমনিয়া। এ স্বপ্নের মানে কি ভাই?

নিতাই। [সবিস্ময়ে] নেশা-ভাঙ করেছ নাকি কিছু?

তালুকদার। আরে না না, নেশা-ভাঙ করতে যাব কেন?

নিতাই। [নীচের দিকে চাহিয়া] বিলটাও নেমে আসছে দেখছি।

[বন্দুক ঘাড়ে বিলটা আসিয়া প্রবেশ করিল।]

তালুকদার। কি হে, তুমি নেমে এলে যে?

বিলটা। [সহাস্য মুখে] আপনারাও নামুন।

তালুকদার। কেন?

বিলটা। বাঘ আজ আর আসবে-না।

নিতাই। কি ক'রে জানলে তুমি?

বিলটা। বাঘিনী এসেছে যে একটা। বাঘ আর বাঘিনীটা চর পেরিয়ে চ'লে গেল দেখলাম দু-ই দিক পানে।

নিতাই। সে কি?

বিলটা। আজ্ঞে হাঁ্যা। দেবদারুগাছের মগডালে ব'সে সব দেখেছি আমি। প্রথমে এল বাঘটা, নদীর চরের ওপর বসল, এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলে খানিক, তারপর দিলে এক হাঁকাড়। শোনেন নাই আপনারা?

তালুকদার। শুনেছি বইকি। তারপর?

বিলটা। তারপর এল বাঘিনীটা। ইয়া লম্বা-চওড়া তুলতুলে এক বাঘিনী! সেও এসে বসল বাঘটার কাছে, ব'সে তার গা চাটতে লাগল। বাঘটা ঘোরাতে লাগল তার ল্যাজটা পাক দিয়ে দিয়ে—সে এক কাণ্ড!

নিতাই। তারপর?

বিলটা। তারপর দুজনে খানিক চাটাচাটি ক'রে উঠে পড়ল, চাঁদের আলোয় হেলতে দুলতে চ'লে গেল চর পেরিয়ে। নিজের চক্ষে দেখলাম।

তালুকদার। সত্যি?

বিলটা। সত্যি নয় তো কি মিছে বলছি আমি?

নিতাই। [সক্ষোভে] বাঘটা দেখলে তুমি, অথচ গুলি করলে না?

বিলটা। কি বিপদ, আমার রেঞ্জের মধ্যে থাকলে কি আমি ছেড়ে দিই? তারা ছিল দু-ই চরের মাঝে, আমার নাগালের বাইরে।

নিতাই। আশ্চর্য কাণ্ড!

[অস্তোন্মুখ চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবিচলিত হক মণ্ডল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।]

রাত্রি

উৎসর্গ

সাহিত্য-প্রাণ কবি সমালোচক

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

রাত্রির কথা লিখতে বসেছি।

এখন কিন্তু বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহর, রোদের তাতে প্রকৃতি পুড়ে যাচ্ছে ; মনে হচ্ছে, সকাল থেকে ক্রমাগত আত্মসম্বরণ করে করে প্রকৃতি যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আর পারছে না, অন্তরের পুঞ্জীভূত উত্তাপ চতুর্দিক চৌচির করে দিয়ে এইবার ফেটে বেরোয় বুঝি। নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ নিষ্ঠুর উত্তাপ। একটা তৃষ্ণার্ত কাক অশ্বত্থ গাছের ডালে হাঁ করে বসে আছে, গলার কাছটা কাঁপছে তার। বুড়ো অশ্বত্থগাছটার সর্বাঙ্গে কচি পাতার সমারোহ, নীরবে একটা সবুজ অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে যেন। ঠাকুরবাড়ির গেটটার পাশে সারি সারি গোটা-তিনেক কলসী নিয়ে কইলু বসে আছে—ফতুয়া-পরা ন্যাড়া-মাথা কইলু, কলসী থেকে জল নিয়ে তৃষ্ণার্ত পথিকদের বিনামূল্যে দান করছে দৈনিক চার আনা মজুরির পরিবর্তে। কার পুণ্য হচ্ছে, কে জানে! অদূরে বুড়ো মুচীটাও বসে আছে আশেপাশে নানাজাতীয় ছিন্ন পাদুকা ও পাদুকা-সংস্কারের সরঞ্জাম নিয়ে। বুড়োর লক্ষ্য পথিকদের পায়ের ওপর, মাঝে মাঝে নিজের দিকে কারও কারও দৃষ্টিও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে সে—'জুতিঠো হুজুর!' কেউ তার কথায় কর্ণপাত করছে না ; এই রোদে দাঁড়িয়ে জুতো সারাবে কে! বুড়ো কিন্তু নিরস্ত হচ্ছে না, সুযোগ পেলেই অনুরোধ করছে। তার মানসপটে মুখে-বসন্তের-দাগ জাঁদরেল মুচিনীটার মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে বোধ হয়, বিকেলে সে আসবে, পাই-পয়সার হিসেব নেবে এবং উপার্জন কম হলে কারণে অকারণে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করবে। আর্তনাদ করতে করতে একটা মোটর ছুটে চলে গেল, ধুলো উড়ল। তার পেছনে একটা জীর্ণ টমটম, ঘোড়াটা জীর্ণতর, চারজন মোটা লোককে আর যেন বেচারা টানতে পারছে না, গাড়োয়ান ঘন ঘন চাবুক চালাচ্ছে। ঘন ঘন হর্ন দিতে দিতে আর একটা মোটর বেরিয়ে গেল, আবার একরাশ ধুলো উড়ল। 'ঠাণ্ডা মালাই-বরো-ফ'—ভীষণদর্শন একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে, তার পেছনে একজন কুলি, তার মাথায় লাল শালু দিয়ে মোড়া মালাই-বরফের হাঁড়ি। পিচের রাস্তা গরম হয়ে নরম হয়ে এসেছে। কুলিটার পায়ের চামড়া শক্ত, ফাটা-ফাটা, হয়তো গরম লাগছে না। ঠাণ্ডা মালাই-বরফ বয়ে বেড়াবার জন্যে ক' পয়সা পাবে ও, কে জানে! অশ্বত্থগাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বসে রাত্রির কথা লিখছি, মনে করে করে ভেবে ভেবে লিখছি। এই দারুণ দ্বিপ্রহরের পটভূমিকায় নিবিড় রাত্রির স্মৃতি অস্পষ্ট, রহস্যময়।

খট-খট-খট-খট-খট-খট।

মদগর্বিত পদবিক্ষেপে একদল পুলিস-বাহিনী রাস্তা প্রকম্পিত করে চলে গেল। ওদের খাকী সাজ আর লাল পাগড়ি আশ্চর্য রকম মানিয়েছে উদ্ধত দ্বিপ্রহরের নিদারুণ এই—

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অশ্বত্থগাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে। ওই পুলিস-বাহিনীর একটি পুলিসকে চিনতে পেরে আমারও হাসি পাচ্ছে। কালই আভূমি নত হয়েও সেলাম করছিল ট্যাঁস-ফিরিঙ্গী এক গার্ড-সাহেবকে আকবর নগর স্টেশনের প্লাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে, আমি দেখেছিলাম। খট-খট-খট-খট-খট-খট—মদগর্বিত পদধ্বনি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। বুড়ো মুচীটা সভয়ে চেয়ে রইল, জলসত্র-পরিচালক কইলু একজন তৃষ্ণার্ত পথিকের আঁজলায় জল ঢালতে ঢালতে অন্যমনস্ক হয়ে মাটিতেই ঢেলে দিলে খানিকটা জল।

এই বিক্ষেপ-বিক্ষোভ-উত্তাপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে বসেই লিখতে হচ্ছে রাত্রির কথা। তিমিরময়ী নক্ষত্রখচিত রাত্রি। নক্ষত্র অগণিত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদও উঠেছিল মধ্যরাত্রে। ঝড়ও উঠেছিল। আমি সবটা দেখি নি, দেখলেও হয়তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। না, আমি সবটা দেখি নি, দেখতে পারি নি; অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জেগে উঠলাম, দেখলাম, প্রভাত হয়েছে।

॥ ২ ॥

জীবনের যে অনিবার্য ঘটনাগুলিকে অপছন্দ করি আমি, আশ্চর্যের বিষয়, সেই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিরই সহায়তায় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেদিন। সেদিন কি বার ছিল, কি মাস ছিল, কি তিথি ছিল, কিছুই মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। শুধু মনে আছে, দগদগে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের ডোরা-কাটা শতরঞ্জিটা প্লাট্‌ফর্মে পেতে তার ওপর বেকুবের

মত বসেছিলাম আমি। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অস্বস্তি আরও প্রবল হয়ে উঠল, যখন একজন কুলি এসে মাথার ওপর একটা আলো জেলে দিয়ে গেল। অস্পষ্ট আর কিছু রইল না। শতরঞ্চি শতকণ্ঠে আত্মপ্রচার করতে লাগল, আমার প্রকাণ্ড কালো তোরঙ্গটার ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আমার নামটা অগোচর রইল না আর কারও।

স্ত্রীবিহীন পুরুষকে চাকরের ওপর নির্ভর করতে হয়—সে-ই সখী, সচিব, গৃহিণী সব—বিশেষত আমার মত কাছাখোলা লোককে, যার নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাওয়ার সামর্থ পর্যন্ত নেই। সেই চাকর যদি আবার আমার গোকুলচন্দ্রের মত যুগপৎ রসবোধলেশহীন, কর্মঠ, বিশ্বাসী এবং স্নেহশীল হয়, তা হলে এই রঙচঙে শতরঞ্চির ওপর বেকুবের মত বসে অস্বস্তি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ট্রেন ছাড়বার মিনিট-দশেক আগে হন্তদন্ত গোকুল এই শতরঞ্চিটা কিনে স্টেশনে দিয়ে গেল আমাকে, সকাতরে অনুরোধ করে গেল, বিছানাটা যেন না খুলি, এই শতরঞ্চিটা পেতেই যেন চালিয়ে দিই ভ্রমণকালীন শোয়া-বসাটা! গোকুল জানে, বিছানায় টুকিটাকি নানা রকম জিনিস আছে, খুললেই একটা না একটা হারিয়ে যাবে। গোকুলকে অমান্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু ভগবান গোকুলকে আর একটু যদি—রসিক নয়, কম বেরসিক করে সৃষ্টি করতেন, কি ক্ষতি হ'ত তাতে তাঁর? আশ্চর্য কাণ্ড, পয়সা দিয়ে শতরঞ্চিবেশী এই প্রলাপটা কিনে নিয়ে এসেছে ও সজ্ঞানে, স্বচ্ছন্দে! কিছুদিন পূর্বে এই বেখাপ্পা রকম বড় কালো রঙের তোরঙ্গটাও এই গোকুলই কিনেছিল, সাদা রঙ দিয়ে নাম গোকুলই লিখিয়েছে। শুধু তোরঙ্গে নয়, আমার সমস্ত জিনিসে—বাসন-কোসন, জামা-কাপড়, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, গেঞ্জি, লুঙ্গি, সমস্ত জিনিসে আমার নাম লেখা এবং সমস্তই আমার হিতৈষী গোকুলের কীর্তি। গোকুল আমাকে নিয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত। আমি যেন সমস্ত জিনিস হারিয়ে ফেলতে উদ্যত, নাম-টাম লিখে গোকুল কোনক্রমে সামলে-সুমলে রেখেছে সব যেন।

ওয়েটিং-রুমের পাশে অন্ধকার এক কোণে রঙিন শতরঞ্চিটার ওপর চুপ করে চোখ বুজে পড়েছিলাম আমার আষ্টেপৃষ্ঠে মজবুত করে বাঁধা বিছানার বাণ্ডিলটায় হেলান দিয়ে। অদূরে একটা এঞ্জিন শব্দ করছিল—শ্‌ শ্‌ শ্‌ শ্‌ শ্‌। চোখ বুজে শুয়ে একটা গল্পের প্লট ভাবছিলাম। একটু নমুনা দিই।—

—চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকার। অরণ্যসমাকুল উপত্যকার সমস্ত সৌন্দর্য

"অমাবস্যার অন্ধকারে অবলুপ্তপ্রায়। নির্মেঘ আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছায়াপথ প্রসারিত। সুবিশাল বৃশ্চিকরাশি বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্নের মত চিরন্তন প্রশ্নের রহস্য লইয়া অন্ধকার শূন্যে জ্বলিতেছে। দূরসন্নিবদ্ধ দেবদারুশীর্ষে অনুরাধা, তাহার ঈষৎ নিম্নে জ্যেষ্ঠা, এবং শূলপাণি-পর্বতের অগ্রভাগে মূলা নক্ষত্র দেদীপ্যমান। নক্ষত্রের মৃদু আলোকে অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ, ঘনসন্নিবদ্ধ বনশ্রেণী পর্বতগাত্রে পুঞ্জীভূত মেঘবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। শূলপাণি ও পার্বতীর মধ্যস্থিত বনসমাচ্ছন্ন এই উপত্যকায় বৌদ্ধ কাপালিক রক্তভিক্ষু সঙ্গোপনে বাস করেন। উপত্যকা শ্বাপদসঙ্কুল, গভীর নিবিড় রাত্রেও নীরব নহে। নিকটে দূরে বন্য পশুর সাবধান-সঞ্চরণ-শব্দ, অজগর-নিষ্পিষ্ট অসহায় পশুর অবরুদ্ধ আর্তনাদের মত একটা প্রচ্ছন্ন ধ্বনি, জটিল শাখা-প্রশাখাময় বৃক্ষশীর্ষে নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন—

ঘর্ঘর করে একটা শব্দ হ'ল, চোখ খুলে দেখলাম, ঠিক মাথার ওপরে যে বাতিটা টাঙানো ছিল, একটা কুলি হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা নাবাচ্ছে। একটু পরেই আলো জ্বলে উঠল এবং আমাকে কেন্দ্র করে গোকুলের কীর্তি সকলের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল। রঙিন শতরঞ্জি, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠে বসলাম, এবং টাইম্-টেবলটা নিয়ে আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতাটার ওপর অকারণে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। ওতেই নিমগ্ন হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং—স্টেশনের ভেতরে ঘণ্টা বাজল। কে একজন আপ-ডাউন ভাষায় আর এক স্টেশনের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। কথা শেষ হয়ে গেল। এঞ্জিনের শ্‌ শ্‌ আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেন জানি না, আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতা থেকে চোখ তুলে হঠাৎ আমি ডান দিকে ফিরে চাইলাম, মনে হ'ল কে যেন আমায় ঘাড় ধরে ফিরিয়ে দিলে। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না, তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজার ফাঁক দিয়ে কালো কুচকুচে একজোড়া চোখ আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে। আর কিছু নয়, কেবল একজোড়া চোখ।

রাত্রি।

আমার রঙিন শতরঞ্জি এবং নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে লজ্জিত হয়ে ওঠবার পূর্বেই, বেশ মনে পড়ছে, বংশী এসে ঢুকল ওয়েটিং-রুমে এক ঠোঙা খাবার এবং এক কুঁজো জল নিয়ে। তারপর কয়েক

মিনিট কি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। এইটুকু শুধু মনে আছে, এঞ্জিনের শ্‌শ্‌ শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল, এবং আমি সহসা আবার প্রাণপণে সেই অন্ধকার উপত্যকায় নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন অনুসরণ করে সেই বৌদ্ধ কাপালিকের আলৌকিক কাহিনীটা গড়ে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম।

আপনিই কি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার?

প্রশ্ন করলে বংশী, কিন্তু ঈষদুন্মুক্ত দরজার অন্তরালে শাড়ির টুকটকে লাল পাড়ের ঝলক চোখে পড়ল। বুঝলাম, বংশী প্রশ্নকারক নয়, প্রশ্নবাহক।

কি রকম যেন বেকায়দায় পড়ে গেলাম।

'ঘনশ্যাম' নামটা এ যুগের সভ্য-সমাজে অচল, যে রগরগে শতরঞ্জিটার ওপর বসে আছি সেটা অচল, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা অচল, এবং সর্বাপেক্ষা অচল আমার ব্রণ-লাঞ্ছিত-মুখ-সর্বস্ব এই রোগা লম্বা চেহারাটা। বাইরের এই জিনিসগুলোর সঙ্গে আমার অন্তর্লোকের সুন্দর সাহিত্য-সাধনাকে বিজড়িত করতে বরাবরই আমি একটু সঙ্কুচিত হই। তবু সম্ভবত 'বিখ্যাত' শব্দটার মোহে অভিভূত হয়ে বংশীকে সত্য কথাই বললাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপনি ডাক্তারি করতে করতে কি করে লেখেন এত?

বুঝলাম, এ প্রশ্নটি বংশীর মস্তিষ্ক থেকে স্বতঃ উৎসারিত হ'ল। একটু মুচকি হাসলাম। আমার মুচকি হাসির অন্তরালে কি পরিমাণ উষ্মা নিহিত ছিল, তা দেখতে পেলে বংশী একটু বিব্রত হ'ত। অনেকেই এ প্রশ্ন করে। কিন্তু কি মূর্খের মত প্রশ্ন। এ যেন অনেকটা 'আপনি ডাক্তারি করতে করতে নিশ্বাস নেন কি করে'-জাতীয় প্রশ্ন। অনেকেই দেখেছি আলাপ শুরু করেন প্রশ্ন দিয়ে। দু'চারটে সাধারণ প্রশ্নের পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রকম ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন বর্ষিত হতে থাকে। 'মাসে কত টাকা উপায় করেন'—এ প্রশ্ন তো অনেকের মুখেই শুনেছি। 'প্র্যাক্‌টিস কেমন হচ্ছে', লেখা থেকে 'দু'পয়সা হচ্ছে কি না'—এত বার এত লোকের কাছে শুনেছি যে, গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এক জাতীয় সাহিত্যিক স্রষ্টা আছেন, তাঁদের প্রশ্নগুলো বেশ জটিল ধরনের। 'ছোটগল্প কি করে লিখতে হয়', 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিম-চন্দ্রের তফাত কোথায়', 'সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর কবি কি না', 'বাংলা-সাহিত্যে কোন্ কবি ব্রাউনিঙের মত', 'জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবিই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কি না'—দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়।

বংশী শতরঞ্চিতে উপবেশন করে তৃতীয় প্রশ্নটা করলে এবং আত্মপ্রকাশ করলে।

আচ্ছা, আজকাল চারিদিকে 'ফ্রয়েড ফ্রয়েড' খুব শুনি, লোকটা কে বলুন তো?

আমি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলাম, ডিটেক্‌টিভ।

শিস দেবার ভঙ্গীতে মুখটা কুঁচকে বিস্মিত বংশী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারলে না, ভেতর থেকে ডাক এল।

বংশীদা, শুনুন।

মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে—যেন আকাশের ওপার থেকে—কথাগুলো ভেসে এল। রাত্রির সম্পর্কে বরাবরই, এমনঃকি শেষ পর্যন্ত, আমার এই দূরত্ববোধক অনুভূতিটা ঘোচে নি।

উঠে চলে গেল বংশী।

আমি বসে রইলাম চুপ করে। এঞ্জিনের শ্‌ শ্‌ শব্দটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিছু একটা করবার জন্যেই সম্ভবত স্টেশনের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। ঘড়ি চলছে না। সংস্কৃত ভাষায় গল্পের যে প্লটটা ভাবছিলাম, সেটাই আবার ভাববার চেষ্টা করলাম। চোখ বুজে আবার ঠেস দিয়ে শুলাম বিছানার বাণ্ডিলটায়। শূলপাণি এবং পার্বতী পর্বতের মধ্যস্থিত উপত্যকার সে ছবিটা আর কিন্তু মনের মধ্যে তেমন ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠল না। বংশী মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল, আর সেই কালো কুচকুচে চোখ দুটো, সেই লাল পাড়ের ঝলকানি। তখন ভাবি নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওই শ্বাপদসঙ্কুল অন্ধকার উপত্যকার সঙ্গে কালো কুচকুচে চোখ দুটো, লাল পাড়ের ঝলকানি আর বংশীর অতি নিবিড় যোগ ছিল। না থাকলে ঠিক সেই সময় রক্তভিক্ষু নামে একটি কাপালিকের কথা আমার মনে হবে কেন? সেই অন্ধকার উপত্যকায় শূলপাণি-পর্বতের গুহায় রক্তভিক্ষু নামে যে বৌদ্ধ কাপালিককে আমি ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করেছিলাম, সে যদিও আর কোনদিন আমার লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করবে না, সে যদিও হারিয়ে গেল, তবু কিন্তু ঠিক সেই সময় সে আমার কল্পনাতেই বা মূর্ত হয়েছিল কেন, যদি না—

স্বর্ণেন্দু বলে কাউকে চেনেন আপনি?

চোখ খুলে উঠে বসলাম।

বংশী আবার এসেছে।

স্বর্ণেন্দু ?

হ্যাঁ, স্বর্ণেন্দু রায়, স্কটিশে আপনার সঙ্গে—

আর বলতে হ'ল না, যবনিকা উঠে গেল, চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বর্ণেন্দুর মুখখানা। কালো রোগা লাজুক স্বর্ণেন্দু। 'সোনার চাঁদ' বলে রাগাতাম তাকে আমরা।

খুব চিনি। কেউ হয় নাকি স্বর্ণেন্দু আপনার ?

আমার পিসতুতো দাদা।

ও।

সোনাদা এসে পড়বেন এখুনি দিল্লী এক্সপ্রেসে। আমরা সবাই মধুপুর যাচ্ছি।

বেড়াতে ?

না, চেঞ্জে। পিসেমশায়ের অসুখ।

কি হয়েছে ?

ডাক্তারী কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলাম না।

পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাতের শ্লীল অশ্লীল নানা রকম কারণ মাথার মধ্যে ভিড় করে এল।

আশ্চর্য আমাদের মন !

কতদিন থেকে ?

এক বছর হবে। কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না একেবারে।

কোথায় রয়েছেন তিনি, ওয়েটিং-রুমে ?

হ্যাঁ, আসুন না, দেখবেন ?

খুব সম্ভবত একজন লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যেই, (ইংরেজীতে যাকে বলে 'কাঁধ-ঘষাঘষি') বংশী আমাকে ভেতরে যেতে বললে।

না, থাক্, হয়তো ঘুমুচ্ছেন এখন।

ঘুমুবেন কি, ঘুমই হয় না তাঁর, দিনরাত জেগে আছেন।

অচেতন নয়, সচেতন মনেরই প্রত্যক্ষলোকে কালো কুচকুচে চোখ দুটো নির্নিমেষে চেয়ে ছিল। আকর্ষণ করছিল, বিকর্ষণও করছিল। স্বর্ণেন্দুর কে হয় ও ?—হয়তো দু' মিনিট কেটেছিল, হয়তো দু' ঘণ্টা, ঘড়ির দিক থেকে ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন। এইটুকু শুধু মনে আছে,

অনেকক্ষণ লেগেছিল কুণ্ঠাটা কাটাতে—বেশ কিছুক্ষণ। চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। চোখের দৃষ্টিতে সাজপোশাকবর্জিত আসল মানুষটিকে চেনা যায়—মনের গহনলোকে সঙ্গোপনে যে মানুষটি বাস করে তাকে, সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত আসল সত্তাটিকে। সাজে-পোশাকে আলাপে-ব্যবহারে সভ্য-জগতের সব মানুষই প্রায় এক ছাঁদের। চোখের দৃষ্টিই মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে এখনও। চোখের দৃষ্টিই মুখশ্রীর প্রাণ। অদ্ভুত ওই কালো চোখ দুটি! বিশিষ্ট! হয়তো ওর সঙ্গে জীবনে কখনও পরিচয় ঘটত না। আমার বর্ণবহুল শতরঞ্জি, ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার নাম-লেখা তোরঙ্গ, ডাক্তারি-সাহিত্যিকতার আপাত-অদ্ভুতত্ব নিয়ে আলোচনা—অর্থাৎ যে জিনিসগুলো আমি অপছন্দ করি, সেই জিনিসগুলিরই আকস্মিক সমন্বয় না ঘটলে সেদিন, কিংবা কোনদিনই হয়তো, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটত না আমার। তার কথাগুলো—প্রায় বছর ৬'য়েক আগে শোনা কথাগুলো, মনে পড়ছে আমার।

আপনার ওই শতরঞ্জিটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল আমার, তারপর দেখলাম নাম-লেখা তোরঙ্গটা। নামটা দেখেই মনে পড়ল, দাদার এই নামেরই তো একজন ডাক্তার লেখক-বন্ধু আছেন। বংশীদাকে বললাম—

আশ্চর্য রকম ছোকরা এই বংশী, অর্থাৎ আশ্চর্য রকম লোক-ঠকানো চেহারা ওর। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, চালাক-চতুর বেশ। চেহারাতে এমন একটা লালিত্য আছে, অর্থাৎ সেই ধরনের লালিত্য আছে, যা আজকালকার মেয়েদের পছন্দ। বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক নয়, বেশ রোগা-রোগা, পাঞ্জাবি-পরলে-বেশ-মানাস-গোছ চেহারা। মুখে যে হাসিটা সর্বদাই চিকমিক করছে, আপাতদৃষ্টিতে হঠাৎ সেটা বুদ্ধির দীপ্তি বলে ভুল হবার সম্ভাবনা। প্রতি কথাতেই সমঝদার-মার্কা হাসি। সেই হাসির অন্তঃসারশূন্যতা কিন্তু নিমেষে বোঝা যায় চোখ দুটোর পানে চাইলে। সর্বদা চঞ্চল চোখ দুটোর দৃষ্টি ছটফট করছে—যেন নিজেকে ঢাকবার জন্যে, ধরা পড়ার ভয়ে, কিন্তু পারছে না। নির্বোধ, ভীরু, লোলুপ, চঞ্চল দৃষ্টি।

আসুন না, দেখবেন?

আবার অনুরোধ করলে বংশী।

চলুন।

॥ ৩ ॥

আলোটা উস্‌কে দাও, ঘনশ্যামবাবু এসেছেন।

আলোটা উজ্জ্বলতর হতেই অনিবার্যভাবে তাকেই প্রথমে দেখলাম, যদিও সে কোণের দিকে বসে ছিল। আলোটা উস্‌কে দিলে চাকরটা।

বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না। অক্ষমতা নয়। রঙচঙে কথার আতসবাজি ছুটিয়ে, শব্দের ঝঙ্কারে সকলকে দিশাহারা করে দিয়ে পরিশেষে 'অবর্ণনীয়া' বলে অক্ষমতা জ্ঞাপন করবার কৌশল আমার খুব আয়ত্ত আছে। এ ক্ষেত্রে সে কৌশল প্রয়োগ করতে বিরত হ'লাম, কারণ আমি কিছুই অতিরঞ্জিত করতে চাই না। ঔপন্যাসিকী কায়দায় বর্ণনা করতে বসলে অতিরঞ্জন অবশ্যম্ভাবী। অতি সংক্ষেপে কেবল কিছু বলছি, যদিও তাও, খুব সম্ভব, 'অতি' না হলেও ঈষৎ রঞ্জিত হয়ে যাবেই।

ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, কালো রঙ। এমন কালো সাধারণত দেখা যায় না। মিশ কালো, কুচকুচে কালো প্রভৃতি কালো-রঙ-প্রকাশক বিশেষণগুলি দিয়ে এ কালো রঙের বর্ণনা করা যাবে না। কারণ তার রঙে শুধু কালিমা নয়, কোমলতাও ছিল—মখমলের মত অদ্ভুত একটা কোমলতা। অতি পেলব, অতি মৃদু, অতি আশ্চর্য একটা শ্রী ওই কালো রঙের নিবিড়তায় আবিষ্ট হয়ে স্বপ্ন দেখছিল যেন। কুচকুচে কালো চোখ দুটো আরও অদ্ভুত—চঞ্চল নয়, নিস্পলক। যখন যতটুকু দেখে, নির্নিমেষে দেখে, যার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে বিদ্ধ করছে তত মনে হয় না, যত মনে হয় নিঃশেষ করছে—মনে হয়, তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব যেন দেখতে পাচ্ছে ও। প্রথমেই তাকে দেখে আমার এত কথা মনে হয় নি, এই বর্ণনাটুকু আমি আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্কলন ক'রে দিলাম। প্রথমেই তাকে দেখে আমার মনে যে ধারণা হয়েছিল, প্রথম দৃষ্টিতেই সে রকম ধারণা করতে পারে কেবল বাঙালী-সন্তান। যদিও সে একটিও কথা বলে নি, তবু সহসা আমার মনে হ'ল, মেয়েটা জ্যাঠা, ইংরেজীতে যাকে বলে 'প্রিকোশাস'। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, তাকে বয়সের আন্দাজে বেশি বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়েছিল। বয়সের আন্দাজে! তার বয়স কত—সে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম কি? আঠারো কি আটাশ—সে প্রশ্নই তো মনে জাগে নি তখন। কার জাগে? অনেকদিন পরে বংশী যখন নিমোনিয়ার ঘোরে প্রলাপ বকছিল—"তোমার বয়স কত তা

আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধেও সব কিছু জানতে চাই না আমি"—মনে পড়ছে, এই প্রলাপের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল। বংশীর প্রলাপের চিকিৎসা অবশ্য করেছিলাম ডাক্তার আমি, কিন্তু কবি আমি সায় দিয়েছিলাম ওই প্রলাপের সঙ্গে। পুরুষের মনকে যে নারী প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তার নারীত্বের বেশি আর কিছু জানবার আগ্রহ থাকে না মনের। তার বয়স কত, তার ওজন কত—নিরতিশয় অবান্তর প্রসঙ্গ এসব; অনভিভূত মনের বস্তুতান্ত্রিক কৌতূহল। প্রথম দর্শনেই তাকে জ্যাঠা বলে কেন মনে হয়েছিল, তার সঙ্গত কারণ অবশ্য একটা ছিল। চলচ্চিত্রে যেমন একটা ছবিকে অবলুপ্ত করে মুহূর্তের মধ্যে আর একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাকে দেখে তেমনই তার নিষ্পলক চাহনিতে প্রথমে বিস্ময়, তারপর বিদ্রূপ ফুটে উঠেছিল। সেই র্নির্নিমেষ নীরব চাহনিকে ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এই রকম শোনাবে—'তুমিও এলে! অসুস্থ বাবাকে দেখতে এসেছ?'—একটু হাসি, তারপর—'তোমাদের সব্বাইকে ভাল করে চিনি আমি'।

যথাসম্ভব আত্মসম্বরণসহকারে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ আত্মসম্মানটাকে অনাবশ্যক রকম বর্মাবৃত করে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বংশীকে বললাম, কই, স্বর্ণেন্দুর বাবা কোথায়? আমি তো কিছুই শুনি নি! এই অনুযোগটার মধ্যে যে কৃত্রিমতা ছিল, তা আমারও কানে বাজল। বংশী আলোটা এগিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম স্বর্ণেন্দুর বাবাকে। মেঝেতে বিছানা পাতা, তারই ওপর শুয়ে রয়েছেন তিনি, গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা, মুখটুকু খোলা আছে শুধু। মুখের আধখানা মরা, আধখানা জীবন্ত। মরা অংশটা ভাবলেশহীন, চোখের পাতাটা যেন শ্রান্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে জল, ঠোঁটের কোণটা নেমে এসেছে, সমস্তটা মিলে কেমন যেন একটা আত্মসমর্পণের ভাব। বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী যদিও তা মরা নয়, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তা মৃত্যুর বাড়া; বেঁচে আছে, কিন্তু জীবনের বিকাশ নেই। জীবন্ত অংশটা কিন্তু অতিরিক্ত রকম জীবন্ত। চোখের দৃষ্টি প্রখর, অধর-প্রান্তে উদ্ধত অবজ্ঞা, রগের ওপর কুটিল গোটা-দুই শিরা স্পন্দিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত।

অভ্যাসমত নাড়ীটা টিপে দেখলাম। ব্লাড-প্রেসার খুব বেশি বলে মনে হ'ল না। হার্টের খবর নেবার জন্যে সংস্কার-অনুযায়ী স্টেথোস্কোপের অভাব অনুভব করলাম। রগের শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করছে কেন? বৈজ্ঞানিকভাবে ভাববার চেষ্টা করলাম একটু। রোগের ইতিহাস, রক্ত-পরীক্ষা—ডাক্তারী

চিন্তা-পরম্পরাকে স্তব্ধ করে দিয়ে জীবন্ত চোখের দৃষ্টিটা যেন চিৎকার করে উঠল, চোপ রও। জীবন্ত অধরপ্রান্ত উদ্ধত অবজ্ঞায় ব্যঙ্গ করতে লাগল। মরা চোখটা, দেখলাম, মিনতি করছে; অবনমিত মৃত অধর নীরবে বলছে, ক্ষমা করুন। অদ্ভুত ঐকতান!

ঠিক এর পর আমি কি করেছিলাম, কি বলেছিলাম, এর পরও কি করে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে ওয়েটিং-রুমের ইজিচেয়ারে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে করে তার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা সম্ভবপর হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। অস্পষ্টভাবে এইটুকু শুধু মনে আছে, ভদ্রতার হাসিটুকু মুখে ফুটিয়ে রেখে নমস্কার করে আমি উঠে যাচ্ছিলাম—হ্যাঁ, সম্ভবত উঠে বাইরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঠিক যে কি কারণে আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম—হয়তো অকারণেই, হয়তো কাপড়টা আটকে গিয়েছিল চেয়ারটার হাতলে, ঠিক মনে নেই এখন। কিন্তু ফিরে তাকালাম বলেই ব্যাপারটা ঘটতে পারল। ঠিক পর পর ঘটনাগুলো মনে নেই। যে ছবিটা এই সূত্রে মনের মধ্যে ফুটে উঠছে, সেটা এই—বংশী শশব্যস্ত হয়ে বার্নারটা ভাল করে গরম হবার আগেই জোরে জোরে কয়েকবার পাম্প করে স্টোভে তেল উঠিয়ে ফেলেছিল, জলন্ত কেরোসিন তেলের হলদে আলোয় সহসা তার চরিত্রের একটা দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে, অন্তত আমার তাই মনে হ'ল। তেল উঠিয়ে ফেলে বংশী শশব্যস্ত হয়ে উঠল, সে কিন্তু এতটুকু বিচলিত হ'ল না, কেবল ওষ্ঠের চাপে অধর যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল, চোখের কোণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-করুণাদীপ্ত এক ঝলক দৃষ্টি যেন মূর্ত হয়েই অবলুপ্ত হয়ে গেল, আর কিছু নয়। তারপর—ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই আমার—ছোট্ট দু'টি কথা, সরো তুমি। বংশী সরে গেল, সে বসল গিয়ে স্টোভের কাছে। একটু পরেই স্টোভ-সাইলেন্সারের শতছিদ্রপথে মূর্ত হয়ে উঠল আগুনের নীল-কমল, রূপান্তরিত কেরোসিন-শিখা। আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

এর পরেই যে ঘটনাটা মনে আছে, সেটা মর্মান্তিক বলেই মনে আছে, এবং সেটা ঘটেছিল দ্বিতীয় পেয়ালা চা খেতে খেতে। এত বড় মর্মান্তিক আঘাত এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাব—অর্থাৎ ঈশপের একচক্ষু হরিণের দুর্দশা যে আমার কপালেও লেখা ছিল, তা কল্পনা করি নি। চায়ের পেয়ালাটা ছোট ছিল, অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে গেল।

আর একটু নেবেন?

দিন।

প্রথম-পেয়ালা-পর্বের হালকা কথাবার্তায় আড়ষ্টতাটা কমে এসেছিল নিশ্চয়ই, যদিও প্রথম-পেয়ালা-পর্বের সে হালকা কথাবার্তাগুলো যে কি ছিল, তা মনে নেই। খুব সম্ভবত পক্ষাঘাত বিষয়েই দু'চারটে টুকরো আলোচনা, স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে দু'একটা কথা, বংশী অবনীশের উল্লেখ করে বংশী-সুলভ রসিকতার চেষ্টাও করেছিল যেন—অর্থাৎ সেই সব আলোচনা, যার কোন উদ্দেশ্য নেই, মাথামুণ্ড নেই, অর্থও সব সময়ে নেই, যার একমাত্র সার্থকতা অপরিচয়ের অথবা অতিপরিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য আড়ষ্টতাকে সুলঙ্ঘ্য করে তোলা।

দ্বিতীয়বার আমার পেয়ালাটায় চা ঢালতে ঢালতে, চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বললে, আপনি বিদেশী বই অনেক পড়েছেন, নয়?

কিছু কিছু পড়েছি।

আপনার লেখা পড়লে সেটা বোঝা যায়।

এটা নিন্দা, না, প্রশংসা—সেটা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্বেই চিনি, মেশাতে মেশাতে এবং পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মৃদুকণ্ঠে সে আবার বললে, একটা জিনিস বুঝতে পারি না আমি, স্বীকার করেন না কেন আপনারা?

কি?

ইব্‌সেনের পিয়র গিন্ট থেকে আপনি আপনার নাটকে হুবহু খানিকটা নিয়েছেন. কীট্‌সের একটা বিখ্যাত কবিতার সঙ্গেও আপনার একটা কবিতার আশ্চর্য রকম মিল আছে, কিন্তু আপনি ঋণ স্বীকার করেন নি কোথাও। আজকালকার অনেক লেখকই করেন না; আমি ঠিক বুঝতে পারি না, এত বড় শক্তিশালী লেখকদের এ সামান্য দুর্বলতা কেন?

আমার মুখের পানে নির্নিমেষ নয়নে ক্ষণকাল চেয়ে রইল। বংশী বোধহয় বলতে যাচ্ছিল, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক; কিন্তু 'গ্রেট মেন' পর্যন্ত বলেই সে হেসে ফেললে এবং চলকে-পড়া চায়ের প্রবাহে 'থিঙ্ক অ্যালাইক'টা ভেসে গেল।

গুলি খেয়ে একচক্ষু হরিণটা মারা গিয়েছিল।

আমারও মৃত্যু হ'ল।

নির্বাক হয়ে রইলাম আমি।

আপনার লেখা কিন্তু খুব ভাল লাগে আমার।

মনে হ'ল অনেক দূর থেকে ফোনে যেন সে কথা বলছে। ভাল লাগে! নিহত হরিণটার মাংসও নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল সেই শিকারীর।

হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম।

শুনলাম, আমি বলছি, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে, বুঝলেন কিনা, অনেক জিনিস—

ও, তাই নাকি ?

ঠিক এর পরের মুহূর্তেই আমার সমস্ত সত্তা আমার দৃষ্টিপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তার আনমিত মুখের দক্ষিণ অংশটুকুতে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল মখমল-কোমল কালো রঙের নিবিড় অন্ধকারে। কয়েকটি আবিষ্ট মুহূর্ত।

তারপর যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, তখন দেখলাম, একটা অজুহাত পেয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে প্লাট্‌ফর্মের দিকে ছুটছি। প্লাট্‌ফর্মে একটা সোরগোল উঠেছে, টেন এসেছে একটা।

লোকে লোকারণ্য। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্‌', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্‌' চিৎকারের উপলক্ষ্য খদ্দর-পরিহিত মাল্যভূষিত ব্যক্তিটি ফার্স্ট' ক্লাস থেকে নামলেন। মক্কেলহীন এই উকিলটি সকলেরই পরিচিত। ডেমোক্রেসি-যন্ত্রের নানা চাকায় নানা তৈল, যেখানে যেটির প্রয়োজন, নিপুণভাবে নিষেক করতে পারলে ভাগ্যচক্র যে উন্নতিপথে ঘর্ঘর-শব্দে ছুটে চলবার যোগ্যতা লাভ করে, ইনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম প্রথম ইনি দেশসেবার খুচরো কারবার করতেন, এখন পাইকারী ব্যবসা খুলেছেন—বচন, বুদ্ধি আর খদ্দর এই মূলধন নিয়ে। ভিড় চলে গেল, ট্রেন চলে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও, তাই নাকি ?

কানের পাশে আবার গুঞ্জন করে উঠল কথাগুলো। সহসা নিজেকে ওই মাল্যভূষিত চোরটার সগোত্র বলে মনে হ'ল। বসে পড়লাম। রঙিন শতরঞ্চিখানা প্রসারিতই ছিল, শিয়রে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা বিছানা, পাশে নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। চোখ বুজে বিছানাটায় ঠেস দিলাম, ভারি নিঃস্ব মনে হতে লাগল নিজেকে। চুরি ধরা পড়েছে ক্ষতি নেই, কিন্তু ওর কাছে! তখন কে জানত যে, চোরাই-মাল-সমেত ওকেও ধরা পড়তে হবে একদিন আমার কাছে! কিন্তু না, জিনিসটা ঠিক তা নয়, ও ধরা পড়ে নি, ধরা দিয়েছিল।

আকাশ-পাতাল তফাত যে! আমি হয়তো সারারাত তেমনি ভাবেই বসে থাকতাম, যদি না টেলিগ্রাফ-পিওনটা এসে বংশীর খোঁজ করত। বংশীর নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। ওয়েটিং-রুমের দরজাটা একটু ফাঁক করে ডাকলাম বংশীকে। বংশী বেরিয়ে এসে টেলিগ্রাম খুলে দেখলে, তারপর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, জ্যোতির্ময়দা টেলিগ্রাম করেছেন—Missed train. Following in a taxi. Inform Ratri. Wait for me.

দরজার পাশে দেখলাম, রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে।

চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ৪ ॥

দিল্লী এক্সপ্রেসে যখন স্বর্ণেন্দু এল, তখন আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। বংশীর ডাকে উঠে বসে সামনে দেখলাম, একমাথা রুক্ষ চুল, একমুখ রুক্ষ গোঁফ-দাড়ি, আর ময়লা-জামা-কাপড়-ক্যাম্বিসের-জুতো পরা এক ব্যক্তি আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। কক্ষনও এ স্বর্ণেন্দু নয়। আমাদের সঙ্গে যে রোগা লাজুক ছেলেটি পড়ত, সে এই! আমি উঠে দাঁড়াতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে ঘনশ্যাম, তুই! আর কিছু বলতে পারলে না সে।

স্বর্ণেন্দু ঘণ্টা দুই ছিল বোধহয়। কিন্তু এই দু'ঘণ্টার অধিকাংশ সময়ই সে আমার কাছে ছিল। এসেই মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার ওয়েটিং-রুমের ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর বরাবর আমার কাছেই ছিল। শুনলাম, মাকে আনতে সে মথুরা গিয়েছিল, কিন্তু মা এলেন না। সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আসতেই চান না নাকি তিনি। একটু ম্লান হেসে স্বর্ণেন্দু বললে, মায়ের মাঝে মাঝে ওই রকম ধর্মবাই চাগে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সরে পড়েন তিনি, আবার কিছুকাল পরে ফিরে আসেন, আবার চলে যান। বাবার পক্ষাঘাত হয়ে আরও সুবিধে হয়েছে তাঁর। আসল কথা কি জানিস? ওয়েটিং-রুমের দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, রাতুই আসল কারণ। ওর বিয়ে নিয়েই তাই যত গোলমাল। মা একটু—মানে, আজকালকার স্বাধীন মতামতগুলো পছন্দ করেন না। তাই বা বলি কি করে? একটু থেমে, ছোট্ট একটু হেসে বললে,

মানে, আমাদের সঙ্গে তর্কে না পেরে রাগারাগি করে শেষকালে পালিয়ে যান।

কোথা যান ?

কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ—যখন যেখানে তাঁর গুরুদেব থাকেন। তাঁকে খবর দিলেই গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন।

একটু খটকা লাগল।

গুরুদেব গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন ?

হ্যাঁ। মাকে তুই দেখিস নি কখনও, অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ মা। মাঝে মাঝে দেবতার ভর হয় তাঁর ওপর।

দেবতার ভর হয় ?

না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ভারি অদ্ভুত কিন্তু।

মায়ের গল্প শেষ করে স্বর্ণেন্দু নিজের বেকার জীবনের ইতিহাস শুরু করলে। কত রকম ভাবে চেষ্টা করে সে কত রকম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তারই বর্ণনা। দু' ঘণ্টা ধরে নানা ছন্দে একই কাহিনী শুনলাম। তার সব কথা মনে নেই ; কিন্তু এটা বেশ মনে আছে, স্বর্ণেন্দুকে সেদিন যেন নূতন রূপে দেখলাম। লাজুক রোগা স্বর্ণেন্দু আমাদের সঙ্গে পড়ত, এ যেন সে নয়,—এ যেন তার থেকেই উদ্ভূত অন্য আর একজন।

প্রায় বছর দশেক আগে একবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন মামার বাড়ির চেহারা ছিল—তকতকে ঝকঝকে উঠোন, উঠোনের এক কোণে বাঁশের মাচায় কচি শসা ঝুলছে, দক্ষিণ দিকে মাটির দেওয়াল বেয়ে ঝিঙেলতা উঠেছে—তাতে অজস্র ঝিঙেফুল, দাঁড়ে টিয়াপাখি চোখ পাকিয়ে হরিনাম শোনাচ্ছে সবাইকে, রান্নাঘরের দাওয়ায় মামীমা তাঁর নিজস্ব ছোট উনুনটার ধারে বসে কখনও পাটিসাপটা, কখনও সন্দেশ, কখনও ক্ষীরপুলি তৈরী করছেন। মামারা এখন শহরে, বাড়িতে কেউ নেই। মাস-দুয়েক আগে একটা কার্যোপলক্ষ্যে আবার সেখানে গিয়েছিলাম আমি। বাড়িটার আর এক রকম চেহারা দেখে এলাম। উঠোনে একহাঁটু জঙ্গল—কচু, ঘেঁটু, মনসা, আপাং, শেয়ালকাঁটা আরও কত রকম গাছ গজিয়ে ছেয়ে ফেলেছে উঠোনটাকে। গিরগিটি, ছাতারে পাখি নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রী যে নেই তা নয়, কিন্তু নূতন রকম শ্রী।

স্বর্ণেন্দুকে দেখে মামার বাড়ির ছবি দুটো পর পর চোখের ওপর ভেসে

উঠেছিল সেদিন। আগে যে কথাই বলত না, সে বাক্যবাগীশ হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত বকে চলেছে।—

বুঝলি ভাই, দরখাস্ত নিয়ে তো গেলাম লোকটার কাছে, সে আমাকে মুখে একেবারে স্বর্গে তুলে দিলে, বুঝলি ভাই, বললে, ফার্স্ট ক্লাস এম. এ. যখন তুমি, তখন তোমার আর ভাবনা কি, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, আমি প্রাণপণে রেকমেণ্ড করব তোমাকে। ও হরি! শেষকালে শুনলাম, সবাইকেই ওই কথা বলেছে লোকটা, আসলে ঘুষ না দিলে কিছু করবে না।

এমন অদ্ভুত একটা ছোট্ট হাসি হেসে স্বর্ণেন্দ্ আমার মুখের পানে চাইলে, যার অর্থ—সত্যি সত্যি ঘুষ দিয়ে তো আর চাকরি নেওয়া যায় না, সুতরাং সরে পড়তে হ'ল।

ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং—

যে এঞ্জিনটা এতক্ষণ শ্‌শ্‌ করছিল, সেটা মাল-গাড়ি শান্ট করছে। খানিকক্ষণ বোধহয় ট্রেন আসার সম্ভাবনা নেই, আপ-ডাউন-ভাষী বাবুটি কার্বন-পেপারের ওপর পেন্সিল পিষে চলেছেন। কুলিগুলো সার সার শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তারপর বুঝলি, চাকরির চেষ্টা ছেড়েছুড়ে দিয়ে একটা দোকান করলাম। প্রথম প্রথম বেশ চলল কিছুদিন, বাঙালীরা সব্বাই আমার দোকান থেকে জিনিসপত্তর কিনতে লাগল, কিন্তু ক্যাপিটাল বেশি ছিল না, শেষ পর্যন্ত চালাতে পারলাম না, ভয়ানক কম্‌পিটিশন ভাই, বুঝলি?

আবার সেই ছোট্ট ধরনের হাসি হেসে ভয়ানক কম্‌পিটিশনের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সে নিরস্ত হচ্ছিল। আমি বললাম, বাঙালীরা সবাই কিনতে লাগল, অথচ দোকান চলল না—তার মানে?

স্বর্ণেন্দু একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, অর্থাৎ আসল কথাটা ব্যক্ত করতে তার নিজেরই যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। তার গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে সেকেলে কালের লাজুক স্বর্ণেন্দু যেন ক্ষণিকের জন্যে আত্মপ্রকাশ করলে।

মানে, বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো, সবাই প্রায় ধারে কিনত, সব সময়ে ক্রেডিট-মেমোতে সইও করত না, আর ক্রেডিট-মেমোতে সই করলেও কি আর আমি নালিশ করতে পারতাম? অনেকে বাবার বন্ধু, অনেকে আমার বন্ধু, সবাই প্রায় আপনা-আপনি, কিনতে এলে চক্ষুলজ্জার জন্যে 'না' বলতে পারতাম না, মানে, আমাদের বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো? একটু হেসে

সে এমনভাবে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলে, যেন সে সমস্ত বাঙালী জাতির হয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

আমি ওর কথা শুনছিলাম না যে তা নয়, কিন্তু শোনার চেয়ে বেশি দেখছিলাম আমি ওকে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর ছোট ছোট হাসির টুকরো, ওর রুক্ষ চুল দাড়ি গোঁফ, ওর আদর্শবাদ, ওর সত্যনিষ্ঠা, ওর অসহায় ভঙ্গী— সবটা মিশিয়ে নতুন ধরনের স্বর্ণেন্দু। এখন বুঝতে পারছি, বেকার-জীবনের শত লাঞ্ছনার মধ্যেও হাসিমুখে টিকেছিল সত্যনিষ্ঠার জোরে। সম্ভবত একবার মাত্র মিথ্যে কথা ও জীবনে বলেছিল এবং বলবার পর আর বেঁচে থাকে নি।

ইন্সিওরেন্সের দালাল হয়ে কিছুদিন ঘুরলাম, কিন্তু ও আমার পোষাল না ভাই, বড্ড বেশি মিথ্যে কথা বলতে হয়, তা ছাড়া খোশামোদও করতে হয় ভয়ানক—কম্পানির খোশামোদ কর, পাব্লিকের খোশামোদ কর, ডাক্তারের খোশামোদ কর—দেশের অধিকাংশ লোকই রুগ্ন, তাদের সুস্থ বলে চালাতে হবে তো! তুই তো নিজে ডাক্তার, তোকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে হয় এই নিয়ে মাঝে মাঝে, বুঝতেই পারছিস।

আবার সেই অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি, যার অর্থ—মিথ্যে কথা বলে বলে তো আর টাকা রোজগার করা যায় না, সুতরাং সরে পড়তে হ'ল। স্বর্ণেন্দু চুপ করলে।

একটার পর একটা—অনেক কাহিনী শুনলাম, প্রত্যেক কাহিনীর শেষেই 'সুতরাং সরে পড়তে হ'ল'-ব্যঞ্জক হাসি।

তোদের চলছে কি করে তা'হলে?

অভদ্র এই প্রশ্নটা আমার জিভ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল।

বাবার পেন্‌শন। বাবার মৃত্যু হলেই আমাদের মৃত্যু। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি তাই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে। কলকাতায় অবশ্য ছোটখাট বাড়ি আছে আমাদের একটা, কিন্তু সেটা এমন জায়গায় যে, তার ভাড়াটেই জোটে না।

আবার হাসলে স্বর্ণেন্দু এবং আমার মনে যে অভদ্রতর প্রশ্নটা উঁকি দিচ্ছিল, অজ্ঞাতসারেই তার জবাবও দিয়ে দিলে।

ভাগ্যে অবনীশ কিছু টাকা দিয়েছে, আর জ্যোতির্ময়ের একটা বাড়ি আছে মধুপুরে, তাই বাবাকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে পারছি, তা না হলে বাবার পেন্‌শনে এত সব কুলোয় কি?

অবনীশই বা কে, জ্যোতির্ময়ই বা কে ?

দু'জনেই আমার বন্ধু। অবনীশ বোম্বেতে বিজ্‌নেস করে, বেশ দু'পয়সা করেছে। জ্যোতির্ময় একজন আর্টিস্ট।

ও।

বংশী চা দিয়ে গেল। বংশী ঠিক চাকরের মত খাটছে দেখলাম। বংশী চলে যেতে স্বর্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, বংশী তোদের সঙ্গেই থাকে বুঝি বরাবর ?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে। ওর বাপ মা কেউ নেই. আমার বাবাই মানুষ করেছেন, ওকে বি এ পাস করবার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছেন বাবা ! কিন্তু কিছুতেই ও পাস করতে পারলে না।

বংশীর সম্বন্ধে এই অপ্রীতিকর উক্তিটা করে স্বর্ণেন্দুর মনে বোধহয় ঈষৎ ক্ষোভ হ'ল, একটু হেসে বলল, এক-একজনের পরীক্ষা পাস করবার 'ন্যাক' থাকে না, বংশী এদিকে বেশ ইয়ে আছে।

নীরবেই দু'জনে চা-পান শেষ করলাম।

স্বর্ণেন্দু নিজের প্রসঙ্গ শেষ করে আমাকে নিয়ে পড়ল।

তুই কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস করিস কোন্‌খানটায় ?

বেনেটোলায়।

বেনেটোলার ধরণীবাবুকে চিনিস ? বেনেটোলায় আমার দূর-সম্পর্কের একজন ভগ্নীপতিও থাকেন—নিখিল চৌধুরী, উকিল।

কাউকেই চিনি না আমি।

এবার গিয়ে আলাপ করিস।

ঠিকানা দিয়ে দিলে স্বর্ণেন্দু।

বেনেটোলায় কি ওঁদের নিজেদের বাড়ি ?

ধরণীবাবুর নিজের বাড়ি, নিখিলদা ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, অনেক দিন ধরে আছেন ওই বাড়িতে। বেশ লোক।

আচ্ছা, এবার গিয়ে আলাপ করা যাবে।

নম্বর দুটো টুকে নিলাম।

চমৎকার লিখছিস আজকাল ভাই তুই কিন্তু। রাতু তো তোর লেখার ভয়ানক 'অ্যাড্‌মায়ারার'।

লক্ষ্য করলাম, 'ভয়ানক' কথাটা ভয়ানকভাবে ব্যবহার করে স্বর্ণেন্দু। রাতু

আমার লেখার ভয়ানক অ্যাড্‌মায়ারার শুনেই বোধহয় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে ফেললাম, ওর বিয়ের একটা কিছু ঠিক করে ফেল্‌ এবার। আমিও চেষ্টায় থাকব। মেয়ের বিয়ে আজকাল একটা সমস্যা।

রাতুর বেলায় সমস্যা হ'ত না, মা যদি না অবুঝ হতেন। মায়ের মাথায় যে কি ঢুকেছে, তা বলতে পারি না। জ্যোতির্ময় মানে, আমার আর্টিস্ট বন্ধুটি, ওকে এখুনি বিয়ে করতে রাজি, কিন্তু মা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না; আর মায়ের মত না পেলে জ্যোতির্ময় বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। মায়ের পছন্দ অবনীশকে।

কেন?

অবনীশ দু'পয়সা রোজগারও করে, তা' ছাড়া একটু ধার্মিক-গোছের, মায়ের আরও পছন্দ সেইজন্যেই বোধহয়।

অবনীশ রাজি নয় বুঝি?

অবনীশ রাজি আছে। আমরা, মানে, আমি মত দিই নি।

কেন?

ঝাঁকড়া গোঁফ-দাড়ি সত্ত্বেও লাজুক স্বর্ণেন্দু পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলে, তারপর তৎক্ষণাৎ ছোট্ট একটু হেসে সামলে নিলে লজ্জাটা। তারপর উকিলরা যেমন আসামীর পক্ষ নিয়ে বলে, তেমনই ভাবে বলতে লাগল, রাতু বেচারা মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে বলে কি তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ থাকতে নেই? নিজে সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বললে না বলে সব জেনে-শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না? আমি জানি—

এইটেই স্বর্ণেন্দুর লজ্জার কারণ সম্ভবত, কিন্তু সেটা খুলে বললে না সেদিন। একটু থেমে শুধু বললে, অবনীশটা নিরামিষ খেয়ে, সন্ধ্যাহ্নিক করে আর বার বার টাকা পাঠিয়ে মাকে হাত করেছে। মা এক রকম কথাই দিয়েছেন তাকে। অথচ আসল কথাটা জেনে কি করে আমি—

মুচকি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

একটু পরে আর একটু মুচকি হেসে বললে, এই যে রাতদুপুরে জ্যোতির্ময় ট্যাক্‌সি হাঁকিয়ে ছুটে আসছে—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গেল স্বর্ণেন্দু, হঠাৎ খুব যেন গম্ভীর হয়ে পড়ল, হঠাৎ যেন লাজুক স্বর্ণেন্দুকে আড়াল করে আদর্শবাদী ভাবুক স্বর্ণেন্দু

ভ্রুকুঞ্চিত করে ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌নালের লাল আলোটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ সেই অদ্ভুত ছোট্ট হাসিটা হেসে কি একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল, থেমে গিয়ে অপ্রতিভ হ'ল একটু।

তোর মা জ্যোতির্ময়ের ওপর চটা কেন?

ঠিক উলটো। ভয়ানক ভালবাসে মা ওকে, অবনীশের চেয়ে বেশি ভালবাসে, কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি নয় কিছুতেই।

কেন, গরিব বলে?

জ্যোতির্ময় খুব গরিব নয়, মধুপুরে বাড়ি আছে, কলকাতায় বাড়ি আছে, ছবি একে রোজগারও করে কিছু। কিন্তু হলে কি হবে, ভয়ানক উড়নচণ্ডে, বেপরোয়া, খামখেয়ালী।

তোর সঙ্গে আলাপ হ'ল কি করে?

মা-ই ওকে আবিষ্কার করেন প্রথমে কাশীতে। মায়ের মুখ থেকেই শুনেছি, ওর বাবা নাকি মায়ের গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন। জ্যোতির্ময় হবার পর ওর মা মারা যান, কিছুদিন পরে বাবাও। মায়ের গুরুদেবই জ্যোতির্ময়কে মানুষ করেছেন। জ্যোতির্ময়ের যে সম্পত্তি গুরুদেবের কাছে গচ্ছিত ছিল, সে সব জ্যোতির্ময় বড় হবার পর জ্যোতির্ময়কে দিয়েছেন তিনি।

চনন‍ং চনন‍ং চনন‍ং—

আমার ট্রেন এসে পড়ল, কুলিটা এসে দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি শতরঞ্চি গুটিয়ে উঠে পড়লাম। 'চিঠি দিস মাঝে মাঝে'—কলরবের মাঝে স্বর্ণেন্দুর কথাগুলো এখনও শুনতে পাচ্ছি যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজায় নীরবে রাজি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ পাখাটা বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য গরম। একটা দমকা হাওয়ায় তপ্ত ধুলোগুলো ঘুরপাক খেয়ে উড়ছে। বুড়ো মুচী আর কইলু ইতর ভাষায় কলহ শুরু করে দিয়েছে। লোম-ওঠা কুকুরটা ধুঁকছে রাস্তার এক ধারে বসে। একটা টমটমের সঙ্গে একটা সাইকেলের ধাক্কা লেগে গেল। ছিটকে পড়ল সাইকেলের ছোকরা, তারই দোষ, সে হাত ছেড়ে দিয়ে বাহাদুরি করতে করতে যাচ্ছিল। টমটমওয়ালা ছুট দিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে কতকগুলো লোক ছুটল তাকে ধরতে। ঝগড়া ভুলে বুড়ো মুচী আর কইলুও ছুটল। কি অদ্ভুত আবহাওয়া! আজ আর লিখব না। সুর কেটে গেছে। আর একদিন শুরু করা যাবে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

কিছুক্ষণ আগে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

পৃথিবী সামান্য একটু ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয় নি। ছানা কেটে গেলে দুধ যেমন দেখতে হয়, খোবা খোবা ছানার ফাঁকে ফাঁকে সবুজাভ ছানার জল যেমন দেখা যায়, এক পসলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশের অবস্থা অনেকটা তেমনই হয়েছে। ফাটা মেঘের মাঝে মাঝে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেদুর জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক আবিষ্ট। মেঘমুক্ত পূর্ণিমারাত্রির শোভা নয়, আবছা অর্ধস্ফুট মাধুরী। দেওয়ালের ওপাশে সদ্যস্নাত হাসনুহানার ঝাড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেছে, টের পাচ্ছি। খোলা আকাশের নীচে বসে আছি, কিন্তু মশারির ভেতরে। ভয়ানক মশা। এমন রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে। পাশে কোন সঙ্গিনী থাকে তো ভালই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। বস্তুত সশরীরে না থাকাটাই বোধহয় বেশি বাঞ্ছনীয়, অনায়াসে কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে, নীলাম্বরী তন্বী একজন বসে আছে পাশে। সেই কল্পনাসঙ্গিনী আর যা-ই করুক, কথা বলে রসভঙ্গ করবে না।

কিন্তু এসব কিছু না করে লণ্ঠন জেলে আমি লিখতে বসলাম। স্বর্ণেন্দু এসে ভর করেছে। এই মেঘমেদুর জ্যোৎস্নার মধ্যে স্বর্ণেন্দু প্রচ্ছন্ন হয়ে এসেছে কি-না কে জানে!

কলুটোলার মোড়ে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখাটার কথা মনে পড়ছে।

মশারির বাইরে রক্তপিপাসু অসংখ্য মশা চিৎকার করে তাই করছে, প্রচলিত ভাষায় যাকে গুঞ্জন বলে। এই রক্তলোভী মশার দল কোন মন্ত্রবলে হঠাৎ যদি মালপোলোভী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীতে রূপান্তরিত হয়ে সবিনয়ে আমাকে বলে, আপনাকে একটা কীর্তন শোনাতে এসেছি আমরা, দয়া করে মশারিটি তুলে বসুন, তা হলে আমি যত আশ্চর্য হয়ে যাই তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন স্বর্ণেন্দুর হাতে টকটকে লাল খাপে ঢাকা চকচকে ছোরাখানা দেখে। অথচ ভেবে দেখলে ব্যাপারটা এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। মানুষের হাতেই তো ছোরা থাকে। আসলে সেদিন শেষরাত্রে প্লাটফর্মের ওপর বসে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম, তার মধ্যে ছোরার সম্ভাবনা

ছিল না। রজ্জু সহসা সর্পে রূপান্তরিত হলেই আমরা চমকাই। একটু পরেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে, রজ্জুতে আমার সর্পভ্রম হয়েছে, রজ্জু ঠিক রজ্জুই আছে। কিন্তু ওই ভ্রমের মধ্যেও যে একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল, সেদিন তা বুঝি নি।

ধরণীবাবুর কথাগুলো মনে পড়ছে—ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশাই, ওরা বাঙালী নয়, আলাদা জাতের লোক। ধরণীবাবু লোকটি অবশ্য নিখাদ বাঙালী। চাকরি করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, পরনিন্দা করেন, দোল-দুর্গোৎসব করেন, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রে 'লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ' ছাপান, লৌকিকতা গ্রহণ করেন তা সত্ত্বেও, দেনও; বাড়িতে শাক-চচ্চড়ি খেয়ে বাইরে সশব্দে উদ্গার তুলে মুখবিকৃতি করে বলেন, রিচ ফুড আর হজম হয় না মশাই। ভুঁড়ি আছে, টাক আছে, অষ্টধাতুর আংটি আছে, হুঁকো আছে, বাড়িতে ন'হাতি কাপড় পরে মিতব্যয়িতা এবং সকালবেলা টুকটুক করে হেঁটে স্বাস্থ্যচর্চা করেন। আলাপ হবার পর থেকে এই প্রাতভ্রমণের মুখে মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় এসে চা-পান করতেন, এবং সেই সময়ই স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে আলোচনা চলত। স্বর্ণেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই কারণে, যে কারণে নাকি, তাঁর ভাষায়, 'দুটো কুকুরের মধ্যেও বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব'—অর্থাৎ দায়ে পড়ে। চাকরির ঘূর্ণাবর্তের টানে দু'জনেই এমন স্থানে গিয়ে পড়েছিলেন, যেখানে তৃতীয় কোন বাঙালী ছিল না। সুতরাং বন্ধুত্ব হয়েছিল, ধরণীবাবু এটাকে বন্ধুত্বই বলতেন, যদিও তাঁর কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা যেত যে, এ বন্ধুত্বের মধ্যে যে বন্ধন ছিল, তা আত্মার নয়—স্বার্থের। ধরণীবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর পাল্লায় পড়েই নাকি তামাক খেতে শিখেছিলেন, অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি, কারণ পূর্ণেন্দুবাবু বন্ধু হলেও তাঁর ওপরওলা অফিসার ছিলেন।

বাঙালী বলেই যেতে হ'ত—ধরণীবাবু বলতেন,—সায়েবী ধাতেরই হোক আর যা-ই হোক, বাঙালী তো, নাড়ীর যোগ আছে একটা। নাড়ীর টানে যেতাম, কিন্তু আলাপ জমত না। পূর্ণেন্দুবাবু ঢিলে পাজামা পরে আর পাইপ কামড়ে যে-সব গল্প জুড়তেন, তা এমন বিদঘুটে যে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। এই ধর না, একদিন সাফ্রাজেট্‌সদের নিয়েই খুব বক্তৃতা শুরু করলেন। কি করব! সায় দিয়ে যেতাম। একদিন বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার মুখের পানে। তারপর বললেন, তামাক ধর তুমি।

ধরণীবাবুর কথায় আমিও মুচকি হেসে সায় দিতাম। আমি ডাক্তার, ব্যবসার খাতিরেই আমাকে মুচকি হেসে সায় দেওয়াটা শিখতে হয়েছিল। মুচকি হাসির সায় পেয়ে ধরণীবাবুর মনের দরজাটা আরও খুলে যেত, অনর্গল বলে যেতেন তিনি এদের কথা। তবে সমস্ত কথা যে তিনি বলেন নি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরে।

কলুটোলা স্ট্রীট যেখানে এসে কলেজ স্ট্রীটে মিশেছে, সেইখানেই হঠাৎ স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ছে, ঠিক সেই সময় মেডিকেল কলেজের গেট থেকে একটা মড়াকে কাঁধে নিয়ে হরিধ্বনি করতে করতে জনকয়েক লোক কলুটোলার মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল, ঠিক ওই মোড়ের কাছাকাছি আপাদমস্তক পেতলের বালা-পরা যে উড়েনীটা ফুটপাথে শুয়ে থাকত, তার কাছে মোটা-গোছের একজন বাবু উবু হয়ে বসে কিছু খাবার নিগে তাকে খাওয়াবার জন্যে সাধ্য-সাধনা করছিলেন (উড়েনীর সম্বন্ধে নানা রকম গুজব প্রচলিত ছিল—কেউ বলত, ও নাকি তন্ত্রসিদ্ধ যোগিনী, কেউ বলত, স্পাই; কেউ বলত, পাগল)। হার্ডিঞ্জ হস্টেলের ওপরতলা থেকে কে যেন গাইছিল—'কে যাবি পারে'। আমি এসপ্লানেডের ট্রাম থেকে নেবে হার্ডিঞ্জ হস্টেলের দিকেই যাচ্ছিলাম আমার মামাতো ভাই হারাধনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে; তখনও ঠিক সন্ধে হয় নি, এজরা হস্পিটালের পেছন দিকের গাছগুলোতে অসংখ্য কাকের ডাকাডাকি শুনে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ নজরে পড়ল, স্বর্ণেন্দু চলেছে ওপারের ফুটপাথ দিয়ে। মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে, এমনভাবে চলেছে—যেন তার আশেপাশে আর কেউ নেই, যেন সে আর তার সমস্যা ছাড়া অন্য সব কিছু অনাবশ্যক, এত অনাবশ্যক যে—তাদের দিকে ফিরে চেয়ে তাদের অস্তিত্বটুকু স্বীকার করবার মতও বাড়তি সময় যেন নেই তার।

স্বর্ণেন্দু!

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আমাকে দেখতে পেল না, সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কলুটোলার ফুটপাথে কাক-কলরব-মুখরিত আসন্ন সন্ধ্যায় তার চোখের বিস্মিত সেই দৃষ্টি এখনও আমি যেন দেখতে পাচ্ছি।

এগিয়ে গেলাম।

ও, তুই ঘনশ্যাম!

একটু ছোট্ট হাসি, তারপর কলুটোলার ফুটপাথে তার আকস্মিক

আবির্ভাবের জন্য সলজ্জ একটু জবাবদিহি—একটা চাকরির চেষ্টায় এসেছিলাম ভাই, সিটি কলেজে একটা লেকচারারের পোস্ট খালি ছিল—। একটু থেমে বললে, হ'ল না. লোক ঠিক হয়ে গেছে। তারপর এমন হাসি-ভরা চোখে সে চেয়ে রইল, যেন স্বর্ণেন্দু নামক বেকার যুবকের চাকরির জন্যে এই হাস্যকর ছটফটানিটা সে নিজে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে।

তোর হাতে ওটা কি ?

খবরের কাগজের মোড়কটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল খাপে ঢাকা বাঁকা ছোরাটা।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম আমি।

কিনলি নাকি ?

না। এটা ফার্নান্‌ডিজ রাতুকে জন্মদিনে উপহার পাঠিযেছে। আমাদের এখানকার ঠিকানায় পড়ে ছিল, নিযে যাচ্ছি।

ফার্নান্‌ডিজ কে আবার ?

বাবা যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন, ফার্নান্‌ডিজ তখন আমাদের ড্রাইভার ছিল। প্রতি বছর রাতুর জন্যে একটা না একটা কিছু পাঠায়।

স্বর্ণেন্দুর চোখ দুটো সহসা যেন স্বপ্নাতুর হয়ে এল। বলতে লাগল, তখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, তবু তার চেহারাটা একটু একটু মনে আছে এখনও। লম্বা-চওড়া কালো-কুচকুচে চেহারা। একটু থেমে বললে,—হাবসী ক্রিশ্চান। খুব ভালবাসে রাতুকে, ও বাহাল হবার বছর দেড়েক পরে রাতুর জন্ম হয়, মানে রাতুকে জন্মাতে দেখেছে বলেই বোধহয়—। ছোট্ট হাসিটি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

খুলে দেখলাম। খাপ থেকে খুলতেই চকমক করে উঠল। স্বর্ণেন্দুর মুখখানা ছোরাটার শাণিত ফলকে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠল একবার। মোড়ের ঘড়িটার দিকে চেয়ে স্বর্ণেন্দু বললে, ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই, চললাম ভাই।

মধুপুরেই ফিরে যাচ্ছিস ?

হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়বাবু এসেছেন ?

সেই দিনই তো ট্যাক্সি করে এসে পড়ল , তুই চলে যাবার একটু পরেই।

বাবা কেমন আছেন ?

ভেবেনিই।

ঘাড় নেড়ে হেসে স্বর্ণেন্দু চলে গেল।

॥ ২ ॥

তাড়াতাড়িতে স্বর্ণেন্দুকে তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, তার দূর-সম্পর্কের ভগ্নীপতি নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে শুধু আলাপ নয়, বেশ একটু মাখামাখি হয়েছে আমার। মাখামাখি হবার একটা স্থূল আধিভৌতিক কারণও ঘটেছিল। বিপত্নীক নিখিল চৌধুরীর কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড কাহার চাকর চামেলির রন্ধন-পটুতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার গোকুলচন্দ্র যে মাংস রাঁধতে পারে না তা নয়, কিন্তু খুব ভাল করবার আগ্রহাতিশয্যে ধনে-হলুদ-আদা-জিরে-দই-পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কার সম্মিলনে যে বস্তু সে প্রস্তুত করে, তা শুধু যকৃতের নয়, রসিকের পক্ষেও দুষ্পাচ্য। ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণ ওই চামেলির রান্নার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তা মসলার নয়—ওর নিজের বৈশিষ্ট্য। সুস্বাদটারই প্রাধান্য, উপকরণের নয়। একটা কথা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগে, এই চামেলি না থাকলে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপটা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ত না এবং এই উপাখ্যানের অনেকখানিই হয়তো আমার অগোচরে থেকে যেত।

সেদিন সকালে গোটা-চারেক বুনো হাঁস কিনেছিলাম। হৃষ্টপুষ্ট গোটা-চারেক 'লালসর'। খাবার জন্যেই যখন কিনেছিলাম, তখন তাদের মৃত্যু অনিবার্য। সহসা মনে হ'ল, গোকুল রান্না করলে এ মৃত্যু শোচনীয়ও হয়ে উঠবে। দিলাম পাঠিয়ে সেগুলো নিখিল চৌধুরীকে। সদ্গতি হবে।

হার্ডিঞ্জ হস্টেলে হারাধনের সঙ্গে দেখা সেরে ফিরে এসেই নিখিলবাবুর চিঠি পেলাম—

ঘনশ্যামবাবু,

লালসর শুধু বন্য হংস নহে, পরম হংস। এই কলিকাতা শহরে মহাভাগ্যবলে দৈবাৎ ইহাদের দর্শনলাভ ঘটে। আপনার উদারতার জন্য গদগদকণ্ঠে সাধুবাদ জানাইয়া নিবেদন করিতেছি, আপনি শীঘ্র আসুন, চামেলি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

নিখিল চৌধুরী

না উড়লে নীলকণ্ঠ পাখির নীল-বর্ণসম্পদ যেমন সম্যকরূপে নয়নগোচর হয় না, একটু উত্তেজিত না হ'লে তেমনই আসল নিখিল চৌধুরীকে চেনা যায় না। সেদিন সন্ধ্যায় আহারাদির পূর্বেই খোলা ছাদে ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে স্বর্ণেন্দুর কথা আলোচনা করতে করতে নিখিল চৌধুরী একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এক নজর আমার পানে চেয়ে হাতির দাঁতের নস্যদানিটা থেকে বড় এক টিপ র-ম্যাড্রাসী নস্যি বার করে একটু হেঁট হয়ে ঘন ঘন নাকের ছিদ্র দুটো বোঝাই করে নিলেন।

তারপর নাকের আশেপাশে-লাগা নস্যিটা না ঝেড়েই ঈষৎ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কিছুই জানেন না আপনি।

বুঝলাম, নিখিল উত্তেজিত হয়েছেন। কারণ আমি যে কিছু জানি—এ দাবি আমি মোটেই করি নি। স্বর্ণেন্দুকে উপলক্ষ্য করে যে কথোপকথন শুরু হয়েছিল, তা স্বর্ণেন্দুতেই নিবদ্ধ ছিল না, রাত্রিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল এবং সেই আবর্তের মুখে আমি কেবল আমার সরল বিশ্বাসটুকুই ব্যক্ত করেছিলাম—কালো হলে কি হয়, চমৎকার দেখতে মেয়েটি! এ কথা শুনে প্রথমটা কিছু বলেন নি নিখিলবাবু, কিন্তু দ্বিতীয়বার এ কথা বলতেই নস্যি নিয়ে উক্তিটি করলেন।

আমি পুনরায় বললাম, চমৎকার নয়?

আবার এক টিপ নস্যি তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ করে কটমট করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার পানে, তারপর সশব্দে সেটা নাসারন্ধ্রে টেনে নিয়ে নাকের আশেপাশের নস্যিগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মনে হ'ল যেন অস্ফুট-কণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর! তারপর আমি কিছু বলবার আগেই স্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলেন, চেকভ না শেকভ—উচ্চারণ ঠিক জানি না, তাঁর লেখা 'ডার্লিং' আপনি পড়েছেন?

পড়েছি।

আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেয়া' না 'থেস' উচ্চারণ ঠিক জানি না, পড়েছেন?

পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'?

পড়েছি।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কুচকুচে কালো লম্বা একটা বাঘিনী আছে, দেখেছেন?

দেখেছি।

অমাবস্যার অন্ধকার দেখেছেন একা মাঠে দাঁড়িয়ে কখনও ?

দেখেছি।

চকচকে তলোয়ার দেখেছেন ?

দেখেছি।

চুম্বক ?

দেখেছি।

তা'হলে এই সমস্তগুলির আত্মাকে আকাশের মত বিরাট একটা কটাহে একত্রিত করে কোন জলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর চাপিয়ে ডিস্‌টিল করতে থাকুন কল্পনায়।

তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, করছেন ?

চেষ্টা করছি।

করুন। যা হবে, দেখবেন, তা ওই ড্রয়িং-রুম-মার্কা ছোট্ট চিকমিকে 'চমৎকার' কথাটা দিয়ে বর্ণনীয় নয়।

আবার একটু থেমে বললেন, 'সাংঘাতিক' বললে কিছু আভাস পাওয়া যায় হয়তো, তাও যৎসামান্য।

এর পর কি বলব, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কারণ নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রির একটা ঘোরতর রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে ঘটেছে, তা অবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলাম ; কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি আলোড়নযোগ্য কি না, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সাবধানতা অবলম্বন করে বললাম, আপনার আত্মীয় যখন, তখন নিশ্চয়ই আপনি ভাল করে চেনেন। আমার তো সে সুযোগ—

বিরক্তিকর! আবার আপনি একটা ভুল কথা ব্যবহার করলেন অজ্ঞাতসারে। রাত্রির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা সুযোগ নয়, দুর্যোগ। আমার স্ত্রী ওর জন্যে আত্মহত্যা করেছে, আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালিয়ে বেঁচেছি।

এরপর চুপ করে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় রইল না। দুজনেই নির্বাক হয়ে রইলাম। চারটে বুনো হাঁসের মধ্যস্থতায় এত বড় একটা সত্যের সম্মুখীন হতে পারব, তা আমি কল্পনাই করি নি। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নিখিলবাবু বললেন, এখনও কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। ভালবাসি, ঘৃণাও করি। বিরক্তিকর!

বললাম অর্থাৎ না বলে পারলাম না, আপনার সঙ্গে ওদের যা সম্পর্ক তাতে অনায়াসেই তো ওকে বিয়ে করতে পারতেন আপনি।

দুটো বাধা ছিল। প্রথমত—পূর্ণেন্দুবাবু, পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী, রাত্রি এরা ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে, অন্তত আমার তাই ধারণা। আর দ্বিতীয়ত—আমিও ঠিক সেই ধরনের উদার লোক নই, যে সব জেনেশুনে একটা প্রেম-করা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।

একটু ইতস্তত করে একটু হেসে বললাম, কিন্তু প্রেম তো আপনার সঙ্গেই হয়েছিল।

নিখিল সশব্দে আর এক টিপ নস্য টেনে নিলেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, রাত্রির আকাশে অগণিত নক্ষত্র। আবার একটু থেমে বললেন, দিনের আকাশেও অগণিত নক্ষত্র, কিন্তু দেখা যায় না। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে 'বিরক্তিকর' কথাটা হয়তো উচ্চারণ করেছিলেন নিখিল চৌধুরী, কিন্তু গোলমালে আমি শুনতে পাই নি, একটা দ্রুতগামী লরির ঘড়ঘড় শব্দের তলায় শেষের দিকের কয়েকটা কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

নিখিলবাবুর মুখে সেদিন যা শুনেছিলাম, সেই স্মৃতির সঙ্গে আর একটা শ্রুতি-স্মৃতি মিলিয়ে দেখছি। একদিন লুকিয়ে তার কান্না শুনেছিলাম। নিখিল চৌধুরী-বর্ণিত অগণ্য নক্ষত্রময়ী রাত্রির পাশে মেঘভারাক্রান্ত বর্ষণমুখর রাত্রির ছবিটি রেখে বিস্মিত হয়ে দেখছি। এই বাড়িতেই গভীর রাত্রের নির্জন অন্ধকারে ওই পাশের ঘরটায় সে লুকিয়ে কাঁদছিল। এই ছাতেরই এক প্রান্তে আধখোলা জানলাটার পাশে অন্ধকারে আমি যে সবিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা সে জানত না। মাঝে মাঝে ভাবি, জানলে সে কি করত? হয়তো হেসে উঠত। তার কলকণ্ঠের অট্টহাস্য ভীরু অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে বিদ্যুতের মত ঝকমক করে উঠত হয়তো। কিন্তু সে দেখতে পায় নি। আমি কিন্তু দেখেছি, শুনেছি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অঝোরঝরে কাঁদছিল সে।

আমি জানতাম না, (এখনও অবশ্য কতটুকুই বা জানি!) তাই একটু সসঙ্কোচে নিখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবনীশ জ্যোতির্ময় কি তখনও ছিল?

না, এদের নাম তখন শুনি নি, অন্তত মনে পড়ছে না। তখন ছিল খগেন,

সৌমেন্দ্র, তপেশ, অমীর বলে এক মুসলমান ছোকরা, হারুবাবু নামে এক বুড়ো ডেপুটি, আর নিখিল চৌধুরী। অর্থাৎ এদের কথা আমি জানতাম, আরও অনেকে ছিল নিশ্চয়। একটু থেমে আবার বললেন, ওদের বাড়িটায় পুরুষদের একটা মস্ত আড্ডা ছিল যে তখন।

আড্ডা ছিল?

রীতিমত। হবে না? যে বাড়িতে অমন চমৎকার চা তৈরি হয় এবং তা যখন খুশি গেলে পাওয়া যায়, যে বাড়িতে বাজি রেখে ব্রিজ খেলা হয় এবং খেলার সঙ্গিনী হিসেবে রাত্রির মত মেয়েকে পাওয়া যায়, যে বাড়ির গিন্নি—গড নোজ হোয়াই—সংসার ছেড়ে তীর্থে তীর্থে গুরুদেবের সেবা করে বেড়ান, যে বাড়ির কর্তার স্থনীতি-দুর্নীতি পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে তা বল্‌শেভিক রাশিয়াতেও চলবে কি না সন্দেহ, সে বাড়িতে পুরুষমানুষের—মানে আমাদের মত পুরুষমানুষের আড্ডা হবে না তো কি হবে?

কোথায় ছিলেন আপনারা তখন?

এই কলকাতা শহরেই! পূর্ণেন্দুবাবু তখন ছ'মাসের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

তখনও পক্ষাঘাত হয়নি তাঁর?

আরে না না, তখনও তিনি রকেটের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন। বছর তিনেক আগে আর কি।

নিখিল চৌধুরী আবার একবার নস্যি নিলেন।

আমি তখনও সিগারেট ধরি নি, অন্যমনস্কভাবে গোঁফের ডগাটা পাকাতে লাগলাম।

বিরক্তিকর!

নিখিলবাবু উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

স্বর্ণেন্দুও কি আপনাদের আড্ডায় যোগ দিত?

না। সে ছিল লক্ষ্ণৌয়ে, এম. এ. পড়ছিল।

ও তো স্কটিশে আমার সঙ্গে পড়ত!

পরে লক্ষ্ণৌ চলে যায়।

স্বর্ণেন্দু আমার সঙ্গে কিছুদিন এক কলেজে পড়েছিল বলে তাকে যতটা আপন বলে মনে হচ্ছিল, এই সামান্য সংবাদটায় সেই আত্মীয়ভাবটা কেমন যেন খানিকটা কমে গেল। আমি ভাবছিলাম—

হঠাৎ ছ'ফুট লম্বা নিখিল চৌধুরী আমার দুই কাঁধে থাবার মত দুটো হাত রেখে বললেন, সাবধান হোন।

এ অবস্থায় সাধারণত লোকে যা করে—ভাষার সাহায্যে আত্মগোপন—আমি তাই করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হ'ল না, চামেলি এসে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

দু জনে নীচে নেমে গেলাম।

এমন চমৎকার 'ডাক-রোস্ট' আমি আর কখনও খাই নি। নিখিলবাবু কিন্তু দেখলাম খুব খুশি হন নি। কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগলেন এবং অতি সব তুচ্ছ কারণ আবিষ্কার করে চামেলিকে ধমকাতে লাগলেন। পরে জেনেছিলাম, এইটেই তাঁর ভালবাসা প্রকাশের ধরন। তিনি তাঁর এই ছিপছিপে কালো কাহার ভৃত্যটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই তুচ্ছ অলীক কারণে তাকে ধমকান। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিখিল চৌধুরীও অবশ্য নিজেকে লুকোতে পারেন নি, চামেলি সব বুঝত। নিখিলবাবু যখন তাকে ধমকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে যদিও সে শুষ্কমুখে অপরাধীর মত ভাব প্রকাশ করছিল, কিন্তু আড়ালে মুখ টিপে হাসছিল।

যেন ছাতে কোন আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখে আমরা নেবে এসেছিলাম, এমনই একটা মনোভাব নিয়ে খাওয়া শেষ হতেই যন্ত্রচালিতবৎ আবার আমরা দু'জনে ছাতে এসে বসলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেই রইলাম—যদিও দু'জনেই একই কথা ভাবছিলাম, এবং আশ্চর্যের বিষয়, দু'জনেই তা বুঝতে পারছিলাম। নিখিলবাবুর একটা কথা ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল—এরা কেউ ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে। কথাগুলোর নানা রকম অর্থ করা যায়। আমার সহসা কৌতূহল হ'ল, নিখিলবাবু কি অর্থে কথাগুলো ব্যবহার করলেন, কে জানে? কৌতূহলটাকে বাঙ্ময় করলাম যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক আকার দিয়ে এবং নিরুৎসুক কণ্ঠে।

মেয়েরা একটু বড় হয়ে গেলে, আজকালকার দিনে, যাকে-তাকে বিয়ে করতে চায় না। স্বর্ণেন্দুর কথাটারই পুনরুক্তি করলাম, তাদেরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে তো!

বড় মানে কি, কত বয়সের মেয়েকে আপনি বড় বলেন?

শুধু নিখিল চৌধুরীই নয়, অনেকেই দেখেছি, কোন একটা জিনিস বুঝেও

যখন না বুঝতে চান, তখন তাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করেন। পৃথিবীতে প্রায় সব জিনিসেরই ব্যতিক্রম আছে—এই সত্যটার সুযোগ নিয়ে তাঁরা প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করবার প্রয়াস পান। হ'লও তাই।

আমি যেই বললাম—এই ধরুন ষোল-সতরো, শিকারের ওপর ঝম্পোন্মুখ শিকারী পশুর চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, নিখিল চৌধুরীর চোখেও ঠিক সেই দৃষ্টি ফুটে উঠল। এক টিপ নস্যি তুলে নিয়ে বললেন, তার ঢের আগে আপনার ওই রাত্রি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের চোটে সকলের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল একদিন। তখন ওর বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে।

সশব্দে নস্যিটা টেনে নিলেন।

হয়েছিল কি?

বিয়ের কনে পিঁড়ি থেকে উঠে পালিয়েছিল, বরের কানে একটু খুঁত ছিল বলে।

কানে?

হ্যাঁ, কানে। ঠিক কাটা নয়, কানটা একটু মোড়া-গোছের ছিল।

কি রকম?

পূর্ণেন্দুবাবু আশীর্বাদ করতে যান, তখন সেটা পাগড়ি দিয়ে ঢাকা ছিল বলে দেখা যায় নি।

আশীর্বাদ করবার সময় বর পাগড়ি পরে ছিল নাকি?

হ্যাঁ। ছেলেটি পশ্চিমেই মানুষ, পশ্চিমেই থাকত, তাই পাগড়ি পরাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল তখন সকলের। আসল কারণটা বোঝা গেল বিয়ের ঠিক আগে, টোপর পরবার সময়।

নিখিল চুপ করলেন।

আমি বলতে গেলাম, জোচ্চোরকে বিয়ে না করে তো ঠিকই—

বিরক্তিকর! আমি কি বলেছি, বেঠিক করেছিল? আমার বক্তব্য শুধু এই যে, অন্য কোন মেয়ে ঠিক এমনটা করত না ওই বয়সে।

আমি মানস-চক্ষে দেখতে পেলাম ছবিটা। টোপর-পরা বরের মুখের দিকে ক্ষণকাল নিষ্পলক নয়নে চেয়ে থেকে তারপর উঠে গেল সে। পরনে লাল চেলী, কপালে কনে চন্দন।

পূর্ণেন্দুবাবু সেই একটিবার মাত্র সম্বন্ধ করে ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন,

আর করেন নি। একটু থেমে নিখিলবাবু আবার বললেন, ওর মায়ের জন্তে আর সম্ভবও হয় নি।

মায়ের বিয়ে দিতে আপত্তি ছিল নাকি খুব?

নিখিল চৌধুরী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর জানতেন কি না এবং জানলেও দিতেন কি না জানি না; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে টং-টং করে বারোটা বেজে উঠতেই দু'জনে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হতে বাধ্য হলাম। নিখিলবাবু বললেন, বিরক্তিকর! কাল আবার সকালেই কোর্ট আছে আমার।

আমারও একটি রোগীকে ভোরেই ইনজেকশন দেবার কথা ছিল। সুতরাং উঠতে হ'ল। কিন্তু বেশ মনে আছে, নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারেই উঠেছিলাম সেদিন। নিখিলবাবুকে এতক্ষণ ধরে একা পাবার সুযোগ আর একদিন মাত্র ঘটেছিল আমার। সেদিনও প্রসঙ্গ এই, কিন্তু 'পরিস্থিতি' বিভিন্ন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

আমি গোড়াতেই বলেছি, রাত্রির সবটা আমি দেখি নি। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি এবং অনেকখানি কল্পনা করেছি। যদিও সকলের সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান এই তিনটি জিনিসের যোগ-বিয়োগের ফল, তবু রাত্রির সম্বন্ধে এ কথাটা আরও বেশি করে মনে রাখা উচিত এই কারণে যে, এ ক্ষেত্রে যোগ-বিয়োগের ফলে যে ধারণাটা আমাদের মনে স্থায়ী হবার সম্ভাবনা, সে ধারণাটার স্বরূপ সমাজ-স্বার্থের দিক থেকে, কিন্তু—না থাক্। বাক্যের আবর্তে আপনাদের সহজ বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে তুলতে চাই না। আমি ঘটনাগুলির যথাযথ বর্ণনা করে যাচ্ছি, আপনারা নিজেরাই নিজেদের স্বকীয়তা অনুযায়ী স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। কেবল সত্যনিষ্ঠার খাতিরে এইটুকু শুধু আমি বলছি যে, ঘটনাগুলির মধ্যে পারম্পর্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। 'যথাযথ' শব্দটাকেও বৈজ্ঞানিক অর্থে নিলে চলবে না। নারীর সম্বন্ধে পুরুষের বর্ণনা কখনও যথাযথ হতে পেরেছে? 'পারম্পর্য নেই'—এ কথাটা যে তুচ্ছ করবার মত নয়, একটা উদাহরণ দিলে তা আরও স্পষ্ট হবে। বিছুটি-লতার সুনাম নেই। মনে করা যাক, আপনি এই বিছুটির পাতা দেখেছেন, শিকড় দেখেছেন, বীজ দেখেছেন, অখ্যাতি শুনেছেন এবং সংস্পর্শও লাভ করেছেন; কিন্তু বিছুটির জীবনের সেই কটা দিন হয়তো আপনি দেখেন নি, যখন সে ফুলে ফুলে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ যদি পুষ্পালঙ্কৃতা রূপান্তরিতা বিছুটিকে একটু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে কোন দিন দেখতেন, তা হলে হয়তো বিছুটির সম্বন্ধে আপনার ভূতপূর্ব তিক্ত ধারণায় হঠাৎ খানিকটা মাধুর্য-সঞ্চার হত। আপনার অজ্ঞাতসারেই বিছুটির বিজ্ঞানসম্মত বদনাম সত্ত্বেও আপনার মন অনেক রকম দার্শনিক তথ্য, সত্য-অসত্যের অভিন্নতা, স্বপ্নের বাস্তবতা, আপাতদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা—নানা রকম উদ্ভট আলো-আঁধারির মোহ সৃজন করে অসহায় আত্মহারা ভাবে বিছুটির পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে যুক্তি আহরণ করতে ব্যস্ত হত। অর্থাৎ বিছুটি নামক বিষাক্ত উদ্ভিদটির জীবনের ঘটনা-পরম্পরা পর পর দেখবার সুযোগ যদি কারও ঘটে, তা হলে বিছুটির ওপর চটে থাকা অসম্ভব হবে তার পক্ষে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিছুটির

পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি বিছুটির জীবনে স্বল্পকাল থাকে এবং অধিকাংশ লোকের তা নয়নপথবর্তী হয় না।

আমি যে রাত্রির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি দেখতে পেয়েছিলাম তা নয়; কিন্তু কল্পনা করতে ক্ষতি কি, বিশেষত সে কল্পনায় যখন অতি স্বাভাবিক একটা ভিত্তি আছে। নিখাদ বাঙালী ধরণীবাবুও কল্পনা করেন, 'ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশায়, ওরা বাঙালী নয়, ওরা আলাদা জাতের লোক।' আমারই বা কল্পনা করতে বাধা কি যে, রাত্রির জীবনেও একদিন অতিশয় স্বাভাবিক নিয়মে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছিল, যে ফুলের সৌরভ শুধু অলিকুলকেই নয়, রাত্রিকেও আবিষ্ট করেছিল, যে আবেশের মোহে সে ভেবেছিল—অলিদের নয়, বসন্তকেই সে বন্দী করে রাখতে পারবে তার পুষ্পিত কারাগারে!

আমার বিশ্বাস, স্বর্ণেন্দু তার এই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপটি দেখেছিল,—শুধু দেখে নি, মিলিয়ে দেখেছিল তার নিজের অপুষ্পিত ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে। তা না হলে—কিংবা হয়তো তার মায়ের কথা—না, কারণটা এখনও ঠিক জানি না আমি। কিন্তু স্বর্ণেন্দুর, সেই আদর্শবাদী স্বর্ণেন্দুর নিষ্পাপ মুখচ্ছবিটা ভুলতে পারি না আমি কিছুতে। অতিশয় শান্তভাবে কেবল সে বলেছিল, আমি করেছি। কোন উত্তেজনা, কোন বাহাদুরি, কোন উত্তাপ ছিল না তার কণ্ঠস্বরে। তাই আমার মনে হয়, রাত্রির পুষ্পিত জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যর্থ জীবন সে মিলিয়ে দেখেছিল এবং—। কিন্তু এ সব আমার কল্পনা। ঘটনাটা শুনুন।

নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রিদের সম্বন্ধে আলোচনা হবার প্রায় ছ'মাস পরে ঘটনাটি ঘটেছিল। এই ছ'মাস আমি এদের কারও কোন খবর পাই নি, রাখিও নি। সেদিন রাত্রে নিখিলবাবুর সাবধান-বাণী অনুসরণ করেই যে আমি এদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম তা নয়, ধরণীবাবুর আলোচনা শুনেও আমার মনে জুগুপ্সার সঞ্চার হয় নি, রাত্রির সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য এতটুকু কমে নি, বরং বেড়েছিল; তবু এদের সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়ে কোন সংবাদ সংগ্রহ করি নি—সম্ভবত মজ্জাগত সেই স্বভাবের প্রভাবে, যার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়ে কোন কিছুই করি না, যা চোখে পড়ে তাই দেখি, যা কানে ঢোকে তাই শুনি। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ছ'মাসের খবর যদি আমি রাখতাম, অন্তত চিঠি-পত্রেরও আদান-প্রদান যদি চলত, তা হলে হয়তো খবরের কাগজে কাহিনীটা যত বীভৎসভাবে বেরিয়েছিল আমি তার প্রতিবাদ

করতে পারতাম ; এবং এই কাহিনীতে কল্পনায় যে সত্যটা অনুভব করছি, প্রত্যক্ষদর্শনের জোর পেলে—কিংবা হয়তো ভুল বলছি—প্রত্যক্ষদর্শনের উগ্রতাটা এত বেশি যে তার দাপটে সূক্ষ্ম সত্য অনেক সময় মারা পড়ে। কল্পনার সূক্ষ্ম জালেই সূক্ষ্ম সত্য ধরা যায়। সবটা প্রত্যক্ষদর্শন করলে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তিই থাকত না হয়তো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডিস্পেন্সারি থেকে ফিরলাম প্রায় সাতটার পর। নানা কারণে মনটা ভাল ছিল না। দিন সাতেকের মধ্যে দুটো রুগী মরেছিল, আরও দুটো মর-মর হয়েছিল, একজন বড়লোক ভাটিয়ার বাড়িতে দুটো সঙিন-গোছের ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। অল্পদিন মাত্র ঘরটায় ঢুকেছিলাম, দু' দুটো মৃত্যু ঘটে গেলে, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির সঙিনতার নয়, আমারই বদনাম হবে। ঘোষেদের বাড়ির টাইফয়েডটাকে পথ্য দিয়েছিলাম, বিকেলের দিকে শোনা গেল, তার একটু জ্বর হয়েছে। সকালবেলা শুভবিবাহ-মার্কা যে নেমন্তন্নের চিঠিখানা পকেটে পুরেছিলাম সেটার কথা মনেই ছিল না। বাড়ি ফিরে পকেট থেকে স্টেথস্কোপ বার করতে গিয়ে চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল। বিরক্তিতে সারা মনটা ভরে গেল। না গিয়ে উপায় নেই। শুধু যেতে হবে তা নয়, একটা উপহার কিনে নিয়ে যেতে হবে। এড়াবার উপায় নেই, কারণ ধনী জমিদার রায় মশায় একজন মস্ত বড় পেট্রন আমার। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহে কোমরে গামছা বেঁধে দই পরিবেশন করতেই লেগে যাওয়া উচিত ছিল আমার। অন্তত টাকা পাঁচেকের মত দিশী বিলিতী জাপানী জার্মানী যাই হোক কিছু একটা শৌখিন দ্রব্য কিনে ঠোঁটে ভদ্রতার হাসিটি ঝুলিয়ে আত্মীয়তার অভিনয় করতেই হবে গিয়ে। অভিনয় করা শক্ত হবে না, কিন্তু কি জিনিস কেনা যায় তাই একটা সমস্যা। কারণ জিনিসটা তো আর অভিনয় করবে না। ফুলদানি, টয়লেট-সেট, টি-সেট, নিটিং-সেট, রাইটিং-সেট—নানা রকম সেটের কথা মনে হ'ল, কিন্তু একটাও মনঃপুত হল না। শাড়ির কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। পাঁচ টাকা দামের শাড়ি রায় মশায়ের মেয়ে কচিৎ কখনও পরলেও পরতে পারে হয়তো, কিন্তু সে শাড়ি উপহারের ভিড়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই তো উপহার দেওয়া। মনে হ'ল, তেমন কিছু পাঁচ টাকার মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ধড়াচূড়া ছেড়ে স্নান করলাম। স্নানান্তে এক কাপ চা খেয়ে একটু প্রফুল্লিত হলুম। মনে হ'ল, দুলাল সাধুর শরণাপন্ন হলে সে

পাঁচ টাকার মধ্যেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। গোটা পাঁচেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিলাম, গোকুল এসে পথরোধ করলে।

আজ রায়েদের বাড়ি নেমন্তন্ন না তোমার ?

সেইখানেই তো যাচ্ছি।

কাপড়-চোপড়গুলো বদলে যাও, ও-রকম ময়লা জামা-কাপড় পরে নেমন্তন্ন খেতে যায় নাকি কেউ ?

জানি, প্রতিবাদ করা বৃথা।

বললাম, শিগগির দে তা হলে।

গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, বাবুধাক্কা-পাড় কাপড়, ফিতে-বসানো পেটেণ্ট লেদারের কালো পাম্প-শু, যায় রুপো দিয়ে বাঁধানো শৌখিন ছড়িটি পর্যন্ত এনে হাজির করলে গোকুল। আলমারি খুলে এসেন্সের শিশি বার করে পাট-করা রুমালে এসেন্সও ঢালতে লাগল। পৃথিবীতে এত লোকেরই যখন মন রেখে চলেছি, বস্তুত সমাজ-জীবন মানেই যখন একনাগাড়ে সকলের মন রেখে চলা, তখন গোকুলকেই বা মনঃক্ষুণ্ন করি কেন ? কোনও আপত্তি করলাম না।

বেশি রাত করো না যেন।

আচ্ছা।

তখন কি জানি, রাত্রির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে !

আমার সচেতন সত্তা জানত না যদিও, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, অবচেতন মনের কোন স্তরে সংবাদটা এসে পৌঁছেছিল বোধহয়, এবং সেইজন্যেই আমি বোধহয় আমার কিছুক্ষণ আগেকার উপহার-বিরোধী মনোবৃত্তি সত্ত্বেও—না, ভুল বলছি—আসলে সেটা দুলাল সাধুর কীর্তি—আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েই সোজা সেই মনিহারী দোকানটির উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হলাম, যার একচ্ছত্র মালিক শ্রীদুলালচন্দ্র সাধু। একাধিক কারণে দুলাল সাধুর অসাধুতার নানা প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আমি সব জিনিস তার দোকান থেকেই কিনি। প্রথমেই বলেছি, চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। দুলাল সাধুর চোখ দেখেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার প্রতি। বড় ট্যারা চোখ। যখন মনে হবে, দুলাল সাধু রাস্তার ষাঁড়টার দিকে চেয়ে আছে, তখন কিন্তু সে নিরীক্ষণ করছে আপনাকে। যখন তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আকস্মিক ভৎর্সনা ঘনিয়ে উঠতে দেখে আপনার মনে আতঙ্ক সঞ্চার হচ্ছে, তখন তার 'মাপ কর বাবা, এখানে হবে না' শুনে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে প্রত্যাখ্যাত ভিখারীটাকে

দেখে আশ্বস্ত হবেন। ওর অদ্ভুত ট্যারা চোখই আকৃষ্ট করেছিল আমাকে প্রথমে। পরিচয় পেয়ে আরও আকৃষ্ট হ'লাম। অতি অমায়িক লোক। যখন গলা কাটছে, তখনও অমায়িক। পৃথিবীতে গলা তো সকলেই কাটে, অমায়িক ক'জন হয়? আমার বিশ্বাস, এটা ওর নিছক ভণ্ডামির আবরণ নয়, এটা ওর বিশেষ একটা গুণ। 'আপনি হলেন ঘরের লোক'—এটা শুধু ওর মুখের কথা নয়, আচরণেও সেটা ফুটিয়ে তোলার শক্তি আছে ওর। কেবল মুখের কথায় মানুষ বরাবর ভোলে না, খানিকটা আন্তরিকতাও থাকা চাই।

তৃতীয়ত, ধার দেয়। সকলকে দেয় না, লোক বুঝে দেয়। দুলাল সাধুর এইটে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা। ট্যারা চোখের এক চাউনিতেই ও বুঝে নেয়, লোকটা কোন্ জাতের, একে ধার দেওয়া চলে কি না!

আমি যখন দুলাল সাধুর দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বেচারা ভারি ব্যস্ত। নানা-রঙের শাড়ি-পরা এক ঝাঁক কলেজের মেয়ে তাকে ঘিরে ছিল। দুলাল যে কখন কার মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, তা বোঝবার উপায় ছিল না। তবে এটা ঠিক, ফরসা লম্বা মেয়েটি যখন মনে মনে ঈষৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে করতে মুখে একটা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করছিল, তখন দুলাল তাকে দেখছিল না, তখন দুলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল খুব সম্ভব বাঁ ধারের শ্যামবর্ণাটির ওপর। শ্যামবর্ণা মেয়েটি নিজেকে যখন বিব্রত মনে করতে লাগল, তখন দুলালের দৃষ্টি পড়েছে আমার ওপর—

আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু আসুন, বসুন।

বসব না আর, আমাকে টাকা পাঁচেকের মত কিছু একটা দিন তো—বিয়ের উপহার।

এক মিনিট, এক্ষুণি দিচ্ছি। ওরে ভোঁদড়, পান দে ডাক্তারবাবুকে।

বলা বাহুল্য, একাধিক মিনিট বসতে হ'ল।

বসে বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম মেয়েগুলিকেই। মুগ্ধ নয়, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। নানা রকম লোভনীয় মনিহারী জিনিসের দিকে সঞ্চরমান ওদের দৃষ্টিতে সে দিন যে লুব্ধতা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা ভুলব না কোনদিন। চোখ দিয়ে ওরা জিনিসগুলোকে গিলছিল যেন। এক-একবার মনে হচ্ছিল, আমার যথাসর্বস্ব খরচ করে কিনে দিই ওদের জিনিসগুলো। ট্যারা দুলাল সাধুর সামনে ওদের ওই লুব্ধতা আমারই আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করছিল যেন। কিন্তু আমার যথাসর্বস্ব আর কতটুকু! খুব বেশিও যদি থাকত, তা হলেও

ওদের তৃপ্ত করতে পারতাম না। হুতাশনকে ঘি খাইয়ে তৃপ্ত করবে কে? অনেক দর কষাকষি করে (সেদিন এটাও লক্ষ্য করেছিলাম, এবিষয়ে মেয়েরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি পটু) একখানি মাত্র শাড়ি কিনে চলে গেল ওরা। শাড়ির দরকার ছিল একজনের, বাকি ক'জন বোধহয় পছন্দ করতে এসেছিল।

এইবার ডাক্তারবাবু, আপনাকে কি দোব বলুন? ওহে জগু, ফ্যানটা খুলে দাও ওদিকের।

টাকা পাঁচেকের মত যা হোক একটা কিছু দিন শৌখিন-গোছের—বিয়েতে উপহার।

সসম্ভ্রমে দুলাল বললে, রায়েদের বাড়ির জন্যে বুঝি?

হ্যাঁ।

সামনের তাকে রক্ষিত গণেশের দিকে চেয়ে দুলাল হুকুম করলে, ওহে চণ্ডী, ওপর থেকে নিকেলের ইলেক্ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আন তো, সাবধানে এনো।

একটু পরে চণ্ডী নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আনলে, এবং দুলাল সাধু সসম্ভ্রমে সেটা খুলে দেখাতে লাগল।

এর পাঁচ টাকা দাম?

দাম কিছু বেশি। কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে জিনিস যাবে, দামের দিকে লক্ষ্য রাখলে তো চলবে না আমার।

শাড়ি-ব্লাউজ-পরা ডামিটার দিকে চেয়ে দুলাল সাধু মুচকি হেসে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলে, যা সত্যিই অবর্ণনীয়। তবু আমি শেষ চেষ্টা করলাম, আমার সঙ্গে পাঁচ টাকার বেশি নেই যে!

দাম আপনি যখন খুশি দেবেন, নাও যদি দেন তাও সহ্য হবে আমার, কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে চার-পাঁচ টাকা দামের খেলো জাপানী জিনিস পাঠাতে পারব না আমি।

ডামিটার দিকে এমন মর্মাহতভাবে চাইলে দুলাল সাধু যে, আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না।

সকলেই প্রশংসা করেছিল আইস্‌ক্রীম-সেটটার। রাত্রি প্রশংসা করেছিল আমার রুচির। বছর-খানেক পরে দুলাল বিল পাঠিয়েছিল—চল্লিশ টাকা পনেরো আনা।

রায় মশায় আমাদের পাড়ার বর্ধিষ্ণু লোক। সুতরাং এ পাড়ার অতি-পরিচিত, অর্ধপরিচিত, অপরিচিত সকলকেই প্রায় নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। বাইরের লোকও অনেক ছিল। শামিয়ানার তলায়, টিনের চেয়ারে, বৈঠকখানা ঘরের বিস্তৃত ফরাশে, বারান্দায়, সামনের একটা তাঁবুতে—চতুর্দিকে গিজগিজ করছিল নিমন্ত্রিতের দল। কুলীর মাথায় নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইসক্রীমসেট সহ আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। ভাগ্যে গেটে কেউ এসে আটকায় নি, কারণ, যে কার্ডখানা গেটে প্রদর্শন করবার কথা সেটা আমি আনতে ভুলে গিয়েছিলাম।

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, কনসার্ট, লাল নীল হলুদ সবুজ ইলেক্‌ট্রিক আলোর সারি, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকরা-গাড়ির গাড়োয়ানদের কণ্ঠরব, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নজনিত চেঁচামেচি—সমস্তটা মিলে একটা প্রলাপ যেন।

খানিকক্ষণ পরে আর একটা প্রলাপ যে আমাকে শুনতে হবে—বংশীর প্রলাপ—তা তখন কে জানত!

॥ ২ ॥

বংশী যে প্রলাপ বকবে, তা বোধহয় রাত্রিও জানত না, জানলে সে আমাকে নিয়ে যেত না সঙ্গে করে। অবশ্য রাত্রি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, এটা ঠিক সত্য কথা নয়; আমিই তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কিছুই সম্ভব হ'ত না, যদি কান্তি পালের সঙ্গে দেখা না হ'ত।

অগ্রগামী কুলির মাথায় নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইসক্রীমসেট নিয়ে রায় মশায়ের বিরাট বাড়ির চৌহদ্দিতে যেই আমি ঢুকলাম, অমনিই দেখা হয়ে গেল কান্তি পালের সঙ্গে। সেদিন কান্তি পালের সঙ্গে ওই ভিড়ের মধ্যে দেখা হয়ে যাওয়াটাকে আমি এখন আর আকস্মিক বলে মনে করি না। আমার মনে হয়, নিয়তির এই চক্রান্তের মধ্যে কান্তি পালের স্থান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

কান্তি পাল লোকটি কান্তিমান লোক নন। রোগা বকের মত চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো—কিন্তু নিয়মিতভাবে নয়, প্রত্যহ তো নয়ই। হাঁটুর

ওপর কাপড় তুলে নগ্নগাত্রে একখানা ভিজে লাল গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে বীজন করছিলেন তিনি ম্যাগ্‌নোলিয়া-গ্রাণ্ডিফ্লোরা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। আমি তাঁকে দেখতে পাই নি। তিনিই এগিয়ে এসে বললেন, ডাক্তার যে, এস এস, ঝুলির মাথায় ও কী।

উপহার একটা।

ও নিতু, ডাক্তারবাবুর এই জিনিসটা মাঝের হল-ঘরে রাখিয়ে দাও—বেশ সামনের দিকে রাখিয়ে দিও।

নিতু এসে ঝুলিটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। হল-ঘরে উপহারের একটা প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল।

কান্তি পাল বললেন, উঃ, রগ দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে আমার! আবার বনবন করে গামছা ঘোরাতে লাগলেন এবং আমি কিছু বলবার আগেই বললেন, সকাল থেকে ক' ব্যাটা উড়েকে নিয়ে প্রকাণ্ড উনুনের সামনে—উঃ!

কান্তি পালকে আমি চিনি, তিনি আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছিলেন, তাও আমার অবিদিত ছিল না। বললাম, আপনি বলেই পারেন এ সব, আমরা হলে মরে যেতাম।

আর পারি না ভাই, বয়স তো হচ্ছে। চল, তোমাকে বসিয়ে দিই গে। ভিড়ের মধ্যে ঢুকো না, ও ধারের বারান্দার কোণে একটা নিরিবিলি জায়গা আছে, সেখানেই চল। একটা ফ্যানও আছে সেখানে, আরামে বসতে পারবে।

তারপর যেতে যেতে বললেন, উঃ, মনে হচ্ছে, দুটো রগে দুটো ইস্কুরুপ কে যেন প্যাঁচকষ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢোকাচ্ছে!

কান্তি পালের এই বৈশিষ্ট্য। শিবহীন যজ্ঞ বরং সম্ভব, কিন্তু এ পাড়ায় কান্তি-পাল-হীন 'যগ্যি' অসম্ভব। সকাল থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি রান্না-বান্নার তদারকের ভার নিয়ে এগিয়ে যাবেন। তারপর যত বেলা বাড়তে থাকবে, কান্তি পাল তত গম্ভীর হতে থাকবেন এবং ক্রমশ চেনা-শোনা যার সঙ্গে দেখা হতে থাকবে, তার কাছেই চুপি চুপি ক্লান্ত-কণ্ঠে নিজের একটা না একটা শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ করে 'ক্যাসাবিয়াঙ্কা-' মার্কা এমন একটা নিদারুণ রকম আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন (গোপনে গোপনে কিন্তু) যে, শ্রোতাকে সহানুভূতি-মিশ্রিত দু'চারটে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতেই হবে। কান্তি পাল এর বেশি আর কিছু চানও না। অসুখের

প্রতিকারকল্পে কেউ যদি কোন ব্যবস্থা করতে যায়, কান্তি পাল বলবেন, না থাক্। সমস্ত দিন রান্নাঘরে ঘোরা-ফেরা করবেন, কিছু খাবেন না এবং রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে এক গ্লাস শরবত কিংবা বড় জোর একটা মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যাবেন।

কান্তি পাল আমাকে নিয়ে গিয়ে যে স্থানটিতে বসিয়ে দিলেন, সে স্থানটি আমি এই ভিড়ের মধ্যে নিজে খুঁজে বার করতে পারতাম না এবং তা না পারলে পরবর্তী ঘটনাপরম্পরা আমার জীবনে ঘটত কি না সন্দেহ। আমার সহানুভূতিসূচক কথায় বিগলিত হয়ে কান্তি পাল যেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন, সেটা অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা নয়। সেটা পেছন দিকে অন্দর-মহলের কাছাকাছি একটা স্থান। খুব পরদানশীনও নয়, খুব প্রকাশ্যেও নয়। মেয়েরাও বসতে পারে, পুরুষেরাও বসতে পারে। সেখানে ছিল একটা গোল টেবিলের চারপাশে খান কয়েক চেয়ার, মাথার ওপর একটা পাখা। আশপাশ দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল বটে, কিন্তু সেখানে থামছিল না কেউ। এই ভিড়ের বাড়িতে এমন একটা জায়গা পাওয়া ভাগ্যের কথা। ফ্যানটি খুলে দিয়ে কান্তি পাল মুচকি হেসে বলে গেলেন, ওদিক পানে চেয়ো না যেন।

তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশে চেয়ে দেখলাম, একটু দূরে একটি বিস্তৃত ঘরে নিমন্ত্রিতা ভদ্রমহিলারা সমবেত হয়েছেন। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠছে। তাঁরা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ মনে হল, বুনো রামনাথের স্ত্রী এঁদের মধ্যে নেই। হাতে শাঁখা (এমন কি অভাবে লাল সুতো), সীমন্তে সিঁদুর, আর সাধারণ সাদাসিধে সুতোর কাপড় পরে যে মহিলা সগৌরবে নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন, এই মেকী প্রজাপতির দলে তিনি নিশ্চয়ই নেই। বুনো রামনাথের স্ত্রীর আত্মমর্যাদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কেবল তাঁর স্বামীর ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর, আর এই মেকী প্রজাপতিদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত কেবল তাদের স্বামীর উপার্জন কিংবা ধার করবার ক্ষমতার ওপরই নয়, সৎ-অসৎ ভদ্র-অভদ্র নানা উপায়ে সেটা জাহির করবার প্রচেষ্টার ওপর। এদের আত্মসম্মান পরিপুষ্ট হয় সোফা-সেট্টি-মোটর-বসন-ভূষণ কিনেই নয়, তা অধনী-অধন্যদের চোখের

সামনে নানাভাবে আস্ফালন করে। অন্তরের ঐশ্বর্যের কথা কেউ আজকাল ভাবেই না, বাইরের ঐশ্বর্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড। তাই নানা রঙের কাপড় নানা ঢঙের গয়না পরে মুখে পাউডার ক্রীম ঘষে আন্তরিকতাবর্জিত হাসি হেসে প্রাণপণে সবাই অভিনয় করে চলেছে। সবাই সবাইকে সমালোচনাও করছে মনে মনে, মুখের ভদ্র হাসিটুকু বজায় রেখে। কার স্বামী কেরানী এবং কার স্বামী সেই কেরানীর প্রভু, তা বোঝবার উপায় নেই তাঁদের স্ত্রীদের দেখে। গয়না-কাপড়ের দৌলতে সবাই রাজরানী। পেট ভরে খায় না, মনুষ্যত্বের চর্চা করে না, কিছু রোজগার করে তা দিয়ে ঠুনকো ঐশ্বর্যের সস্তা চাকচিক্য কিনে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে। বুনো রামনাথের স্ত্রীর নিরলঙ্কৃত মর্যাদাবোধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হয়তো একরকম কম্‌প্লেক্স, কিন্তু এই দরিদ্র পরাধীন দেশে গয়না-কাপড়-সর্বস্ব ঝুটো-আভিজাত্য-কমপ্লেক্সের চেয়ে দারিদ্র্য-কম্‌প্লেক্স ঢের বেশি শ্রেয় এবং সম্মানার্হ। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের চেয়ে ঢের কম রোজগার করে ঢের বেশি সুখে ছিলেন, কারণ তাঁদের মর্যাদাবোধ আর্থিক ছিল না, আত্মিক ছিল। সুখে জীবনযাপন করবার জন্তেই অর্থ, অর্থের জন্ত জীবনযাপন নয়—একথা আমরা ভুলে গেছি বলেই যে কোন ধনী দুরাত্মার কাছে সামান্ত অর্থের বিনিময়ে মাথা নোয়াতে পেলে ধন্ত হয়ে যাই।

পলাশির যুদ্ধ···রামমোহন রায়···বিদ্যাসাগর···বঙ্কিম···বিবেকানন্দ··· রবীন্দ্রনাথ···একশো তিরাশি বছর মনের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে পার হয়ে গেল।

দিস ইজ ক্যালকাটা কলিং—

চাল-ডালের দর থেকে আরম্ভ করে বড় বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের সংবাদ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সেতারে কানাড়ার আলাপ, মধ্যযুগের সাধনা, আবৃত্তি, নাটক, ফুটবল খেলার ফলাফল তারস্বরে একের পর এক শূন্তে চিৎকার করে মরছে—পান-বিড়ির দোকানেও, মহারাজার প্রাসাদেও। আর এই গান! বাংলা ভাষা যারা বোঝে না, তারা হয়ত ভাবে, বাংলা দেশ জুড়ে মড়াকান্না উঠেছে। কিন্তু কাঁদবে কে? একটা মড়া কি আর একটা মড়ার শোকে কাঁদে কখনও? কান্না নয়, গানই হচ্ছে, ভাষা বুঝলে গানের কথায় মুগ্ধ হয়ে যেত—কেউ মরে নি, সবাই বেঁচে আছে এবং এত আনন্দে আছে যে, অষ্টপ্রহর গান গাইছে সবাই।

টর্চের আলো নিবিড় অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দেয় যেমন করে, আমার মনের তমিস্রাকে বিচ্ছিন্ন করে পাশের ঘরে তেমনই ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, কে আপনি? সবিতা দেবীর বাড়িতে স্বর্ণেন্দুবাবু খবর পাঠিয়েছেন? রাত্রিকে ডাকছেন? কি বলব তাঁকে? একা রুগী সামলাতে পারছেন না? আচ্ছা, আমি দেখছি। যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনি ওদিকের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাঁকে আমি দেখতেই পেলাম না। আমার মনে পর পর দুটো অসংলগ্ন চিন্তা জাগল—রায় মশায়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি—রাত্রির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হঠাৎ উঠে বারান্দার সিঁড়িটা দিয়ে হনহন করে আমি লনে নেমে গেলাম, সম্ভবত সিঁড়িগুলো সামনে ছিল বলেই। লনের ওধার দিয়ে এক ছোকরা ট্রেতে সাজিয়ে শরবত নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, রায় মশায় কোথায় বলতে পারেন?

তিনি গেস্ট-হাউসে রয়েছেন। দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার আছেন কিনা সেখানে।

ছোকরা চলে গেল।

যদিও রায় মশায়ের নিমন্ত্রণেই এসেছিলাম, তবু—কিন্তু না, দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার থাকতে রায় মশায় আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সময় নষ্ট করবেন—এ কথা চিন্তা করাও অন্যায়, হলামই বা আমরা নিমন্ত্রিত। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে লোকের অভাব নেই তো। এত বড় একটা রাজসূয় ব্যাপারে জনে জনে প্রত্যেককে আপ্যায়িত করা রায় মশায়ের পক্ষে সম্ভব কি? আর, তা ছাড়া, আর একটা কথাও কি সত্য নয় যে, আমাকে নিমন্ত্রণ না করলে কিংবা আমি না এলে, এ উৎসব এতটুকু অসম্পূর্ণ থাকত না? আমাকে অনুগ্রহ করেন বলেই নিমন্ত্রণ করেছেন, না করলেও পারতেন।

সমস্ত তিক্ততা মুহূর্তে মাধুর্যে রূপান্তরিত হ'ল।

নমস্কার। আপনিও এসেছেন দেখছি।

চেয়ে দেখি, রাত্রি নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে, মুখে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা। তার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির রঙ এত অদ্ভুত রকম ফরসা যে, হঠাৎ দেখলে ইহুদী বলে সন্দেহ হয়। তখন আমি জানতাম না, রাত্রি বিনা-নিমন্ত্রণেই এ বাড়িতে এসেছিল এই সবিতাকে দেখবে বলে। সবিতার বাড়ি গিয়ে দেখা পায় নি, সবিতা এখানে চলে

এসেছিল নিমন্ত্রণ-রক্ষা করবার জন্তে, রাত্রিও খোঁজ নিয়ে এসেছিল। সবিতা ও রাত্রি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল—হ্যাঁ, সেই পুরাতন উপমাটাই ব্যবহার করছি—ঠিক যেন আলো আর অন্ধকার। রাত্রির মুখভাবে সেদিন অতি-ভদ্র অতি-মোলায়েম শিষ্টাচারমসৃণ যে স্নিগ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা যে অন্তরোৎসারিত নয়, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না সেদিন। দেশলাই-কাঠির কালো মাথাটার ভেতর আগুন যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, রাত্রির মধ্যেও সেদিন তেমনই আগুন লুকানো ছিল, আমি বুঝি নি। সবিতার সঙ্গে রাত্রির যে সেদিন প্রথম আলাপ, রাত্রি নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, তাও আমি জানতাম না। কাল সকালে জ্যোতির্ময় এসে রাত্রিদের সঙ্গে একবার মাত্র দেখা করে এই সবিতাদের বাড়িতেই উঠবে—একথাও তখন আমার অজ্ঞাত ছিল। রাত্রি দেখতে এসেছিল সবিতা মেয়েটি কেমন, একটা চুম্বক আর একটা চুম্বকের শক্তি নির্ধারণ করতে এসেছিল।

আপনারা মধুপুর থেকে কবে এলেন ?

দিন চারেক আগে।

রাত্রি না হয়ে যদি অপর কেউ হত, তা হলে এই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খবরও বলত। আমার প্রশ্নটির উত্তরটুকু মাত্র দিয়ে রাত্রি চুপ করে রইল। আমি চেয়ে দেখলাম, সে সবিতার মুখের পানে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে, এবং সবিতা মেয়েটি অস্বস্তি ভোগ করছে সেজন্তে। আমিও কম অস্বস্তি ভোগ করছিলাম না। এর পর কি করব, কি কথা বলে আলাপটাকে স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাব, তাই ভাবছিলাম (রাত্রির সামনে বরাবরই আমার এমনই বাক্‌সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে), এমন সময় নিতু একটা কার্ড আর লাল পেন্সিল নিয়ে হাজির হল।

আপনার নামটা কাইন্ডলি বলুন না।

কেন ?

আপনার দেওয়া আইসক্রীম-সেটটার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে দেবো।

সবিতা জিজ্ঞাসা করলেন, উপহারগুলো কোথায় রাখা হয়েছে, আমরা একবার দেখতে পাই না ?

ওই যে, বাঁ দিকের ওই হলটায়। আসুন না।

সকলে নিতুর অনুসরণ করলাম।

উপহার-প্রদর্শনীর বর্ণনা করে সময় নষ্ট করতে চাই না, মনিহারী দোকানে

যত রকম জিনিস পাওয়া যায়, সবই ছিল সেখানে। রাত্রি নিকেলের ইলেক্ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেটটা দেখে (নিতু আমার নাম-লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিচ্ছিল তখন) দু'টি কথা মাত্র বলেছিল—বেশ জিনিসটি। তারপর হঠাৎ সবিতার দিকে ফিরে বলেছিল, ইনি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার। নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পর মামুলি প্রথায় দু'চারটে শিষ্টবাণীর আদান-প্রদানও হয়তো চলত, কিন্তু হঠাৎ পাশের দুয়ারের পর্দা ঠেলে ব্যস্তবাগীশ-গোছের মালকোঁচা-মারা ঘর্মসিক্ত ঢিলে গেঞ্জি গায়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে পড়লেন এবং সবিতা দেবীকে সামনে পেয়ে বললেন, ও, সবিতা, তুমি এদিকে চলে এসেছ, সুবর্ণপ্রভাকে আমি আবার ভেতরের দিকে পাঠালাম তোমার খোঁজে। এখনই তোমাদের বাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক ফোন করছিলেন, রাত্রি বলে একজন মেয়েকে, আই মীন—মহিলাকে, স্বর্ণেন্দুবাবু বলে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। বললেন, তিনি রুগীকে একা সামলাতে পারছেন না। আমি তো রাত্রি বলে কাউকে খুঁজেই পাচ্ছি না।

ইনিই রাত্রি দেবী।

ও, নমস্কার।

ভদ্রলোককে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে রাত্রি বললে, এখুনি যাচ্ছি আমি।

আমি কর্তব্যের অনুরোধেই সম্ভবত প্রশ্ন করলাম, বাড়িতে কারও অসুখ নাকি?

বংশীদার জ্বর হয়েছে।

হঠাৎ ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়বার ভান করলাম।

ও, বলেন তো আমিও যাই আপনার সঙ্গে!

বেশ তো, আসুন।

বেশ মনে পড়ছে, সবিতার দিকে ফিরে রাত্রি বলেছিল, কাল ভোরেই জ্যোতির্ময়বাবু আসছেন, বেলা দশটা নাগাদ আপনাদের বাড়িতে যাবেন। আপনি যে আগেই চিঠি পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না, তাই খবরটা দিতে এসেছিলাম।

হাস্যদীপ্ত চক্ষে সবিতা বললেন, অনেক ধন্যবাদ।

উপহার-প্রদর্শনী-হল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা দু'জনে।

॥ ৩ ॥

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেক্‌ট্রিক আলো, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, শামিয়ানার তলায় ভোজননিরত নিমন্ত্রিতের দল, পরিবেশনের গোলমাল, রেডিওর নিনাদ কয়েক মুহূর্তের জন্ত ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল যেন আমার চোখের সামনে থেকে ; মনে হ'ল, কেউ কোথাও নেই, রাত্রি আর আমি পাশাপাশি চলেছি। মুহূর্তগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। মনে হচ্ছিল, যেন একটা সংকীর্ণ বনপথ দিয়ে নিবিড় অন্ধকার রজনীতে পাশাপাশি চলেছি দু'জনে, রাত্রির অঞ্চলতলে শঙ্কিত ভীরু দীপশিখা,—বাতাস উঠেছে···। সহসা রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেক্‌ট্রিক আলো, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের চিৎকার, পরিবেশনের কলরব, রেডিওর নিনাদ সব আবার একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন আমার সচেতন মনের ওপর। দেখলাম, রাত্রি ঝুঁকে তার স্যাণ্ডালের স্থানচ্যুত স্ট্র্যাপটাকে বাঁধছে। রায় মশায়ের বাড়ির হাতা থেকে বেরিয়ে গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হঠাৎ দুলাল সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, টাকা পাঁচটা পকেটে আছে, ট্যাক্সি ডাকলাম।

ট্যাক্সিতে তার সঙ্গে আমার দু'টি কথা হয়েছিল।

নতুন কোন বই শুরু করেছেন নাকি আর ?

না।

যে বংশীর অসুখের সংবাদে চিন্তিত হয়ে হিতৈষীর ছদ্মবেশে বিনা আহ্বানেই যাচ্ছিলাম, সেই বংশীর অসুখের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই উঠল না কোন দিক থেকে। নীরবেই বসে রইলাম দু'জনে। আলোকোজ্জ্বল বড় বড় বাড়ি পেছনে ফেলে চলেছিলাম। ফুটপাথের জনতা থেকে একটি মেয়ের কলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনতে পেয়েছিলাম মনে আছে ; কোণের অন্ধ ভিখারীটা তখনও হাত পেতে বসে ছিল ; ট্রামের ঘণ্টা, রিক্‌শা, হকারের চিৎকার, রাস্তার বিচিত্র জনতা রোজ যেমন থাকে সেদিনও তেমনই ছিল। আমিও ঠিক তেমনই ছিলাম না। রাত্রিকে পাশে বসিয়ে ট্যাক্সি করে ছুটছিলাম আমি।···একটু পরে রাত্রির নির্দেশ অনুসারে থামল ট্যাক্সিটা।

ভাগ্যে থামল! আর কিছুক্ষণ চললে আমি বোধ হয়—মানে, ট্যাক্সি থেকে যখন নাবলাম, মনে হ'ল নক্ষত্রলোক থেকে নাবলাম।

এক পাশে একটা ডাস্টবিন আর এক পাশে একটা ল্যাম্প-পোস্ট, মাঝখানে গলিটা। অন্ধকার সরু একটা অন্ধ গলি। সেই গলির অপর প্রান্তে ছোট দ্বিতল বাড়িখানা, দেখতেই পাওয়া যায় না গলির এ প্রান্ত থেকে।

আসুন।

কপাট খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল এক জোড়া জলন্ত চোখ, তারপর একটি তরুণীর মুখ, তারপর তার গৈরিক বসন। হ্যাঁ, প্রথমে তরুণীই মনে হয়েছিল তাঁকে আমার। তখনও ভাবতেই পারি নি যে, ইনি স্বর্ণেন্দুর মা, রাত্রির মা। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল, রাত্রির সমবয়সী। আমাকে দেখেই তাঁর চোখের জলন্ত দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। অতিশয় কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে বাবা তুমি?

আমি স্বর্ণেন্দুর বন্ধু ঘনশ্যাম। শুনলাম, বংশীর অসুখ—

এস বাবা, এস। এখুনি তোমার কথা বলছিল স্বর্ণেন্দু।

রাত্রি কোন কথা না বলে কারও দিকে না চেয়ে ভেতরে চলে গেল। স্বর্ণেন্দুর মা খানিকক্ষণ স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, আমি স্বর্ণেন্দুর মা।

প্রণাম করলাম আমি।

হয়তো আমার সদ্য-লব্ধ জ্ঞানের ফলেই আমার দৃষ্টির তারতম্য ঘটল। প্রণামান্তে চোখ তুলে যখন চাইলাম, তখন মনে হল, তাঁর মুখের তরুণী-ভাবটা যেন তিরোহিত হয়েছে। অন্তরালবর্তিনী বৃদ্ধাকে যেন দেখা যাচ্ছে। নিটোল মুখখানি জরালেশহীন (পদ্মপত্রে জলের দাগ পড়ে না, আকাশের গায়ে মেঘের মলিনতা লেপটে থাকতে পায় না), তবু কিন্তু কোথায় যেন, খুব সম্ভবত চোখের দৃষ্টিতেই, তাঁর আসল বয়সের পরিচয় পেলাম। পরে এই মহিলার জীবন-রহস্যের যতটুকু আবিষ্কার করেছি, যদিও তার অধিকাংশই হয়তো আমার কল্পনা কারণ মাত্র একখানা চিঠির টুকরো টুকরো কথা থেকে নিঃসংশয়ে কতটুকুই বা জানা যায়, ডি. কে-র কথাই বা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা কে জানে! তা ছাড়া তার মুখ থেকে সব ঘটনাটা আমি শুনিও নি। রাখালবাবু পূর্ণেন্দুবাবু জ্যোতির্ময় নামেরুজাতীয় লোক থাকাও যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব নয়—যাই হোক, যতটুকু আবিষ্কার করেছি বলে আমার বিশ্বাস, এবং

যে বিশ্বাসের জোরে রাত্রির সমস্ত দুষ্কৃতি সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা সম্ভবপর হয়েছিল আমার পক্ষে—সেদিন সে রহস্যের আভাস স্বর্ণেন্দুর মায়ের চোখে দেখেছিলাম যেন। সেই চির-পুরাতন চির-নূতন রহস্য, সর্বযুগের সর্বস্তরের নারীর দৃষ্টিতে যার কুণ্ঠিত বা অকুণ্ঠিত প্রকাশ সর্বযুগের সর্বস্তরের পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে নানা ভাবে।

এই সামনের ঘরটাতেই আছে স্বর্ণেন্দু। যাও, ভেতরে যাও তুমি।

পাশের সিঁড়ি বেয়ে তিনি দোতলায় উঠে গেলেন। এমন নির্বিকারভাবে গেলেন, যেন এ বাড়ির তিনি কেউ নন, কিংবা যেন সমস্তই তাঁর এত জানা, এমন নখদর্পণে যে, এ সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র কৌতূহল তাঁর অবশিষ্ট নেই, এমন কি এই সব কেন্দ্র করে শিষ্টাচার করাও যেন তাঁর পক্ষে ক্লান্তিজনক।

দ্বার ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই স্বর্ণেন্দুর বাবার মুখখানা চোখে পড়ল, আধখানা মরা আধখানা জীবন্ত মুখ। দ্বার খোলার শব্দে জীবন্ত চোখটা খুলে গেল, সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর আবার বুজে গেল চোখটা. নীরবে যেন তিনি বললেন, ও, বুঝেছি। ঘরে আর কেউ নেই। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। রকেটের মত ছুটে বেড়াতেন যিনি, যাঁর সুনীতি-দুর্নীতি-পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে, তা বলশেভিক রাশিয়াতেও চলবে কি না সন্দেহ, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিছানায় পড়ে আছেন—নির্বাক, নিঃসঙ্গ, ছেলে মেয়ে স্ত্রী কেউ কাছে নেই। এ রকম করুণ দৃশ্য আমার ডাক্তারী জীবনে আরও দেখেছি। বাড়ির কর্তা হঠাৎ যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যা নেন, তখন তাঁকে ঘিরে কিছুকাল চিকিৎসার সমারোহ হয়, যার যেমন সঙ্গতি সেই অনুসারে। তারপর ক্রমশ সব থেমে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে অনিবার্য দুর্ঘটনাটা সকলের গা-সওয়া হয়ে আসে, আত্মীয়-স্বজনের স্নায়ু-কেন্দ্রে উত্তেজনা সঞ্চার করবার মত তীব্রতা আর তাতে থাকে না। তখন অসহায় চলচ্ছক্তিহীন শয্যাশায়ী বৃদ্ধের সেবা করাটা ক্রমশ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর মত নিয়ম-রক্ষাগোছ কর্তব্যে পরিণত হয়। ঠাকুরের সঙ্গে শয্যাশায়ী কর্তার কিন্তু অনেক তফাত। সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে বিলম্ব হলে মাটির ঠাকুর প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু সেবার ত্রুটি ঘটলে (এবং অনেক সময় সেবার ত্রুটি ঘটেছে কল্পনা করে নিয়ে) পক্ষাঘাতগ্রস্ত কর্তা অসন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেবক-সেবিকারাও—হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলে

মেয়েরাই—বিরক্ত হয়ে ওঠেন দেখেছি। কতদিন আর একটানা রাত্রি জাগা যায়, বার বার কতবার বিছানা বদলাতে পারে মানুষে,—হ'লই বা স্বামী, হ'লই বা বাবা—মানুষের, রক্তমাংসের মানুষের, সহ্যের সীমা আছে তো! পুত্রও তখন পিতাকে রূঢ়ভাষণ করে, সতী রমণীর মুখ দিয়েও যে বাক্য নির্গত হয় তা রমণীয় নয়। আমার মনে একটা কথা জাগছিল, মধুপুর ছেড়ে কলকাতা শহরের এই এঁদো গলিতে চলে এলেন কেন এঁরা? পরে জেনেছি, আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বর্ণেন্দু যখন তার মাকে মথুরা থেকে আনতে গিয়েছিল, তখন তাঁকে বলে নি যে, মধুপুরে জ্যোতির্ময়ের বাড়িতেই যাচ্ছে তারা; এবং তিনি পূর্ণেন্দুবাবুর সম্বন্ধে এত নির্বিকার ছিলেন যে, কৌতূহলও তেমন প্রকাশ করেন নি তখন,—পূর্ণেন্দুবাবু সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহলই যেন অবসান হয়ে গিয়েছিল তাঁর। স্বর্ণেন্দুর মা জানতেন, জ্যোতির্ময়ের বাড়িতে ভাড়াটে আছে এবং জ্যোতির্ময় মেতে আছে তার চিত্র-প্রদর্শনী নিয়ে কলকাতায়। ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়েছে—জ্যোতির্ময় ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিয়েছে, চিত্র-প্রদর্শনীর দরজায় তালা বন্ধ করে দিয়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চলে এসেছে, এসব কিছুই জানতেন না তিনি। যেদিন জানতে পারলেন, সেই দিনই তিনি মথুরা থেকে চলে এলেন এবং এমন সব কাণ্ড করতে লাগলেন, এমন ঘন ঘন ভয় হতে লাগল তাঁর যে, স্বর্ণেন্দু বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে চলে এল কলকাতায়। আমার মনে হয়, স্বর্ণেন্দু যদি সমস্ত ব্যাপারটা মথুরাতেই মাকে খুলে বলত, এত কাণ্ড হ'ত না, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আর রাত্রি এতদিন একসঙ্গে থাকবার সুযোগ পেত না। এ কথা শোনা মাত্র প্রবল আপত্তি করতেন তিনি এবং তাঁর প্রবল আপত্তির বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু, জ্যোতির্ময়, রাত্রি কেউ দাঁড়াতে পারত না। স্বর্ণেন্দু ভেবেছিল, মাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোন রকমে এনে ফেলতে পারলে হয়তো তিনি বুঝবেন সব, হয়তো তিনি রাত্রি আর জ্যোতির্ময়ের মেলামেশা দেখে বিয়ে দিতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু ভুল ভেবেছিল স্বর্ণেন্দু, নিজের মাকে সে চিনত না। ক'জনই বা চেনে? গাছ কি মাটিকে ভাল করে চেনে? মাটির সব দৈন্য-ঐশ্বর্যের খবর রাখে? সে শুধু মাটির রস চেনে, যা শোষণ করে সে বড় হয়।

পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত-চোখটা আবার খুলে গেল। শুধু খুলে গেল নয়, ক্রমশ বড় হতে লাগল, মনে হ'ল ছুটে এসে, বুলেটের মত আঘাত করবে আমাকে এখুনি। যদিও মৃত চোখটা সঙ্গে সঙ্গে মিনতি করছিল, তবু আমি সামনের

দেওয়ালে পরদা-ঢাকা যে দরজাটা ছিল, সেইটে দিয়ে দ্রুতপদে ঢুকে পড়লাম পাশের ঘরটাতে।

খুব লম্বা সরু গোছের ঘরটা, কমানো টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলোকে ঈষৎ আলোকিত। ঘরের অপর প্রান্তে একটা খাটে বংশী শুয়ে ছিল, তার মাথার শিয়রে বসে ছিল স্বর্ণেন্দু, তার গোঁফ-দাড়ি-সমাকীর্ণ আনত মুখখানাতে সস্নেহ সেবাপরায়ণতা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। স্বল্পালোক সত্ত্বেও আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম, আমার ভুল হয়নি। ভুল হয়নি বলেই প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও আমি জানি, স্বর্ণেন্দু নির্দোষ। আমি এগিয়ে যেতেই স্বর্ণেন্দু চোখ তুলে চাইলে, তারপর একটু হাসলে—ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার—তারপর বললে, আয়, বস্।

বসলাম।

কি হয়েছে বংশীর, কে দেখছে ?

কোন ডাক্তার ডাকি নি এখনও। এসেই কম্প দিয়ে জ্বর এল, ভাবলাম, ম্যালেরিয়া, দু' একদিনে সেরে যাবে, কিন্তু আজ বিকেল থেকে কেমন যেন—

কম্প দিয়ে জ্বর, নিশ্বাসের দ্রুত-গতি এবং প্রলাপ দেখে সন্দেহ হ'ল লোবার নিউমোনিয়া। বংশী বিড়বিড় করে বকছিল, হঠাৎ জোরে জোরে বলে উঠল, তোমার বয়স কত, তা আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধে ওসব কিছু জানতে চাই না আমি, আমি তোমাকে চাই। কোথায় রাত্রু! রাত্রু! আবার খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে কি খানিকটা বলে গেল। তারপর আবার জোরে—হ্যাঁ, দিয়েছিলে, একদিন তো দিয়েছিলে, কেন দিয়েছিলে, কেন ?—উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে উঠতে গেল, স্বর্ণেন্দু শুইয়ে দিলে জোর করে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, হঠাৎ চোখে পড়ল, অন্ধকারে রাত্রিও বসে আছে বিছানার ও-পাশটায়, বংশীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। চোখে অদ্ভুত একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম তিনজনেই। বংশী কখনও বিড়বিড় করে, কখনও জোরে জোরে প্রলাপ বকতে লাগল। ঠিক কতক্ষণ যে বসে ছিলাম, এসব শুনে ঠিক সেই সময়ে মনে কি কি ভাবোদয় হয়েছিল, তা এখন ভাল করে মনে নেই। এর পর যে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে তা এই—স্বর্ণেন্দু রাত্রিকে বলছিল, ভোরে জ্যোতির্ময়কে তুই কি স্টেশন থেকে আনতে যাবি ? সে তো এ বাসা চেনে না।

যাব।

স্বর্ণেন্দু স্নেহভরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাত্রির দিকে। শুধু স্নেহ নয়, একটা মুগ্ধ ভাবও যেন লক্ষ্য করেছিলাম তার চোখে। বিছুটির পূর্ণপুষ্পিত রূপটি হয়তো দেখেছিল সে তখন।

হঠাৎ বংশী বলে উঠল, ইজিপ্টে ভাই-বোনে বিয়ে হ'ত—

রাত্রির নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি আরও হিংস্র হয়ে উঠল।

বংশী প্রলাপ বকছে।

জ্যোতির্ময় কয়েক ঘন্টা পরেই এসে পড়বে।

এর পর সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা যদিও এই অধ্যায়েরই বিষয়বস্তু, পর পর ঘটেছিল, সুতরাং একসঙ্গেই বর্ণনীয়, কিন্তু তাদের গুরুত্ব এত বেশি, এবং শুধু লেখক হিসাবেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমি এ কাহিনীর সঙ্গে এমন বিজড়িত যে, একটানা লিখে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসে আছি। সাশির লাল নীল সবুজ বেগুনী নানা রঙের কাচের ভেতর দিয়ে একই সূর্যালোক নানা বর্ণে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে আমার খাতার ওপর। একই সূর্যালোক! সবিস্ময়ে এই কথাটাই ভাবতে ইচ্ছে করছে বার বার।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি পরবর্তী একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সেই কারণে করতে চাই, যে কারণে মহাভারতের সম্ভব-পর্বে অলৌকিক-ধীশক্তি-সম্পন্ন অযুত-নাগেন্দ্র-সদৃশ বলবান, সুবিদ্বান, মহাবীর্য, মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধ হবার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়েছিলেন, মহাভারতকার বলেছেন, মায়ের দোষে। সত্যবতী যদিও পুত্রবধূ অম্বিকাকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন—তোমার এক দেবর আছেন, আজ রাত্রে তিনি তোমার নিকট আসবেন, তুমি অপ্রমত্তা হয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করো ; কিন্তু অম্বিকা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন নি। দীপশিখার প্রদীপ্ত আলোকে কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু দেখে ভয়ে বিস্ময়ে চক্ষু দুটি নিমীলিত করে ফেলেছিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ হতে হয়েছিল। অন্ধতা-প্রযুক্ত তিনি যা করেছিলেন, তার জন্যে দায়ী তাঁর মা—অম্বিকা।

সেদিন শেষরাত্রে জ্যোতির্ময়কে স্টেশন থেকে আনতে যাবার মুখে রাত্রি আমার বাসায় এসেছিল কয়েক মিনিটের জন্যে। স্টেথোস্কোপ প্রভৃতি নিয়ে রীতিমত চিকিৎসক-বেশে আমি দ্বিতীয়বার যখন বংশীর চিকিৎসা-উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়েছিলাম, তখন আমার ঠিকানা আর ফোন-নম্বর দিয়ে বলে এসেছিলাম, একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, প্রলাপটা যদি না কমে, খবর দিও। সেই ঠিকানার সহায়তায় রাত্রি এসেছিল ভোরবেলা।

মনে দুশ্চিন্তা ছিল, মোহ ছিল, পেটে ক্ষুধাও ছিল প্রচুর (কারণ রায় মশায়ের বাড়িতে খাওয়া হয় নি এবং সে কথাটা গোকুলকে অত রাত্রে বলবার সাহস হয় নি), তবু এসে শোওয়া মাত্র আমি অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শুধু তাই নয়, স্বপ্নও দেখেছিলাম একটা। যেন প্রকাণ্ড একটা দিগন্তবিস্তৃত জলাশয়, কিন্তু তাতে জল নেই, আছে খালি কাদা—কাদা যে আছে তাও দূর থেকে বোঝা যায় না ; মনে হয়, শক্ত জমি ; স্থানে স্থানে সবুজের আভাস আছে, কিন্তু তার ওপর দিয়ে চলতে গেলেই হাঁটু পর্যন্ত

পুঁতে যায়। সেই নির্জলা জলাশয়ের ওপর দিয়ে আমি আর রাত্রি যেন চলেছি, বার বার হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে যাচ্ছে। রাত্রি আমার ওপর ভর দিয়ে পঙ্ককুণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে, কিন্তু তার দৃষ্টি আমার দিকে নেই, নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে আছে শূন্য দিগন্তের পানে।

হঠাৎ কড়কড় করে দুয়ারের কড়াটা নড়ে উঠতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। নেবে গেলাম। কপাট খুলেই দেখি, রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা সুটকেস। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল সে, আমিও চেয়ে রইলাম।

বংশী কি এখনও প্রলাপ বকছে?

থেমে গেছে।

অতি সাধারণ ব্রোমাইডে এত তাড়াতাড়ি এমন ফল পাওয়া যাবে, তা যদিও আমি প্রত্যাশা করি নি, তবু আত্মপ্রসাদে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

আপনি কি জ্যোতির্ময়বাবুকে আনতে হাওড়া যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। এই সুটকেসটা আপনার এখানে রেখে যেতে চাই। আপনার কি কোন অসুবিধে হবে?

না, কিছুমাত্র না।

একটা সুটকেস হাতে করে জ্যোতির্ময়বাবুকে আনতে যাবার হেতু কি এবং হেতু থাকলেও মধ্যপথে সে সুটকেস আমার বাসায় রেখে-যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন—এই সব অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন আমার মনে জাগে নি তখন। আমি সেদিন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, বাস্তব জগতের সঙ্গতি-অসঙ্গতির কোন অর্থ ছিল না আমার কাছে। এখন জেনেছি, পাছে পুলিসের হাতে চিঠিখানা পড়ে, এই ভয়েই সে সুটকেসে চিঠিখানা ভরে নিয়ে এসেছিল, তারপর মাঝ-রাস্তায় তার মনে হয়েছিল, জ্যোতির্ময় যদি চিঠিখানা দেখে ফেলে! চিঠিখানা সে নষ্ট করে ফেলে নি কেন, তা এখনও আমি ভেবে পাই না। বোধ হয় চিঠিখানা রেখেছিল নিজের ধর্মপরায়ণা মায়ের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল-স্বরূপ, অবশ্য এ সব আমার কল্পনা।

রাত্রি চলে গেল। স্টেশন থেকে জ্যোতির্ময়কে নিয়ে আর ফেরে নি সে। শবিতার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের দেখা হবার সুযোগই সে দেয় নি। ফিরেছিল মাস চারেক পরে। জ্যোতির্ময় সঙ্গে ছিল না, সঙ্গে ছিল অবনীশ। অবনীশও

বেশিক্ষণ থাকে নি, রাত্রিকে রেখে সে পরের ট্রেনেই ফিরে গিয়েছিল বম্বেতে। ব্যবসায়ী লোক সে, নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে ছিল না।

যে স্যুটকেস রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল···হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের মুখটা মনের মধ্যে জেগে উঠছে আমার। আচ্ছা, কেন এমন হয় বলতে পারেন, একটা কথা ভাবতে ভাবতে অতর্কিতে আর একটা কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে, একটা ছবিকে আড়াল করে আর একটি ছবিকে জাহির করতে চায়? জ্যোতির্ময়কে আমি দেখি নি কখনও, কিন্তু তার কথা শুনেছি অনেক। যখনই আমি তাকে কল্পনা করি তখনই দেখি, সে যেন খুব দামী বিরাট একখানা মোটর 'ফুল স্পীডে' হাঁকিয়ে চলেছে। প্রকাণ্ড ভারী ফরসা মুখে টানা টানা চোখ, কালো সরু লম্বা একটা সিগারেট-হোল্ডার মুখের এক কোণে কামড়ে ধরে আছে, হু-হু শব্দে হাওয়া বইছে, হু-হু শব্দে মোটর ছুটে চলেছে, মাথার বিস্রস্ত চুলগুলো উড়ছে, স্টিয়ারিং ধরে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে জ্যোতির্ময়। সে আশপাশের কাউকে দেখছে না, গাড়ির ভালো-মন্দর দিকেও তার লক্ষ্য নেই, পাশে কে বসে আছে তাও তার খেয়াল নেই—সে ফুল স্পীডে খালি ছুটে চলেছে।

সেদিন যে স্যুটকেসটা রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল, তা আমি প্রায় তিন মাস পরে খুলেছিলাম, মানে—খুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাতে রাত্রিরই দু-একখানা কাপড় শেমিজ ব্লাউজ ছিল, আর ছিল একখানা চিঠি। রাত্রির মায়ের চিঠি, পূর্ণেন্দুবাবুকে লেখা। সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি চিঠিখানার কথা বলতে চাই। অবশ্য চিঠিখানা যে পূর্ণেন্দুবাবুকেই লেখা, চিঠিতে তার কোন প্রমাণ নেই, চিঠিতে 'শ্রীচরণেষু' ছাড়া অন্য কোন সম্বোধনই ছিল না। তবু কিন্তু চিঠির ধরন-ধারণ, তাতে ফার্নানডিজের উল্লেখ, অনুতাপ মিশ্রিত একটা করুণ আকুতি, আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি—অবশ্য কল্পনায়—যে চিঠিখানা পূর্ণেন্দুবাবুকেই রাত্রির মা লিখেছিলেন। আদালতে হয়তো এ কথা প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার অন্তর্যামী এ বিষয়ে নিঃসংশয়।

আমার গোকুলচন্দ্র ছুটি না নিলে এ আবিষ্কার সম্ভবপর হ'ত না। শুধু তাই নয়, গোকুল যদি নীলুর চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিমান আর কাউকে দিয়ে যেত, তা হলেও হয়তো হ'ত না। তৃতীয় এবং সর্বপ্রধান যে কারণে এই 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হয়েছিল, সেটা হচ্ছে গয়াতে হঠাৎ আমার বাল্যবন্ধু

ডি.কে.-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অদ্ভুত রকম যোগাযোগ সেটা। আমার কলকাতারই এক বড়লোক মক্কেল গয়ায় গিয়েছিলেন পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করতে। গয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং গয়ার চিকিৎসকদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে না পেরে (অদ্ভুত জিনিস এই আস্থা !) আমাকে টেলিগ্রাম করলেন। আমি এলাম, চিকিৎসা করলাম, নিজের জীবনীশক্তির জোরেই বোধ হয় তিনি সেরে উঠলেন। আমি কিছু সুনাম এবং অর্থ নিয়ে সানন্দে ফিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ রাস্তার ব্যায়ামবীর ধীরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা। ধীরেনের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার আরও দু' একবার দেখা হয়েছিল, মাঝে মাঝে সে দু' একবার আমার বাসায় এসেছে গেছে, সুতরাং এক নজরেই দু'জনে পরস্পরকে চিনতে পারলাম। সাধারণ কাপড়-জামা পরে থাকলে ধীরেনকে ব্যায়ামবীর বলে চেনবার যেমন উপায় নেই, তার নেপালী-ধরণের শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডলের মৃদু হাসি দেখেও তেমনই বোঝবার উপায় নেই যে, ছোকরা ভীষণ রকম একগুঁয়ে। মাথায় একবার একটা ধারণা বসে গেলে আর নড়তে চায় না। গয়ার ধূলিধূসর রাস্তায় আমাকে দেখতে পেয়ে ডি. কে. থমকে খানিকক্ষণ দাঁড়াল, ক্ষণকাল কি চিন্তা করল এবং পরমুহূর্তেই উল্লসিত হয়ে উঠল—আমার অপ্রত্যাশিত দর্শন লাভ করে নয়, অন্য কারণে। গয়ায় আমার আগমনের কারণ খুলে বলতেই, 'অদ্ভুত যোগাযোগ তো' এই কথা কটি উচ্চারণ করে ডি. কে. আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করলে। অর্থাৎ সে সঙ্গে সঙ্গে কৃতনিশ্চয় হয়ে গেল যে, আমি নির্ঘাত ওর সঙ্গে তাজমহল দেখতে আগ্রা যাচ্ছি, আকস্মিক যোগাযোগটাই ওর বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করছিল। আমি যে ওর সঙ্গে যাবই,—অর্থাৎ নিজের শক্তি সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। 'খপ্পর' নামক ছোট্ট কথাটি যে কত প্রবল এবং কিরূপ জটিলতাবোধক, ধীরেনের খপ্পরে না পড়লে তা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শিকারের গায়ে এক পাক কোনক্রমে জড়াতে পারলে পাইথন যেমন শিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়, আমার নাগাল পাওয়া মাত্র ধীরেনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক, একজন বাঙালী সঙ্গী পাওয়া গেল। বাঙালী সঙ্গী না হলে যে ওর ভ্রমণ আটকে ছিল তা নয় ; কিন্তু ধীরেনের ওই স্বভাব,—একটা ধারণা মাথায় একবার প্রবেশ করলে সহজে বেরুতে চায় না। সাধারণত বাঙালীরা যেমন ফোটো তোলায় একবার বিয়ের সময় আর একবার মৃত্যুর পর, তেমনই ভ্রমণও করে—হয়

চাকরি কিংবা ব্যবসায় ব্যপদেশে, অথবা ধর্মকামনায় বৃদ্ধবয়সে, যদি সঙ্গতি থাকে। শুধু শুধু তাজমহল দেখতে পয়সা খরচ করে আগ্রা যাব—এ চিন্তাও বাঙালী-সন্তানের কাছে হাস্যকর। সত্য মিথ্যা নানা ওজুহাত দেখিয়ে আপত্তি করলাম। কিন্তু ডি. কে.-র মাথায় ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল, তা ছাড়া সে ভাল করে জানত, কি করলে বাঙালী-সন্তান কাবু হয়! কিছু না বলে সে এগিয়ে এল এবং আমার গলাটি জড়িয়ে আমার টিকিট এবং সদ্য-লব্ধ 'চেক' সমেত 'মনিব্যাগ'টি বুক-পকেট থেকে বার করে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ডি. কে. পালোয়ান লোক, কপাল দিয়ে লোহার ডাণ্ডা বেঁকাতে পারে, বুকের ওপর মোটরকার চড়ায়, তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করতে যাওয়া বৃথা। সকাতরে বললাম, আমি প্রায় এক কাপড়ে চলে এসেছি ভাই, যদি নিতান্তই যেতে হয়, কলকাতা থেকে জিনিস-পত্র নিয়ে আসি তা হলে।

ডি কে. আর একবার মৃদু হেসে চাইলে আমার দিকে।

নীরবেই পথ অতিবাহন করতে লাগলাম দু'জনে খানিকক্ষণ।

পোস্ট-অফিসের সামনে এসে ধীরেন বললে, দাঁড়াও একটু।

দাঁড়িয়ে রইলাম, পালাবার উপায় নেই, ব্যাগ ওর কাছে। মিনিট দশেক পরে পোস্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চল।

কোথায়?

ধর্মশালায়, ওইখানেই উঠেছি আমি।

ধীরেনকে ভ্রমণের নেশায় পেয়েছিল। বললে, দু'মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্মশালায় পৌঁছে বললে, তোকে আগ্রা থেকেই ছেড়ে দেব। আমার কেদার-বদরি পর্যন্ত ধাওয়া করবার ইচ্ছে আছে। একা একা ভাল লাগছিল না, এমন সময় তোর সঙ্গে দেখা।

আমার যে কাপড়-চোপড় কিচ্ছু সঙ্গে নেই।

রাত এগারোটা নাগাদ সব এসে পড়বে। আমার চেনাশোনা একটি লোক আসছে আজ, তাকেই টেলিগ্রাম করলাম তোর বাসা থেকে তোর কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন, না এসে পড়ে, কিনে নিলেই হবে। আমি দাম দেব।

পাইথনের হাত থেকে নিস্তার পেলাম না।

আমার বাসায় গোকুল ছিল না, নীলু ছিল। গোকুল থাকলে আমার

নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা এসে পড়ত, কিন্তু নীলু থাকাতে এসে পড়ল সেই সুটকেসটা, যা একদা তিন মাস আগে রাত্রি রেখে গিয়েছিল আমার কাছে প্রদোষের গোপনতায়।

॥ ২ ॥

ধীরেনকে মিছে কথা বলেছিলাম। একেবারে যে আমার কাছে কাপড়-চোপড় ছিল না তা নয়, অল্প-সল্প ছিল। আগ্রার ধুলোয় দু' দিনেই সে সব ময়লা হয়ে গেল। ধীরেনের সেদিন যাবার কথা, ট্রেনের বেশি দেরি ছিল না। নিজের জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল সে। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে হঠাৎ সে বললে, আচ্ছা, তুই এ স্যুটকেসটা আনালি, অথচ একদিনও খুললি না কেন বুঝতে পারছি না!

ওর চাবি আমার কাছে নেই।

চাবি নেই বলে ময়লা কাপড়-জামা পরে ঘুরবি!

ঘরের কোণে স্যুটকেসটা ছিল, ডি. কে. উবু হয়ে গিয়ে বসল তার সামনে এবং আমি কিছু বলবার আগেই তালাটা ধরে এমন একটা মোচড় দিলে যে, সবশুদ্ধ উপড়ে উঠে এল। অপর কেউ হলে বাক্সের ডালাটা তুলে দেখত এরপর, কিন্তু ডি. কে র তা স্বভাব নয়। সে স্থানচ্যুত কলশুদ্ধ তালাটা মেঝেতে রেখে আমার দিকে একবার চাইলে এবং তারপর বেসুরে একটা গান গুনগুন করতে করতে আবার নিজের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। সেই দিনই ও মথুরা হয়ে হরিদ্বার যাচ্ছিল, সেখান থেকে হৃষিকেশ-কনখল সেরে লছমনঝোলা যাবে। লছমনঝোলা থেকে কেদার-বদরি। ও তখন মনে মনে মশগুল হয়েছিল, একটা ছোট স্যুটকেসের ভেতর কি আছে তা দেখবার কৌতূহলই হ'ল না ওর। তালা ভাঙা সত্ত্বেও আমিও যে তখুনি উঠে বাক্সটা খুললাম না, সেটাও ওর নজরে পড়ল না। ওর স্বভাবই ওই রকম। একটু পরেই টাঙা ডেকে আমি স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলুম ধীরেনকে। ধীরেন বলে গেল, কেদার-বদরি থেকে যদি ফিরতে পারে, তাহলে আবার কলকাতায় দেখা করবে এসে। আমি আগ্রায় আরও দু' একদিন থেকে গেলাম, কাছাকাছি আরও দু' একটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে যাবার লোভ হ'ল।

এই সূত্রে এক সিগারেটখোর সায়েবের গল্প মনে পড়ছে, এবং তার সঙ্গে

নিজের আচরণের তুলনা করে মনে যে অনুভূতি জাগছে, চলতি ভাষায় তাকে লজ্জাই বলতে হয়, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, আমরা নির্লজ্জ। এক ডাকবাংলোয় এক সিগারেটখোর সায়েবের দেশলাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি সব দোকানে খোঁজ করলেন, কিন্তু 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' দেশলাই পাওয়া গেল না, সব 'মেড ইন জাপান'। ছ' ক্রোশের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের তৈরি দেশলাই পাওয়াই গেল না। সন্ধ্যাবেলা স্টিমার এল, তাতে 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' দেশলাই পাওয়া গেল, তারপর সায়েব সিগারেট ধরালেন। সমস্ত দিন তিনি সিগারেট খান নি।

আমাদের আদর্শনিষ্ঠা অতিশয় ঠুনকো। সামান্য একটু চাপ পড়লেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ডি. কে. চলে যাবার পর রাত্রির স্থটকেস খুলে দেখেছিলাম। তাতে দু' একখানা শাড়ি-ব্লাউজ ছাড়া একখানা চিঠি ছিল। কারও চিঠি তার বিনা অনুমতিতে পড়া যে অনুচিত—এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও চিঠিখানা পড়েছিলাম আমি। পূর্ণেন্দুবাবুকে লেখা রাত্রির মায়ের চিঠি।

॥ ৩ ॥

তার পরদিন ঠিক সূর্যোদয়ের পূর্বে তাজমহলের একটা মিনারেটের ওপর একা বসেছিলাম। গ্রীষ্মকাল। দেখছিলাম, প্রায়-নির্জলা যমুনা পূর্বমহিমার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে কোনক্রমে। কল্পনা করবার চেষ্টা করছিলাম, আলমগীর-কল্পিত কালো তাজমহল যদি যমুনার ওপারে সত্যিই নির্মিত হ'ত, কেমন দেখতে হ'ত সেটা। তাজমহলের অভ্যন্তরে বৃদ্ধ পরিচারকের মুখনিঃসৃত 'আল্লা' শব্দটার করুণ প্রতিধ্বনি আবার যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল আগ্রা ফোর্টের সেই অংশটা, যেখানে শাহজাহান এসে বসতেন—দেওয়ালের গায়ে সারি সারি সবুজ গোল পাথর আর তার প্রত্যেকটিতে তাজমহলের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। সহসা সমস্ত অবলুপ্ত করে মনে পড়ল চিঠিখানার কথা। চিঠিখানা পকেটেই ছিল, আবার খুলে পড়লাম, বার বার করে সেই অংশটাই পড়লাম, যার অর্থ বুঝতে পেরেও বুঝতে না পারার ভান করছিলাম।—

"তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার অনুমতি না নিয়ে কেবল মাত্র ফার্নান্ডিজকে সঙ্গে করে আমি শিবসমুদ্রম্ দেখতে কেন গিয়েছিলাম, সেখানে কেনই বা আমার দু' দিন দেরি হ'ল—এ সবের জবাবদিহি তোমার কাছে দিতে আমি বাধ্য নই, তা তুমি জান। জেনেশুনেও তুমি তবু জবাবদিহি

তলব করেছ, কারণ তুমি পুরুষ, উচ্ছ্বাসের মুখে যে সব প্রতিশ্রুতি দাও, উচ্ছ্বাস কমে গেলে তা পালন করবার কষ্ট স্বীকার করতে চাও না। এখন তুমি অনায়াসে ভুলে গেছ যে, শান্তনুর মত তুমিও একদিন আমার কাছে গদ্‌গদ ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমার কোন আচরণের প্রতিবাদ তুমি করবে না। অথচ আজ তুমি কড়া ভাষায় জবাবদিহি চেয়েছ। ন্যায়ত ধর্মত যাঁর জবাবদিহি দাবি করবার অধিকার, তিনি ভুলেও কখনও তা করেন নি, করবেনও না। তুমি কি জান না, তুমিই এর মূর্তিমান জবাবদিহি!…"

এ ক'টি কথার মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করবার সাহস আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। রাত্রির অন্ধকারে গাছকে ভূত এবং মেঘকে পর্বত বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। তবু আমি জানি, আমি ভুল করি নি। রাত্রিকে এ বিষয়ে কোনদিন—হ্যাঁ, অধিকার পেয়েও—প্রশ্ন করি নি। স্যুটকেসটি নিখুঁতভাবে সারিয়ে নিরুৎসুকভাবেই ফেরত দিয়েছিলাম।

বেশ মনে পড়ছে, চিঠিখানা পড়বার পর আবার আমার কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল যমুনার অপর পারে কালো তাজমহলের নিকষকৃষ্ণ নিবিড় কান্তি,—তার কোথাও একবিন্দু সাদা নেই, আগাগোড়া সমস্ত কালো।

তারপর সহসা অনুভব করলাম, আমি শুভ্র তাজমহলের সু-উচ্চ মিনারেটে বসে সূর্যোদয় দেখছি—কালো তাজমহলটা নিছক কল্পনামাত্র।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

সেদিন ভোরে স্থটকেসটা আমার কাছে রেখে রাত্রি যখন চলে গেল, আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। রাত্রির অপ্রত্যাশিত অভ্যাগম ও অন্তর্ধান, তিন খোরাক ব্রোমাইড মিকৃশ্চারের কার্যকরী শক্তি এবং তজ্জন্য নিজের ঈষৎ গর্ব, আমার বৈঠকখানা-ঘরের নতুন-কেনা নীল-ডোম-দেওয়া ইলেকট্রিক বাতির নীলাভ আলো, কয়েকটা কলের সমবেত বংশীধ্বনি—সমস্তটা মিলিয়ে সেটা যেন একটা নূতন রকম ভোর।

এই গলিতে যত দিন থেকে বাস করছি, তত দিন ভোরের সঙ্গে যে কটা জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলে আমার ধারণা, সেদিন ভোরে এক ওই কলের বাঁশি ছাড়া, কি করে জানি না, বাকি কটা জিনিস বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রোজ হড়হড় শব্দ করে ময়লাফেলা গাড়ি যায়, কড়কড় শব্দ করে পাশের বাড়ির ঝি এসে কড়া নাড়ে, ঘড় ঘড় শব্দে গলার কফ তুলতে তুলতে সামনের বাড়ির দ্বারিকবাবু তামাক খান, গড়বড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে একদল লোক গঙ্গাস্নান করতে যায়, ছড়ছড় করে কলে জল আসে। সেদিন ভোরেও এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ চেতনায় দাগ কাটতে পারে নি। সেদিনকার ভোরটা গগন ঠাকুরের ছবির মত একটা বিশিষ্ট অপরূপতায় আঁকা আছে আমার মানসপটে এখনও। নীলাভ আলোতে রাত্রি এসে দাঁড়াল, বংশীর প্রলাপ থেমে গেছে শুনে আমার মন আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, রাত্রির স্থির দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত প্রশংসার আভাস মাত্র না দেখে একটু ক্ষোভ জাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে রাত্রির গম্ভীর প্রকৃতির পরিচায়ক মনে হওয়াতে সান্ত্বনা এল, নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কলের বাঁশিগুলো বেজে উঠল, রাত্রি চলে গেল।

বেশ মনে পড়ছে, আমার মনে হয়েছিল যে, কলকাতা শহরে মাটি আকাশ গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের কোন অর্থ নেই, যেখানে ফুলের স্থান গাছে নয়—বাজারে, যেখানে পাখি নীড় বাঁধে না—খাঁচায় থাকে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সকলেই যেখানে নেশার ঘোরে উন্মত্ত, সুস্থ মনোবৃত্তি যেখানে উপহাসের খোরাক, নারীর নারীত্ব, কবির কবিত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে

পণ্যদ্রব্যের সামিল, যেখানে ট্রামে বাসে সিনেমায় বড় রাস্তায় গলিতে সর্বত্রই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মৃতপ্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিস্তেজ আক্ষেপকে আনন্দ বলে মনে করে কৃত্রিম উল্লাসের ভান করছে, সেই কলকাতা শহরের বুকে এমন একটা ভোর সম্ভব হল কি করে! বিস্ময় জেগেছিল মনে, একটা স্বপ্নসুলভ আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি, সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলাম যে, বর্তমান যুগের উন্মাদ জনতার আমিও একজন, যে আনন্দে অভিভূত হয়েছি তা বর্তমান-যুগ-সুলভ স্বাপ্নিক আনন্দই, বলিষ্ঠ কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম তখন দেখলাম, সেই নীলাভ আলোতে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে তন্ময় হয়ে 'লোবার নিউমোনিয়া' সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করছি। আমার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত বিদ্যা একাগ্র হয়ে উঠেছে—বংশীকে বাঁচাতে হবে। হোক রাত্রির প্রকৃতি সুগভীর, বংশীকে যদি সত্যি সত্যি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, এতটুকু কৃতজ্ঞতার ঢেউ কি জাগবে না তার রহস্যময় অন্তর-সমুদ্রে, নিষ্পলক চোখের দৃষ্টিতে সামান্যতম কোমলতাও কি আভাসিত হবে না?·· কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে নেই। আরও অনেকক্ষণ হয়তো পড়তাম, যদি না একটা তীব্র অনুভূতির তাড়নায় উঠে বসতে হ'ত। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। সমস্ত রাত খাওয়া হয় নি। সহসা পুঞ্জীভূত বিরক্তিসহকারে ডাক্তারী বইগুলো সরিয়ে ফেলে অনাবশ্যক রকম উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম গোকুলকে, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। খোলা দরজা দিয়ে কুণ্ঠিত ভোরের আলো ঘরে প্রবেশ করল, ইলেকট্রিক আলোর ভয়ে সে যেন এতক্ষণ বাইরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়েছিল।

আদেশ শুনে গোকুল খুশি হ'ল, মনে মনে একটু বিস্মিতও হ'ল বোধ হয়। 'ভয়ানক খিদে পেয়েছে' বলে খাবার দাবি করছি, এর চেয়ে আনন্দ-জনক বিস্ময়কর ঘটনা গোকুলের জীবনে বেশি ঘটে না। ওকে প্রত্যহ অনুযোগ, মিনতি, বকুনি, অভিমান—নানা উপায় অবলম্বন করতে হয় আমাকে পেট ভরে খাওয়াবার জন্যে। ওর ধারণা, ছোট ছেলেরা যেমন মাকে ফাঁকি দিয়ে নানা ছুতোয় খায় না, আমিও তেমনই নানা ছুতোয় গোকুলকে ফাঁকি দিই। মহানন্দে গোকুল একটা বড় পাউরুটি কাটতে বসে গেল। একটু পরে শব্দ শুনে বুঝলাম, ডিমও ফ্যানাচ্ছে—গোকুল জানে আমি কি ভালবাসি, ও পুরুষমানুষ নয়, ও মা।

এখন আমার মনে হচ্ছে, সেদিন এই দেরিটা যদি না হ'ত অর্থাৎ রাত্রির

আসা, স্যুটকেস রাখা, চলে যাওয়া—এই সামান্য ঘটনা যদি আমাকে সেদিন অতটা স্বপ্নাচ্ছন্ন না করত, বড় বড় ডাক্তারী বই ঘেঁটে অতখানি সময় যদি আমি অনর্থক নষ্ট না করতাম, অমন অসময়ে যদি অত খিদে আমার না পেত, রায় মশায়ের বাড়িতে রাত্রির সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বেই যদি আহারটা সমাধা করতে পারতাম—অর্থাৎ অনিবার্যভাবে যে যে ঘটনা ঘটাতে স্বর্ণেন্দুর ওখানে যেতে আমার দেরি হয়ে গেল,—সেগুলো যদি না ঘটত, তা হলে হয়তো জিনিসটা অন্য রকম হতে পারত। দেরি হ'ল বলেই প্রাতর্ভ্রমণ-ফিরতি ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, তিনি গল্পের অবতারণা করে আরও দেরি করে তো দিলেনই, আমার মুখে সমস্ত শুনে পূর্ববন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন এবং নিজের চোখে সমস্ত দেখে আইনের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।

আমি স্নান সেরে যখন চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময়ে দ্বারের কাছে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রঙ-চটা-গাঁট-গাঁট ল্যাঠিটি বগলে করে ঈষৎ ঝুঁকে রুমালের ঝাপটা দিয়ে প্যানেলা জুতো থেকে ধুলো ঝাড়ছেন ধরণীবাবু। আমাকে দেখে ঈষৎ হাসলেন, তারপর যেন আমার একটা জুয়াচুরি ধরে ফেলেছেন এইভাবে প্রশ্ন করলেন, এর মধ্যেই চা তৈরি যে দেখছি আজ, ব্রাহ্মণকে সকালবেলায় চা খাইয়ে পুণ্য-সঞ্চয় করবার মতলব নাকি হে ?

বললাম, আসুন, বসুন।

খুটখুট করে প্রবেশ করলেন ধরণীবাবু।

॥ ২ ॥

যদিও আমি খুব অন্যমনস্ক ছিলাম, অর্থাৎ আমার মনের যে অংশটা ধরণীবাবুর সঙ্গে লৌকিকতা করতে ব্যস্ত ছিল, তার চেয়ে ঢের বড় একটা অংশ যদিও নীরব নেপথ্যে ব্যস্ত ছিল রাত্রিকে নিয়ে, তবু ধরণীবাবুর অংশটায়। এক চুমুক চা পান করে ভারি একটা হৃদয়রোচক প্রসঙ্গ তুললেন ধরণীবাবু।

শুধু ধরণীবাবুই নয়, আমাদের অনেকেরই জীবনদর্শন এবং জীবনযাপন এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। সত্য অথবা মিথ্যা দার্শনিকতার পাখায় ভর করে মনোলোকের যে আকাশে আমরা অহরহ উড্ডীয়মান হই, সত্যি সত্যি উড়তে গিয়ে দেখা যায়, সে আকাশ-বিলাস বাস্তব-জগতে

আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমাদের পাখা এবং আকাশ দুই-ই কাল্পনিক, আসলে একটা পঙ্ককুণ্ডে কৃমির মত কিলবিল করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কল্পনাবান কৃমির যা দুর্দশা, আমাদেরও সেই দুর্দশা। ধরণীবাবু সাহেবদের ওপর চটা, স্ত্রী-শিক্ষার ওপর চটা, ব্রাহ্মদের ওপর চটা, সিনেমার ওপর চটা, টর্চের ওপর চটা, ট্যাক্সির ওপর চটা, আধুনিক অনেক জিনিসেরই ওপর হাড়ে-চটা তিনি। তাঁর মন কল্পনার পাখায় ভর করে যে যুগের আকাশে উড়ে বেড়ায়, সেটা—ধরণীবাবু যদিও বলেন বৈদিক যুগ—আসলে বোধ হয় শায়েস্তা খাঁর আমল। সে যুগে টাকায় আট মণ চাল ছিল, প্রচুর টাটকা দুধ ঘি মাছ সস্তায় পাওয়া যেত, স্ত্রীলোকদের আব্রু ছিল, এক-ব্যক্তিক নয়—একান্নবর্তী পরিবারে লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘজীবী হয়ে গ্রামে বাস করত। এই যুগের স্বপ্ন দেখতে বাস্তব জীবনে কিন্তু ধরণীবাবুকে সাহেবদের ঝুঁকে সেলাম করে তাদের অধীনে চাকরি করতে হয়েছে, শহরে এসে বাস করতে হয়েছে, একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করতে হয়েছে, নিজের ছোট মেয়েটিকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে হয়েছে, সিনেমা দেখতে হয়েছে, টর্চ কিনতে হয়েছে, গত যুগের ব্রাহ্মদের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়েছে, ট্যাক্সি চড়তে হয়েছে, কলের চাল পচা মাছ জলো দুধ দুর্মূল্যে কিনতে হয়েছে, এবং আরও অনেক কিছু করতে হয়েছে, যা শায়েস্তা খাঁর আমলে কেউ করত না। এর ফলে যা হয়েছে, তাকে যদিও আমরা শুদ্ধ ভাষায় দার্শনিকের আকৃতি বলি না, চলিত ভাষায় কুৎসা-প্রবণতা নামে অভিহিত করে থাকি কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে, কয়লাই অনুকূল 'পরিস্থিতি'তে হীরকে পরিণত হয়। আমার বিশ্বাস, অনুকূল 'পরিস্থিতি'তে পড়লে ধরণীবাবুর পরনিন্দাপ্রবণ মনোভাব দার্শনিক মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারত, তিনি আর কিছু না হোন, জনপ্রিয় সম্পাদক হতে পারতেন, সকালে বিকেলে অপরের বৈঠকখানায় হানা দিয়ে বর্তমান-যুগে-বাধ্য-হয়ে-বাস-করা-জনিত দার্শনিক ক্ষোভ উদাহরণ-সম্বলিত করে প্রকাশ করে বেড়াতে হ'ত না তাঁকে, লোকে সভা করে ডেকে নিয়ে যেত তাঁকে সভাপতিরূপে এবং উৎকর্ণ হয়ে শুনত তাঁর দার্শনিক বাণী।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ধরণীবাবু বললেন, ওহে, মেঘনাদ এতদিন মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, এইবার সশরীরে দেখা দিয়েছেন। ইয়া পাকানো গোঁফ। মেঘনাদপ্রসঙ্গ ধরণীবাবু ইতিপূর্বে আরও দু'-একবার আলোচনা করেছেন; সুতরাং বুঝতে দেরি হ'ল না যে, তিনি

সেই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির অদৃশ্য-অথচ-বর্তমান প্রণয়ীটির চাক্ষুষ দর্শন লাভ করেছেন, যে তরুণী শিক্ষয়িত্রীটি তাঁর বাড়ির সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন।

উৎসুক কণ্ঠে বললাম, তাই নাকি ?

কাপে দ্বিতীয় চুমুক দেবার জন্যে কাপটি তুলছিলেন ধরণীবাবু, কিন্তু ওষ্ঠ পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে শূন্যেই সেটাকে ধরে রাখলেন এবং সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

তোমরা নাড়ী টিপে তবে লোকের ভেতরের খবর বলতে পার, তাও সব সময় পার না, কিন্তু আমরা এক নজরেই পারি।

দ্বিতীয় চুমুক দিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে সেই জাতীয় আনন্দ ক্ষরিত হতে লাগল, যা কোন আবিষ্কারকের দৃষ্টি থেকে উপচে পড়ে স্বাভাবিক আবিষ্কারের পর।

যখনই দেখলাম, ঘন ঘন সিডান-বডি ট্যাকসি এসে দাঁড়াচ্ছে আর জানলায় ঘন ঘন টর্চের আলো ফেলছে—

তৃতীয় চুমুক দিয়ে খানিকটা চা ডিশে ঢাললেন।

বাধ্য হয়েই, মানে ভদ্রতার খাতিরেই, বলতে হ'ল আমাকে, আজকালকার কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের।

আমার এই উক্তিতে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা করবার সুযোগ পেলেন তিনি। উত্তেজনাভরে ডিশে ঢেলে ঢেলে তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করে মুখটা মুছে হাত ধুয়ে বহুবার-শ্রুত সেই হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি বেশ তারিয়ে তারিয়ে বলতে লাগলেন, আমি স্মিতমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে শুনতে লাগলাম। তারপর একটু পরেই আমার যা স্বভাব, বাইরে হুঁ হুঁ করতে করতে ভেতরে ভেতরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। ভাগ্যিস মহিলা কলকাতা শহরে চাকরি করেন! কলকাতা শহরের বিশাল জনসমুদ্রে এত অসংখ্য কুৎসা-বুদ্বুদ উঠছে এবং লয় পাচ্ছে যে, তা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার অবসর নেই কারও, তা ছাড়া এখানে কেউ কারও তোয়াক্কাই করে না। কিন্তু এই মহিলা যদি কোন মফস্বল শহরের ডোবায় গিয়ে বুদ্বুদ কাটতেন, সেখানে যদি ঘন ঘন সমাগত সিডান-বডি ট্যাকসি এবং টর্চ দিয়ে আলো ফেলার সঙ্গে ইয়া-পাকানো গোঁফকে জড়িয়ে ফেলবার সুযোগ দিতেন সেখানকার ধরণীবাবুদের, তা হলে কি বিপর্যয় কাণ্ডই না ঘটত! মফস্বলের ছোট শহরে সকলেই সকলের হিতৈষী, সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। কতকগুলো বেকার বুড়ো আর ছোঁড়া

সকলের সব খবরের জন্তে সর্বদা উৎকর্ণ। মফস্বলের ইস্কুল-মাস্টারনীদের দেখেছি, তাদের কথা ভাবলে ভারি দুঃখ হয় আমার। শহরশুদ্ধ সবাই তাদের গার্জেন। তাদের স্বাধীনভাবে কোথাও যাবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে হেসে কথা কইবার উপায় নেই, রাত নটার পর কোথাও থাকবার উপায় নেই (যেন রাত্রি নটার আগে কোন কিছু দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব!), বেচারীদের কিছু করবার উপায় নেই। বহু গার্জেন কটমট করে সর্বদাই তাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন, এবং তারাও লেখা-পড়া শিখে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে হাস্যকর নিয়মের বোরখা পরে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে বন্দিনীর মত।

সহসা সচেতন হয়ে উঠলাম ধরণীবাবুর একটা কথায়।

আরে, ওই যে তোমার পূর্ণেন্দুবাবুর মেয়ে—ওইটুকু বয়সে ও না করেছে কি ?

তখন আমি জানতাম না, পরে জেনেছি, এই ধরণীবাবুই তাকে প্রেমপত্র লিখেছিলেন একটা। হ্যাঁ, এই ধরণীবাবুই—তার পিতৃবন্ধু।

উঠে পড়লাম।

আমাকে একবার যেতে হবে ওদের বাড়িতে এখুনি। বংশীর খুব অসুখ।

ওঁরা এসেছেন নাকি এখানে ?

হ্যাঁ।

রাত্রিও এসেছে ?

এসেছে।

কবে ?

কবে ঠিক জানি না।

জামাটা গায়ে দিয়ে হাতে যখন হাতঘড়িটা বাঁধছি, ধরণীবাবু বললেন, চল, আমিও দেখে আসি। হাজার হোক বন্ধুলোক।

আপত্তি করতে পারলাম না।

ধরণীবাবু সঙ্গী হলেন।

॥ ৩ ॥

সেদিন সকালের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার মনে আছে। বেরিয়েই হাতঘড়িটা দেখলাম—ছটা বেজে পনেরো মিনিট। যে ঘটনা-পরম্পরার জন্তে অনিবার্যভাবে আমার দেরি হ'ল, সেগুলো না ঘটলে আমি অন্তত আরও দু

ঘণ্টা আগে যেতে পারতাম বংশীর কাছে এবং ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ত না। আমার এখনও ধারণা, ব্যাপারটা যদি ধরণীবাবুর জ্ঞানগোচর না হ'ত তা হলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি সব জানাজানি হয়ে যেত না, হয়তো অন্য রকমও হতে পারত। কারণ বাড়িতে কেউ ছিল না। যে ঠিকে ঝিটা ওরা বহাল করেছিল এসেই, সেই ঝিটা তখনও আসে নি। স্বর্ণেন্দুর মা-ও ও-বাসায় ছিলেন না, তিনি ছিলেন মির্জাপুর স্ট্রীটের একটা বাড়িতে তাঁর গুরুদেবের কাছে। বস্তুত, পরে শুনেছিলাম, তিনি এ বাড়িতে এসে ওঠেনই নি। তিনি গুরুদেবকে নিয়ে মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় উঠেছিলেন। রায় মশায়ের বাড়ি থেকে রাত্রির সঙ্গে এসে গত রাত্রে যখন তাঁকে আমি দেখেছিলাম, তার একটু আগে তিনিও এদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন। দেখা করতে আসার উদ্দেশ্য—বংশী অথবা পূর্ণেন্দুবাবু নয়, জ্যোতির্ময় এবং রাত্রি। তিনি দেখতে এসেছিলেন, জ্যোতির্ময় এসেছে কি না! আমি চলে আসবার একটু পরেই তিনিও ফিরে গিয়েছিলেন মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় তাঁর গুরুদেবের কাছে।

ঘড়িটা থেকে চোখ তুলেই দেখতে পেলাম, ঘোর-নীল-লুঙ্গি-পরা সেই রোগা ফরসা ছোকরাটিকে, যে রোজ রাস্তার ধারের জানলায় ছোট হাত-আয়নাটি রেখে তন্ময়চিত্তে মুখ-বিকৃতিসহকারে দাড়ি কামায়। সেদিনও সে তাই করছিল। জানলার নীচেই সরু ফুটপাথে একটা কালো বেড়াল দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দিকে পীতাভ সবুজ চোখ দুটো ক্ষণকাল নিবদ্ধ রেখে হঠাৎ সে ত্রস্ত হয়ে ঢুকে পড়ল পাশের গলিটায়। তার পরের বাড়ির কাকাতুয়াটা তারস্বরে চিৎকার করছিল সমস্ত পাড়াটা সচকিত করে। রাস্তাটা যেখানে বেঁকেছে, সেই বাঁকের মুখে একটা কল আছে, সেই কলকে কেন্দ্র করে কলতলার কাব্যকলরব উঠছিল, দগ্ধ-কটাহ-মার্জন-নিরতা আঁট-সাঁট কাপড়-পরা একটি তরুণী পরিচারিকার নবোন্মেষিত যৌবনের ঈষন্মাদক আবহাওয়ায়, আর একটু দূরে একজন ফেরিওয়ালা এসে এ-পাড়ার সবজান্তা গোষ্ঠবাবুর অহমিকাকে তোয়াজ করে কতকগুলো দাগী আম বিক্রি করবার চেষ্টা করছিল, তাঁর কাছে বলছিল, আপনি হলেন সমঝদার লোক বাবু, তাই আপনার কাছেই আগে নিয়ে এলুম। বুলবুলভোগ আম, এ কলকাতা শহরে কটা লোক চেনে, বলুন? এই আমগুলো দেখে ধরণীবাবুর ভদ্রতাজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হ'ল সম্ভবত, বললেন, তোমার কাছে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা হবে হে ডাক্তার? পকেট থেকে ব্যাগ বার করে দেখলাম, কাল রাত্রে ট্যাক্সি-ভাড়া দেওয়ার পর পাঁচ টাকা

থেকে যা অবশিষ্ট ছিল তাই রয়েছে। ড্রাইভারকে আমি পাঁচ টাকার নোটটা দিয়েছিলাম, সে কত ফেরত দিয়েছিল তা গুনে নেবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন আমার। দেখলাম, একটা আধুলি রয়েছে, বার করে দিলাম ধরণীবাবুকে। ধরণীবাবু বললেন, ও নিয়ে আমি কি করব, কিছু কমলালেবু-টেবু কিনিগে চল। রুগীর বাড়ি যাচ্ছি; তা বললে কি চলে, হাজার হোক বন্ধুলোক, লোক ত ধর্তব্য একটা—। ধরণীবাবু কথা অসম্পূর্ণ রেখে এমন ভাবে আমার পানে চাইলেন, যেন আমি কমলালেবু কেনার বিরোধী। আমি কিছু না বলে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। মোড়ের চায়ের দোকানটায় দেখলাম, বাঁধা খদ্দেরগুলি যুদ্ধের সংবাদ আলোচনা করতে করতে বহুবার-মোছা অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলের ধারে বসে রোজ যেমন চা খান, সেদিনও তেমনই খাচ্ছেন। ঠোঁটে ধবল, আঙুলে ধবল; চোখের কোলে ধবল জ্যোতিষীটি নিজের আসনটি পাতছেন ফুটপাথের ওপর এদিক চাইতে ওদিক চাইতে। শ্যামবাজারমুখী ট্রামটার শিরোনামায় এস্প্ল্যানেড লেখা রয়েছে,—হয় ড্রাইভার অন্যমনস্ক; না হয় ঘোরাবার যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে। ডানহাতি গলির মোড়টায় শ্বশুরের সহায়তায় সদ্য-বিবাহিত যে যুবকটি মনিহারী দোকানটি সম্প্রতি খুলেছেন, তাঁকে সঙ্গসুখ দান করবার জন্যে যে কজন ছোকরা ওই সঙ্কীর্ণ দোকানের সঙ্কীর্ণতর বেঞ্চিটায় বসে রোজ হাসাহাসি করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'জন এসে জুটেছেন দেখলাম, যেটির নেউলের মত মুখ সেইটি এবং নাদুসনুদুসটি। কার বাড়ি থেকে জানি না, বড় বড় লোমওয়ালা ছোট্ট একটা কুকুর ফুটপাথে বেরিয়ে ছুটোছুটি করছিল—চ্যাপ্টা-গোছের ছোট মুখ, লোমে পরিপূর্ণ, চোখ দেখা যায় না···

চলে যেও না হে, দাঁড়াও।

ও-ধারের ফুটপাথে কমলালেবু দেখতে পেয়েছিলেন ধরণীবাবু। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে রাস্তা পেরিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলেন, আমি যন্ত্রচালিতবৎ অনুসরণ করলাম। পশ্চিমদেশীয় দোকানদারটির সঙ্গে হাস্যকর হিন্দীতে অনেক দর-কষাকষি করলেন, আমি নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। অনেক ধস্তাধস্তির পর টাকায় বত্রিশটা থেকে টাকায় চল্লিশটা দিতে সে যখন রাজি হ'ল, তখন আট আনার লেবু কিনলেন ধরণীবাবু। পাশের একটা মুদীর দোকান থেকে একটা বড় ঠোঙা ভিক্ষে করে আনলেন।

এই সমস্তই এবং আরও নানা ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছিল

সেদিন সকালে। সমস্তই আমি ধৈর্যভরে সহ্য করেছিলাম সেই শক্তিবলে, যে শক্তি মানুষ লাভ করে আনন্দের প্রেরণায়। আমার দেওয়া তিন খোরাক ব্রোমাইড মিক্শ্চার পান করে বংশীর প্রলাপ থেমেছে এবং রাত্রি নিজে এসে সে কথা আমায় বলে গেছে, এতেই আমার মন এমন একটা উত্তুঙ্গলোকে আরোহণ করেছিল যে, এই সব তুচ্ছ ঘটনার সাধ্য ছিল না আমাকে বিচলিত করে।

মনুমেণ্টের ওপর দাঁড়িয়ে সমতলবর্তী লোকজন গাড়ি বাড়ি মোটর এবং তাদের সমন্বয়-বৈচিত্র্য লোকে যেমন নিরুৎসুক অনুকম্পাভরে দেখে, সেদিন সকালের ঘটনাবলী আমিও সেই রকম উদাসীন দৃষ্টিতে দেখেছিলাম অনেক ঊর্ধ্বলোক থেকে। যদিও রাত্রির মুখের একটি পেশীও বিচলিত হয় নি, তার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে হর্ষের বিন্দুমাত্র আভাসও দেখতে পাই নি, তবু সেদিন কলকাতা শহরের কলরবের মধ্যেও দুটি কথা আমার কানে যেন গান গেয়ে ফিরছিল—"থেমে গেছে"।

॥ ৪ ॥

স্বর্ণেন্দুর বাসায় যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে, কিন্তু তখনও সেই অন্ধ গলিটা থেকে অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নি। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। সরু লম্বা ঈষৎ অন্ধকার গলিটা, তবু তার ভেতর থেকে ফুরফুরে একটা হওয়া বইছিল, কল থেকে চৌবাচ্চায় জল পড়ার একটা একটানা শব্দও ভেসে আসছিল কোথা থেকে যেন, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাশের বাড়ির বারান্দার খোপ থেকে পায়রাটা ডাকছিল তার সঙ্গিনীকে গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে, ঠুনঠুন শব্দ করে একটা রিকশওয়ালা অলস মন্থর গতিতে চলেছিল।

প্রথম রসভঙ্গ হ'ল গলিতে ঢোকবার মুখেই, ধরণীবাবুর কমলালেবুর ঠোঙাটা ফেটে গেল, পড়ে গেল দু-চারটে লেবু এবং সেগুলোকে সামলাতে গিয়ে আরও দু-চারটে পড়ল। বিরক্ত ধরণীবাবু হেঁট হয়ে কুড়োতে লাগলেন সে সব। আমার লোকটাকে ঘোর মিথ্যুক বলে সন্দেহ হ'ল। গত তিন মাস যাবৎ ইনি কোমরের বাতের ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন আমার কাছ থেকে; দেখা হলেই বলেন, ওষুধে কোন ফল হ'ল না হে, মোটে হেঁট হতে

পারি না। স্বচক্ষে দেখলাম, বেশ হেঁটে হতে পারছেন তিনি। অথচ সে কথা স্বীকার করেন না কখনও ভুলেও, চিকিৎসা করাচ্ছেন যেন আমাকে বাধিত করবার জন্যেই। মানব-চরিত্রের একটা দিক যেন পরিস্ফুট হ'ল আমার কাছে, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

গলির ভেতর ঢুকেই চোখে পড়ল, স্বর্ণেন্দুদের বাসার দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজার পাশেই একটা শ্যাওলা-পড়া ছোট চৌবাচ্চা, একটা ভাঙা কলের মুখ থেকে অবিরাম জল পড়ছে তাতে, কাছেই হাতলহীন টিনের একটা মগ পড়ে আছে কাত হয়ে।

ধরণীবাবু কমলালেবুগুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়েছিলেন। আমি একাগ্রদৃষ্টিতে খোলা দরজাটার পানে চেয়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, হঠাৎ হয়তো রাত্রি এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবে, অপরিচিত জ্যোতির্ময়বাবুও হয়তো বেরিয়ে আসতে পারেন। বেশ মনে আছে, এদের দু'জনকেই আমি প্রত্যাশা করছিলাম। ওই খোলা দরজায় স্বর্ণেন্দুর আবির্ভাব যদিও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, আমি সেটা প্রত্যাশা করি নি।

কেউ এল না। এটাও বেশ মনে পড়ছে, তাদের না আসার একটা সঙ্গত কারণও আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম ওই অল্প কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। মনে হয়েছিল, সারারাত জেগে এসে ক্লান্ত জ্যোতির্ময়বাবু হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত্রি হয়তো স্নান করছে। কিংবা হয়তো নিদ্রিত বংশীর মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করছে আস্তে আস্তে। সমস্ত রাত জেগে স্বর্ণেন্দু হয়তো শুয়েছে একটু—

খোলা দরজাটা দিয়ে আমি ঢুকলাম।

আমার পিছু পিছু ধরণীবাবু।

ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত চোখটা। যদিও তিনি উত্থানশক্তিরহিত, পাশের ঘরে কি ঘটেছে তা জানবার যদিও কোন উপায় ছিল না তাঁর, তবু আমার মনে হয়, কোন অতীন্দ্রিয় উপায়ে কিছু আভাস যেন পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবন্ত চোখটা যেন তারস্বরে প্রশ্ন করছিল, কি হয়েছে, ও-ঘরে কি হয়েছে, জান তোমরা?

তাঁর বিছানার পাশেই খালি একটা চেয়ার ছিল। ধরণীবাবুর মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, নিমেষের মধ্যে তাঁর মুখে প্রাগ্‌জীবনের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ-জনিত দাস্য-ভাবটা প্রকট হয়ে উঠল, আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে সবিনয় নমস্কারান্তে সসঙ্কোচে উপবেশন করলেন তিনি চেয়ারটাতে।

আমি পাশের ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

স্বর্ণেন্দু যেন দোল খেলেছে। তার জামা, কাপড়, বংশীর বিছানা সব লাগে লাল। রক্ত। চাপ চাপ রক্ত চতুর্দিকে। বংশীর গলার প্রকাণ্ড ক্ষতটা হাঁ করে আছে। পাশেই পড়ে আছে রক্তাক্ত বাঁকা ছোরাটা, যেটা ফার্নানডিজ রাত্রিকে উপহার পাঠিয়েছিল তার জন্মদিনে। লাল খাপখানাও পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এ কি!

স্বর্ণেন্দু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর তার ছোট্ট হাসিটি হেসে বললে, আমি করেছি।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

ঠিক এর অব্যবহিত পরে যা যা ঘটেছিল, তার স্মৃতি আমার মনে অস্পষ্ট নয়, কিন্তু তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করব না। গ্লানিজনক বলে নয়, এ কাহিনীর পক্ষেও অবান্তর বলে। তা ছাড়া লিপিবদ্ধ করবার মত সুসম্বদ্ধভাবে সব কথা আমার মনে নেই। একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবার পর তাকে লোমহর্ষণ অথবা ওই-জাতীয় কোন একটা বিশেষণে ভূষিত করে আমরা সাড়ম্বরে সাধারণত যা যা করে থাকি, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। পুলিশ এসেছিল, খবরের কাগজে সত্যমিথ্যা-কল্পনা-প্রণোদিত সংবাদ বেরিয়েছিল, মকদ্দমা হয়েছিল, তদ্বির হয়েছিল। এমনই যে কিছু একটা নির্ঘাত ঘটবেই, একদিন ধরণীবাবু মাথা নেড়ে বার বার সে কথা বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, অদূরদর্শিতাপ্রযুক্ত এত বড় একটা কাণ্ড চাপা দেবার কল্পনাও করেছিলাম এবং ধরণীবাবু না মানা করলে তা করতে গিয়ে আমি সুদ্ধ যে জড়িয়ে পড়তাম—এ কথা নিজেদের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে জাহির করে আমার কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করবার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। অনেক ফুসফুস, অনেক গুজগুজ, উক্ত-অনুক্ত অনেক চিন্তা, উদ্বেগ-অনুদ্বেগের অভিনয়—কোন কিছুরই ত্রুটি হয় নি। আইনের রথচক্রের আবর্তনে যে পরিমাণ শব্দ ও ধূলি উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, সবই হয়েছিল। সে সবের বিস্তৃত বর্ণনা এ কাহিনীর পক্ষে ক্লান্তিকর। আমি রাত্রির কথা লিখতে বসেছি, স্বর্ণেন্দুর নয়। রাত্রিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে স্বর্ণেন্দুকে আনতে হয়েছে, অন্ধকারকে ভাল করে জানবার জন্যে যেমন আলো জ্বালতে হয়।

ইতিপূর্বে একবার বলেছি, আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ কাহিনীতে পারম্পর্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। সেই ফাঁকগুলো আমি আমার কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি। আমার এ কল্পনা-বিলাসের হেতু কি, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, সত্যের অনুরোধে আমাকে বলতেই হবে, মোহ। এই মোহের বশেই সব জেনে-শুনেও রাত্রির সম্পর্কে আমার মন তিক্ত হয়ে ওঠে নি; এর পরও প্রভাতকে নিষ্কলঙ্ক করবার প্রয়াস আমি করেছিলাম।

এই সময় একটি আশ্চর্য চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস আমি পেয়েছিলাম, আগে সেই কথাই বলব ; চরিত্রটি অসাধারণ। অর্থাৎ এত অসাধারণ যে, সব কথা জানবার পরও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না ; মনে হয়, এমন নিগূঢ় কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না, এবং যা দেখতে পেলে, বুঝতে পারলে ওই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে অনায়াসে সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে। অসাধারণকে সাধারণের পর্যায়ভুক্ত করবার কি দুর্দমনীয় আগ্রহ আমাদের ! কোন কিছুর অসাধারণত্ব আমরা যেন সইতে পারি না। মনে হয়, লোকটা সুদক্ষ অভিনেতা, মনে হয়, মুখোশ পরে আছে, কিছুতেই মনে হয় না, লোকটা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু এই ব্যক্তিটির কোন মুখোশ নয়নগোচর অথবা বুদ্ধিগোচর যখন হয় নি, তখন তাঁকে আমি অসাধারণ বলতে বাধ্য। বস্তুত, আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন তাঁকে মোটে অসাধারণ বলে মনেই হয়নি। সমস্ত ইতিহাস জানবার পর তবে তাঁর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়েছি। রাত্রির কাহিনীতে এই চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, রাত্রির মায়ের জীবনের বিভিন্ন যুগকে এ চরিত্রটি, শুধু গভীরভাবে নয়, নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে বিভিন্ন সময়ে। সুতরাং, মুখ্যভাবে না হলেও গৌণভাবে রাত্রির সঙ্গে এর যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।

বিশ্লেষণ করলে এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কারণ আবিষ্কার করা যায়, যা আমি এ প্রসঙ্গের অবতরণিকায় এইমাত্র বললাম। আমরা সহসা অসাধারণকে অসাধারণ বলে চিনতে পারি না, চিনলেও মানতে পারি না,—অহঙ্কারবশে মানতে চাই না। রাত্রির মা পরবর্তী জীবনে যাঁকে গুরুদেব বলে সকলের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী জীবনে যদি তাঁর অসাধারণত্বকে মেনে নিতে পারতেন, তা হলে এ সব হয়তো কিছুই হ'ত না। রাত্রিরই জন্ম হ'ত না হয়তো।

গুরুদেব-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে দাড়ি-জটা-গেরুয়া-রুদ্রাক্ষজাতীয় যে সব জিনিস সাধারণত জড়িত থাকে, রাত্রির মায়ের গুরুদেব রাখালবাবুর সে সব কিছুই ছিল না। নামের পূর্বে স্বামী এবং পরে আনন্দ যোগ করে ধ্বনি-ঝঙ্কার দ্বারা নিজের নাম-মাহাত্ম্য বাড়াবার চেষ্টাও তিনি করেননি, বস্তুত ধর্ম নিয়ে কোন ভড়ংই ছিল না তাঁর। রাখালবাবু এত বেশি রকম সাদাসিধে ছিলেন যে, তাঁকে দেখলে হঠাৎ নির্বোধ বলে সন্দেহ হ'ত। দেহের তুলনায় মাথাটা

বড় ছিল তাঁর, চোখ দুটো খুব শান্ত ধরনের ছিল, কিন্তু চোখে অদ্ভুত ধরনের বিস্মিত দৃষ্টি ছিল একটা। মনে হ'ত, সর্বদাই অকৃত্রিম বিস্ময়ভরে যেন তিনি চেয়ে আছেন জগতের পানে। ভাল করে লক্ষ্য না করলেও বোঝা যেত যে, সে বিস্ময় এত গভীর, এত সর্বগ্রাসী যে, অন্য কোন দিকে মন দেবার অবসর নেই তাঁর। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে দেখতে কোন কোন দর্শক যেমন আত্মহারা হয়ে যান, পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না, রাখালবাবুও ঠিক তেমনই যেন বিশ্বরঙ্গমঞ্চের সামনে সবিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিজেও যে একজন অভিনেতা, সে খেয়াল নেই তাঁর, অন্যান্য অভিনেতারা আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর এই বিস্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও যেন তাঁকে সচেতন করতে পারছেন না, বাধ্য হয়ে অন্য একজন অভিনেতা এসে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করছেন, এবং রাখালবাবু একটু সরে দাঁড়িয়ে সে অভিনয়ও সমান বিস্ময়ে উপভোগ করে চলেছেন। বলা বাহুল্য, এ রকম মনোবৃত্তি অসাধারণ। কিন্তু অসাধারণ কেউ তাঁকে বলেনি। নির্বোধ, কাপুরুষ, পাগল, এমন কি নপুংসকও কেউ কেউ বলেছে তাঁকে শুনেছি। কিন্তু তিনি এ সব গ্রাহ্য করেননি, কারণ গ্রাহ্য করবার মত মনোবৃত্তি থাকলে তিনি আত্মহারা অভিনয়-রসিক না হয়ে আত্মপরায়ণ কলাকুশল অভিনেতা হতেন। এই আত্মবিস্মৃত মনোবৃত্তি ছাড়া আর একটা বর্ম ছিল তাঁর, যাতে প্রতিহত হয়ে সমালোচক বীরপুরুষদের বাক্যবাণ সব ভোঁতা হয়ে যেত শুনেছি।—তাঁর সরল হাসিটি। যে যাই বলুক, বিরুদ্ধ সমালোচনা যত বিষাক্ত, যত অসম্মানজনকই হোক না কেন, সরল হাসিটি হেসে তিনি তার নিষ্পত্তি করে ফেলতেন, মনে কোন দাগ পড়ত না। তিনি বোধ হয় ভাবতেন, সমস্তটাই তো অভিনয়, রেগে কি আর হবে! এ সব অবশ্য আমার কল্পনা, কারণ আমি তাঁর বিরুদ্ধ-সমালোচকদের দেখিনি এবং তাঁকেও মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিলাম। শুনেছি, আর একটা সুবিধে ছিল রাখালবাবুর, এক জায়গায় তিনি বেশিদিন থাকতেন না, ভারতের নানা স্থানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, প্রধানত তীর্থে তীর্থে। লোকটির পরনে আড়ময়লা কাপড়, হাত-কাটা ফতুয়া, মাথায় কাঁচাপাকা চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, গোঁফ-দাড়ি অযত্নরক্ষিত, অর্থাৎ যদিও তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে দরিদ্র বলে মনে হ'ত, কিন্তু ব্যাঙ্কে তাঁর অনেক টাকা ছিল এবং অধিকাংশই তার ব্যয় করতেন তিনি দেশভ্রমণে। তাঁর সম্বন্ধে এত সব তথ্য আমি পরে সংগ্রহ করেছিলাম—কিছু রাত্রির কাছে, কিছু

ধরণীবাবুর কাছে, কিন্তু নিখিল চৌধুরীর কাছে। কল্পনাও খানিকটা রঙ ফলিয়েছে। তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে। স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় গিয়ে প্রথমেই যে লোকটিকে দেখেছিলাম, তিনিই রাখালবাবু। তিনি ফতুয়া পরে বারান্দার এক ধারে বসে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিলেন ফুটপাথের ওপর ক্রীড়ানিরত একটি শিশুকে। শিশুটির মাথায় চুল চূড়ো করে বাঁধা, চোখে কাজল, পরনে রঙচঙে পোশাক। পাশের বাড়িতে বোধহয় বিয়ে ছিল। কাছেই সার সার বাজনদার বসে ছিল। আমি বারান্দায় উঠতেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন—তাঁর সেই শান্ত অথচ কৌতূহলী দৃষ্টি। তিনিই যে রাত্রির মায়ের গুরুদেব, তা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। গুরুদেবের অঙ্গে অন্তত একটা গৈরিক বসনও থাকবে—এ প্রত্যাশা করেছিলাম। তাঁকে গোমস্তা-জাতীয় একটা কিছু ভেবে একটু আদেশের ভঙ্গীতেই বলেছিলাম মনে পড়ছে, বাড়ির ভেতরে একবার খবর দাও তো, বল গিয়ে—স্বর্ণেন্দুবাবুর বাসা থেকে ঘনশ্যামবাবু এসেছেন, বড় জরুরি দরকার। তাঁর সেই সরল হাসিটি হাসলেন তিনি, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে গেলেন। আমি বারান্দাতেই অপেক্ষা করে রইলাম। একটু পরে তিনি ফিরে এসে বললেন, স্বর্ণেন্দুর মা পূজো করতে বসেছেন, আপনি যদি অপেক্ষা করতে পারেন অপেক্ষা করুন, কিংবা যদি ইচ্ছে করেন আমাকেও বলে যেতে পারেন—কি দরকার!

এত বড় একটা নিদারুণ সংবাদ ভৃত্য-জাতীয় একটা লোকের কাছে দেওয়া অসমীচীন বোধ করেই যে আমি অপেক্ষা করা স্থির করলাম তা নয়, কারণ কোন কিছু স্থির করবার মত মাথার ঠিক ছিল না আমার। আমি যন্ত্রচালিতবৎ ঢুকে পড়লাম সামনের ঘরটাতে। রাখালবাবু আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে আবার বাইরে গিয়ে বসলেন। শিশুটি তখনও ফুটপাথে খেলা করছিল।

আমার মনটা তখন এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিল যে, স্বর্ণেন্দুর মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে শুনেই আমি যেন বেঁচে গেলাম, অন্য কোন কারণে নয়, কিছু একটা করতে পেয়ে। বংশীর গলার প্রকাণ্ড ক্ষতটা, রক্তাক্ত স্বর্ণেন্দু, ধরণীবাবুর অন্তর্ধান ও প্রতিবেশীদের নিয়ে আগমন—এ সমস্তকে ছাপিয়ে আমার মনে একটি কথা শিখার মত জ্বলছিল, জ্যোতির্ময়কে নিয়ে রাত্রি স্টেশন থেকে ফেরেনি। বাইরের বারান্দায় যিনি ক্রীড়ানিরত শিশুটিকে

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর দিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না আমার। আমার অন্যমনস্কতা এবং তাঁর অন্যমনস্কতার অবকাশে তাঁর সঙ্গে সেদিন যতটুকু পরিচয় হয়েছিল, তা স্বল্প বলেই স্মৃতি সেটি কৃপণের মত সঞ্চয় করে রেখেছে। তাঁকে সেই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। আর একটু পরিচয় অবশ্য পেয়েছিলাম স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে দেখা হবার পর, অর্থাৎ যখন আবিষ্কার করেছিলাম—ওই আড়ময়লা-কাপড়-পরা আপাতনগণ্য ব্যক্তিটিই রাত্রির মায়ের গুরুদেব, যাঁর সঙ্গে রাত্রির মা ছায়ার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়ান সর্বত্র।

॥ ২ ॥

কতক্ষণ বসে ছিলাম মনে নেই।

কিন্তু এটা এখনও বেশ মনে আছে যে, সীমন্তে চওড়া সিঁদুর এবং টকটকে লালপেড়ে গরদ পরে স্বর্ণেন্দুর মা এসে যখন আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনও আমি অসাড়ভাবে বসেই ছিলাম খানিকক্ষণ, তারপর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে অসংলগ্ন ভাষায় আবোল-তাবোল কি যে বলেছিলাম, তা মনে নেই, নিদারুণ দুঃসংবাদটাই জ্ঞাপন করেছিলাম নিশ্চয়।

সমস্ত শুনে স্বর্ণেন্দুর মা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মুখচ্ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধী যেমন ভাবে দণ্ডাজ্ঞা শোনে, ঠিক যেন তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি সব শুনলেন। সব শোনবার পর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আরও খানিকক্ষণ। তারপর সহসা যেন ভেঙে পড়লেন, বসে পড়লেন ঘরের মেঝের ওপর, কাঁদলেন না, একটি কথা বললেন না। আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু না, যদিও তিনি বরাবর আমার দৃষ্টির সামনেই বসে ছিলেন, তবু, খুব সম্ভব বরাবর আমি তাঁকে দেখছিলাম না। শব্দটা শোনবার পর আবার যেন তাঁকে নূতন ভঙ্গীতে নূতন রূপে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম। মাথার অবগুণ্ঠন খসে পড়েছে, মুখের ওপর ঘাড়ের ওপর পিঠের ওপর বিস্রস্ত হয়ে নেমে এসেছে আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশভার, বিস্ফারিত চোখ দুটো সামনের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত, মেঝের ওপর দু' হাতে ভর দিয়ে দুলছেন তিনি, আর তাঁর সমস্ত অন্তর মথিত করে যে আর্ত শব্দটা উঠছে তার

অনুরূপ শব্দ আমি শুনেছি প্রসব-বেদনাতুরা জননীর মুখে। খানিকক্ষণ পরে সহসা শব্দটা থেমে গেল। বিস্ফারিত চক্ষু দু'টি আরও বিস্ফারিত হয়ে স্থির হয়ে গেল, স্থির দৃষ্টিতে কি একটা দেখতে লাগলেন যেন তিনি। তারপর সহসা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন, গৌতমের আশ্রম, এক চাপ কালো কলঙ্কের মত কালো পাথরটা এখনও পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি; বৃষ্টিতে গলে যায়নি, রোদে ফেটে যায়নি, একটুও ক্ষয়ে যায়নি, যুগযুগান্ত ধরে ঠিক তেমনই ভাবে পড়ে আছে।—এইটুকু বলে আবার থেমে গেলেন তিনি, আবার দুলতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে আবার ক্রমশ তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হতে লাগল, আবার কি যেন একটা দেখতে লাগলেন তিনি, আবার দোলা বন্ধ হয়ে গেল, বক্তৃতার ভঙ্গীতে আবার শুরু করলেন, পাষাণী অহল্যা আজও পাষাণস্তূপ হয়ে পড়ে আছে, আজও মুক্তি হয়নি তার, অনেক শাস্তি বাকি আছে, অনেক রোদ-বৃষ্টি-বজ্রপাত সহ্য করতে হবে এখনও। তারপর দু'হাত মেঝের ওপর প্রসারিত করে লুটিয়ে পড়লেন, কোথায় তুমি নবজলধরশ্যাম রামচন্দ্র, এস, দয়া কর, অভয় চরণের স্পর্শ দিয়ে পাসাণী অহল্যাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও—

নিস্পন্দ দেহটা পড়ে রইল মেঝের ওপর। স্বর্ণেন্দুর মুখে শুনেছিলাম, তার মায়ের মাঝে মাঝে 'ভর' হয়—এই কি? হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রাখালবাবু উঠে এসেছেন কখন বারান্দা থেকে এবং সবিস্ময়ে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে। তাঁর সে নির্বিকার অথচ বিস্মিত দৃষ্টি কোন দিন ভুলব না আমি। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি রাত্রির মায়ের পাশে গিয়ে বসলেন। অতিশয় স্নেহভরে তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে আমার মনে হতে লাগল, তিনি ঠিক সান্ত্বনা দিচ্ছেন না, তিনি যেন কোন অভিনেত্রীকে অভিনয়-কুশলতার জন্ত নীরবে বাহবা দিচ্ছেন।

চল, ও-ঘরে চল।

রাত্রির মা বেশবাস সম্বৃত করে উঠলেন এবং তাঁর অনুসরণ করে পাশের ঘরে গেলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেলেম—রাখালবাবু বলছেন, তুমি যদি স্বর্ণেন্দুর মকদ্দমার জন্তে থাকতে চাও, থাক, আমি কাল হরিদ্বারে চলে যাই, টাকা-কড়ির সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি।

তুমি আমাকে থাকতে বল ?

আমি কিছুই বলি না—একটু থেমে—কোন দিনই তো কিছু বলিনি।

তারপর খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর সহসা পাশের বাড়িতে বিয়ের বাজনা বেজে উঠল একসঙ্গে। আর শুনতে পেলাম না কিছু। একটু পরে বেরিয়ে এলেন রাখালবাবু, শান্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বললেন, আপনার পুরো নামটা কি ?

ঘনশ্যাম সরকার।

সরকার ? 'আই' দিয়ে বানান করেন, না 'এ' দিয়ে ? 'কে' না 'সি', সেটাও বলবেন দয়া করে।

বললাম। তিনি একটা ড্রয়ার টেনে একটা চেক-বুক আর কলম বার করলেন, তারপর একটা চেক কেটে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, হাজার টাকার একখানা চেক। চেক থেকে চোখ তুলতেই তিনি বললেন, আমরা কাল হরিদ্বার যাচ্ছি। স্বর্ণেন্দুর মকদ্দমার তদ্বির যাতে হয়, দেখবেন দয়া করে।

বলেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি এত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, তাঁকে প্রণাম করতে ভুলে গেলাম।

এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

গোটা পাঁচেক অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণকায় লোক গোটা তিনেক ঢোল আর গোটা দুই সানাই নিয়ে কি ভীষণ শব্দ-প্রভঞ্জন সৃষ্টি করতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ওদের শীর্ণ দেহের পেশীতে যতটা শক্তি আছে সমস্তটা প্রাণপণে প্রয়োগ করে স্বর-সৃষ্টি করে চলেছে ওরা, রঙিন-কাপড়-পরা নানা বয়সের এক দল মুগ্ধ শ্রোতাও দাঁড়িয়ে রয়েছে আশেপাশে, আড়ময়লা কয়েকটা রাজহাঁস তাদের বাচ্চাগুলিকে আগলে খুব নির্বিকার ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের কাছে-পিঠেই. বাচ্চাগুলি যেন পাঁশুটে রঙের তুলো দিয়ে তৈরি, ভবিষ্যৎ রাজহাঁস যে ওদের মধ্যে লুকিয়ে আছে বোঝা যায় না সহসা; ঢোল আর সানাই সম্বন্ধে ওরা উদাসীন, রাস্তার নালা থেকে আহার-সংগ্রহের দিকেই ওদের বেশি আগ্রহ।· নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত গাম্ভীর্যকে বিচলিত করে একটা খামখেয়ালী দুরন্ত হাওয়া হুড়োমুড়ি করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, লুটোপুটি করছে গাছের পাতায়, ছুটোছুটি করছে রাস্তার ধুলোয়, ছেঁড়া কাগজ শুকনো পাতাদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের খেয়াল-খুশিতে। ঢোল আর সানাই সমানে বেজে চলেছে, তাদের উচ্চনিনাদকে বিক্ষত করে একটা কাঠবেড়ালী অশ্বত্থগাছের ডালে পুচ্ছোৎক্ষেপসহকারে ডাকছে—চিক-চিক-চিক। মুচীটা নেই; কইলুর বদলে আর একজন লোক এসেছে, কষ্টিপরা ভক্ত-গোছের। ময়দা-কলের আকাশচুম্বী চিমনিটা থেকে খুব ঘন কালো রঙের ধোঁয়া খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে কুণ্ডলাকারে বেরুচ্ছে। ঈশান-কোণে পুঞ্জীভূত ধোমটায় মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে, একটু পরে কালবৈশাখীর যে তাণ্ডব শুরু হবে, তারই মহড়া চলছে বোধ হয় ওখানে। "সীতারাম, সীতারাম বোলো ভাই"—গর্জন করতে করতে সামনের গলি থেকে ষণ্ডা-গোছের একটি লোক বেরুল, তার হাতে চকচকে একটা ঘটি, কপালের মাঝখানে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, এদিক ওদিক চেয়ে সশব্দে একবার উদ্গার তুললে, তারপর আবার "সীতারাম বোলো, সীতারাম বোলো ভাই" বলতে বলতে চলে গেল; এক পাল নধরকান্তি গাভী প্রকাণ্ড একটা ষণ্ড-সমভিব্যাহারে হেলতে দুলতে মন্থরগমনে পার হয়ে গেল রাস্তাটা; এক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসল সামনের বাড়ির ছাতে, একটা ছুটন্ত গরুর গাড়ির ছইয়ের ভেতর

থেকে কমলা-রঙের ওড়না গায়ে পর্দানশীন একটি মেয়ে পর্দাটি একটু ফাঁক করে কৌতূহলভরে দেখতে দেখতে চলে গেল।… ভাবছি, বাংলার বাইরে নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের এই পরিবেষ্টনীর মাঝখানে কলকাতা শহরের সেই সন্ধ্যাটি আমি মূর্ত করে তুলতে পারব কি না, যে সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

সেদিন একটু আগেই এক পসলা বৃষ্টি হয়েছিল, গুমট গরমটা আরও যেন বেড়ে উঠেছিল তাতে। নিখিল চৌধুরী ট্রাম থেকে নামলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, ভালই হ'ল, চলুন যাওয়া যাক। আমি প্রায় পনরো দিন কলকাতায় ছিলাম না। বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশে গিয়েছিলাম। সঙ্গে যে ক'টা বই নিয়েছিলাম, শেষ হয়ে গিয়েছিল। বই কিনতেই বেরিয়েছিলাম। একটা পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কতকগুলো উপন্যাস বেছে রেখে দরদস্তুর করতে যাচ্ছিলাম। ভালই হ'ল, চলুন, যাওয়া যাক।— এই কথাগুলো নিখিল যদিও খুব স্বাভাবিক কণ্ঠেই উচ্চারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হ'ল, তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের একটা স্বস্তির নিশ্বাসও যেন নির্গত হ'ল, যে ধরনের স্বস্তির নিশ্বাস কোন মজ্জমান ব্যক্তির বক্ষ ভেদ করে নির্গত হওয়া স্বাভাবিক—সামনে একটা নৌকো বা ভেলা দেখলে। আমি বইগুলোর দাম দিয়ে বগলে করে নিলাম, দরদস্তুর করবার সময় হ'ল না। নিখিল চৌধুরীর পানে তির্যক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে বললাম, কেন, ব্যাপার কি?

বিরক্তিকর, চলুন না।

মজ্জমান ব্যক্তির নিশ্বাসের আভাস আর পেলাম না, নিখিল তখন সামলে নিয়েছেন। নীরবে অনুসরণ করলাম নিখিল চৌধুরীকে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড় তখন চতুর্মুখী জনস্রোতের সংঘর্ষে তুমুল হয়ে উঠেছে। চারিদিকে সারি সারি ট্রাম, সারি সারি মোটর, রিক্শ, ফিটনগাড়ি, গরুর গাড়ি, ফেরিওয়ালা, ঝাঁকামুটে, খবরের কাগজের হকার, প্যাচপেচে কাদা, অসংখ্য মানুষ, নানা রকমের চিৎকার। আমরা একটু সরে গিয়ে দেলখোশ কেবিনের সামনা-সামনি হ্যারিসন রোডটা পেরিয়ে যাব ঠিক করলাম ট্রামগুলো বেরিয়ে গেলেই। সারি সারি অনেকগুলো ট্রাম দাঁড়িয়েছিল, একটা গরুর গাড়ি উল্টেছিল ট্রাম-লাইনে। পিছু ফিরে দেখলাম, দেলখোশ কেবিন উপচে পড়ছে, একটুও স্থান নেই, এক কাপ চা খেয়ে সময়টা অতিবাহিত করবার

ইচ্ছাটিকে বিসর্জন দিতে হ'ল ; সামনে নবীন ফার্মেসির দোকানে লাল নীল রঙের জল-পোরা বড় বড় কাচের জালাগুলো ইলেকট্রিক আলোর দৌলতে বিস্ময়জনক হয়ে উঠেছে ; কেষ্টদাস পালের প্রতিমূর্তির নীচে বেলফুলের মালা, নানা রকম ছবি, টুকিটাকি জিনিস, লাল রঙের চীনে ফানুস বিক্রি হচ্ছে ; ওভারটুন হলে কোন বক্তৃতা হচ্ছিল বোধ হয়, শেষ হয়ে গেল, গলগল করে লোক বেরুতে লাগল ওয়াই. এম. সি এ-র দরজা দিয়ে। নিখিল চৌধুরী যে ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, ক্ষণিকের জন্যে সে কথাও ভুলে গেলাম অন্যমনস্ক হয়ে। কলকাতা শহরে প্রতি মুহূর্তে এত বিচিত্র উত্তেজনা যে, কোন উত্তেজনাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পার না, ছায়াবাজির মত হয় আর মিলিয়ে যায়। সচেতন মনের ওপর দিয়ে প্রতিক্ষণেই নতুন একটা মিছিল চলছে যেন। মানুষ কতক্ষণ মনে রাখবে, কাকে মনে রাখবে ? চলমান মিছিলের প্রতি অংশটাই সচল, বিস্ময়কর, উত্তেজনাজনক। মন দিশাহারা হয়ে আত্ম-রক্ষার্থেই বোধ হয় উদাসীন হয়ে পড়ে শেষটা। না, ঠিক সেই মুহূর্তে দু' মাস আগের ঘটনা আমার মনে ছিল না। সেই মুহূর্তে আমি মোড়ের ঘড়িটার দিকে চেয়ে সক্ষোভে ভাবছিলাম, এম্পায়ারে আজ ভাল একটা নাচ ছিল, নিখিল চৌধুরীর পাল্লায় পড়ে যাওয়া হ'ল না। হঠাৎ ট্রাম-লাইন পরিষ্কার হয়ে গেল, ঘডাং ঘডাং শব্দ করে ট্রামগুলো চলতে লাগল, আমরা দু'জনে ট্যাক্সি রিক্শ জনতার ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হ্যারিসন রোড পার হয়ে গেলাম।

নিখিলবাবু আর একটিও কথা বলেননি। গলিতে ঢুকে আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি বলুন তো, চামেল্লি আজ ভাল কিছু রেঁধেছে নাকি ? নিখিল চৌধুরী গলিতে ঢুকেই পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করেছিলেন, আমার কথা শুনেই ঢাকনি খুলে এক টিপ তুলে নিলেন এবং আমার দিকে চকিতে এক নজর চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে নস্যিটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে রুমাল নিয়ে নাকের আশপাশ ঝেড়ে পুনরায় ভাল করে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি আমাকে যেন কশাঘাত করলে। আমি বিস্মিত হয়ে পুনরায় বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো ?

নিখিলবাবু স্ফুটকণ্ঠে একটু ধমকের সুরে বললেন, চলুন !

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর !

নীরবেই পথ অতিবাহন করতে লাগলাম দু'জনে।

॥ ২ ॥

নিখিলবাবুর বাসার ছাতে দু'জনে নীরবে বসেছিলাম। কাছে কোন আলো ছিল না। পাড়াতেই কাদের বাড়িতে যেন গ্রামোফোন বাজছিল। হু-হু করে একটা দক্ষিণে বাতাস উঠল। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বসে ছিলাম। স্বর্ণেন্দুর বিচারের শেষ নিষ্পত্তি যে হয়ে গিয়েছে, তা আমি জানতাম না। আমি যে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে ইচ্ছে করে নির্বিকার হয়ে ছিলাম তা নয়, হাজার টাকার চেক দিয়ে রাখালবাবু আমাকে যে অনুরোধ করেছিলেন দু' মাস আগে, আমি যে তার মর্যাদা রক্ষা করিনি তাও নয়। আমি সেই দিনই চেকটা নিখিলবাবুর হাতে দিয়ে তাঁকে বলে এসেছিলাম, আইনত বে-আইনত যে কোন উপায়ে হোক স্বর্ণেন্দুকে বাঁচাতে হবে। নিখিলবাবু রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু চেকটি তিনি ভাঙাতে চাননি, পরে ভাঙিয়েছিলেন কি না, তা আমি জানি না। নিখিলবাবু ভাল উকিল, স্বর্ণেন্দুর আত্মীয়। যতটা করা সম্ভব ততটা তিনি নিশ্চয় করবেন—এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই যে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম—এটা ওজুহাতস্বরূপ খাড়া করতে পারি, কিন্তু কারণটা আসলে তা নয়। তা ছাড়া আমি স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে সত্যিই নির্বিকার ছিলাম না, সত্যিই তার কথা উদ্বিগ্নভাবে আমি ভাবতাম মাঝে মাঝে। সে যে নির্দোষ, সে সম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু এটা ঠিক, স্বর্ণেন্দুর চেয়ে রাত্রির কথাই আমি বেশি ভেবেছি, যদিও তার মধ্যেও যে বিস্মৃতি ছিল না, তা নয়। এদের সম্বন্ধে আমার মন সর্বতোভাবে সর্বদা উন্মুখ ছিল না, তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, আমার চিত্তবৃত্তি মানবীয়, কোন উত্তেজনার প্রভাবেই উৎসাহের উচ্চশীর্ষে বেশিক্ষণ টিঁকে থাকতে পারে না, নেমে পড়ে। স্বর্ণেন্দুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পরদিন থেকেই তা নামতে শুরু করেছিল এবং সাত দিনের মধ্যেই কলকাতা শহরের এবং আমার ডাক্তারী-জীবনের নব নব উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছি। পক্ষাঘাতগ্রস্ত পূর্ণেন্দুবাবুর ভার যখন তাঁর এক মামাতো ভাই এসে নিলেন এবং তাঁর দূরসম্পর্কের জামাই নিখিলবাবু যখন তাঁর তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব স্বীকার করলেন, তখন আমার আর কিছুই করবার রইল না। বস্তুত সামাজিক কোন বন্ধন না থাকাতে আমি আরও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এদের সঙ্গে আমার বন্ধনটা সত্যই

আকস্মিক। সেদিন স্টেশন-প্লাটফর্মে রাত্রি যদি আমাকে অভিভূত না করত, তা হলে আমি এদের নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না, স্বর্ণেন্দুকে ভাল করে লক্ষ্য করবার সুযোগ, এমন কি প্রেরণাও পেতাম না সম্ভবত। কর্তব্যবোধে আমি স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে জেলে একবার দেখা করতেও চেয়েছিলাম, স্বর্ণেন্দুই দেখা করেনি। আইনের কবলে পড়ে বংশীর চিকিৎসক হিসেবে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে হয়েছিল। আমি যা জানতাম, (যা সন্দেহ করতাম, তা নয়) যথাযথ বলেছিলাম সত্যনিষ্ঠার জন্যে নয়, বাধ্য হয়ে। বানিয়ে দু'চারটে মিছে কথা বললে স্বর্ণেন্দুর যদি কোন সুবিধে হ'ত, আমি নিশ্চয়ই বলতাম, কিন্তু সে সুযোগই পাওয়া যায়নি। সেদিন সকালে সেই যে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ছোট্ট হাসিটি হেসে স্বর্ণেন্দু আমাকে বলেছিল—আমি করেছি, সে কথা আর সে প্রত্যাহার করেনি। যে নিজের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করে, তাকে আইনের কবল থেকে বাঁচাবে কে ?

শুধু নিজের মুখে নয়, নিজের হাতে লিখে সে দোষ স্বীকার করেছিল। সে লিখে দিয়েছিল যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা তার মা মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় তাঁর গুরুদেবের কাছে চলে গিয়েছিলেন, তার বোন রাত্রিও মধুপুরে যাবার জন্যে চলে গিয়েছিল ভোরবেলা, পাশের ঘরে বাবা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উত্থানশক্তিরহিত—এই সুযোগে সে স্বহস্তে ছোরা দিয়ে বংশীকে খুন করেছিল কোন বিশেষ কারণে। কারণটা কি, তা সে বলবে না।

পুলিস স্বর্ণেন্দুর মা, স্বর্ণেন্দুর বাবা এবং রাত্রিকেও তলব করেছিল সাক্ষী হিসেবে। স্বর্ণেন্দুর বাবা কিছুই শোনেননি। পুলিস আসবার সময় তাঁকে একটু আড়ালে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তারপর সেই দিনই তাঁকে তাঁর মামাতো ভায়ের বাড়িতে সরিয়ে ফেলা হয়। তিনি নাকি বাঁ হাতে লিখে লিখে স্বর্ণেন্দু, রাত্রি এবং বংশীর কথা জিজ্ঞেস করতেন নিখিলবাবুকে—কোথায় গেল এরা সব ? নিখিলবাবু নানা রকম মিছে কথা বলে স্তোক দিতেন। স্বর্ণেন্দুর বাবাকে সাক্ষী দিতে হয়নি, নিখিলবাবু পুলিসকে বলে সে ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। স্বর্ণেন্দুর মা সাক্ষী দিতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ ঠিক সেই দিনটি আমি কলকাতার বাইরে ছিলাম। স্বর্ণেন্দুর মা স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, স্বর্ণেন্দু দেখা করেনি। রাত্রিকে মধুপুরে পাওয়া যায়নি। তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল বম্বেতে একটা হোটেলে, সেখানে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে সে ছিল। তার অসুখ

করেছিল বলেই সে নাকি আসতে পারেনি, তার বদলে একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট এসেছিল। তবু কমিশনে সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল তার। সে বলেছিল, সে বংশীকে অসুস্থ দেখে এসেছিল, এর বেশি আর কিছু সে জানে না। স্বর্ণেন্দু তার স্বীকারোক্তির এক বর্ণও প্রত্যাহার করেনি। নিখিলবাবু যে শেষ চেষ্টা করেছিলেন, তাও সফল হয়নি। কিছুতেই তাকে পাগল বলে প্রমাণ করা গেল না। ডাক্তারেরা পর্যবেক্ষণ করে মত দিলেন যে, তার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ। সে রীতিমত খায়, ঘুমোয়, সুস্থ লোকের মত আলাপ করে—সব শেষ হয়ে যাবার পর নিখিল চৌধুরীর মুখে আমাকে এই সব বিবরণ শুনতে হচ্ছিল। আমি নিজে সাগ্রহে ঔৎসুক্যভরে স্বয়ং এগুলো সংগ্রহ করিনি বলে নিজের কাছেই কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলাম। দূরে গ্রামোফোন বাজছিল, হু-হু করে দক্ষিণে হাওয়াটা বইছিল, নিখিলবাবুর ছাতে অন্ধকারে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বসেছিলাম আমি।

এ সব সত্ত্বেও ওর হয়তো ফাঁসি হ'ত না, যদি না অ্যানার্কইজ্‌মের ফ্যাকড়াটা উঠত।—এই বলে নিখিল চৌধুরী সশব্দে নস্যি টেনে নিলেন।

অ্যানার্কিজ্‌মের ফ্যাকড়া মানে ?

আপনি শোনেননি কিছু ?

মনে মনে আর একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, না।

পুলিস স্বর্ণেন্দুকে একজন ফেরারী অ্যানার্কিস্ট বলে সনাক্ত করেছিল, একটা নয়, দু'তিনটে পলিটিক্যাল খুনের সঙ্গে ওর নাকি যোগ ছিল, ওকেই ওরা নাকি খুঁজছিল, বংশীর অ্যাপ্রুভার হবার সম্ভাবনা ছিল বলেই নাকি বংশীকে ও খুন করেছে—এই ওদের থিওরি।

নিখিল চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন এবং ছাতে পায়চারি করতে লাগলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

বিরক্তিকর !

আবার এসে বসলেন নিখিল চৌধুরী।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে নিষ্ফল আক্রোশে যেন চাপা গর্জন করে বললেন, আর জানেন, স্বর্ণেন্দু হাসিমুখে তাও মেনে নিলে! ড্যাম হিজ হাসি!

আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটু ইতস্তত করে এবং রূঢ় সত্যটা শোনবার জন্যে মনকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার ফাঁসির দিন কবে ?

ফাঁসি কাল হয়ে গেছে।

হাওয়াটা থেমে গেল না, দূরের বাড়ির গ্রামোফোনও সমানে বাজতে লাগল। চামেলি এসে খবর দিলে, খাবার দেওয়া হয়েছে। নীরবে নীচে নেমে গেলাম। ফাউলের ফ্রেঞ্চ কাটলেট, সুগন্ধি রূদনি চালের ভাত, চমৎকার মুগের ডাল—সবই উপাদেয় হয়েছিল। তবু কি একটা তুচ্ছ কারণে চামেলিকে ধমকালেন নিখিলবাবু। চামেলি নীরবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হাসিমুখে। অর্থাৎ সবই যেমন হয়, হতে থাকল। স্বর্ণেন্দুর ফাঁসি হয়ে গেছে বলে কিছুই আটকাল না, কিছুই বদলাল না। স্বর্ণেন্দু যে নির্দোষ, এ কথা নিঃসংশয়ে জেনেও আমার আহারে রুচি কিছুমাত্র কমল না, আমি বেশ খেতে লাগলাম। স্বর্ণেন্দু আদালতে যে মিছে কথা বলেছিল, তার একটা প্রমাণ তো এখনই স্বকর্ণে শুনলাম। রাত্রির যে সেদিন ভোরে মধুপুর চলে যাওয়ার কথা ছিল না, স্বর্ণেন্দু তা জানত। রাত্রি স্টেশনে গিয়েছিল জ্যোতির্ময়কে আনতে, কিন্তু ফেরে নি।

নিখিলবাবু তৃতীয় কাটলেটটি নিঃশেষ করে চতুর্থটি আক্রমণ করতে করতে সহসা বললেন, কিন্তু এই দুঃসংবাদটা দেবার জন্যেই আপনাকে টেনে আনি নি। অধিকতর দুঃসংবাদ একটা আছে।

আবার কি?

রাত্রি পরশুদিন আসছে অবনীশের সঙ্গে বম্বে থেকে।

এই সংবাদে আমার মুখভাব কি রকম হয়েছিল, তা বলতে পারি না, কিন্তু তা লক্ষ্য করেই নিখিলবাবু সম্ভবত বললেন, অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলে চলবে না, আপনাকেই ধাক্কাটা সামলাতে হবে। তারা আমার বাসাতেই এসে উঠবে লিখেছে। অবনীশবাবু লিখেছেন, কি একটা জরুরি কাজ আছে তাঁর। কিন্তু আমি থাকব না, আপনিই জরুরি দরকারটা সামলে দেবেন আমার হয়ে।

আপনি কোথা যাচ্ছেন?

অপ্রত্যাশিত একটা সংবাদ দিলেন নিখিল চৌধুরী।

বিয়ে করতে।

বিয়ে করতে! এতদিন পরে হঠাৎ এ খেয়াল?

খেয়াল নয় প্রয়োজন। স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করতে গেলে বিয়ে করা দরকার। অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই সুখে থাকতে পারে, আমরা পারি না।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা ছাড়া চামেলিটাকে শায়েস্তা করবার লোক দরকার একজন। ইদানীং ও বড্ড বেড়েছে।

ঠিক উৎসুক হয়েছিলাম বলে নয়, এই প্রসঙ্গে একটা কিছু বলতে হয় বলে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বিয়ে করছেন ?

ঘোর পাড়াগাঁয়ে, কালো কুচ্ছিত একটা হাঁদা মেয়েকে, তার একমাত্র গুণ, সে স্বাস্থ্যবতী। সুন্দরী স্নিগ্ধ বুদ্ধিমতী দেখে দেখে অরুচি জন্মে গেছে।

নিরর্থক জেনেও বললাম, আপনার মত লোকের এ রকম বিয়ে করার—

আমার কথা শেষ হতে না দিয়েই নিখিলবাবু বললেন, বংশরক্ষার্থে। এবং তারপর একটু থেমে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর।

উভয়ে নীরবেই আহার করতে লাগলাম।

আমার মনের মধ্যে একটি চিন্তা মেঘের মত নানা ভাবে নিজেকে প্রসারিত করছিল,—রাত্রি আসছে, জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে নয়, অবনীশের সঙ্গে। স্বর্ণেন্দু নেই, নিখিলবাবুও থাকলেন না।

সহসা প্রভঞ্জন থেমে গেল।

সানাই ঢোল একসঙ্গে নীরব হ'ল। নিবিড় স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। স্তব্ধতাকে বিক্ষত করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাঠবেড়ালীটা ডাকছে কেবল, চিক-চিক-চিক-চিক।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

কার্যকারণের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এর পরে যা ঘটেছিল, তারও একাধিক কারণ ছিল, যদিও সে কারণগুলো তখন আমার মনে তত স্পষ্ট ছিল না, এখন যতটা হয়েছে। সমস্ত জিনিসটা পর্যালোচনা করে এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। (যদিও সেটা মাসীর গোঁফ গজালে মামা হ'ত গোছ হাস্যকর সিদ্ধান্ত) যাই হোক, এই কথাটাই এখন আমার মনে হয় যে, অবনীশের ব্যবসায় এবং সামাজিক বুদ্ধি যদি আর একটু কম প্রকট হ'ত, সেদিন গভীর নিশীথে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে রাত্রির কান্না যদি না দেখতাম এবং মোহের প্ররোচনায় পড়ে নিজেকে কুসংস্কারহীন অতি-আধুনিক আত্মত্যাগী বলে শুধু প্রচার নয়—প্রমাণ করবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা যদি আমাকে না পেয়ে বসত, তা হলে হয়তো এমন হ'ত না। শেষোক্ত কারণটাকেই মুখ্য বলতে আমি রাজী নই—যদিও ধরণীবাবু এবং নিখিল চৌধুরীর তাই মত, কারণ আগের দুটোর অস্তিত্ব না থাকলে আমার মোহ নিজেকে জাহির করবার সুযোগ এবং সম্ভবত প্রেরণাও পেত না। গাছের উদ্ভবের জন্যে মাটি এবং বীজ উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

অবনীশের কথা চিন্তা করলেই আমার খুব ছেলেবেলায় দেখা এক স্টেশন-মাস্টারের কথা মনে পড়ে। স্টেশনের নাম মনে নেই, কোন রেলওয়ে তাও মনে নেই, তবে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। স্টেশনটা খুব ছোট, এক মিনিটের বেশি কোন গাড়িই সেখানে বোধ হয় থামে না। স্টেশনেরই এক অংশে স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টার। চারিদিকে ধু-ধু করছে মাঠ। আমাদের ট্রেন যখন সেখানে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। অস্তগামী সূর্যের লাল আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্টেশনের পাশেই একটি নধরকান্তি গাই বাঁধা রয়েছে, আর নিকটেই একটি বলিষ্ঠ-গঠন প্রৌঢ় ব্যক্তি হেঁট মুখে, খালি গায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে জাব মেখে চলেছেন! দু'হাতের কনুই পর্যন্ত খোল-খড় মাখা। ট্রেন এসে দাঁড়াতেই তিনি জাবের ডাবা থেকে মুখ তুলে ডাকলেন, কই রে ফাগুয়া? ফাগুয়া স্টেশনের ভেতর থেকে একটা টুপি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল এবং সেটা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে। টুপিতে লেখা রয়েছে—এস এম.।

তিনি খোল-খড়-মাখা ডান হাতটা তুলে বললেন, অল রাইট, অল রাইট। ফাগুয়া ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজালে, লাইন ক্লিয়ার দিলে, গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিলেন, ট্রেন চলতে লাগল। অবনীশের সঙ্গে এই স্টেশন-মাস্টারের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য নেই, কিন্তু মূলত মিল আছে। দু'জনেই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ঘোর স্বার্থপর, দু'জনেই শ্যাম এবং কুল দুই-ই বজায় রাখতে অশোভনভাবে ব্যস্ত। অবনীশের চেহারাটা দেখে হঠাৎ তাকে খুব খারাপ লোক বলে মনে হয় না। খুব বেঁটে সাহেবী পোশাক-পরা শ্যামবর্ণ লোকটি, পুরু ঠোঁট, ভুঁড়ো নাক, কিন্তু সমস্ত মুখখানাতে এমন একটা সদা-সপ্রতিভ ভাব আছে যে, তাতেই মুখখানা কিঞ্চিৎ শ্রীসম্পন্ন হয়েছে। দেখলেই, অর্থাৎ পরিচয় পাওয়ার আগে, মনে হয়, লোকটি নির্ভরযোগ্য, ভেতরে শক্তি আছে। পরিচয় পেলে মনে হয়, শক্তি আছে বটে, কিন্তু সে শক্তির এক বিন্দু তিনি অপচয় অর্থাৎ অপরের জন্যে ব্যয় করতে রাজী নন। মাথায় হ্যাট আছে, ছোট একটি টিকিও আছে। দুটোই তিনি শিরোধার্য করেছেন, আমার মনে হয়, ব্যবসার খাতিরে, নিরামিষ আহার করাটাও বোধ হয় ব্যবসার অঙ্গ। এ দেশে বিশুদ্ধ ঘিয়ের ব্যবসা করতে হলে এ সব চাই।

চামেলির মুখে যখন খবর পেলাম যে রাত্রিকে নিয়ে অবনীশবাবু এসে পৌঁছেছেন, তখন আমার মনে আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেকদিন আগে শোনা স্বর্ণেন্দুর কথাগুলো মনে হয়েছিল—সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বলবে না বলে সব জেনে-শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না? ভয় হয়েছিল, প্রবল-পরাক্রান্ত অবনীশের কবল থেকে রাত্রিকে উদ্ধার করবার মত সামর্থ হয়তো আমার নেই। রাত্রির ওপর আমার কি জোর আছে, কোন অধিকারে আমি এর বিরুদ্ধাচরণ করব?

নিখিলবাবুর বাসায় এসেই অবনীশের সঙ্গে দেখা হ'ল। নীচের বসবার ঘরে একাই বসেছিলেন তিনি, হাতে একটা পেন্সিল ছিল। আমাকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সপ্রতিভভাবে বললেন, আসুন, আপনিই আশা করি ডক্টর সরকার। আমি অবনীশ।

নমস্কারান্তে বসলাম।

আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আবার বললেন, আচ্ছা, বাই এনি চান্স, আপনি বড়বাজারের ঘিয়ের আড়তদার কাউকে চেনেন?

না।

কোনও ব্রোকার ?

না।

ঠোঁট দুটো ফাঁক করে পেন্সিল দিয়ে সামনের একটা দাঁতে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলেন চিন্তিত মুখে। তারপর হঠাৎ টেলিফোন-গাইডটা খুলে একটা নম্বর খুঁজে বার করে ফোন করলেন কাকে, ফোনে ঘি সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল হিন্দিতে।

এতদিন অবনীশ আর রাত্রিকে কেন্দ্র করে পূর্বরাগরঞ্জিত যে কুয়াশাটা আমার মনে সঞ্চিত হয়েছিল, একটা আচমকা দমকা হাওয়ায় সেটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ফুটকি দিয়ে আঁকা এক রকম ছবি আছে, দু'দিক থেকে দু'রকম দেখায়। একই ছবি এক দিক থেকে দেখলে হয়তো রমণীর মুখ, উল্টো দিক থেকে দেখলে ওরাংওটাং। ছবিটাকে উল্টো দিক থেকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম আমি।

হাঁ হাঁ, আভি, তুরন্ত।

রিসিভারটা নামিয়ে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। মাথার সামনের কেশবিরল অংশটায় হাত বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন ডক্টর সরকার, ট্যাক্সিতেই আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। দুটো কথা আছে আপনার সঙ্গে। নিখিলবাবু যখন নেই, তখন আপনাকেই বলে যাই, নেক্স্ট বেস্ট ম্যান।

কোথা যাবেন আপনি ?

বেশি দূর নয়, বড়বাজার। তারপর একটা হোটেল ঠিক করতে হবে আমাকে আজ রাত্রের মতন। কালই আমি ফিরে যাব, হয়তো আর দেখাই হবে না আপনার সঙ্গে।

দু'হাত দিয়ে টেনে তিনি প্যান্টলুনটা ঠিক করে নিলেন।

হোটেল কেন ?

একটু হেসে অবনীশ বললেন, আমি থাকব।

রাত্রি আসেনি ? সে কোথায় ?

ও ওপরে আছে, সে এখানেই থাকবে। চলুন।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে চড়ে বসলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে অবনীশ কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়ে বললেন, দেখুন, আপনার কথা

শুনেছি আমি অনেক, আপনার লেখাও পড়েছি, সেই জন্তেই ভরসা করছি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম।

অবনীশ আবার বললেন, এ বাড়িতে আমি রাত কাটাতে চাই না। গাড়িতেও আমরা একসঙ্গে আসিনি, তুটো আলাদা আলাদা কম্পার্টমেণ্টে ছিলাম।

এতে আমার বিস্ময় বাড়ল দেখে তিনি একটু হেসে বললেন, আলাদা আলাদা যে ছিলাম, তার ডকুমেণ্টারি প্রমাণ রাখবার জন্তে পয়সা খরচ করে ভিন্ন তুটো কম্পার্টমেণ্টে বার্থ রিজার্ভ করিয়ে এসেছি। এখানেও হোটেলে থাকতে চাই, ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স একটা থাকবে।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। বললাম, এর মানে কি?

মানে কি, আপনারা ডাক্তার মানুষ তু'দিনেই বুঝতে পারবেন। স্বর্ণেন্দুর বন্ধু হিসেবে যেটুকু কর্তব্য ছিল করলাম, তাকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে পৌছে দিয়ে গেলাম। পূর্ণেন্দুবাবুর বর্তমান ঠিকানাটা খুঁজে সেইখানেই পৌছে দেবেন আপনারা—যদি দরকার মনে করেন। আমি হাত ধুয়ে ফিরে যেতে চাই।

জ্যোতির্ময়বাবু কোথায়?

একটা অদ্ভুত রকম হাসি হাসলেন অবনীশ।

আহ্ আহ্ আহ্ আহ্—ঈষৎ মুখ ফাঁক করে খুব আস্তে আস্তে এই শব্দটা করলেন। তারপর বললেন, আপনি জ্যোতির্ময়বাবুর কথা জানেন তা হলে?

শুনেছি কিছু।

আরও শুনবেন ক্রমশ।

তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। ভুঁড়ো নাকের নীচে পুরু ঠোঁট তুটো কি যেন বলি বলি করে চেপে গেল।

জ্যোতির্ময়বাবু কোথায় এখন?

প্যারিসে। কিছু টাকা যোগাড় করে তিনি প্যারিসে চলে গেছেন আর্ট-চর্চা করবার জন্তে। আর্টিস্ট লোক।

চুপ করে বসে রইলাম আমি।

অবনীশ বড়বাজারে ট্যাক্সি থামিয়ে নানা দোকানে ঘুরলেন। একটা গলির

ভেতর ঢুকে গেলেন শেষে। আমি ট্যাক্সিতেই চুপ করে বসে রইলাম। স্টেশন-মাস্টারের ছবিটা ফুটে উঠল মনে। মনে হ'ল, চাকরির সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে গরুর জাব-দেওয়ার মধ্যে খাঁটি-দুগ্ধ-লোলুপ যে মনের পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম, আমাদের অধিকাংশের মনোবৃত্তি হয়তো ওই। জীবনের আনন্দ গৃহস্থালিতে—চাকরিতে নয়, চাকরিটা বজায় রাখতে চাই গৃহস্থালির সুবিধে হবে বলে। গৃহস্থালির সঙ্গে চাকরির বিরোধ যদি কোনদিন দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে, তখন স্টেশন-মাস্টারকে চাকরিটাই ছাড়তে হবে, গৃহস্থালিটা নয়। সব রকম বাঁচিয়ে যদি প্রেম করা চলত, অবনীশ রাজী ছিলেন। কিন্তু নিজের সুনাম ক্ষত-বিক্ষত করে? এই রকম মেয়ের সঙ্গে? অবনীশ মোটেই তাতে রাজী নন। প্রয়োজন হলে শুধু টিকি আর নিরামিষ আহারের নজিরেই নয়, দলিলের জোরে তিনি প্রমাণ করবেন যে, রাত্রির সঙ্গে কলঙ্কজনক কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁর হয়নি। তিনি নিজের ব্যবসার খাতিরে কলকাতা এসেছিলেন, বন্ধুর বোন হিসাবে ভিন্ন কম্পার্টমেণ্ট ভিন্ন বার্থে অধিষ্ঠিতা রাত্রির একটু-আধটু খোঁজ-খবর মাত্র করেছিলেন তিনি, আর কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে অবনীশ ফিরে এলেন।

ফিরে এসে বললেন, যাক, হাজার টাকার বিজ্‌নেস হ'ল। ট্রিপটা নেহাত বৃথায় গেল না।

আমি ভদ্রতার খাতিরে সায় দিয়ে মুচকি হাসলাম।

অবনীশ নামজাদা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন এবং ট্যাক্সিওয়ালাটাকে বলে দিলেন, আমাকে যেন বেনেটোলায় পৌঁছে দেয় সে, তার জন্যে ভাড়াটাও দিলেন তাকে অগ্রিম।

গুড নাইট।

গুড নাইট।

জনতা ভেদ করে ট্যাক্সি ছুট্‌তে লাগল।

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

॥ ২ ॥

"আপনারা কি আশা করেন, বংশীর সেই কুৎসিত প্রলাপ জ্যোতির্ময় এসে শুনবে, এ-সম্ভাবনা জেনেও আমি চুপ করে বসে থাকব? আমি? কিন্তু স্টেশনে গিয়ে দেখলাম, জ্যোতির্ময়ের আসা চলবে না, সবিতার স্বপ্নে তার দু'টি চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। দেখলাম, আমার দিকে চেয়ে সে ভাবছে সবিতাকে। এ দেখবার পরও কি আমি তাকে সবিতার বাড়ি যেতে দেবার সুযোগ দিতে পারি? তা ছাড়া সে এসেই হয়তো পুলিসের হাতে পড়ত। সবিতা, পুলিস।—কিছুতেই তাকে আসতে দিলাম না। কেমন করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম? আলেয়া যেমন করে পথিকের পথ ভোলায়, বাঘিনী যেমন করে অসহায় হরিণের ঘাড় মটকে তাকে অনায়াসে পিঠে করে তুলে নিয়ে যায়, তেমনই করে। কিন্তু তবু সে রইল না। যে হরিণটাকে মরা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম, হঠাৎ সেটা আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে তড়াক করে উঠে গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল চকিতের মধ্যে।" না, রাত্রি এসব কথা বলেনি। আমি কল্পনা করেছিলাম, যেন রাত্রি বলছে। রাত্রিকে আমি এসব বিষয়ে প্রশ্নই করিনি কোনদিন। অবকাশ হয়নি বলে নয়, সাহস হয়নি, ভদ্রতায় বেধেছিল। তা ছাড়া লোকে প্রশ্ন করে সংশয় নিরসনের জন্যে, আমার মনে কোন সংশয় ছিল না। আর একদল অভদ্র লোক সব জেনে-শুনে প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত করবার জন্যে। এ সব প্রশ্ন করে রাত্রিকে আমি অপ্রস্তুত করতে পারতাম কি না, জানি না; কিন্তু তাকে অপ্রস্তুত করবার বাসনাই আমার মনে হয়নি কোনদিন।

আমি কল্পনা করেছিলাম। সেদিন রাত্রে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের বিছানায় রোরুদ্যমানা রাত্রিকে দেখে অনেক রকম কল্পনা করেছিলাম আমি। মেঘ-ভারাক্রান্ত নিবিড় রাত্রি অন্ধকারে লুকিয়ে কাঁদছিল। আমি সে কান্না দেখেছিলাম, শুনেছিলাম, কেমন যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। জলে বরফ যেমন গলে যায়, তেমনই আমার মনের জমাট সংস্কারগুলো ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছিল। শ্রাবণশর্বরীর নিরবচ্ছিন্ন ধারা-বর্ষণ অন্তরলোকে যে নিবিড় রহস্যলোক সৃজন করে, সে রহস্যলোকের নিগূঢ় অস্পষ্টতায় যেমন বুদ্ধিবৃত্তির কোন যুক্তি চলে না, একটা

সশব্দ উৎকীর্ণ অনুভূতি অবুঝের মত রুদ্ধশ্বাসে অনির্দিষ্ট একটা কিছুর প্রত্যাশা করে যেমন প্রতি মুহূর্তে, তেমনই আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো অসম্ভব সম্ভবপর হয়ে উঠবে, হয়তো রাত্রি এখনই উঠে বসে চিৎকার করে বলবে, আমি তোমাদের আইন মানি না, ধর্ম মানি না, কিছু মানি না, আমি কেবল আমাকেই মানি ; আমি আছি বলেই তোমরা আছ, জগৎ-সংসার আছে,— আমার আমিত্বটাকে চেপে পিষে দলে মেরে ফেলতে দেব না, দেব না, দেব না ; পারবে না তোমরা, কিছুতেই আমাকে এঁটে উঠতে পারবে না, তোমাদের সমস্ত আইন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আমি নিজেকে জাহির করবই।

কিন্তু কিছুই সে বলেনি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অঝোরঝরে কাঁদছিল সে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আমি যে দেখছিলাম, তা সে জানত না। তার দুর্বল মুহূর্তে তাকে যে একদিন দেখেছিলাম, সে কথা কোনদিন তাকে বলিনি। তার ধারণা, সম্রাজ্ঞীর মত অনুকম্পাভরেই সে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি যেন আমার নিজের গরজেই তার কাছে কৃপা ভিক্ষা করেছিলাম, এবং উদারতা-চর্চা করবার সুযোগটা দিয়ে সে যেন আমাকে কৃতার্থ করেছিল। তার ভূলুণ্ঠিত সত্তার আকুল ক্রন্দন যে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সে কথা তাকে জানিয়ে কি লাভ হ'ত আমার ? তাকে শুধু ছোট করা হ'ত, সঙ্কুচিত করা হ'ত, তার পরাজিত বিধ্বস্ত অহমিকাকে নীচের মত উপহাস করা হ'ত। রাত্রিকে অপমান করবার মত কাপুরুষতা অথবা নিষ্ঠুরতা আমার ছিল না। জ্যোতির্ময়ের কথা আলাদা। সে বিশুদ্ধ শিল্পী, তাই সে স্বভাবতই নিষ্ঠুর। শিল্পীরা আলোকতীর্থের যাত্রী। যুগে যুগে তিমিরময়ী রাত্রিকে অতিক্রম করে চলে যায় তারা। জ্যোতির্ময়কে দোষ দিই না আমি।

অবনীশের সঙ্গে রাত্রি কলকাতায় এসেছিল কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। তখন তার কোন উত্তর পাই নি, পরে পেয়েছিলাম। রাত্রি এসেছিল দেখতে, সবিতা কলকাতায় আছে কি না ! সবিতা ছিল।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

কলকাতা শহরের ট্রাম ট্যাক্সি জনতা কোলাহল, ধরণীবাবু ছদ্ম উৎকণ্ঠা, নিখিল চৌধুরীর নির্জলা ক্রোধ, রাখালবাবুর উইল, ডি কে-র বর্ণনা, ডাক্তারী-জীবনের সফলতা-নিষ্ফলতা, লেখক-জীবনের প্রেরণা-অবসাদ—এ সমস্ত সত্ত্বেও পাঁচটি ছবি আমার মনে আঁকা আছে, চিরকাল থাকবে বোধ হয়।

অন্ধকার। গড়ের মাঠের একটা নির্জন অংশে রাত্রি শুয়ে ছিল, আমি পাশে বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমরা দু'জন ছাড়া পৃথিবীতে আর যেন কেউ নেই, কলকাতা শহরটা তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আকস্মিকভাবে ক্ষণিকের জন্য যেন আবির্ভূত হয়েছে, বুদ্বুদের মত এখনই মিলিয়ে যাবে। রাত্রির মনের মধ্যে ঢুকে আমি যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, অন্ধকার গুহার ভেতরে লোকে যেমন পথ হারিয়ে ফেলে, তেমনই। মোটরের চিৎকার মশকের গুঞ্জনের মত মনে হচ্ছিল, ক্রমশ তাও আর শোনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, চারদিকের আলো ক্রমশ যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, মুমূর্ষু রোগীর নাড়ী ক্রমশ যেমন ক্ষীণ হয়ে আসে। সমস্ত বিশ্বে যেন কিছু নেই, আছে কেবল একটা অনুভূতিময় স্পন্দন, ভেসে চলেছি যেন আমরা দু'জনে—মন্থর গতিতে, সেই স্পন্দনের তালে তালে সময়ের স্রোতে। সময়ের গতিও যেন থেমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, চেতনা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছিল।—হঠাৎ তার দীর্ঘনিশ্বাসপতনের শব্দে চমকে উঠলাম। হঠাৎ কলকাতা শহর তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আবার মূর্ত হয়ে উঠল চতুর্দিকে। আলো অন্ধকার সব ফিরে এল। চেয়ে দেখলাম, রাত্রি শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

॥ ২ ॥

দিনটা মেঘলা ছিল।

নিছক বেড়াবার জন্যেই বেরিয়েছিলাম। দ্রুতগামী একটি ট্রেনের খালি কম্পার্টমেণ্টে বসে ছিলাম দু'জনে। মেঘের স্তর ভেদ করে যে সূর্যালোক সেদিন নেমে এসেছিল পৃথিবীতে, তা যেন আগত নয়, আসন্ন—যেন একটা

অলৌকিক কিছুর পূর্বাভাস। এলোমেলো হাওয়াটা সেদিন বইছিল যেন তার অলক আর বসনকে উতলা করবার জন্তেই। তার পরনে ছিল জবাফুলের মত লাল রঙের একটি রেশমী শাড়ি। শাড়ির কোন পাড় ছিল না। মাথায় কোন অবগুণ্ঠন ছিল না। জানলার বাইরে চেয়ে চুপ করে বসেছিল সে। লাল শাড়িতে তার সর্বাঙ্গ আবৃত, মুখটি শুধু খোলা। মনে হচ্ছিল, মহাকাশচারী কোন জলন্ত নক্ষত্রের একটা টুকরো মাধ্যাকর্ষণের টানে হঠাৎ নেমে এসেছে যেন পৃথিবীতে, তার খানিকটা নিভে কালো হয়ে গেছে, বাকিটা জলছে এখন।—দু'পাশে দিগন্তবিস্তৃত ডানকুনির মাঠ। নিউ কর্ডের নূতন লাইন। দ্রুতগামী ট্রেন। গাড়িটা দুলছিল। হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে চাইলে আমার দিকে, তার নির্নিমেষ চোখে একবার যেন নিমেষপাত হ'ল, কৌতুকদীপ্ত এককণা হাসি চিকমিক করে উঠল কুচকুচে কালো চোখে, ক্ষণপরেই সে হাসি সংক্রমিত হ'ল অধরে।

আপনার খুব অনুতাপ হচ্ছে, নয়?

বিস্ময়ের ভান করে বললাম, না, আনন্দ হচ্ছে।

সত্যি?

ক্ষণকালমাত্র কৌতুকদীপ্ত দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করে আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে। এলোমেলো হাওয়া উদ্দাম হয়ে উঠল তার অলকগুচ্ছে, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। কেন আনন্দ হচ্ছে—এ কথা সে জানতে চায়নি, কিন্তু যেহেতু আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছিল না, অনুশোচনাই হচ্ছিল, তাই আনন্দিত হবার একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ বিবৃত না করে পারলাম না আমি।

আইনকে আইন দিয়েই জব্দ করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে বইকি।

আবার সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলে, চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

আপনার আত্মীয়স্বজন? তাঁরাও কি আনন্দিত হবেন এ খবর শুনলে?

সম্ভবত হবেন না। কিন্তু তাঁদের জানাবার দরকার কি? জীবনের অধিকাংশ আনন্দজনক কার্যই অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে করতে হয় সকলকে।

আধুনিকতার সুরা পান করেছিলাম বটে, কিন্তু এক চুমুক মাত্র। নেশার চেয়ে ক্ষোভই বেশি হয়েছিল, কিন্তু ভান করতে হচ্ছিল, যেন সত্যি সত্যি নেশা হয়েছে। নেশা যে একেবারে হয়নি, তা নয়; কিন্তু তা আধুনিকতার সুরা পান করে নয়, সনাতন সুরা পান করে। তার সঙ্গে আধুনিকতার

বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, তা যুবতীর সম্পর্কে যুবকের আদিম নেশা। কিন্তু সে উন্মাদনাকে আধুনিকতার ছদ্মবেশে নিস্পৃহ ঔদার্যের ভূমিকা অভিনয় করতে হচ্ছিল মিথ্যা আনন্দের আতিশয্য-সহকারে।

দ্রুতগামী ট্রেন দুলছিল। দু'পানে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ মেঘলা দিনের স্নিগ্ধ আলোকে প্রতীক্ষা করছিল যেন কার। এলোমেলো হাওয়া পাগল হয়ে উঠেছিল তার অলকে আর লাল শাড়িতে, আমি চুপ করে বসে দেখছিলাম, তার মখমল-কোমল কালো মুখে অনুদ্ভাসিত অপরূপ একটা অরুণিমা উদ্ভাসিত হবার সাধনা করছে।

॥ ৩ ॥

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছিল হঠাৎ আর একদিন।

রাত্রি তার বাবার কাছে যায়নি, যেতে চায়নি। তাকে আলাদা একটা বাসা করে দিয়েছিলাম। বাসাটার সামনে ছোট একটুখানি ফাঁকা জায়গা ছিল। জায়গাটার ওপারে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িখানা যাঁর, এই ফাঁকা জায়গাটুকুরও তিনিই মালিক। রাত্রিকে প্রায় সমস্ত দিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম—বাসে, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনে। খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল হোটেলে। শোবার জন্যেই কেবল বাড়িটা ভাড়া করতে হয়েছিল রাত্রির অভিপ্রায় অনুসারে। সেদিন বিকেলে রাত্রির আসবার কথা ছিল আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম, তবু সে এল না। যে 'কল' দু'টি বাকি ছিল, তা সেরে রাত্রির বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি, সামনের মাঠটায় অসম্ভব ভিড়। তিনতলা-বাড়ির মালিকের পিতৃশ্রাদ্ধ. কাঙালী-বিদায় হচ্ছে। অন্ধ, খঞ্জ, নানা ভাবে বিকৃত নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষ ছেঁড়া কাপড়ে রুখু চুলে কিলবিল করছে মাঠটায়। সমস্ত স্থানটা দুঃশব্দে ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দেখলাম, রাত্রি মাঠের দিকের কপাট জানলা সব বন্ধ করে দিয়েছে। সম্ভবত ভিড়ের জন্যে বেরোতেও পারেনি।

কড়া নাড়তেই চাকরটা এসে কপাট খুলে দিয়ে গেল। ওপরে উঠে দেখলাম, রাত্রি পড়ছে। আমার কাছে নানা রকম মাসিকপত্র জমে ছিল, তারই এক বোঝা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাকে।

আজকাল সাহিত্য-সমাজেও খুব দলাদলি, নয় ?

প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তবু একটা উত্তর দিলাম।

হবে না কেন ? মানুষ, বিশেষত সাহিত্যিকেরা স্বাধীন-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। প্রত্যেকেরই স্বাধীন মত আছে এবং তা প্রকাশ করবার অধিকার আছে। সুতরাং দলাদলি তো হবেই।

আপনি কি বলতে চান, স্বাধীন মতের প্রতি নিষ্ঠার জন্যেই এত দলাদলি ? আমার তো নানা কাগজের নানা প্রবন্ধ পড়ে মনে হ'ল যে, সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা কারও নেই, সকলেই মতলববাজ ব্যবসাদার।

এ রকম মনে হওয়ার মানে ?

মানে, যিনি লিখছেন—দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে যতক্ষণ না সাহিত্য গঠিত হচ্ছে ততক্ষণ তা খাঁটি সাহিত্য নয়, তিনি নিজে হয় প্রকাশক কিংবা কোন প্রকাশকের বন্ধু, এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য—দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে লেখা কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া। আবার এই দেখুন, আর একটা কাগজে দেখছি, একটা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—গণসাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয়নি এ দেশে। এঁর সঙ্গে বোধ হয় প্রথম প্রবন্ধ-লেখকের শত্রুতা আছে। আর একটা কাগজ প্রগতি-সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করছেন, এঁরও উদ্দেশ্য—

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, আহা, এরা সবাই যে মতলববাজ, এ সন্দেহ হ'ল কি করে তোমার ? ও-সব প্রবন্ধে যে যুক্তি আছে, সেগুলো কি অর্থহীন ?

একটু হেসে রাত্রি বললে, বুদ্ধিমান লোকে যে কোন জিনিসের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনায়াসে একটা যুক্তি খাড়া করতে পারে, ভাল উকিল দোষীকে মাঝে মাঝে বেকসুর খালাস করিয়ে আনে, তাই ব'লে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। যারা মানুষকে ভালবাসে, তারা যেমন মানুষের জাতবিচার করতে বসে না, তেমনই যারা সত্যিকার সাহিত্য-রসিক, তারা সাহিত্যের জাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানুষের সুখ-দুঃখ প্রেম-ঘৃণা আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মানুষের জীবন নিয়েই সাহিত্য। সে মানুষ ধনী কি গরিব, রাজরানী কি মেথরানী—এ নিয়ে যারা বেশি মাতামাতি করে তারা জানবেন, চণ্ডীমণ্ডপবাসী ঘোঁট-পাকানো মতলববাজ টাইদের সগোত্র। তারা ব্যবসাদার, সাহিত্যিক নয়।

ওয়েটিং-রুমে রাত্রির সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা হবার পর আর সাহিত্য-প্রসঙ্গ তার কাছে তোলবার সাহস ছিল না আমার। মাসিক-পত্রগুলো তার

কাছে এনে দিয়েছিলাম অবশ্য ক্ষীণ একটা আশা নিয়ে। সাহিত্যবিষয়ক দু'চারটে প্রবন্ধ ইদানীং লিখেছিলাম এবং প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য নিয়েই লিখেছিলাম। রাত্রির মুখে এই মন্তব্য শুনে আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, আমার ওই লোক-ভোলানো সস্তা উচ্ছ্বাসগুলো ওর চোখে যেন না পড়ে। কোন অজুহাতে মাসিকগুলো সরিয়ে নিয়ে যাব আমি এখান থেকে।

জ্যোতির্ময়ের যে ছবিখানা এন্‌লার্জ করতে দিয়েছিলাম, সেটা হয়েছে ?

কবে দেবার কথা ছিল ?

আজই।

চল, তবে বেরোনো যাক।

ওই নোংরা ভিড় ঠেলে আমার আজ বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনিই গিয়ে নিয়ে আসুন।

তার আদেশ—হ্যাঁ, আদেশই—অগ্রাহ্য করবার মত মানসিক শক্তি আমার ছিল না। সে আদেশ করবে না কেন, কিছুই সে লুকোয়নি, জ্যোতির্ময়ের সম্বন্ধে কোন কথাই সে আমার কাছে গোপন করেনি। সমস্ত জেনে-শুনেই আমি তাকে—না, ভুল বলছি—আমি তাকে প্রশ্রয় দিই নি, সেই আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি সব জেনে-শুনেও অর্ঘ নিবেদন করেছিলাম, সে তা গ্রহণ করে কৃতার্থ করেছিল আমাকে। আদেশ করবে না কেন ?

বেরিয়ে এলাম। ভিড় ঠেলে রাস্তায় গিযে পডলাম অনেক কষ্টে। গলির বাঁকে অদৃশ্য হবার পূর্বে ঘাড় ফিরিয়ে যে ছবিটা দেখলাম, তা আমার মনে স্পষ্টভাবে আঁকা আছে এখনও। দোতলার বারান্দায় নির্বিকারভাবে রেলিঙে ভর দিয়ে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পায়ের নীচে অসংখ্য ভিখারী।

॥ ৪ ॥

টেলিফোনের ঝনৎকারে ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসলাম, তখন রাত দুটো। কলকাতা শহরও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে সহসা বিদ্যুতের চমক দেখতে পেলাম। সোঁ-সোঁ করে একটা হাওয়া উঠল। সে দিন সমস্ত দিন রাত্রির সঙ্গে দেখা হয়নি। বিকেলে গিয়েছিলাম, দেখা পাইনি—একাই সে কোথায় বেরিয়েছিল। মনে

হ'ল, রাত্রিই হয়তো ফোন করছে কোথাও থেকে। গোকুল এসে বললে, নবীনবাবু—

নবীনবাবু লোকটি কে, ভাববার চেষ্টা করলাম। রোগীদের নাম আর পেটেন্ট ওষুধের নাম মনে রাখা এমন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! অথচ এই দু'টি জিনিসই আমাদের পেশার পক্ষে অপরিহার্য। সহসা মনে পড়ল, নবীনবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর মামাতো ভাইয়ের নাম। নেমে এলাম বিছানা থেকে। টিপটিপ করে বৃষ্টিও নামল, হাওয়ার বেগ বাড়ল।

ফোনে নবীনবাবু বললেন, দাদা কেমন যেন করছেন, আপনি দয়া করে শিগগির আসুন একবার।

রাত দুটোর সময় যে সব রোগী 'কেমন যেন করে,' তাদের অনেকের কথা জানি, কারও বেলাতেই দয়া করতে ত্রুটি করিনি, কিন্তু—। মনের ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ সুরটা সহসা ভোঁতা হয়ে গেল, যখনই ভাল করে মনে পড়ল, পূর্ণেন্দুবাবু স্বর্ণেন্দুর বাবা।

তাড়াতাড়ি জামা-জুতো পরে স্টেথসকোপ আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম—হঠাৎ যদি কোন ট্যাক্সি পাওয়া যায় এই ভরসায়। কলকাতা শহরেও অত রাত্রে যানবাহন সুলভ নয়। ফুটপাথ দিয়ে জোরেই হাঁটতে লাগলাম। বিরাট কর্নওয়ালিস স্ট্রীট জনশূন্য। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, হাওয়া বইছিল বেশ জোরে। রাত্রির কথা মনে পড়ল। বিশেষভাবে আরও এইজন্যে মনে পড়ল যে, এসে থেকে রাত্রি পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে যায়নি। কেন যায়নি, এ প্রশ্ন তাকে করেছিলাম। উত্তরে সে যা বলেছিল, তা নিখিল চৌধুরীর কাছে হয়তো সন্তোষজনক বলে মনে হতে পারত, কিন্তু আমার কাছে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। বলেছিল, গেলে উনি হয়তো দাদার কথা জানতে চাইবেন; কিন্তু বলার ধরনে কেমন যেন একটা কপটতা ছিল। এ কপটতার কারণ যে কি তার আভাস আমার অজ্ঞাত ছিল না; অবশ্য তা আভাস মাত্র। রাত্রি এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কেন যে দেয়নি, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম। কতক্ষণ যে চলেছিলাম, তা ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ফাঁকা ফুটপাথ দিয়ে রাত্রির কথা ভাবতে ভাবতে একা হেঁটে চলেছিলাম।

শাঁখারিটোলায় নবীনবাবুর বাসায় যখন পৌঁছলাম, নবীনবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, কেমন যেন নিঝুম হয়ে পড়েছেন। ঘরের ভেতর ঢুকে

দেখলাম, জীবন্ত চোখটাও মিনতি করছে; যাঁর ঘুম হ'ত না, মহানিদ্রা নেমেছে তাঁর চোখে, সমস্ত মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছে। পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেছেন।

ফেরবার সময় একটা ট্যাক্সি পেলাম। মনে হ'ল রাত্রিকে খবরটা দিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। রাত্রির বাসায় পৌঁছে বিস্মিত হয়ে গেলাম। রাত্রি তখনও জেগে আছে। জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, জোরে হাওয়া বইছিল, গলির মোড়ে অপেক্ষমান ট্যাক্সিটার হেড-লাইটের আলো নিঃশব্দে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছিল, আমি রাত্রির জানলার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাত্রি এতক্ষণ পর্যন্ত জেগে আছে কেন? মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব অসম্ভব নানা কারণ মনের মধ্যে ভিড় করে এল, চলে গেল। কড়া নাড়লাম।

রাত্রি জানলায় উঠে এল।

কে?

আমি।

আপনি এত রাত্রে?

চাকরটাকে না জাগিয়ে নিজেই নেমে এসে দরজা খুলে দিলে।

এত রাত্রে হঠাৎ যে?

ওপরে চল, বলছি। তুমি এখনও জেগে আছ কেন?

চিঠি লিখছিলাম।

কাকে?

ফার্নান্‌ডিজকে।

এমন সহজভাবে বললে, যেন ফার্নান্‌ডিজকে আমি চিনি আর সে কথা ও জানে। নিমেষের মধ্যে মানসপটে অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল—কলুটোলার মোড়ে স্বর্ণেন্দু, তার হাতে খবরের কাগজে মোড়া টকটকে লাল খাপে ঢাকা ছোরা, রাত্রির জন্মদিনে ফার্নান্‌ডিজের উপহার।

যেন কিছুই জানি না, এমনই ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ফার্নান্‌ডিজ কে?

ফার্নান্‌ডিজ আমাদের ড্রাইভার ছিল। আমাদের পুরোনো বাসাটার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম আজ বিকেলে, সেখানে দেখলাম, আমার নামে ফার্নান্‌ডিজের একটা চিঠি রয়েছে, আর এই ফোটোখানা।

টেবিলের ওপরেই কোটোখানা রাখা ছিল। দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠগঠন একজন হাবসী। ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম নির্নিমেষে।

হঠাৎ জানলা দিয়ে দমকা একটা হাওয়া ঢোকাতে চিঠি লেখবার প্যাডের পাতাগুলো ফরফর করে উড়তে লাগল। দেখলাম, রাত্রি ফার্নানডিজকে দীর্ঘ পত্র লিখেছে। কি লিখেছিল, আমি দেখিনি। রাত্রি একটা বই নিয়ে প্যাডটার ওপর চাপা দিলে।

বললাম, পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেলেন এখুনি।

রাত্রি শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ পরে বললে, শান্তি পেলেন এতদিনে।

একটুও কাঁদলে না।

তারপর হঠাৎ বললে, আচ্ছা, একটা স্যুটকেস আপনার বাসায় রেখে গিয়েছিলাম সেবারে, সেটা আছে তো?

আছে।

কাল নিয়ে আসতে হবে সেটা।

আচ্ছা।

পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল, জোরে জোরে হাওয়া বইতে লাগল, প্রকাণ্ড ট্যাক্সিখানা নীরবে অপেক্ষা করে রইল নীচের গলিটাতে খানিকটা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত।

॥ ৩ ॥

সিনেমায় ভাল একখানা বই ছিল।

সকাল থেকেই কাজকর্ম এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম, যাতে সন্ধ্যাবেলায় অবসর থাকে। পাশাপাশি দু'খানা সীট আগে থেকে 'বুক' করে রেখেছিলাম। যথাসময়ে রাত্রির বাসায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোন সাড়া পেলাম না। হাতঘড়িটা দেখলাম, আর মাত্র আধ ঘণ্টা দেরি আছে। ট্যাক্সি করে না গেলে সময়ে পৌঁছনো যাবে না। আবার কড়া নাড়লাম, এবার একটু জোরে। ছোকরা চাকরটা নেমে এল। কবাট খুলে দিয়ে বললে, মায়ের অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে? তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। সামনের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না। ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। শোবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, সেখানেও কেউ নেই। আবার ডাকলাম, সাড়া নেই। এদিক ওদিক খুঁজে শেষে বাথ-রুমের পাশে অন্ধকার ছোট যে ঘরটা ছিল, সেই ঘরটায় ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরটার কোণে রাত্রি উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। প্রসব-বেদনাতুরা রাত্রি। কাঁদছিল না, কাঁপছিল না, নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিল। আমিও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত্রি আমার পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল। বেশবাস সম্বৃত করে আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ চাহনি নিবদ্ধ করে সহজ কণ্ঠে বললে, আজ হবে। আমি আরও ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আমাকে ডাক্তারী বিবেকের তাড়নায় ছুটে বেরিয়ে আসতে হ'ল। যে ধাত্রীটিকে ঠিক করে রেখেছিলাম, তারই উদ্দেশে ছুটতে হ'ল ট্যাক্সি নিয়ে। রাত্রি বারোটার পর নির্বিঘ্নে রাত্রির সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। আমি তার নামকরণ করলাম, প্রভাত।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

এর পর যে-সব বর্ণনা গল্পলেখকের লেখনীতে অনর্গলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী, সে সব বর্ণনা আমি করব না। বসন্তের যাদুস্পর্শে শুষ্ক তরু যেমন মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, অদৃশ্য শক্তির লীলায় পাথর বিদীর্ণ করে যেমন নির্ঝর নিঃসৃত হয়, বর্ষাসমাগমে শীর্ণ স্রোতস্বতী যেমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে দু'কূল প্লাবিত করে ছোটে, সন্তান লাভ করে রাত্রিরও মাতৃহৃদয় তেমনই —এই জাতীয় বর্ণনা রাত্রির সম্পর্কে আমি করতে পারব না, কারণ তা মিথ্যা হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সন্তান প্রসব করে রাত্রি মুঞ্জরিত হয়ে ওঠেনি, নির্ঝরের চপলতা লাভ করেনি, নদীর মত দু'কূলপ্লাবিনী হয়নি। রাত্রি কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল, তার নির্ভীক সত্তা কেমন যেন নির্জীব হয়ে এসেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা আকাশচারী ব্যোমযানকে কে যেন গুলি করে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। তার চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে উঠেছিল, তাতে মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধতা ছিল না, ছিল শরাহত ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের মৌন বিলাপ। তার সারাদিন শান্তি ছিল না, সারারাত ঘুম ছিল না। ওই মাংসপিণ্ডটার প্রতি-মুহূর্তের অসংখ্য দাবি মেটাবার জন্যে অহরহ তাকে সে প্রাণপাত করতে হ'ত, তার মধ্যে মহনীয় কিছু আমি দেখতে পাইনি। আমার মনে হ'ত, অমোঘ আইনের কবলে পড়ে সে যেন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে। তার মলিন মুখ, শঙ্কিত দৃষ্টি, শীর্ণায়মান দেহ, অন্তরের নিদারুণ গ্লানি সত্ত্বেও বাইরের ছদ্ম-সপ্রতিভতা —না, মহনীয় কিছুই ছিল না।

প্রভাত কি তার মায়ের বন্দীত্বের ব্যথা অনুভব করেছিল? আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, করেছিল। শিশুকে আমরা যত অবোধ ভাবি, হয়তো সে সত্যিই তত অবোধ নয়। আমার মনে হয়, প্রভাত তার মায়ের ব্যথা বুঝেছিল, কোন নিগূঢ় উপায়ে বুঝেছিল, তাই সে তার মাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেল। তা না হলে অমন সুন্দর সুস্থ শিশুর হঠাৎ মৃত্যু হ'ল কেন?

অসুস্থ হয়ে পশ্চিমের এই শহরটায় বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে এসে স্মৃতি-মন্থন করে যে কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করছি, এখন মনে হচ্ছে, তার কতটুকু

আমি জানি! সবই তো অস্পষ্ট! কল্পনায়-বাস্তবে, আলোয়-আঁধারে মিলিয়ে যে ছবি আমি আঁকলুম, তার কতটুকু কল্পনা, কতটুকু বাস্তব, কতটুকু আলো, কতটুকু আঁধার, কিছুই তো জানি না—সমস্তটাই আমার মনের বিকার কি না, কে জানে! সবই মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু একটা অবিসংবাদিত সত্যকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, আমি মোহগ্রস্ত। মোহের মায়াময় অঞ্জন চোখে লাগিয়ে হয়তো আমি কুৎসিতকে সুন্দর, পাপকে পুণ্য, অসত্যকে সত্য রূপে দেখেছি এবং অপরকে দেখাতে চেষ্টা করেছি। বর্তমান যুগের এই সর্বনাশা মনোবৃত্তি হয়তো আমাকেও পেয়ে বসেছে। অন্যায়কে অন্যায় জেনেও, নিজের দুর্বলতার জন্যে লজ্জিত না হয়ে তাকে সুন্দর করে আঁকবার চেষ্টা করেছি কেবল আমার লেখার শক্তি আছে বলে। বুঝছি, কিন্তু নিরস্ত হতে পারছি না।

তেতলার একটা ঘরে বসে লিখছি। দূর দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ও-পাশের সাদা স্তূপ-মেঘটার সর্বাঙ্গে অভ্র আবীর। সারি সারি পাখি উড়ে চলেছে, দলে দলে গরু ফিরে আসছে মাঠ থেকে, নদীপারের তালবনে সোনার স্বপ্ন নেমেছে যেন, তালবনের ও-পারে ঘন-নীল মেঘটার গায়ে আলোর জরি জ্বলছে।

ডি কে.-র কথাগুলো মনে পড়ছে।

"তাঁরা দু'জনে পাপ-পুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশে চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দু'জনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

হিমালয়ের পথে রাখালবাবু আর স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে ডি কে.-র নাকি দেখা হয়েছিল। আলাপও হয়েছিল। ডি. কে জানত না যে, আমার সঙ্গেও তাঁদের আলাপ ছিল। তাই সেই কলকাতায় ফিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁদের গল্প করছিল আমার কাছে।—

আশ্চর্য লোক ভাই রাখালবাবু, নিজের ভ্রষ্টা স্ত্রীকে ভ্রষ্টা জেনেও একদিনের জন্যে ত্যাগ করেননি।

আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম, কিছু বলিনি, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিতে-ভ্রূর কুঞ্চনে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না তোর? তুই ভাবছিস, আমি কেমন করে জানলাম? রাখালবাবুর স্ত্রীই নিজে আমাকে বলেছিলেন একদিন। কেদার-বদরির পথে

একটা চটিতে ছিলুম আমরা। অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। হঠাৎ রাখালবাবুর স্ত্রী কেমন যেন ক্ষেপে গেলেন। চুল এলো করে, চোখ বড় বড় করে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ভাই! হঠাৎ আমাকে বললেন, না, আমি পাপের বোঝা বুকে নিয়ে কেদারনাথে যেতে পারব না, ফেটে মরে যাব; তুমি শোন, তোমার কাছে বলে হালকা হই আমি। এই বলে বলতে লাগলেন, আমার জ্যোতির্ময় যখন এক বছরের সেই সময় পূর্ণেন্দুবাবু বলে একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয় আমাদের। আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল। ঘনিষ্ঠতা শেষটায় এমন দাঁড়াল যে, নিজের পেটের ছেলেকে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে গেলাম তার সঙ্গে। পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে অনেক দিন ছিলাম, অনেকে আমাকে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী বলেই জানে—

এই সময় ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠেছিল, ধীরেনকেই কে যেন ডাকছিল ফোনে—জরুরি দরকারে। ধীরেন গল্পটা অসমাপ্ত রেখেই চলে গিয়েছিল, বলে গিয়েছিল, আর একদিন এসে বাকিটা বলবে। এখনও ফেরে নি। শুনেছি, সঙ্গী পেয়ে সে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে গেছে। মানস-সরোবরে যেতে পারেনি বলে সঙ্কোচে গোড়াতেই রাখালবাবুদের সম্বন্ধে যে কথাগুলো সে বলেছিল, সে কথাগুলোই বার বার মনে পড়ছে আমার—তাঁরা দু'জনে পাপপুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশে চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দু'জনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উত্তর দিকের পালক-মেঘগুলোতেও রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে, দেখতে দেখতে সব গোলাপী হয়ে গেল। তালবনের ও-পারে ঘন-নীল বেগুনী হয়ে আসছে, আলোর জরিতে আগুন জ্বলছে। একটা পাশুটে রঙের মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর ঝিলিক ছুটছে তার চারদিক দিয়ে।

নিখিল চৌধুরী যেদিন রাখালবাবুর উইলটা আমাকে এনে দেখিয়েছিলেন, সেদিনের কথাও মনে পড়ছে আমার আজ। রাখালবাবু মহাপ্রস্থানে যাবার আগে একটা উইল করে নিখিল চৌধুরীর নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি জ্যোতির্ময় আর রাত্রিকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। পূর্ণেন্দুবাবুর জন্যেও ব্যবস্থা ছিল—তিনি যতদিন বাঁচবেন সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবার মতন খরচ পাবেন। পূর্ণেন্দুবাবুর মৃত্যুসংবাদ তিনি পাননি বোধ হয়। নিখিলবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন,

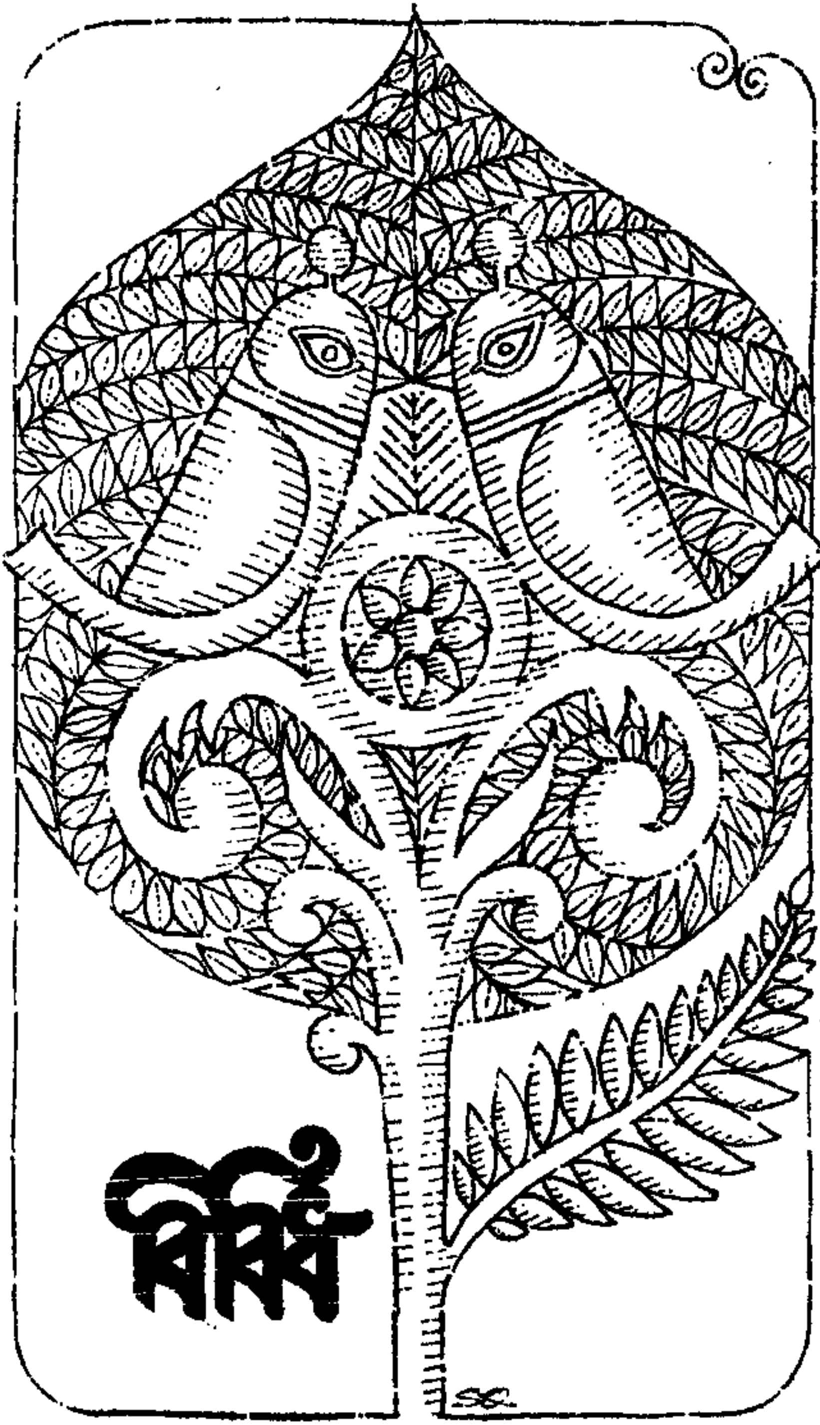
রাত্রির ঠিকানা আমি জানি কি না। ঠিকানা আমি জানতাম না, তাই বলতে পারিনি। প্রভাতের মৃত্যুর দু'দিন পরেই রাত্রি চলে গিয়েছিল। কোথায়, তা আমি জানি না।

আজও কিন্তু আমি তার প্রতীক্ষা করি। অসামাজিকভাবে নয়, সামাজিক দাবিতেই। আইনের চক্ষে আমি তার স্বামী। জ্যোতির্ময়ের সন্তানের জারজ-অপবাদ-মোচনের জন্য আইনত আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। আমি জানি, সে আসবে না। এও আমি জানি, আমার নয়, নিজের সন্তানের জন্যেই এবং হয়তো আমার প্রবল আগ্রহাতিশয্যে এ বিবাহে সে সম্মত হয়েছিল। আমাকে সে কোনদিনই ভালবাসে নি।

তবু তার প্রতীক্ষা করি।

দূর দিগন্তরেখায় তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তপন ধীরে ধীরে নামছে। অস্তরাগরঞ্জিত মেঘমালার বর্ণ-বৈচিত্র্য নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ক্রমশ। অন্ধকারের আগমনী শুনতে পাচ্ছি।

রাত্রি আসন্ন।


বিবিধ

ভূয়োদর্শন

উৎসর্গ

বিশ্রুত-কীর্তি 'পরশুরাম'

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

করকমলেষু—

১০. ৬. ৪২

ভাগলপুর

নরোত্তম

নরোত্তম কিছুদিন হইতে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। 'আকর্ষণ' কথাটার মধ্যে যে একটা জবরদস্তির আভাস আছে, তাহা এ ক্ষেত্রে অলীক নহে, সম্পূর্ণ সত্য। নরোত্তমকে আমি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইয়াছি। নানারূপ সামাজিক সদ্‌গুণে নরোত্তম মণ্ডিত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দেশের কাজে জেল খাটিয়াছে, পরোপকারী এবং সমাজ-সংস্কারার্থে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায়ই প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এ যাবৎ সে আমার শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিতে পারে নাই। তাহাকে সাধারণ আর পাঁচজনের মতই মনে করিতাম। কিন্তু সেদিন জানিলাম, সে লুকাইয়া মদ্যপান করে। জানিবামাত্র বুঝিলাম, নরোত্তম সাধারণ লোক নহে—সে সত্যই শ্রদ্ধার পাত্র। সে সত্যই মানুষ।

মদ্যপান-প্রসঙ্গ লইয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে গেলে আত্মার কথা আসিয়া পড়ে এবং আত্মার কথা আসিয়া পড়িলে সম্ভ্রম না করিয়া পারা যায় না। এই সম্ভ্রম অহেতুক নহে। আত্মা বস্তুটি কি তাহা আমার ঠিক জানা নাই। দেহের কোন্ অংশে তাহার অবস্থিতি সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ; আত্মা কোন্ অবস্থায় সৎ, কোন্ অবস্থায় চিৎ এবং কোন্ অবস্থায় আনন্দস্বরূপ, তাহা বহু চিন্তাসত্ত্বেও আমার নিকট অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আত্মার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িলেই শ্রদ্ধান্বিত হইতে হয় এবং ব্যাকরণ-সম্মত শুদ্ধ সংস্কৃত বাক্যাবলী ব্যবহার করিতে লোভ জন্মে।

আত্মার তৃপ্তির জন্যই অবশ্য নরোত্তম মদ্যপান করে। আত্মাকে তৃপ্তিদান করা সকলেরই অপরিহার্য কর্তব্য, এবং সকলেই সে কর্তব্য করিবার জন্য নানা মার্গ অবলম্বন করেন। জ্ঞান-মার্গ, ভক্তি-মার্গ এবং কর্ম-মার্গ—প্রধানত এই ত্রিবিধ মার্গ অবলম্বন করিয়া মানবগণ আত্মাবিনোদন করিয়া থাকেন। ছুৎ-মার্গ কথাটা শুনিয়াছি; কিন্তু মদ-মার্গ বলিয়া কোন বিশেষ মার্গের উল্লেখ আছে বলিয়া জানি না। আমার মনে হইতেছে, মদ্যবস্তুটি সমস্ত মার্গের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলিয়াই হয়তো বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ ইহাকে একটি পৃথক

মার্গরূপে চিহ্নিত করিয়া দিতে ইতস্তত করিয়াছেন। তাঁহারা হয়তো নিগূঢ়ভাবে এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যে, যে কোন মার্গেই আমরা বিচরণ করি না কেন, আত্মাকে প্রকৃত তৃপ্তিদান করিতে হইলে মদ চাই। বস্তুত জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—অজ্ঞান, অভক্তি, অকর্ম, যে কোন অবস্থার সহিত ইহা বেশ মানাইয়া যায়।

কিন্তু এই মর্মামোদী আলোচনা করিতে করিতে একটি কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আমাদের সমাজে মদ জিনিসটা এখনও চায়ের মত চলে নাই। এমন কি মদ্যপান করিলে লোকে এখনও নিন্দাই করিয়া থাকে। কেহ কীর্তনে মাতিয়া রাস্তায় ঢলাঢলি করিলে আমরা বাহবা দিই, কিন্তু মদ খাইয়া রাস্তায় ঢলাঢলি করিলে আমরা তাহাকে পুলিসে দিয়া থাকি। ইহাই বর্তমান সামাজিক নিয়ম। সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে মানুষ এবং মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ভগবান। মানবের কার্যকলাপ ও বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা করার অর্থ ভগবানের বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা করা। তাহা করিতে আমি অপারগ। বিশেষ ইচ্ছুকও নহি, কারণ আমি সমাজের পক্ষপাতী। আমি ইহা সার বুঝিয়াছি যে, এই জ্বালাযন্ত্রণাময় পৃথিবীতে যখন কিছুদিন বাঁচিতেই হইবে তখন অন্তত পরনিন্দা ও পরচর্চা করিবার জন্যই একটা সমাজ থাকা প্রয়োজন। আমি পরনিন্দাশীল পরচর্চামুখর সমাজের একজন রক্ষণশীল অধিবাসী। এমন কি পরনিন্দা ও পরচর্চার সুযোগ আছে বলিয়াই আমি সমাজের অস্তিত্ব সার্থক মনে করি। সত্য বটে অনেক ভাল পুস্তক, ভাল ছবি, ভাল লোক, ভাল গান এবং অন্যান্য অনেক ভাল জিনিস আমাদের সমাজে তাদৃশ জনপ্রিয় হয় নাই, কিন্তু তাহার জন্য সমাজকে দায়ী করিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে না। মদের মত এমন একটা উৎকৃষ্ট জিনিস সমাজে খোলাখুলিভাবে চলিতেছে না, তাহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী সমাজ নয়।

তাহার জন্য দায়ী সেই অজ্ঞাত হেতু, যাহা আমাদিগকে দিবসে জোৎস্না এবং রাত্রে রৌদ্র উপভোগ করিতে দেয় না, যাহার জন্য আমরা তবলা বাজাইতে বাজাইতে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে অথবা মুগুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রিয়াকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে পারি না। এবম্প্রকার পরস্পরবিরোধী সুখ একসঙ্গে উপভোগ করিতে উৎসুক হইলে একের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমাজ ও মদ একসঙ্গে চলা কঠিন। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেই কঠিন কার্যকে সহজ করিয়া ফেলেন। মোটা লোকের যদি সার্কাসমুখী প্রতিভা

থাকে, সে অনায়াসে শূন্যে অবস্থিত সরু তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যায়। রাধার অন্তরে প্রেম ছিল কিন্তু মস্তিষ্কে প্রতিভা ছিল না। তাই সে শ্যাম এবং কুল দুই রাখিতে পারিল না। নরোত্তমের মত প্রতিভা থাকিলে সে শ্যাম এবং কুল দুই-ই বজায় রাখিতে পারিত।

নরোত্তমের সমাজে ভাল ছেলে বলিয়া সুনাম আছে, অথচ সে লুকাইয়া মদও খায়—একথা যতই ভাবিতেছি, ততই শ্রদ্ধায় আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

মেঘান্তরালবর্তী শশধরের ন্যায়, পত্রান্তরালবর্তী কুসুমের ন্যায়, অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত রূপসীর ন্যায় নরোত্তম দাসের প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সন্দেহ করিতেছি, গতকাল সে আমার বোতল হইতে খানিকটা মদ লুকাইয়া পান করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই তাহার উপর চটিতে পারিতেছি না। বরং আমার মনে এই দার্শনিক তত্ত্ব উদিত হইতেছে যে, যেমন 'ওঁ' নামক ক্ষুদ্রকায় বস্তুটি একটা বিরাট-কিছুর প্রতীক, আমাদের নরোত্তমও তেমনই আমাদের স্বদেশীয় প্রতিভার প্রতীক। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সমন্বয়সাধন। আমরা শৈব ও শাক্ত, তান্ত্রিক ও ব্রহ্মচারী, আমিষ ও নিরামিষ সমস্ত জিনিসের মধ্যে আপোস করিয়া ফেলিয়াছি। রাধা নিজে যদিও দুই দিক রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু রাধাকে দিয়া সব দিক রক্ষা করাইয়া ছাড়িয়াছি। আমরা সূর্যগ্রহণের সহিত ব্যাক্‌টীরিয়া-তত্ত্ব মিলাইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে হাঁড়ি ফেলিতেছি, গোবর জিনিসটা জীবাণুনাশক বলিয়া আমরা চতুর্দিকে গো-বিষ্ঠা লেপন করিয়া হিন্দুমতে জীবাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছি। বৃহৎ-কাষ্ঠে বসিয়া জাতিভেদ ভুলিয়া দিবার মত মানসিক প্রশস্ততা আমাদের আছে এবং লোভনীয় স্ত্রী-রত্ন পাইলে দুষ্কুল হইতেও তাহা গ্রহণ করিবার শাস্ত্রীয় অনুমতি আমরা বহুকাল পূর্বেই পাইয়াছি। সেই সনাতন যুগ হইতে আমাদের জাতীয় প্রতিভা জীবনের সর্ববিভাগে নানা পরস্পরবিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়সাধন করিয়া আসিতেছে। রাজনীতির সহিত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ আমাদের দেশের মহাত্মার কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছে, সন্ন্যাসীর জীবনে ভোগবিলাসের অপূর্ব সমন্বয় আমাদের দেশেই বহু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে অহরহ সাধিত হইতেছে।

শীর্ণকলেবর বাঙালীর জীর্ণ অঙ্গে এখন হ্যাট কোট প্যাণ্ট নেকটাই দেখি, তাহার ভয়কম্পিত কণ্ঠে যখন হিট্‌লার মুসোলিনি লেনিন ট্রট্‌স্কির তূর্যনিনাদ

শুনি, ভূতভয়গ্রস্তা বিলাস-লালায়িতা স্বামী-সন্তানকারিণী রমণীগণের রসনায় যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার উগ্র-বাণীমূর্তি রূপায়িত হইয়া উঠে। তখন মনে হয় কোন অস্বল্পদর্শী কবি বলিয়াছিল—The East is East and West is West, the twain shall never meet ! এই তো meet করিয়াছে !

আমাদের স্বকীয় প্রতিভাবলে আমরা East, West, North, South, Zenith, Nadir সব একসঙ্গে মিলাইয়াছি। 'বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয় !'

নরোত্তমের জয় হউক। ভাল ছেলে বলিয়া সে সমাজে সুনাম অর্জন করিয়াছে,—মদও খাইতেছে, কিন্তু লুকাইয়া। তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আমাদের শক্তি-সম্পদ

এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে যুদ্ধ অহরহ চলিতেছে, তাহার নাম জীবন-যুদ্ধ। কোন 'লীগ অব নেশন্‌স্'-এর মধ্যস্থতায় তাহা কোনদিন থামিবে না। তাহার বিরতি নাই—সন্ধি নাই, তাহা অহরহ চলিতেছে এবং চলিবে। আমাদের মত নিরীহ জাতিও এই ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত আছে এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, এখনও লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমরা এখনও বাঁচিয়া আছি। ভাবিয়া দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মশা, মাছি, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বিশ্ব-জগৎটাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। জীবন-যুদ্ধে সকলেই আমাদের শত্রুপক্ষীয়। এই বিরাট বিশ্বব্যাপী শত্রুবাহিনীর বিপক্ষে আমরা—নিধিরাম সরদারগণ—কি করিয়া টিকিয়া আছি, ইহা পরম বিস্ময়ের বস্তু। ইহা তো বিস্ময়ের বস্তু বটেই, অধিকতর বিস্ময়ের বস্তু এই যে, আমরা আমাদের শক্তি-সম্পদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা নিজেরাই জানি না, কিসের জোরে আমরা এই জীবন-যুদ্ধে যুঝিতেছি ! ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি সত্য, কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরাজিত হই নাই। এ যুদ্ধে পরাজয় মানে মৃত্যু। আমরা এখনও মরি নাই—এখনও বাঁচিয়া আছি।

কিন্তু, কিসের জোরে ?

'আমাদের তো টিকিয়া থাকিবার কথা নহে'—এ কথা যিনি বলিবেন, তিনি জীবন-যুদ্ধের ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 'টিকিয়া থাকিবার কথা নহে' অপেক্ষা 'টিকিয়া আছি' প্রবলতর যুক্তি।

কেন টিকিয়া আছি, কি করিয়া টিকিয়া আছি, আমাদের শক্তি-সম্পদ কোথায়, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া বারম্বার আমার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, সত্যই আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। নিজেদের সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের চেতনা মোটেই জাগরূক নহে। আমরা সোনা ফেলিয়া সুপারি আঁচলে গেরো বাঁধিতেছি!

আমাদের ঐতিহাসিকগণ, সাহিত্যিকগণ, কবিগণ যে সমস্ত সম্পদের কথা লইয়া বিস্তৃত বাগ্‌বিস্তারকরত আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন, জীবন-যুদ্ধে সে সব সম্পদ অতি অকিঞ্চিৎকর।

ঐতিহাসিকগণ আমাদের অতীতের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন করিতেছেন। নানারূপ গবেষণা করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে উৎসুক যে, অতীত কালে আমরা—অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই কেষ্ট-বিষ্টু ছিলেন। ছিলেন তো ছিলেন। আনন্দের কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের কেষ্ট-বিষ্টুত্বের জোরেই কি আমরা বর্তমানে গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইতেছি?

আমাদের স্বাস্থ্য-সম্পদ লইয়া অনেকেরই মস্তক আজকাল ঘর্মাক্ত। স্বাস্থ্যবান হওয়া ভাল কথা, কিন্তু স্বাস্থ্য জীবন-যুদ্ধের প্রধান সহায় হইলেও মূল শক্তি নয়। আহার না জুটিলে স্বাস্থ্য থাকে না। সুস্থ ব্যক্তিমাত্রেই যে আহার জুটাইতে পারিবেন, এমন কোন কথা নাই। ইহার প্রমাণ আমরা প্রত্যহই পাইতেছি। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ, অরণ্য-সম্পদ, শাস্ত্র-সম্পদ, সাহিত্য-সম্পদ প্রভৃতি নানাবিধ বাজে সম্পদ লইয়া আমরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি, কিন্তু আমাদের জীবন-যুদ্ধে যাহারা আসল সম্পদ তাহাদের উল্লেখ পর্যন্ত করি না। আত্মবিস্মৃত জাতিই বটে!

আমরা যে আজও বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বা মহাত্মার দার্শনিক রাজনীতি নয়—তাহার কারণ দোকানী আমাদের ধারে খাইতে পরিতে দেয়, দরজী আমাদের হালফ্যাশানদুরস্ত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দেয়, নাপিত ধারে আমাদের চুল-গোঁফ-জুলফির তদারক করে, ধোপা ধারে আমাদের পরিচ্ছদ রাখে এবং বাড়িওয়ালা বাকি পড়িলে গলাধাক্কা দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেয় না।

ইহারা আমাদের জীবন-যুদ্ধের শক্তি ও সম্পদ। অথচ ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়জন কবি কবিতা লিখিয়াছেন—ইহাদের উপলক্ষ করিয়া কয়টা উৎসবই বা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ? একটাও নয়।

কিন্তু আমি বলিতেছি, এইবার অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। বাঙালীর ভাগ্যাকাশে দারুণ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাদের জীবন-যুদ্ধের প্রধান শক্তিগুলির সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

অর্থাৎ উহাদিগকে তোয়াজ করিতে হইবে।

সাহিত্যিকগণের তরফ হইতে আমি এইটুকু শুধু বলিতে চাই যে, হে কবিগণ, তোমরা এইবার ফুল জোৎস্না প্রিয়া ছাড়িয়া মুদি-কৌমুদী রচনা কর, এইবার দোকানীর দো-কান তোমাদের কাব্যলক্ষ্মীর লীলা-ক্ষেত্র হউক। যে দরজীর প্রসাদে তুমি সভ্যভব্যবেশে ভদ্রলোক বলিয়া সমাজে পরিচয় দিতে পারিতেছ, তাহার সেলাই-কলের খচখচ ধ্বনিতে তোমার কবিতা খচিত হউক। সভা করিয়া রজক ও নাপিতের গলায় মালা দিয়া তাহাদিগকে সম্বর্ধনা কর। বাড়ি-ওয়ালাগণকে আর গালাগালি দিও না—তাহাদের বক্র হাসিতে বিচলিত হইও না, উদ্বোধিত হও। যেরূপ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল তাহাতে রাস্তায় দাঁড়ানো মোটেই সুখজনক হইবে না।

এইবার সাহিত্যে, চিত্রে, স্থাপত্যে বাস্তবিক বস্তুতন্ত্রতা মূর্ত হউক। দোকানী, দরজী, ধোপা ও নাপিতকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাদের স্বরূপ শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে আঁকিবার চেষ্টা কর।

কামান, জাহাজ ও সেনাদল লইয়া যদি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকগণ সারবান সাহিত্য রচনা করিতে পারিয়া থাকেন—এই সব মহানুভব দোকানী দরজী ধোপা নাপিতকে লইয়া আমরাই বা পারিব না কেন ? জীবন-যুদ্ধে ইহারাই তো আমাদের কামান, জাহাজ ও সেনাদল।

আধুনিক গল্প-সাহিত্য *

বর্তমান যুগ সম্মিলনের যুগ। সাহিত্যিকগণকেও মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া সপ্রমাণ করিতে হয় যে, তাঁহারাও এ যুগের অযোগ্য নহেন। ভাবিতেছি, দেশের সমস্ত পাখি কিংবা নদীনদ যদি যুগধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্মিলিত

* চন্দননগর-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশনে পঠিত।

উৎসাহে নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতে উদ্বোধিত হইত, তাহা হইলে কি বিরাট ব্যাপারই না হইত! কিন্তু হায়, তাহা হইবার নহে—কারণ উহারা মনুষ্য নহে। মানুষই আত্মপ্রচারার্থে দল বাঁধিতে ভালবাসে। যখন ছাপাখানা হয় নাই, তখন সাহিত্যিককে আত্মপ্রচার করিবার জন্য দল গঠন করিতে হইত। সাহিত্য জিনিসটা যদিও নির্জনেই বিকশিত হয়, কিন্তু বিকশিত হইবামাত্রই জনতার দিকে তাহার স্বাভাবিক গতি। স্রষ্টা আপন সৃষ্টিকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। লুকাইয়া রাখিতে চাহে না। সেইজন্য যখন ছাপাখানার সুবিধা ছিল না তখন কবিকে দল গঠন করিতে হইত, সুবক্তা, সুগায়ক সকলেই সেখানে সাহিত্যিক-সহযোগে সানন্দে সম্মিলিত হইতেন।

এখন কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগ। এখন কবি বা সাহিত্যিককে যাত্রার দল বাঁধিয়া সাহিত্য-প্রচার করিতে হয় না, মুদ্রাযন্ত্র সে ভার লইয়াছে। বর্তমানে সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে—মাসিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য নানাবিধ সাময়িক পত্রিকার মারফৎ, এবং এই সব সাময়িক পত্রিকাগুলির ক্ষুধা এত প্রচণ্ড যে ইহাদের উদরপূর্তি করিতেই সাহিত্যিকগণকে অনেক সময় দেউলিয়া হইয়া যাইতে হয়, সম্মিলনে পাঠ করিবার উপযোগী ভাল সাহিত্যিক-রচনা সঞ্চয় করিয়া রাখা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যিক-সম্মিলনে 'সম্মিলন' জিনিসটাই মুখ্য বস্তু। এই সম্মিলনে ভাল প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি যেমন আমাদের সম্মানিত করিয়াছেন, তেমনই অসুবিধাতেও ফেলিয়াছেন। প্রথমেই সমস্যা—কি লিখি! নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের ওজন করিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

সাধারণত যে সব প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বলিয়া প্রখ্যাত, তাহা লেখা অন্তত আমার সাধ্যাতীত। 'গীতার ভাষ্য' বা 'মোগল হারেমে বৈষ্ণব প্রভাব' অথবা 'বালীদ্বীপের উদ্ভিদ্' জাতীয় প্রবন্ধ লেখার মত বিদ্যা আমার নাই।

সামাজিক কোন সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে যাওয়া আরও বিপজ্জনক। কারণ সামাজিক সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, এবং ইহাও আমরা সকলে জানি যে এ দেশে রাজনীতি প্রজানীতি নহে। সুতরাং সাহিত্য-সভায় ও-সব সমস্যা না উত্থাপন করাই ভাল।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কিছু আলোচনা করিলে হয়! কারণ বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আলোচনা করাটা একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অজস্র স্তুতিবাদ করিতে করিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে কিছু কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসার সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দেওয়াও যত সহজ, আবার বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বিদেশী সাহিত্য-সমালোচকগণের নিকট ধার-করা বুলি আওড়াইয়া রবীন্দ্রনাথকে নিন্দার নিম্নতম নরকে নামাইয়া দেওয়াও তত সহজ। উপরোক্ত কোন প্রকার কার্যের জন্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। 'রবীন্দ্র-কাব্যে অতীন্দ্রিয়বাদ' কিংবা 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা' লইয়া সহজেই একটা উচ্ছ্বাস রচনা করা যায়। করিলাম না, কারণ আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলা— আধুনিক বাংলা-সাহিত্য যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কি! এ সম্বন্ধে যে কোন সময়ে ও যে কোন স্থানে দুই-চারি কথা বলা প্রাসঙ্গিক।

সুতরাং লিখিতে সুরু করিলাম—

"বাঙালীর ক্ষুদ্রপরিসর জীবনের প্রতিচ্ছবিই মুখ্য ও গৌণভাবে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই সজ্জার অধিকাংশ উপকরণ আবার বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে। শুধু আধুনিক কেন, সমগ্র বাংলা-সাহিত্যটাই একটা সঙ্কীর্ণ সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে নাম করিবার মত কটা বৃহৎ উপন্যাস সৃষ্ট হইয়াছে? বৃহৎ উপন্যাস বলিতে বুঝি, বৃহৎ শহরের মত সৃষ্টি। তাহাতে যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপথ আছে, আকাশ-চুম্বী কারুকার্যখচিত প্রাসাদ আছে, প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন মন্দির মিনার আছে, সুসজ্জিত বাগান, সুনির্মল পুষ্করিণী সুরক্ষিত প্রান্তর, সুবিস্তৃত পণ্যবিপণি আছে, গলিঘুঁজিও আছে—নর্দমা-নালাও আছে, ধনী আছে, ভিখারীও আছে। পুণ্যাত্মাও আছে, পাপীরও অভাব নাই। সত্য, শিব এবং সুন্দরের সহিত অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের নিত্য দ্বন্দ্বে তাহা স্পন্দমান। এরূপ উপন্যাস একটাও নাই। নাই, তাহার কারণ আমাদের জীবনে বৃহৎ শিক্ষা ও বৃহৎ দুঃখ একসঙ্গে এখনও আসে নাই। সুশিক্ষিত মন দুঃখের আবেষ্টনীতে পড়িলে তবে বৃহত্তের দর্শন পায়। আমরা এখনও সুশিক্ষিতও হই নাই এবং চরম দুঃখ এখনও আমাদের জীবনে আসে নাই।

ডস্টয়েভ্স্কি, চার্ল্স্ ডিকেন্স অথবা ম্যাক্সিম গোর্কির আবির্ভাবের জন্য

আমাদের এখনও নিদারুণ তপস্যার প্রয়োজন আছে। শৌখিন দারিদ্র্যের অভিনয় করিয়া বৃহৎ কাব্য সৃষ্টি করা যায় না। আমরা উপন্যাস বলিয়া সাধারণত যাহা পড়ি ও লিখি, তাহা বড় ছোট গল্পমাত্র। উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বৃহত্ত্ব তাহাতে নাই।

সত্যকার ছোটগল্পও আমরা সৃষ্টি করিতে পারিতেছি না। ছোটগল্প-রসিক পাঠক পাঠিকা আমাদের দেশে কম। একগাদা পান্তা ভাত খাইয়া যাহার তৃপ্তি হয়, সে একটি আঙুর কিংবা একটি আপেল খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং একগাদা পান্তা ভাতের সহিত মিশাইয়া আঙুর বা আপেলের টুকরা চালাইতে হইতেছে। তাহা ছাড়া গল্প-সাহিত্যের আর একটা দুর্দশার কারণ এ দেশে গল্প-সাহিত্যের পাঠক অপেক্ষা পাঠিকার সংখ্যাই বেশি। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা এখনও খুব উচ্চস্তরে উঠে নাই। সুতরাং বর্তমান যুগের স্বল্পশিক্ষিতা পাঠিকাগণের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও রসবোধের উপর নির্ভর করিতে গিয়া আধুনিক বাংলা-গল্প-সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য অশিক্ষিতমন-রোচক ও লঘু হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই মাসিকপত্রের কাটতি দেখিয়া। যে মাসিকপত্র সর্বাপেক্ষা বেশি বিক্রয় হয়, সাহিত্যিক আদর্শ তাহাতে কতটা অনুসৃত হয়?

আর দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত সমালোচনা বলিয়া কিছু নাই। একটাও এমন নিরপেক্ষ ভাল সাহিত্যিক পত্রিকা এ দেশে নাই, যাহার সমালোচনার প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আছে। সমালোচনা করিতে বসিলেই বাঙালীর পরনিন্দাপ্রবণতা বা চক্ষুলজ্জা আসিয়া সমালোচনা-সাহিত্যকে একদেশদর্শী করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনায়—"

এই পর্যন্ত লিখিয়াছিলাম, এমন সময় দেখিলাম, এক জোড়া নির্মম চক্ষু নিষ্পলকভাবে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে চাহনিতে ব্যঙ্গ ও ভৎর্সনা যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটির মালিক অপর কেহ নহে—আমারই বিবেক। বিবেকের কণ্ঠস্বরও ক্রমশ শোনা গেল। শুনিলাম, বিবেক বলিতেছে—

"তুমি বিশ্ব-সাহিত্যের কতটুকু খবর রাখ হে বাপু? তোমার বিদ্যা তো আমার অবিদিত নাই। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেই বা তোমার জ্ঞান কতটুকু এবং তাহা লইয়া সমালোচনা করিবার অধিকারই বা তোমাকে কে দিল?

আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করা কি কোন আধুনিক লেখকের পক্ষেই শোভন, না সম্ভব? এই সব সমালোচনা করিবার অছিলায় তুমি তো শুধু নিজের ঢাকটাই পিটাইতেছ! ভাল করিয়া ভাবিয়া বল দেখি বাপু, ইহার মূলে তোমার পরশ্রীকাতরতা ও সস্তায় নাম কিনিবার লোভ আছে কি না?"

দমিয়া গেলাম।

লেখনী সম্বরণ করিতে হইল।

আধুনিক গল্প-স্যাহিত্য লইয়া আসর জমাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ওই নির্মম চক্ষুর নিষ্পলক চাহনিকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে একজন অতি-আধুনিক গল্পরচয়িতা আসিয়া আমাকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি আসিয়া অতীব আগ্রহে তাঁহার স্বরচিত একটি গল্প আমাকে শুনাইলেন। আজিকার এই সাহিত্যিক মজলিসে আমি আপনাদের সেই গল্পটি শুনাইব। গল্পটি আধুনিকতম। কোথাও এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই—লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতাই রচয়িতার নাই। মুখে মুখে বলিয়া গেল।

"এক ছিল রাজা আর তার ছিল এক রাণী।

সেদিন ভোরবেলা উঠেই রাজা ছুটে বাগানে চ'লে গেল। বাগানে গিয়ে দেখলে, গাছে বেশ সুন্দর লাল লাল জবাফুল ফুটেছে। সে বাগান থেকে একটা টকটকে লাল জবাফুল তুলে নিয়ে এল। ফুলটা নিয়ে এসে রাণীকে বললে—দেখেছ, কেমন সুন্দর ফুল এনেছি একটা!

রাণী বললে—বেশ সুন্দর, আমাকে দাও।

রাজা ফুলটা দিতেই রাণী দৌড়ে গিয়ে ভেতর থেকে একটা ফুলদানি নিয়ে এল। তারপর ফুলদানিতে ফুলটা রেখে রাজা-রাণী দুজনে উবু হয়ে ব'সে ফুলটাকে দেখতে লাগল। তারপর রাজা বললে—চল, ফুলটাকে টেবিলে রাখি। রাণী বললে—না, এইখানেই থাক।

দুজনে খুব তর্ক হতে লাগল। ঝগড়া করতে করতে বেলা অনেক বেড়ে গেল।

ঠাকুর এসে বললে—রান্না হয়ে গেছে।

দুজনে তখন উঠে স্নান-টান ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে-সুরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফুলটা মেঝেতেই প'ড়ে রইল।

ঘুম ভেঙে উঠে রাজা গেল বেড়াতে। মাঠে গিয়ে দেখে একটা শেয়াল।

রাজা তাকে ধরবার জন্ত ছুটল। রাজাও ছুটেছে—শেয়ালও ছুটেছে। রাজার সঙ্গে শেয়াল পারবে কেন? রাজা এক ছুটে গিয়ে দৌড়ে শেয়ালটাকে টপ ক'রে ধ'রে ফেললে তারপর কান ধ'রে টানতে টানতে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে এল। নিয়ে এসে মস্ত একটা খাঁচার ভেতর পুরে তাকে রেখে দিলে।

রাণী এসে বললে—আহা, বেচারি যদি ম'রে যায়!

রাজা বললে—একটু দুধ দাও না ওকে।

রাণী শেয়ালটাকে একটা মাটির ভাঁড়ে ক'রে দুধ এনে দিলে। শেয়ালটা চুক্‌চুক্ ক'রে খেতে লাগল। তারপর রাজা-রাণীও খাওয়া-দাওয়া সেরে খিল বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল। রাত হয়ে গেল।

তারপর দিন সকালে রাজা-রাণী উঠল।

রাণী চা ক'রে দিলে, রাজা খেলে।

তারপর রাজা পাড়ায় বেরুল। বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক ক্যালেণ্ডারের ছবি রাজা যোগাড় করলে। সুন্দর সুন্দর বড় বড় সব ছবি। ছবিগুলো এনে টেবিলে রেখে রাজা ছুটে বাগানে চ'লে গেল। গিয়ে অনেক জবাফুল তুলে আনলে। তারপর রাজা-রাণী দুজনে মিলে ছবি আর জবাফুল নিয়ে ঘরের সমস্ত দেওয়াল সাজাতে লেগে গেল। সাজাতে সাজাতে সন্ধ্যে হয়ে এল। সমস্ত দিন খাওয়াই হ'ল না।

সন্ধ্যেবেলা দুজনে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে—আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেছে।

তার পরদিন সকালবেলা উঠেই রাজা বাড়ির পেছন দিকে যে পেয়ারা গাছটা ছিল তাতে গিয়ে উঠল। একটু পরে রাণীও এসে উঠল। অনেক পেয়ারা ছিল সে গাছটাতে। দুজনে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, খেয়েই যাচ্ছে। পেয়ারা আর ফুরোয় না। শুধু পেয়ারা নয়, পেয়ারা পাতাও চিবুতে লাগল দুজনে।

রাণীটা এমন দুষ্টু, রাজার হাতে একটা বড় ডাঁশা পেয়ারা দেখে টপ ক'রে সেটা কেড়ে নিলে। রাজা অমনই রাণীর গালে ঠাস ক'রে এক চড়। রাণীও সঙ্গে সঙ্গে রাজার গালে খামচে দিল। দুজনে আড়ি হ'যে গেল। রাণী সে গাছ থেকে নেবে গিয়ে আর একটা গাছে উঠল।

রাজা একটু পরে রাণীকে ডেকে বললে—আয় ভাই, ভাব করি।

রাণী রাজী হ'ল না।

রাজা তখন নিজের গাছ থেকে নেমে রাণীর গাছে গিয়ে উঠে রাণীকে অনেক ভাল ভাল পেয়ারা দিয়ে ভাব করলে। ভাব হবার পর দুজনে পেয়ারা গাছের ডালে ব'সে পা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেক পেয়ারা খেতে খেতে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করতে লাগল। একটু পরে দুজনে গাছ থেকে নেমে এল। আসবার সময় রাজা কিছু পেয়ারা পকেটে ক'রে নিয়ে এল—নিয়ে এসে খাঁচার শেয়ালটাকে দিল। শেয়ালটাও মজা ক'রে পেয়ারা খেতে লাগল।

বিকেলবেলা রাজা বন্দুক হাতে ক'রে বেরুল। একটু পরে অনেক পাখী শিকার করে নিয়ে এল। বড় বড় সব হাঁস। রাণী নিজের হাতে মাংস রান্না করলে। রাজা বললে, চল, ছাতে ব'সে খাওয়া যাক। ছাতে ওঠবার একটা সিঁড়ি ছিল। রাজা সেটা দিয়ে না উঠে এক লাফে ছাতে গিয়ে উঠল। রাণী বাসনকোসন ব'য়ে সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে রাজা আবার এক লাফে ছাত থেকে নেমে এল। নেমে এসে মাংসের হাড়গুলো শেয়ালটাকে দিলে।"

এই পর্যন্ত বলিয়া গল্পকার চুপ করিলেন।

আমি বলিলাম, তারপর?

"তারপর রাজা একদিন একটা বাঘ ধ'রে আনলে' আর একদিন একটা টিয়াপাখী—"

তাঁহার উৎসাহ আবার সঞ্জীবিত হইতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, আচ্ছা, থাক্, আজ আর নয়—কাল শুনব বাকিটা।

এই গল্প বাস্তব কি অবাস্তব, সুন্দর কি কুৎসিত, ভূ-ভারতে এরূপ কোন রাজকীয় দম্পতি থাকা সম্ভবপর কি না সে বিচার আপনারা করুন, বিশ্ব-সাহিত্যে এ গল্পের স্থান হইবে কি না জানি না, আমি শুধু ইহাই নিঃসংশয়রূপে জানি যে, ইহার রচয়িতার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর,* সে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান এবং তাহার হাতেখড়ি পর্যন্ত হয় নাই। তাহার কল্পনা অদেশ। রাজারাণীকে লইয়া গল্প রচনা করিতেছে এবং তাহার ধারণা গল্পটি নিখুঁত হইয়াছে। বয়সের দিক দিয়া বিচার করিলে গল্পকারকে তরুণতম এবং সময়ের দিক দিয়া বিচার করিলে গল্পটিকে আধুনিকতম বলিতেই হয়। যদি আপনারা কেহ ইহাতে আপত্তি করেন বুঝিব, আপনারা সম্যকরূপে প্রগতিশীল নহেন।

---

* গল্পটির কথক আমার পুত্র শ্রীমান অসীম।

পরচর্চা

পরনিন্দা ও পরচর্চা করিয়াই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। পল্লীগ্রামে আছে চণ্ডীমণ্ডপ আর শহরে ক্লাব। চণ্ডীমণ্ডপ ও ক্লাবগুলিতে প্রতিদিন ওই পরনিন্দা ও পরিচর্চা ছাড়া আর কিছুই হয় না। যতই ভাবিতেছি, ততই ক্ষোভ হইতেছে। আরও গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, এইভাবে যাহারা দেশকে উচ্ছন্নের পথে পরিচালিত করিতেছে, আমিও তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। যদিও আমি কোন চণ্ডীমণ্ডপ বা ক্লাবের সভ্য নহি, কিন্তু গৃহকোণে বসিয়া বসিয়াই প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের সহিত প্রতি সন্ধ্যায় যে পরিমাণ পরনিন্দা ও পরচর্চা করিয়া থাকি, তাহাতে একটা কেন—দশটা দেশ স্বচ্ছন্দে উচ্ছন্ন যাইতে পারে। দেশ উচ্ছন্ন যাউক, তাহাতে আমার কিছু যায়-আসে না, কিন্তু আমি তাহার কারণ হইতে চাহি না। আমি ইহা চাহি না যে, লোকে আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিবে—পরনিন্দা ও পরচর্চা করিয়া যে সব মহাত্মা দেশকে উচ্ছন্নে দিয়াছেন, 'ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।' ইহা আমি চাহি না। আমার নানা দুর্বলতার মধ্যে ইহাও একটি। আমি কোন ব্যাপারেই অঙ্গুলিনির্দিষ্ট হইতে রাজী নহি।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে অবশ্য স্বতই এ প্রশ্ন জাগিতে পারে, 'পরনিন্দা পরচর্চা করিলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে কি প্রকারে?' কি প্রকারে—তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা আমার সাধ্যাতীত, কিন্তু ইহা আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছি যে, দেশকে উচ্ছন্নে পাঠাইবার ইহা একটি প্রশস্ত পথ। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যে কোন চিন্তাশীল পণ্ডিতের নিকট গেলেই তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন। উক্ত জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি পুনরায় আমাকে প্রশ্ন করেন যে, 'উচ্ছন্ন মানেই বা কি? ইহা বলিতে আমি কি বুঝি?' তাহাও তাঁহাকে আমি বুঝাইতে পারিব না। কারণ 'উচ্ছন্ন যাওয়া' মানে এমন একটা শোচনীয় অবস্থা যাহা বর্ণনা করিতে হইলে রীতিমত আলঙ্কারিক হওয়া প্রয়োজন। আমি আলঙ্কারিক নহি। সুতরাং জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট নিজের দীনতা জ্ঞাপন করা ছাড়া আর অন্য কিছুই করিবার আমার উপায় নাই।

মোট কথা, ঠিক করিয়াছি আর পরচর্চা করিব না। সন্ধ্যাবেলা যেই প্রাণকান্ত আসিয়া ঘরের কোণে লাঠিটা রাখিতে রাখিতে সস্মিত-মুখে শুরু করিবে—'শুনেছ হে, আমাদের পাড়ায় রাধু ময়রার ভাদ্দর-বউ—'আর

অমনই আমি সট্‌কাটি বাগাইয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিব, সেটি আর হইবে না। রাধু ময়রার ভাদ্রবধূ ব্যতীত আলোচ্য বিষয় পৃথিবীতে অনেক আছে।

...সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে। চতুর্দিকে ঝিল্লির ধ্বনি। একা নিজের নির্জন ঘরটিতে বসিয়া আছি। ঘরের কোণে টেবিলে বাতিটি কমানো রহিয়াছে—ঘরে স্বল্পালোকিত অন্ধকার। সট্‌কায় মৃদু মৃদু টান দিতেছি। ধূপের মৃদুগন্ধে সমস্ত ঘরটি পরিপূর্ণ। বারান্দায় খুট্ খুট্ শব্দ হইল। প্রাণকান্ত আসিতেছে। সন্ধ্যাকালটা প্রাণকান্তের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিয়াই কাটে। আজ প্রতিজ্ঞাদুর্গের মধ্যে অটল হইয়া বসিয়া আছি—আর যাই করি পরচর্চা করিব না। প্রাণকান্ত আসিয়া ঘরের নির্দিষ্ট কোণটিতে লাঠিটি রাখিয়া স্মিতমুখে বলিল, আজ এত গম্ভীর বদন যে?

মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলাম, তোমার বিরহে। চা খাবে না কি? ওরে ভূতো—

ভূতো নামক ভৃত্য আবির্ভূত হইলে দুই কাপ কড়া চা ফরমাস করিলাম।

প্রাণকান্ত র‍্যাপার দিয়া পা দুইটি ঢাকিতে ঢাকিতে বলিল, ঠাণ্ডাটা আবার জমকে পড়ল।

চা আসিল।

এক চুমুক চা পান করিয়াই প্রাণকান্তের প্রাণ খুলিয়া গেল। আবেগ-তরল কণ্ঠে কহিল, আমাদের পাশের বাড়িতে কোলকাতা থেকে এক আপ-টু-ডেট মেয়ে এসে জুটেছে ভাই—

এইটুকু বলিয়া ডিশে চা ঢালিয়া সুড়ুৎ করিয়া আরও খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

লোকটার উপর আমার ঘৃণা হইতে লাগিল এবং এইরূপ লোকের সঙ্গলাভের জন্য লোলুপ বলিয়া নিজেকেও মনে মনে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিলাম।

বলিলাম, ওসব পরচর্চা ছাড়। এই ক'রেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল। ছাড় ওসব।

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে প্রাণকান্তের শারীরিক ভাবকেন্দ্রই বোধ হয় বিচলিত হইল। খানিকটা চা চল্‌কাইয়া তাহার র‍্যাপারে পড়িয়া গেল। বিস্ফারিত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি সে আমার উপর নিবদ্ধ করিল।

সন্ধ্যেটা কাটে কি ক'রে তা হ'লে বল?

মন আমার ধর্মভাবে পরিপূর্ণ। উত্তর সহজেই দিলাম, তার জন্তে ভাবনা কি? একটা বই চেঁচিয়ে পড় না, শোনা যাক। পরচর্চা করবার দরকার কি? এই নাও।—বলিয়া নিকটস্থ শেল্ফ হইতে একটি পুরাতন বাঁধানো মাসিকপত্র দিলাম। সেকালের 'বঙ্গদর্শন'। ভাল জিনিস।

ওর থেকে যে কোন একটা লেখা পড় না কেন? শিক্ষাও হবে, সময়ও কাটবে।

প্রাণকান্ত নিঃশব্দে বাকি চাটুকু নিঃশেষ করিল। তাহার পর নিঃশব্দেই গোঁফটি পরিপাটিরূপে মুছিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল এবং দিয়াশলাই-বাক্সের উপর সেটি লঘুভাবে ঠুকিতে লাগিল।

সিগারেটটি ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া পরিশেষে সে বলিল, এ তো অতি উত্তম কথা। আলোটা একটু উস্‌কে দাও তা হ'লে। পুরাতন 'বঙ্গদর্শন'টি লইয়া প্রাণকান্ত আলোর নিকট সরিয়া বসিয়া বহিটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, এইটি পড়ছি তা হ'লে শোন:—বিষয়টা ভাল ব'লেই মনে হচ্ছে। 'অক্ষরের প্রকৃতি ও স্বরবর্ণোচ্চারণ।' পড়ব?

পড়।

প্রাণকান্ত পড়িতে লাগিল—

"অক্ষরের দুই অবস্থা—এক লিখিত, আর শব্দিত। সেই লিখিত ভাবকে বর্ণ এবং শব্দিত ভাবকে অক্ষর বলা যাইতে পারে। লিখিত-অবস্থাকে বর্ণ বলার কারণ এই যে, কালো কিংবা রক্তিম কিংবা অন্য কোন বর্ণ দ্বারা তাহা লিপি করিতে হয়, আর শব্দিতাবস্থাকে অক্ষর বলার কারণ এই, তাহার ক্ষয় নাই, তাহা অবিভাজ্য। অ বলিতে যে শব্দটি হয় তাহাকে বিভাগ করা যায় না। সেই প্রকারে আ, ই, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ উচ্চারণ করিলে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয় তাহারা প্রত্যেকে অবিভাজ্য। লিখিতাবস্থাকে অক্ষর বলা যায় না, কারণ লিখিত বর্ণ অবিভাজ্য নহে, তাহা রেখাদ্বারা গঠিত, সুতরাং সেই রেখা সকলকে ইচ্ছামত বিভাগ করা যায়, কিন্তু তাহাদের শব্দিতাবস্থা বিভাজ্য নহে। অ বলিতে যে শব্দ হয়—"

বিজৃম্ভণ করিয়া বলিলাম, এটা ভারি খটমট লাগছে। অন্য আর একটা কিছু পড়।

প্রাণকান্ত বলিল, এর আগের প্রবন্ধটি হচ্ছে 'প্রাচীন সামাজিক চিত্র,' পরেরটি হচ্ছে 'রাজতপস্বিনী'—দুটোই পরচর্চা। সেইজন্তে এইটে ধরেছিলাম।

আচ্ছা, পড়া থাক তাহলে। এস, অন্ত কোন বিষয় আলোচনা করা যাক।

সেই ভাল। কি বিষয়ে বল ?

বলিয়া সে স্মিতহাস্ত করিয়া বইটি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'সভ্যতা বলতে তুমি কি বোঝ ?' ইহার উত্তরে প্রাণকান্ত আর একটি সিগারেট ধরাইল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার আমাকেই প্রশ্ন করিতে হইল, পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ-ই বড়, না, আমাদের সনাতন প্রাচীন আদর্শ-ই বড় মনে কর তুমি ? অর্থাৎ ভোগী সভ্য, না ত্যাগী সভ্য ?

ইহার উত্তরে প্রাণকান্ত যাহা বলিল, তাহা বিস্ময়জনক হইলেও প্রণিধানযোগ্য। তাহার মতে উদ্ভিদগণই পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম প্রাণী। উদ্ভিদের দানের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জীব জীবনধারণ করিতেছে। উদ্ভিদগণই আদিমতম এবং সভ্যতম। তাহারা শিল্পী, তাহারা সাধক, তাহারা সুন্দর, অথচ তাহারা নীরব। আমাদের মত তাহারাও জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত, কিন্তু সে যুদ্ধ তাহারা এত সুনিপুণভাবে করিতেছে যে তাহাতে কোন আকস্মিক ছন্দ-পতন নাই। তাহাদের জীবনযুদ্ধ একটি সুলিখিত কাব্যের মতই সুললিত। তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়াও প্রকৃষ্ট, তাহা নিষ্ঠুর হইলেও দৃষ্টিকটু নহে।

প্রাণকান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় উদ্ভিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে বক্তৃতা করিতে লাগিল, তাহা নিঃসন্দেহে উপাদেয়। আমি ইহা আরও ভালভাবে উপভোগ করিতাম, কিন্তু উদরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। পেটটা ফাঁপিয়াছে। মধ্যাহ্নে গুরুপাকদ্রব্য কি আহার করিয়াছিলাম মনে করিবার চেষ্টা করিতেছি। এমন সময় দীর্ঘ বক্তৃতান্তে প্রাণকান্ত হঠাৎ থামিল।

বলিলাম, বাঃ, বেশ বলেছ তুমি !

এটা কিন্তু পরচর্চা পরনিন্দা দুই-ই হ'ল। অন্যান্য জীবদের নিন্দে ক'রে, তবে না গাছদের বড় করলাম।—বলিয়া সে একটি উদ্গার তুলিল এবং মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, এঃ, একটা চোঁয়া ঢেঁকুর উঠল। বাড়ি ফেরা যাক।

ঘড়িতে টং টং করিয়া আটটা বাজিল।

এতক্ষণ পরে আটটা বাজল। এর মধ্যে বাড়ি ফিরে কি করবে ? নাও, আর একটা কিছু পড়—শোনা যাক। থাম, আমি বেছে দিচ্ছি।

বলিয়া আবার 'বঙ্গদর্শনে'র পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

নাও, এইটে পড। 'নীলাম্বরী'—একটা গল্প।

স্মিতহাস্য করিয়া প্রাণকান্ত বলিল, আমিও তো গোড়ায় 'নীলাম্বরী'র কথাই পেড়েছিলাম, তুমিই তো থামিয়ে দিলে।

কি রকম ?

ওই যে বলছিলাম না আমাদের পাশের বাড়িতে কোলকাতা থেকে এক আপ-টু-ডেট মেয়ে এসেছেন। তিনিও নীলাম্বরী।

তাই নাকি ? আচ্ছা, বল বল শুনি। তা না হ'লে তোমার রাত্তিরে ঘুম হবে না দেখছি।

সোৎসাহে চিৎকার করিলাম, ওরে ভূতো, তামাক দিয়ে যা—

শুরু হইয়া গেল।

রাত্রি এগারটার সময় বাড়ি হইতে চতুর্থবার ডাকিবার পর যখন খাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলাম, তখন আমরা উভয়ে কলিকাতা হইতে আগত সেই নীলাম্বরী, রাধু মধবার ভাদ্রবধূ, হরিচরণের বিবাহযোগ্যা ভগিনী, আজকালকার যুবকদের আচরণ, নিতাই ঘোষালের আঙুল-ফুলিয়া-কলা-গাছ হওয়া, গুপি ডাক্তারের চরিত্র-হীনতা, স্থানীয় অ্যামেচার নাট্যসমাজে দলাদলি এবং তাহার মূল কারণ, অনাবৃষ্টিহেতু চাষের অসুবিধা, ইটালির অতি-বাড়, জার্মেনির যুদ্ধকৌশল, চণ্ডীখুড়োর কেলেঙ্কারি—প্রভৃতি সমস্ত আলোচনা শেষ করিয়াছি।

প্রাণকান্ত বলিল, এইবার ওঠা যাক তা হ'লে। ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ, খানিক আগে চোঁয়া ঢেঁকুর মারছিল—

আমিও সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমারও পেটের ফাঁপ একেবারে নাই, বায়ু সরল হইয়া গিয়াছে।

আহার করিতে করিতে মনে যে দার্শনিক ধারণা হইল, তাহা সংক্ষেপত এই যে, উদ্ভিদগণ কি করে তাহা জানা নাই ; কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, মানুষ পরচর্চা না করিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না,—আর কিছু না হউক তাহার পেট ফাঁপিবে।

লীগ অব নেশন্স্, পার্লামেন্ট, কাউন্সিল, কংগ্রেস, সাহিত্য-সভা, ধর্মসভা পরচর্চা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরচর্চা করিতে গেলে কিঞ্চিৎ পরনিন্দাও অবশ্যম্ভাবী। ইহা না করিলে এই গুরুপাক সভ্যতা হজম করা কঠিন।

বাজে খরচ

একদা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হরি বসাকের পিসামহাশয় কলিকাতায় গিয়া শীত-নিবারণ-কল্পে একটি গরমের জামা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেকালে পিসামহাশয়ের সৌখিন লোক বলিয়া খ্যাতি ছিল। কোট পরিধান করিয়া বাড়ি ফিরিতেই পিসামহাশয়ের বাবা পিসামহাশয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কোটটার দাম কত পড়ল ?

তে—তে—তে—তের টাকা।

পিসামহাশয় তোৎলা ছিলেন।

দাম শুনিয়া পিসামহাশয়ের পিতা বিস্ময়ে অবাক। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইলে তিনি বলিলেন, তে—রো টাকা ! বলিস কি রে ? তেরো টাকায় যে একটা গরু হয় !

পিসামহাশয়ও ইহার যুক্তিযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, গ-গ-গ-গরু তো আর গা-গা-গায়ে দেওয়া যায় না।

পিতাপুত্রের এই উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাল্যকালে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম এবং মনে মনে পিসামহাশয়কেই সমর্থন করিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। আমি নিজেও যৌবনকালে খুব মিতব্যয়ী ছিলাম না। বরং অমিতব্যয়ী ছিলাম বলিলে সত্যের গুরুতর অপলাপ করা হইবে না। আমার যৌবনকালের সমস্ত দুষ্কৃতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোক প্রতি বৎসর লক্ষ্ণৌ শহরে লোক পাঠাইত কেবলমাত্র গরমুজা আনাইবার জন্য। বালক জ্যেষ্ঠ পুত্রের আবদারে বিগলিত হইয়া একটি টাট্টু ঘোড়া যে ব্যক্তি তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিল, তাহার মাসিক আয় এক শতের অধিক ছিল না—এ কথা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। কারণ আমিই সেই বিগলিত ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে গোরার বাদ্য আনিয়া যিনি ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন, তিনি অপর কেহ নন—এই শর্মাই। অথচ সেই শর্মাই পৌত্রের বাজে খরচ দেখিয়া আজ অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছেন এবং তারস্বরে একালের বিলাসপ্রবণতাকে গালাগালি করিতেছেন, ইহার কারণ কি ?

এই দুরূহ মনোবিকলনে ব্যাপৃত ছিলাম, এমন সময় হনহন করিয়া

বাচস্পতি মহাশয় আসিয়া দর্শন দিলেন। আসিয়াই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মুখস্থ চৌকিটিতে উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে ট্যাক হইতে একটি নস্যাধার বাহির করিয়া তাহা আস্ফালন করিতে করিতে যে কয়টি বাক্য ব্যয় করিলেন, সেগুলি বেশ উষ্ণ বলিয়াই মনে হইল।

বিশুর কাণ্ডখানা দেখ একবার দাদা। ভাল একটা নস্যদানি পাঠাতে লিখেছিলাম। এই সেই ভালর নমুনা! কুলাঙ্গার কোথাকার!

বাচস্পতি মহাশয়ের অপেক্ষা আমি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তিনি আমাকে বরাবর 'দাদা' সম্বোধন করিয়া সুখ পাইয়া থাকেন। ইহাতে আমি আপত্তি করি নাই। কিন্তু বিশুকে কুলাঙ্গার বলিতে আমার আপত্তি আছে। বিশু বাচস্পতি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বেশ ভাল ছেলে। এম এ. পাস করিয়া প্রফেসারি করিতেছে। তাহাকে কুলাঙ্গার বলা চলে না।

বলিলাম, মন্দ কি নস্যদানিটা? খারাপ নয় তো।

আরে, এ রকম নস্যদানি আমার দশটা আছে। ভাল নস্যদানি একটা শখ ক'রে পাঠাতে লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম—চন্দন কাঠের না হোক, রুপোর কাজ-টাজ করা একটা পাঠাবে। না, পাঠিয়েছে সেই মোষের শিঙের! কুলাঙ্গার কোথাকার!

বুঝিলাম, বাজে-খরচেচ্ছু বাচস্পতিকে মিতব্যয়ী বিশু অজ্ঞাতসারে আঘাত দিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ বাচস্পতি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, তারা, তারা, তারা, তারা! এইবার উঠি দাদা। আজকালকার ছেলেদের নজরটা কেমন, তাই তোমাকে দেখাতে এসেছিলাম। এই দেশেই শুনি শ্রীরামচন্দ্র পিতার আদেশে বনে গিয়েছিলেন। তারা—তারা—তারা—

বাচস্পতি অপসৃত হইলেন।

কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, যতই বয়স বাড়িতেছে বাচস্পতি মহাশয়ের শখও ততই বাড়িতেছে। গত শীতকালে বালাপোশ মনোমত হয় নাই বলিয়া মধ্যম পুত্রের উপর তিনি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়াইতেছে যে, বৃদ্ধ বাচস্পতি ও আমার পৌত্র প্রায় সহধর্মী হইয়া উঠিয়াছেন। আমিই বা সহসা এরূপ ঝুনা হইয়া উঠিলাম কেন? আমারই বা পুত্রের সমস্ত বাজে খরচ বাঁচাইয়া দিবার জন্য এই অহেতুকী

ব্যগ্রতা কেন ? ঠিক অহেতুকী অবশ্য নয়,—হেতু একটা আছে। আমার বাসনা, অন্যান্য খরচ কমাইয়া বর্তমানে পশ্চিম দিকের ও উত্তর দিকের ঘর দুইখানা সর্বাগ্রে মেরামত করাইয়া ফেলা প্রয়োজন এবং তৎপরে উত্তর দিকের বারান্দা ও পূর্ব দিকের বারান্দাকে সংযুক্ত করিয়া কোণাকুণি বাহিরের দিকে একটা বারান্দা বাহির করাও আবশ্যক। বাহিরের লোক আসিলে বসিতে দিবার সুবিধা হইবে। বর্তমানে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিতেছে। সিনেমা দেখিয়া, উপন্যাস কিনিয়া, মধুপুরে বেড়াইতে গিয়া যে সকল বাজে খরচ হইতেছে, সেগুলি বাঁচাইয়া অনায়াসেই এই প্রয়োজনীয় কর্মগুলি সুনিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না।

সর্বোপরি আমার নাতিটি এই বয়সে এমনই বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা কহতব্য নয়। সুযোগ পাইলেই সমগ্র কলিকাতা শহরটাই সে কিনিয়া পকেটস্থ করিয়া ফেলিবে মনে হইতেছে। ছোকরা এই তো সবে আই. এ পাস করিয়া বি. এ পড়িতে শুরু করিয়াছে—আজ সকালে তাহার পকেটে দেখি চকচকে এক সিগারেট-কেস এবং তাহার ভিতর ঠাসা অত্যন্ত দামী সিগারেট। সিগারেট-কেসটি কাড়িয়া লইয়া বহু কটূক্তি করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছি।

এখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিতেছি—তোমার এ দুর্মতি কেন ? উহাদের বাজে খরচ কমাইবার জন্য তোমারই বা এত শিরঃপীড়া কিসের ?

বলা বাহুল্য, প্রশ্ন কঠিন ও চিন্তাসাপেক্ষ।

সুতরাং ভৃত্যকে তামাক সাজিতে বলিলাম।

পূর্ণ দুইটি ঘণ্টা মাথা ঘামাইবার পর দেখিলাম যে, চিন্তা-সমুদ্র-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং তাহাতে যে শ্রেণীর তরঙ্গমালা দেখা যাইতেছে সেগুলির সংক্ষিপ্ততম বর্ণনা দিতে গেলেও 'উত্তাল' বিশেষণটি ব্যবহার করিতে হয়। ক্ষুদ্র বুদ্ধির ভেলা উত্তালোর্মিসমাকুল চিন্তা-সাগরে বিপর্যস্ত হইয়া নাস্তানাবুদ হইবার যোগাড় হইল। এমন সময় বাগানের মালী আসিয়া বলিল, বাবু, চারাগাছটাকে একটু সরিয়ে পুঁততে হবে। তা না হ'লে চারাটা মারা যাবে—

বলিলাম, চল দেখি।

গিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ আমগাছটির নীচে তাহার আঁটি হইতে উদ্ভূত যে চারাগাছটি হইয়াছে, তাহাকে সত্যই স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। কারণ, দেখিলাম, বসন্তসমাগমে বৃদ্ধ আমগাছটি নবপল্লব-মুকুলে যতটা অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, চারাগাছটি ততটা পারে নাই। তাহাতেও দুই-চারিটা কিশলয় না গজাইয়াছে এমন নয়, কিন্তু বুড়া গাছটার বাহুল্যের নিকট তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বৃদ্ধের আওতায় পড়িয়া এই কিশোর চারাগাছটি এমন মধুমাসেও কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে।

অকস্মাৎ যেন জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল।

উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, আমি এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছি। শুধু দাঁড়াইয়া আছি নয়—যুদ্ধ করিতেছি এবং এই যুদ্ধে আমি আমার পুত্র ও পৌত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের ষোল আনা সুখ-সুবিধা লাভ করিবার জন্য তাহাদের সুখ-সুবিধাকে লক্ষ্য করিয়া নীতিকথার গোলাগুলি ছুড়িতেছি। দেখিলাম, সকলেই নিজের সুখান্বেষণে তৎপর এবং অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন অথবা কটাক্ষশীল। আমার পুত্র মধুপুরে গিয়া সুখ পাইতেছেন, আমার পৌত্র দামী সিগারেট ফুঁকিয়া সুখ পাইতেছেন এবং আমি বর্তমানে বসতবাটির জীর্ণসংস্কার করাইয়া তৃপ্তি পাইতেছি। উপরন্তু এই তৃপ্তিলাভের অন্তরায় বলিয়া এখন কন্যার বিবাহে গোরার বাদ্য আনাটা অপব্যয় বলিয়া মনে হইতেছে এবং খরমুজা-ভোজনের নানাবিধ দোষ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। অর্থাৎ বর্তমানে আমার সুখ, আমার পুত্রের সুখ এবং আমার পৌত্রের সুখ পরস্পরবিরোধী। সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই যুদ্ধে আমার সম্বল নীতিকথা, আমার পুত্রের সম্বল উপার্জন-ক্ষমতা এবং আমার পৌত্রের সম্বল সজলক যৌবন।

বাচস্পতিও দেখিলাম যোদ্ধবেশে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অতি অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সংসারের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে পড়ে এবং যৌবনকালেই তাঁহাকে সংসারী সাজিতে হয়। সেই যৌবনকাল হইতেই বসতবাটি-মেরামতরূপ সুখ নানা ভাবে উপভোগ করিয়া বাচস্পতি এখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—ও-সবে তাঁহার আর রুচি নাই। যে সব সুখ তিনি ভোগ করিতে পান নাই, এই বৃদ্ধবয়সে সেই সবের জন্য তিনি লালায়িত। নস্যের ডিবা ও বালাপোশ লইয়া তাই তিনি স্বপ্নরচনা করিতেছেন, এবং আত্মসুখময় বিত্ত জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে

বলিয়া কুপিত বাচস্পতি শাস্ত্রীয় গোলাগুলির আঘাতে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

দেখিলাম, এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি, বাচস্পতি, আমার পুত্র, পৌত্র এবং সংসারের সকলেই আপন আপন কামনা-ট্রেঞ্চে আত্মগোপন করিয়া নানা কৌশলে পরস্পরকে কাবু করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং কালক্রমে এক ট্রেঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ট্রেঞ্চে গিয়া হাজির হইতেছি। সকলেই আমরা জিঘাংসাপরায়ণ সৈনিক। কেহ পুরাতন বন্দুক হস্তে বীরত্ব করিতেছি, কেহবা অতি-আধুনিক বোমাহস্তে গ্যাস-মাস্ক পরিধান করিয়া আস্ফালন করিতেছি।

এইটুকু যা তফাত।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই নিজের সৈনিক মূর্তি নিজের নিকট প্রকট হইতে লাগিল। ক্রমশ ইহাও উপলব্ধি করিলাম যে, বাজে খরচ জিনিসটা শুধু যে অনিবার্য তাহা নয়—অপরিহার্য। যাহাকে আমরা বাজে খরচ বলি, তাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ওই যে দুরন্ত শিশুটা ক্রমাগত লম্ফঝম্প করিয়া শক্তির অপচয় করিতেছে, স্থূল আপাত-দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা অপব্যয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু দৃষ্টি একটু সূক্ষ্ম করুন. দেখিবেন লম্ফঝম্ফ ব্যতিরেকে ওই শিশুর পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ অসম্ভব। খানিকটা বাজে খরচ না করিলে এই পৃথিবীতে কোন বৃহৎ ব্যাপারই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যুদ্ধের কথাই ধরা যাউক। এমন কোন যুদ্ধের নাম করিতে পারেন যাহাতে সৈন্যসামন্ত, গোলাগুলি, রসদপত্র নিক্তির ওজনে আয়োজিত হইয়াছে? এতটুকু অপব্যয় হয় নাই? প্রয়োজনের অধিক আয়োজন না করিলে কোন জিনিসই সুসম্পন্ন হয় না—তা সে যুদ্ধেই হউক আর উৎসবেই হউক। পঁচিশ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে অন্ততপক্ষে পঁয়ত্রিশ জনের মত ব্যবস্থা করিতে হয়—এ কথা কে না জানে?

আরও একটা কথা। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি বাজে খরচ বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মোটেই বাজে খরচ নয়। সেগুলির বিনিময়ে আমরা এমন বহু মহার্ঘ জিনিস লাভ করি, যাহার মূল্য জীবনে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আমার মত নগণ্য ব্যক্তি যে এত বিভিন্ন লোকের স্নেহলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার কারণ কি আমার দিলদরিয়া মেজাজ নয়? সারা জীবন আমি যদি হিসাব করিয়া খরচ করিতাম, ওজন করিয়া কথা বলিতাম, তাহা হইলে

এক পরমকারুণিক পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহ আমার দিকে ফিরিয়া চাহিত কি না সন্দেহ এবং মনুষ্যসঙ্গবর্জিত হইয়া কেবলমাত্র পরমেশ্বরের মুখ চাহিয়া এই জটিল সামাজিক জীবন যাপন করিতে পারা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইয়া উঠিত তাহা ভাবিতে গিয়া ভীত হইয়া উঠিতেছি। লাভ আছে বই কি! আমার বেশ মনে পড়িতেছে, জনৈক উচ্চপদস্থ রাজ- কর্মচারিকে খরমুজা খাওয়াইয়াছিলাম বলিয়াই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির ভাল চাকুরিটি জুটিয়াছে।

আমার গুণধর পৌত্রটি দামী সিগারেট খাইয়া ও বিতরণ করিয়া কোন্ সমুদ্রে কি ভাবে জাল ফেলিয়া কোন্ রত্ন আহরণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? হয়তো সে নিজেও জানে না।

এই দার্শনিক চিন্তার সূত্র ধরিয়া আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। বাজে খরচ চিরকাল করা চলে না। একদিন তাহা বন্ধ করিতেই হয়—যেদিন মৃত্যু হয়। তৎপূর্বে যাহার যাহা খুশি করুক—এই খুশির খরস্রোতে বাধা দিতে গেলে ঐরাবতও ভাসিয়া যাইবে। সুতরাং অনর্থক নাতিটার মনোকষ্টের কারণ হই কেন? সিগারেট-কেসটি ফিরাইয়া দিব। কিন্তু সিগারেট-কেসের দিকে চাহিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সিগারেট-কেস খালি। অন্যমনস্ক হইয়া একটির পর একটি নিজেই সবগুলি শেষ করিয়া ফেলিয়াছি!

* * *

গভীর রাত্রে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া নাতির ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং অতি সন্তর্পণে তাহার পকেটে সিগারেট-কেসটি সিগারেট সমেত রাখিয়া আসিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। বাজার হইতে নূতন সিগারেট কিনিয়া দিতে হইল—ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

খোশামোদ

চক্ষু দুইটির খোশামোদ করিতে হইবে। নিতান্তই বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেঁক দেওয়া প্রয়োজন। ভৃত্য ভূতোকে গরম জল আনিতে বলিয়াছি, কিন্তু আধ ঘণ্টা হইয়া গেল শ্রীমানের এখনও দর্শন নাই। বুঝিতেছি, তাঁহাকেও খোশামোদ করা আবশ্যক। তাহা না করিলে…হ্যাঁ,হ্যাঁ, তাহাকে বেতন দিই বই কি! কিন্তু বেতনভুক্ ভৃত্যের নির্মম নিক্তিনির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম আমার পছন্দ

হয় না। আমি কর্তব্যের সঙ্গে সামান্য একটু মমতাও কামনা করি, এবং সেই মমতাটুকু লাভ করিতে হইলে এমন কিছু তাহাকে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যাহা বেতনাতীত, যাহা তাহার আইনসঙ্গত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ তাহাকেও খোশামোদ করিতে হয়। যদি তাহাকে এখন ডাকিয়া ধমকাই এবং প্রশ্ন করি যে গরম জল এখনও হইল না, তাহার উত্তরে সে এমন জটিল কিছু একটা বলিবে যে আমার আর কোন কথা চলিবে না। এমন কিছু বলিবে যাহা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত ও যাহার বিরুদ্ধে কোন ভদ্রলোকের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। সে হয়তো বলিবে, গিন্নীমা কয়লার পয়সা ঠিক সময়মত দেন নাই বলিয়া কয়লা আনিতে দেরি হইয়াছে—উনান সেইজন্য এখনও ধরে নাই। স্টোভ ধরাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু স্টোভটি তো জ্বলিতেছে না। বোধ হয় সারানো দরকার—বারো আনা পয়সা চাই।

এই জাতীয় কোন একটা উক্তির দ্বারা সে আমাকে নীরব করিয়া দিবে, এবং ধমকের প্রতিশোধস্বরূপ হয়তো আরও দেরি করিতে থাকিবে।

উহাতে সুখ নাই।

ওসব না করিয়া যদি তাহার একটু খোশামোদ করি, দেখিবেন, যাদুমন্ত্রবৎ কাজ হইবে। যদি এখনই তাহাকে ডাকিয়া বলি—বাবা ভূতনাথ, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের বউটিকে আমি রূপার পৈঁচা গড়াইয়া দিব মনস্থ করিয়াছি; তুমি আর কালবিলম্ব করিও না, আজই নীপু স্যাকরাকে খবর দাও। অথবা, যখন সে পাশের ঘরে কাজ করিতে থাকিবে, তখন যদি তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অপর কাহারও কাছে তাহার অজস্র প্রশংসা করিতে থাকি, তাহা হইলে দেখিবেন ভূতনাথের কর্তব্যবোধ অন্য মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তখন বাড়িতে তাড়াতাড়ি গরম জল করা অসম্ভব হইলে সে পাশের বাড়ির পাচকের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের উনানে আমার জন্য জল গরম করিয়া আনিবে। তাহাও অসম্ভব হইলে সে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিবে—যেমন করিয়া হউক, যত শীঘ্র সম্ভব সে গরম জল আনিয়া দিবেই। বেতনভুক্ ভূতনাথ আমার জন্য এতটা করিবে না, কিন্তু খোশামোদ-বিগলিত ভক্ত ভূতনাথ করিবে।

সেও আনন্দ পাইবে, আমিও আনন্দ পাইব!

এমন একদিন ছিল যখন খোশামোদ কথাটাকে ঘৃণা করিতাম। মনে

করিতাম, উহা অত্যন্ত নীচ কার্য। এখন বয়স বাড়িয়াছে, আজ বুঝিতেছি যে, খোশামোদ করাটা নীচ কার্যই হউক বা উচ্চ কার্যই হউক, উহাই জীবনের সর্বপ্রধান কার্য। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উহাই করিতেছি এবং উপলব্ধি করিতেছি যে ঠিক স্থানটিতে ঠিক সময়ে ঠিক তৈলটি নিষেক না করিলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং এমন একটা অস্বস্তিকর 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হয়, যাহা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। সেই 'পরিস্থিতি'র মধ্যে আর যাহাই সুলভ হউক আনন্দ বস্তুটি সুলভ নহে।

আমি আনন্দকামী। সুতরাং আমি খোশামোদ করিতে ও খোশামোদ পাইতে ভালবাসি। এ বিষয়ে আমি নিরঙ্কুশ। আমি হনুমানকে কন্দর্পকান্তি বলিয়া অভিনন্দন করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিব না যদি সে আমার কবিতাগুলির সুখ্যাতি করে। এই আনন্দটুকু লাভ করিবার জন্য কত রাসভকে সুকণ্ঠ এবং কত বানরকেই সুকান্তি বলিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মিথ্যাভাষণ? হয়তো। মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া কিন্তু সুখ পাই। যে রমণীটিকে বাহুপাশে বাঁধিয়া সোহাগ করি, আবেগকম্পিত কণ্ঠে, প্রণয়পেলব ভাষায়, অলঙ্কৃত বন্দনা-গুঞ্জনে যাহার শ্রবণপটহ স্পন্দিত করিয়া তুলি তাহাকে আমি সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখি না। তাহার সম্বন্ধে আমার সত্য ধারণাটি চিরকাল অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইবে। মনে মনে তাহার দোষ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও মুখে তাহাকে বলিব, তুমি অনুপমা, অনবদ্যা, অনিন্দনীয়া। তোমার সকল কর্ম শোভন, সকল যুক্তি অখণ্ডনীয়, সকল চিন্তা সারবান। তোমার পরিচয় লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি।

পরিবর্তে সেও আমার কর্ণকুহরে ওই প্রকার অসম্ভব অসত্য অত্যুক্তিপূর্ণ প্রলাপ-বচন বর্ষণ করিবে।

ফলে—উভয়ে আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকিব।

প্রথম যৌবনে কিছুই বুঝিতাম না। বুঝিতাম না যে 'খোশামোদ করাটা হীন মনোবৃত্তি', এই বুলি আওড়াইয়া আমি আমার 'অহং'টার খোশামোদই করিতাম। তখন বুঝি নাই—এখন বুঝিতেছি, এবং প্রথম যৌবনের সেই অবুঝ 'আমি'টার প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা হইতেছে। সেই উদ্ধত অশিষ্টটা সকলকে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া সত্যভাষণের গর্বে নাক উঁচু করিয়া প্রচুর সুখ পাইত, অর্থাৎ নিজের 'অহং'টার প্রচুর খোশামোদ করিত। খোশামোদ না করিলে সুখ পাওয়া যায়? তোষামোদ ও তুষ্টি একই ধাতুতে গড়া—এ কথা

মুগ্ধবোধ খুলিলেই দেখিতে পাইবেন। শুধু একের তুষ্টি নয়, উভয়েরই তুষ্টি। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিমল আনন্দ পাইতে হইলে তোষামোদ করিতেই হইবে—তা সে ভূতোকেই হউক, ভগবানকেই হউক, কোন নারীকেই হউক বা নিজের 'অহং'কেই হউক। খোশামোদ করিয়া পরিবর্তে খোশামোদিত হইলেই আনন্দের উৎপত্তি। সকলেই এইরূপ একটা না একটা কাহাকেও ধরিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়—সকলে সে কথা জানেন না।

আসল গল্পটি এইবার শুনুন।

আমার চক্ষু দুইটি চটিয়া অত্যন্ত লাল হইয়া আছে এবং করকর করিতেছে। অবশ্য এ বিশ্বাস আমার আছে যে, সেঁক-রূপ খোশামোদ দিয়া তাহাদের শান্ত করিয়া ফেলিতে পারিব। খানিকক্ষণ বসিয়া নিবিষ্ট মনে গরম গরম সেঁক দিলেই উহারা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বেচারাদের দোষ নাই, চটিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

নিয়তির এমনই পরিহাস যে, কালই আবার ত্রিপুরাচরণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যদিও বর্তমান আখ্যায়িকার পক্ষে ত্রিপুরাচরণ অবান্তর, তথাপি তাহার সহিত আমার যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা শুনিলে আমার বক্তব্য আরও সুপরিস্ফুট হইবে। ত্রিপুরাচরণকে আমি খোশামোদ করিয়া সুখ পাই। ত্রিপুরাচরণ মুসোলিনী-ভক্ত। কাল সকালে সে রুখিয়া আসিয়া উপস্থিত। সে আকারে ক্ষীণ, কিন্তু তাহার ব্যবহার ও মতামত প্রচণ্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টেবিল চাপড়াইয়া, চিৎকার করিয়া জমাইয়া তুলিল। তাহার বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, দেশের প্রায় সকলেই গোল্লায় গিয়াছে—যে দুই-চারিজন অবশিষ্ট আছে তাহারাও গমনোন্মুখ। ইহাদের বাঁচাইতে হইলে দেশের আইন বদলানো দরকার। সে পরিবর্তিত আইনের আভাস যাহা দিল তাহা এইরূপ : প্রথমেই সিনেমা ও থিয়েটারের সংস্কার প্রয়োজন। এ দেশে সিনেমা ও থিয়েটার সম্পর্কিত যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তই লোমহর্ষণকর। এই সব লোমহর্ষণকর ব্যাপার হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আইন করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা কর্তব্য। প্রথমে আইন করিয়া সিনেমা ও থিয়েটারের সমস্ত আসবাবপত্র পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে

সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, সমস্ত প্রযোজকদের, সমস্ত গ্রন্থকারদের, সমস্ত দর্শকদের—সকলকে তোপের মুখে দাঁড় করাইয়া দিলে তবে এ বিষয়ের একটা সুরাহা হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।—এই বলিয়া টেবিলে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া ত্রিপুরাচরণ তাহার বক্তব্য শেষ করিল এবং তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুমি কি বল?

অসঙ্কোচে বলিলাম, নিশ্চয়, সব মেরে ফেলা উচিত।

বন্ধু কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তাহার পর বলিল, আচ্ছা, এই সাহিত্যিকগুলোকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? তোমার এবং আমার লেখা ছাড়া বাকি সব তো রাবিশ! এই বাজে সাহিত্যিকগুলোকে নিয়ে কি করা উচিত?

এ সম্বন্ধে তাহার মতামত আমার ঠিক জানা ছিল না।

দ্বিধাভরে বলিলাম, একটু ভেবে বলতে হবে—প্রায় এক জাতেরই লোক অবশ্য সব—

ত্রিপুরাচরণ ক্ষেপিয়া উঠিল।

এতে আর ভাবাভাবি কি? ও-ব্যাটাদের সাফ ক'রে ফেলা উচিত।

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, আরে, সে কথা কে অস্বীকার করছে! ভাবনা তার জন্য নয়। ভাবছি, এদের গুলি করা উচিত, না শূলে দেওয়া উচিত!

ত্রিপুরা বোকা নয়।

বলিল, ঠাট্টা করছ নাকি?

আমি গম্ভীরভাবে ভৎর্সনামিশ্রিত অনুযোগের সুরে বলিলাম, পাগল! এ বিষয়ে যে কোন মার্জিতরুচি লোক তোমার সঙ্গে একমত হবে। দুঃখ কি জান ভাই, আমাদের স্বাধীন দেশে জন্মানো উচিত ছিল। আমাদের কি এ দেশে মানায়?

এমন সময় ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া আমাকে বাঁচাইল।

ত্রিপুরা উঠিয়া পড়িল এবং বলিয়া গেল, সন্ধ্যার সময় সুবিধা হইলে আসিবে। এখন আফিসের সময় বসিয়া আড্ডা দেওয়া চলে না।

ত্রিপুরাচরণ যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পীতাম্বর খুড়ো আসিয়া হাজির। হস্তে এক নিমন্ত্রণপত্র।

পাড়ার 'বীণাপাণি-মিলন-মন্দির' অদ্য থিয়েটার করিবে।

পীতাম্বর খুড়ো, বিশু সরকার, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, দীনু বোস প্রভৃতি চাঁই চাঁই বৃদ্ধগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক।

পীতাম্বর খুড়ো পত্রটি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, যাচ্ছ তো ?

স্মিতহাস্যে কহিলাম, নিশ্চয়।

পীতাম্বর খুড়ো সোৎসাহে বলিলেন, খুব ভাল বই। ফুল রিহার্সালের দিন গেছলাম আমি। চমৎকার দাঁড় করিয়েছে। যেও—বুঝলে ? ঠিক আটটায় ড্রপ উঠবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।

পীতাম্বর খুড়ো চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম।

ত্রিপুরাচরণকে যাহাই বলি না কেন, আসলে আমার থিয়েটার সিনেমা দেখিতে ভালই লাগে—তা সে যত কদর্যই হউক। কদর্যতার মধ্যেও নানা রসের উপাদান পাই। তা ছাড়া পীতাম্বর খুড়োকেই বা চটাই কেন ? অত আহ্লাদ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। যাইবার প্রাক্কালে বাড়িতে বলিয়া গেলাম যে, ত্রিপুরাচরণ যদি আসে তাহাকে যেন বলা হয়—আমি পূজা করিবার জন্য শিবমন্দিরে গিয়াছি। ফিরিতে রাত হইবে। ত্রিপুরাচরণকেও অনর্থক চটাইয়া লাভ নাই।

থিয়েটারে গিয়া দেখিলাম, আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই। সমস্ত হলটা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গমগম করিতেছে। পীতাম্বর খুড়ো সম্বর্ধনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। নিজেও পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সম্মুখেই দেখিলাম দীনু বোস, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, হারাণ পালিত প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ সারি সারি বসিয়া আছেন।

আমার এক পার্শ্বে পীতাম্বর খুড়ো, অন্য পার্শ্বে বিশু সরকার।

ড্রপ আটটার সময় উঠিবার কথা—উঠিল দশটায়।

এই দুই ঘণ্টা কাল আমরা ইতিহাস চর্চা করিলাম। দীনু বোস প্রাচীন ব্যক্তি। তিনি শুনিয়াছি সেকালে 'সীতার বনবাস' নাটকে রামের ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া তিনি গিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তোফী প্রভৃতি মহাত্মাগণের অভিনয় বহুবার দেখিয়াছেন। সুতরাং অভিনয়-প্রসঙ্গে দুই-চারি কথা বলিবার তিনি অধিকারী। তিনি বলিলেন যে সাগরের সঙ্গে

বরং গোস্পদের তুলনা চলিতে পারে, কিন্তু উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মাগণের সহিত আধুনিক অভিনেতাদের তুলনা পর্যন্ত করিতে তিনি রাজী নহেন।

যত সব জোচ্চোর ফেরেব্‌বাজ কোথাকার—

এই বলিয়া ঘৃণিত লোচনে তিনি একটি মোটা সিগার ধরাইলেন।

পীতাম্বর খুড়ো, বিশু সরকার, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, হারাণ পালিত সকলেই তাঁহার সহিত একমত হইলেন।. আমিও হইলাম।

এই জাতীয় আলোচনায় দুইটি ঘণ্টা হাওয়ার মত উড়িয়া গেল। ড্রপ উঠিল।

নাটকটি করুণরসাত্মক।

কিন্তু দীনু বোসের কথাই ঠিক—আজকালকার ছোকরারা অভিনয়ের 'অ' পর্যন্ত জানে না। এমন করুণ নাটক অভিনয়ের দোষে হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ-মানুষেরা গোঁফ দাড়ি কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজিয়াছে—মনে হইতেছে যেন কতকগুলা হিজড়া। যে নায়িকার প্রেমে পাগল হইয়া নায়ক শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হইল, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে যে কোন লোক প্রথমে ভয় পাইবে এবং পরে হাসিয়া ফেলিবে।

খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

অর্থাৎ করুণরস চরম হাস্যরসে পরিণত হইয়াছে। সকলে হো-হো করিয়া কেন হাসিতেছে না লক্ষ্য করিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের চেয়ারটায় নজর পড়িল। দেখিলাম, দীনু বোস হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন।

পাশে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, পীতাম্বর খুড়ো কোঁচার খুঁটটা চোখে দিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। কি সর্বনাশ, অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট বিশু সরকারের চক্ষু দুটিও সজল।

এ কি হইল!

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখিলাম, চতুর্দিকে সকলেই কাঁদিতেছে। দীনু বোস তো কাঁদিয়া একেবারে কাদা হইয়া গেলেন। আমারই চোখে এক বিন্দু জল নাই, বরং আমার হাসি পাইতেছে।

অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার।

ক্রমে সকলেই দেখিলাম কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দিকে এক-একবার আড়নয়নে চাহিয়া দেখিতেছেন। সে চাহনির অর্থও অতিশয় প্রাঞ্জল— 'লোকটা আচ্ছা পাষাণ তো! সকলে কাঁদিয়া অস্থির হইয়া গেল, এ ব্যাটার চোখে এক ফোঁটা জল নাই!'

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিলেই হাসি পাইতেছে, অথচ চতুর্দিকে সকলেই রুদ্যমান। মহা বিপদ,—কি করি!

এমন সময় বিপদতারণ মধুসূদন মাথায় একটি বুদ্ধি দিলেন।

পকেটে নস্য ছিল। তাহাই বাহির করিয়া নাকে দিবার ছলে চোখে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরবিগলিত ধারা।

সমস্ত রাত থিয়েটার চলিল, সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আমি সমস্ত রাত্রি সমানে অনর্গল চোখের জল ফেলিলাম এবং এ কথাও অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, চোখ যদিও জ্বালা করিতেছিল, অন্তরে প্রচুর আনন্দলাভ করিলাম।

দীনু বোস, দামোদর বাড়ুজ্জে, হারাণ পালিত, পীতাম্বর খুড়ো—সকলেই অশ্রুবিসর্জন ব্যাপারে আমার 'সাহিত্য' লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

এখন চক্ষু দুইটির তোয়াজ করা প্রয়োজন।

ভূতনাথ গরম জলও আনিয়া হাজির করিয়াছে।

ভূতনাথকে বলিলাম, ওরে, তোর নতুন বউকে পৈঁচে গড়িয়ে দেব ভেবেছি—নীলু স্যাকরাকে একবার খবর দে।

গরম তুলোটা সাগ্রহে নিংড়াইতে নিংড়াইতে ভূতনাথ বলিল, এখন আমার মরবার অবসর নেই, হুজুর। বাসনপত্তর কিচ্ছু মাজা হয় নি এখনও। পরে যাব কোন এক সময়ে—

সানন্দে তাহার মুখের প্রসন্নতাটুকু লক্ষ্য করিলাম।

ভূতনাথ ভক্তিভরে আমার চোখে সেঁক দিতে লাগিল।

বাল্যকালে একটা গল্পে পড়িয়াছিলাম যে, এক বৃদ্ধ সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া নিজের গর্দভটি হারাইয়াছিলেন। গর্দভটি হারাইয়াছিলেন সত্য কথা,—কিন্তু তাহার পরিবর্তে যে আর একটি পরম বস্তু লাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু বলেন নাই। সে বস্তুটি আনন্দ—পরম আনন্দ। যে সব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেদের গোঁ-ভরে কাহারও মতামতে কর্ণপাত না করিয়া চলেন, তাঁহাদেরও আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কেমন সন্দেহ হয় যে, জীবনে সত্যকার আনন্দরস তাঁহারা হয়তো পাইলেন না—গর্দভটাকে [illegible] কাটাইয়া দিতে হইল।

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী এনায়েৎ খাঁ সুরবাহারে বাগেশ্রী আলাপ করিতেছেন। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনিন্দনীয় কণ্ঠে স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিবেন তাহার পরই স্বনামধন্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বেহালা এবং তৎপরেই সুপরিচিত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের কীর্তন হইবার কথা।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ গুণীগণ সমবেত হইয়া রহিয়াছেন—নাম করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইঁহারা সকলেই কৃতী।

এত গুণী-সমাগম সত্ত্বেও আমরা কিন্তু নিতান্ত নির্বিকার চিত্তে অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে রহিয়াছি—কোন প্রকার উত্তেজনা নাই। ইঁহাদের মধ্যে যে কোন একজন আসিলেই যথেষ্ট চাঞ্চল্য-সৃষ্টি হওয়ার কথা, কিন্তু এতগুলি বিখ্যাত গুণী একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কোন উৎসব নাই। কোন 'হল' পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হয় নাই—স্বাগত-সঙ্গীত গাহিবার জন্য তালিমপ্রাপ্ত বালিকাদলও দেখা যাইতেছে না। কোন জনতা নাই, অভিনন্দন নাই—কিচ্ছু না। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে আমরা যেন ইঁহাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছি না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা—সংক্ষেপে—নিম্নলিখিত প্রকার।

আমার বাসাবাটির ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে শ্রীহীন ক্যাম্প-চেয়ারে অর্ধমলিন লুঙ্গি পরিয়া শিথিলাঙ্গ আমি সম্মুখস্থ গড়গড়া হইতে অর্ধনিমিলিত নেত্রে ধূমপান করিতেছি। পাকশালার বারান্দায় আমার গৃহিণী যুগপৎ উবু এবং হেঁট হইয়া নির্বাণোন্মুখ চুল্লিটিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে একটি দুর্দশাগ্রস্ত তালবৃন্ত সবেগে সঞ্চালন করিতেছেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ইতস্তত হুড়াহুড়ি করিতেছে। দ্বাদশ দিবস পরে এক মোট লইয়া শ্রীমতী রজকিনী দর্শন দিয়াছেন এবং এনায়েৎ খাঁকে আমল না দিয়া ভৃত্যের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রফেসর এনায়েৎ খাঁর অঙ্গুলীস্পর্শে সুরবাহারের উদারা মুদারা তারায় বাগেশ্রী রাগিণী কাঁদিয়া মরিতেছে।

মানবসুলভ ঔৎসুক্য থাকিলে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই প্রশ্নটি করা

স্বাভাবিক—এতগুলি গুণী লোকের সম্মুখে আমি সপরিবারে এমনভাবে নিজমূর্তি ধরিয়া রহিয়াছি কেন ?

পাশের বাড়ির ক্ষেন্তিপিসি আসিয়া হাজির হইলেও তো আমার গৃহিণী মাথার কাপড়টা টানিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া সশ্রদ্ধভাবে আসনখানা আগাইয়া দিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ওঠেন, এবং আমিও প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের সম্মুখেও এমন শ্লথ-মূর্তি লইয়া প্রকাশ পাইতে লজ্জাবোধ করি। অথচ প্রফেসার এনায়েৎ খাঁর মত গুণীকে আমরা এটুকু খাতিরও দেখাইতেছি না—ইহার কারণ কি ?

কারণ আছে বইকি—অত্যন্ত স্থূল কারণ—

প্রফেসার এনায়েৎ খাঁ সশরীরে উপস্থিত নাই। গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিতেছে।

সশরীরী ক্ষেন্তিপিসি অথবা প্রাণকান্ত শারীরিক দাবির জোরে যে ভাবে আমাদের নিকট হইতে খাতির আদায় করিতে পারেন—অশরীরী এনায়েৎ খাঁ বা রবীন্দ্রনাথ তাহা করিতে অক্ষম। এনায়েৎ খাঁ বা রবীন্দ্রনাথ যদি দয়া করিয়া এ দীনের কুটিরে পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের অর্চনা করিতাম এবং আচারে ব্যবহারে পরিচ্ছদাদিতে সৌষ্ঠব রক্ষা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মনে মনে নাস্তানাবুদ হইলেও বাহিরে হাসিমুখে থাকিতাম। কিন্তু রেকর্ডবিহারী অদেহী রবীন্দ্রনাথ, এনায়েৎ খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দে বা আলাউদ্দিন খাঁকে লইয়া এতখানি বিব্রত হইতে আমরা অভ্যস্ত নহি, প্রস্তুতও নহি।

কল্পনা করিতেও ভয় হয়।

যেই রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি শুরু করিলেন অথবা এনায়েৎ খাঁ সুরবাহার ধরিলেন অমনই যদি আমাকে ছুটিয়া গিয়া চুলটা আঁচড়াইয়া, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি এবং পায়ে পাম্পশু পরিয়া আসিয়া সস্মিতমুখে ঘূর্ণ্যমান রেকর্ডখানার দিকে তাকাইয়া শ্রদ্ধাভরে ঘাড় নাড়িতে হয় তাহা হইলেই তো গিয়াছি। ইহা করা অপেক্ষা রেকর্ডগুলি চুরমার করিয়া গ্রামোফোনটি পুড়াইয়া ফেলা ঢের কম অস্বস্তিজনক।

কিন্তু এ কথাও শতবার স্বীকার্য যে ক্ষেন্তিপিসি অথবা প্রাণকান্ত অপেক্ষা এই সকল গুণীগণকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা করি এবং সৌভাগ্যক্রমে ইহাদের দৈহিক সান্নিধ্যলাভ করিতে পারিলে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিবার জন্য আকুল হইয়া

উঠি। অথচ যে গুণাবলীর জন্য আমরা ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, মাত্র সেই গুণাবলী বাহ্যত আমাদের ততটা উদ্বুদ্ধ করে না। অর্থাৎ চিন্তা করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, সাকার শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সাকার মূর্তির প্রয়োজন। নিরাকার গুণকে আমরা যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি তাহাও নিরাকার—তাহার বাহ্যিক কোন সাড়ম্বর প্রকাশ নাই।

দেখিতেছি, ভগবান সম্বন্ধেও যাহা—এ ক্ষেত্রেও তাহাই।

একটা সাকার মূর্তি—তাহা সে মৃন্ময় প্রতিমাই হউক, ওঁ-ই হউক, ক্রসই হউক অথবা রক্তমাংসের মানবই হউক—মনের মত একটা সাকার মূর্তি পাইলেই আমরা ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাকে পূজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠি, না করিলে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য এ সব কিছুরই প্রয়োজন নাই—তন্ময় হইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই হইল।

সুতরাং চক্ষু বুজিয়াই নিরাকার এনায়েৎ-বাগেশ্রী-রসে নিমজ্জিত হইয়া গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতেছিলাম, এমন সময় কড় কড় করিয়া বাহিরের দুয়ারের কড়াটা নড়িয়া উঠিল।

'ওরে ভুতো, দেখ্ তো—বাইরে কে এসেছে—'

ভুতো চলিয়া গেল।

সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইয়াছিল, সুতরাং এনায়েৎ খাঁ বিদায় লইলেন। এইবার রবীন্দ্রনাথের পালা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে—দ্বারপ্রান্তে জনৈক সাকারের আবির্ভাব হইয়াছে। নিরাকারের অপেক্ষা সাকারের দাবি প্রবলতর।

ভূতনাথ ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটি পত্র দিল এবং বলিল, বাহিরে একটি বাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

পত্রটি প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত লিখিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পত্র।—

'এই ভদ্রলোকটিকে তোমার বৈঠকখানায় বসাও। আমি একটু পরে আসিতেছি।'

ভুতোকে বলিলাম, বাবুকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসা।

উঠিতে হইল। লুঙ্গি ছাড়িয়া একটি ফরসা কাপড় এবং জামাও পরিতে হইল।

বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত অনৈক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

নমস্কার-বিনিময়ের পর আসন গ্রহণ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের জন্ম মনটা ছটফট করিতেছিল।

ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, গ্রামোফোন বাজাচ্ছিলাম। শুনবেন গ্রামোফোন ?

ভদ্রলোক শুধু একটু মুচকি হাসিলেন। বুঝিলাম, কোন আপত্তি নাই। ভৃত্যকে আদেশ করিলাম, ওরে, গ্রামোফোন আর রেকর্ডগুলো এইখানেই নিয়ে আয়।

ভদ্রলোক হাসিমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গ্রামোফোন আসিল।

রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডখানা তাঁহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এইখানাই দিই কি বলেন ?

তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রেকর্ডখানা দেখিয়া সস্মিতমুখে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুরু হইল।

আবৃত্তি শুরু হইবামাত্র ভদ্রলোকের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এরূপ তন্ময়, তদ্গত, শ্রদ্ধানিষ্ঠ মুখচ্ছবি ইতিপূর্বে আমি দেখি নাই। এই রেকর্ডখানি আমি এবং বন্ধু-বান্ধবগণ সকলেই তো বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মুখে যে সুগভীর রস-চেতনা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এমনটি তো আমাদের কাহারও হয় নাই !

বুঝিলাম, প্রকৃতই ভক্ত লোক। ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলাম।

সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইতেই রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি বন্ধ করিলেন।

ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি নিমীলিত নয়নে মুগ্ধমুখে বসিয়া আছেন, মনে হইল যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

রেকর্ডখানা আবার দিলাম।

ভদ্রলোক নিস্পন্দ হইয়া ঠিক সেইরূপ তন্ময়ভাবে ঠায় বসিয়া রহিলেন, যেন রস-সমুদ্রে তলাইয়া যাইতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি অতিশয় উচ্চাঙ্গের, এ সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি যে কোন লোককে এমনভাবে আবিষ্ট

করিতে পারে, ইহা আমার ধারণাতীত ছিল। এরূপ ভক্ত লোক আমি এই প্রথম দেখিলাম।

আমিও রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত। কিন্তু ইহার ভক্তির নিকট মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল।

আবার সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইল।

ভদ্রলোক দেখিলাম ঠিক তেমনই বসিয়া আছেন,—স্তিমিতনয়ন, ভাবগদগদ।

তৃতীয়বার রেকর্ডটি দিব কি না ভাবিতেছিলাম, এমন সময় প্রাণকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, ওসব এখন বন্ধ কর, কাজের কথা হোক আগে।

বলিলাম, আহা চটো কেন। ভদ্রলোক কেমন মুগ্ধ হয়ে শুনছেন দেখ দিকি!

প্রাণকান্ত সাধারণত মুচকি হাসিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথায় তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আরে, ও শুনবে কি! ও যে বদ্ধ কালা।

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া যেন আর একটি সত্যের সম্মুখীন হইলাম। সত্যই ইনি অতি উচ্চস্তরের সাধক, নাম শুনিয়াই সমাধিস্থ হন। মানসপটে কৌপীনধারী, সংসারবিরাগী, শ্রুত-অশ্রুত বহু সন্ন্যাসীর মূর্তি ভাসিয়া উঠিল, কেহ হিমালয়কন্দরে, কেহ নিবিড় অরণ্যে, কেহ শ্মশান বক্ষে—নাম-মাত্র সম্বল করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন,—বাহ্যজ্ঞানহীন রুদ্ধ-ইন্দ্রিয় ভূমাবিলাসী!

ইনিও সেই জাতের লোক।

হেঁট হইয়া পদধূলি লইতে যাইতেছিলাম, এমন সময় চমকিত হইয়া শুনিলাম, প্রাণকান্ত বলিতেছেন—ভদ্রলোকের একটি অবিবাহিতা ভগ্নী আছেন। তোমার নাতিটির সঙ্গে বিয়ে দেবে? যদি দাও ভারি উপকার হয়। আমাকে এসে ভারি ধরেছেন এঁর মা—

কিছুক্ষণ আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার পর বলিলাম, আচ্ছা বেশ তো। মেয়েটির কুষ্টিখানা একবার পাঠিয়ে দেবেন। কুষ্টির মিল হ'লে তারপর কথাবার্তা হবে।

দুই-চারি কথার পর ভদ্রলোককে লইয়া প্রাণকান্ত চলিয়া গেলেন।

আমি নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—

দুই এবং দুই যোগ করিয়া চার হইল। কিন্তু খুশি হইলাম না তো! লোকটাকে ভক্ত ভাবিয়া সুখী হইয়াছিলাম, ভণ্ড ভাবিয়া কষ্ট পাইতেছি। বুদ্ধির যে বিশ্লেষণী-শক্তির সূক্ষ্মবিচারে ও নৈপুণ্যে ভক্ত ভণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া গেল, সেই শক্তি লইয়া আমি করিব কি? এই শক্তি যদি না ক্রমশ লোপ পায় তাহা হইলে তো দেখিতেছি আনন্দলোক হইতে নির্বাসন অবশ্যম্ভাবী। এত বুদ্ধি লইয়া করিব কি!

দাদু!

দেখিলাম, ছোট নাতিনীটি আসিয়াছেন।

কি দিদি?

আমাদের খেলাঘরে আজ তোমার নেমন্তন্ন। খাবে চল।

গেলাম। দেখিলাম, ধূলার পোলাও, কাঁকরের ডালনা, খোলাম-কুচির কাবাব, কাদার মোহনভোগ সাজাইয়া শিশুর দল মহা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্লেষণী-শক্তিকে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া কচুপাতার আসনে সানন্দে বসিয়া পড়িলাম।

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, তোমার ভীমরতি ধরল নাকি? গ্রামোফোনটা বাইরে ফেলে এলে, ভূয়ার খোলা হাঁ-হাঁ করছে—

হাসিয়া বলিলাম, ভীমরতি কবে সত্যি ধরবে বলতে পার?

চিন্তার কথা

চিন্তা করিতেছিলাম।

বিনাব্যয়ে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। অবশ্য চিন্তাটা পরকীয়া, অর্থাৎ পরের বিষয়ে হওয়া প্রয়োজন। নিজস্ব দৈনন্দিন চিন্তা নিজস্ব স্ত্রীর মতই মোহমুক্ত। তাহাতে কোন উত্তেজনা নাই। কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়া বিরাট বিশ্বে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া একটু চিন্তা করুন, দেখিবেন আরাম পাইবেন। বিশেষত যদি চিন্তাটি দুশ্চিন্তা হয়।

ধরা যাউক আপনি সুখী লোক। আপনার চতুর্দিকে সুখ উথলিয়া উঠিতেছে, দুঃখের কোন কারণ নাই। কিন্তু এ জাতীয় একটি দুশ্চিন্তার শরণাপন্ন হউন, দেখিবেন বিচিত্র একটি অনুভূতি মনের মধ্যে আলো-ছায়ার অপূর্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছে।

ধরুন, 'বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ গতি কি হইবে'—তামাক টানিতে টানিতে এই নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাটাই যদি করিতে থাকেন, অবিলম্বে আপনার দশদিকে অন্ধকার নামিতে থাকিবে। কিন্তু মজা এই, সেই অন্ধকারের সূচীভেদ্যতা যতই নিদারুণ হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ যতটা ভয়াবহরূপে আপনি তাহা মানসপটে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন, তাম্রকূটধূমাচ্ছন্ন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আপনার অন্তর ততই এক বিচিত্র রসে আপ্লুত হইতে থাকিবে। সহৃদয় ব্যক্তির নিকট সে রস মিষ্ট নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। রোষ ক্ষোভ হতাশা প্রভৃতির সংমিশ্রণে তাহা নিতান্তই তিক্ত। কিন্তু এই তিক্ততারই মাদকতাশক্তি আছে। তিক্ত সুরার ন্যায় ইহা আপনাকে ক্রমশ উত্তেজিত করিতে থাকিবে, এবং এই শোচনীয় দুঃখময় চিন্তাতেও আপনি উত্তেজনাজনিত একপ্রকার সুখ-ভোগ করিতে থাকিবেন। এমন কি সমস্ত জিনিসটাকে সম্যকরূপে পর্যালোচনা করিবার জন্য বারম্বার কলিকা-বদলানো আপনার প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

আবার ধরা যাউক, আপনি সুখী নহেন—দুঃখী। দুঃখের আপনার অন্ত নাই। অর্থ নাই, শক্তি নাই, অথচ বেকার পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, রুগ্না স্ত্রী সম্বলিত বৃহৎ পরিবার। নানারূপ অভাব-অভিযোগের তাড়নায় আপনাকে অহরহ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাতেও যদি আপনি একটু সময় করিয়া 'বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কি হইবে'—এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে পারেন, দেখিবেন মনের ভার অনেকটা লঘু হইয়া যাইবে। অন্তরে অননুভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করিবেন। গভর্ণমেণ্ট, কংগ্রেস, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি, মন্ত্রীবর্গ এবং সবশেষে নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করিয়া সত্যই আপনি আরাম পাইবেন। নিজেকে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত যুযুধান অভিমন্যু বলিয়া মনে হইবে, এবং অন্যায় সমরে বিধ্বস্ত হইয়াও বড় বড় বীরপুরুষগণ যে সহানুভূতিময় গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আপনিও নিজেকে সেই জাতীয় গৌরবের ন্যায্য অধিকারী মনে করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। এতদ্ব্যতীত এই সূত্রে পরিচিত অধিকতর দুঃখী অন্যান্য বাঙালীগণের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনামূলক

সমালোচনা করিয়া এবং ভবিষ্যতে বাঙালীসন্তানগণ কিরূপে একমুঠা অন্নের জন্ত দ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া বেড়াইবে, তাহা কল্পনা করিয়া আপনার স্বকীয় দুঃখটা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। আপনি সান্ত্বনা পাইবেন, এবং হয়ত ভগবানকে ধন্তবাদও দিবেন।

স্থতরাং চিন্তা করা প্রয়োজন।

এই জাতীয় চিন্তা আপনাকে পারিপার্শ্বিক 'পরিস্থিতি'র কথা ভুলাইয়া দেয়, উপরন্তু অপূর্ব আনন্দরসে নিমজ্জিত করে। কেবল বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ-বিষয়ক চিন্তাই নয়, যে কোন চিন্তাই এ বিষয়ে সমান ফলপ্রসূ। 'ভগবৎ-চিন্তা' 'ইলেকৃশন-চিন্তা' 'পাটের ভবিষ্যৎ-চিন্তা' 'হিন্দু-মুসলমান-চিন্তা'—ইহার যে কোন একটা ধরুন এবং খানিকক্ষণ নিবিষ্টভাবে তন্ময় হইয়া থাকুন, দেখিবেন সুরাপান না করিয়াও আপনার কান গরম হইয়া উঠিয়াছে, এবং রগের শিরাসমূহ দপদপ করিতেছে।

আমি যে চিন্তাটি করিতেছিলাম, তাহার বিষয়—বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ নয়, দুর্গাপ্রতিমার ভবিষ্যৎ। সামনেই পূজা, স্থতরাং চিন্তাটা জগজ্জননীকে কেন্দ্র করিয়াই শুরু হইয়া গিয়াছিল।

চিন্তাটির সূত্রপাত করিয়াছিলেন আমার গৃহিণী।

অকস্মাৎ লক্ষ্য করিলাম, আমার বৃদ্ধা সেকেলে গৃহিণী স্কার্টপাড় শাড়ি ও আধুনিক ধরনের ব্লাউজ পরিধান করিয়াছেন। বিস্মিত হইলাম।

তাহার পর মনে হইল, যুগ বদলাইবে না কেন! নিজেকে দিয়াই তো বুঝিতে পারিতেছি। পূর্বে খড়ম পরিতাম, এখন স্যাণ্ডাল পরিতেছি। সেকালে আমরা গোঁফ রাখাটা পছন্দ করিতাম এবং গোঁফের ডগাটা কি ভাবে রাখিলে মানানসই হইবে তাহার চিন্তায় সারা হইতাম। একালে যুবকেরা গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়া অথবা গোঁফের ডগা দুইটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া আরাম পাইতেছে।

রুচি বদলাইয়াছে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। বদলানো উচিতও। এই চিন্তার সূত্র ধরিয়াই দুর্গাপ্রতিমার ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছিলাম। আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিলাম সবই তো বদলাইতেছে, প্রতিমার রূপটা তো কই বদলাইতেছে না! সেই সাবেক দশভূজা মূর্তি।

শক্তি-পূজা অবশ্য মানুষ চিরকাল করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া শক্তির প্রতীক যে প্রতিমা, তাহার রূপ যে চিরকাল একই থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কস্তাপাড় যদি স্কার্টপাড় হইতে পারে, স্যাণ্ডাল যদি খড়মের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, কেরোসিনের ডিবরি যদি টর্চে রূপান্তরিত হয়, দুর্গাপ্রতিমা বদলাইবে না কেন ?

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পুনরায় তামাক হুকুম করিলাম।

মনে হইতে লাগিল, এই প্রগতির যুগে সেকেলে ধরনের একটা একঘেয়ে প্রতিমা লইয়া পূজা করাটা নিতান্তই অক্ষমতার পরিচয়। দুই-এক স্থানে শুনিয়াছি নাকি মূর্তির ঢঙ বদলাইয়াছে, ওরিয়েণ্টালী রীতিতে গঠিত মূর্তি আমদানি হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, ইহা প্রগতির যথেষ্ট পরিচয় নয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে শক্তি-পূজার প্রতীক একটা মামুলী ম্যাটির পুতুল, এই কথা স্মরণ-মাত্রেই মনে জুগুপ্সার সঞ্চার হইতে লাগিল। আধুনিকা শক্তি-প্রতিমা কিরূপ হওয়া উচিত কল্পনা করিতে লাগিলাম।

মানসপটে নিম্নবর্ণিত ছবি ফুটিতে লাগিল। মা-দুর্গা রীতিমত এরোপ্লেন-বিহারিণী-বেশে মিলিটারি কায়দায় গগল পরিধান করিয়া এরোপ্লেন হইতে সামরিক-জাহাজ-রূপ অসুরের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতেছেন। নিম্নে টর্পেডো-রূপী সিংহ অতি আধুনিক কৌশলে জাহাজটিকে আক্রমণ করিতেছে। সেনাপতি কার্তিকেয় খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট হাফ্‌শার্ট পরিধান করিয়াছেন, বামহস্তে ধূমায়িত পাইপ, গোঁফ মিলিটারি কায়দায় ছাঁটা। ময়ূরের পরিবর্তে মিলিটারি-সরঞ্জাম-সমন্বিত ভীষণদর্শন মোটরকার। লক্ষ্মী সরস্বতীর মেয়েলী মূর্তি নাই। লক্ষ্মীর স্থানে একটি প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরির এবং সরস্বতীর স্থানে একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরির কংক্রিট মিনিয়েচার বিল্ডিং। গণেশ নাই। কেবল গণেশের শুঁড়টি আছে, এবং তাহাও একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন-মূর্তি [?] পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই জিজ্ঞাসা-চিহ্ন-মূর্তির নিচে এক স্থানে কতকগুলি টাকা, এক স্থানে একটা মস্তিষ্কের প্রতিমূর্তি এবং আর এক স্থানে কতকগুলি রেকমেণ্ডেশন লেটার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহার মর্ম আধুনিক জগতে সিদ্ধিদাতা কি ?—অর্থ ? মস্তিষ্ক ? সুপারিশ ? কেহ সঠিক কিছু বলিতে পারে না। সুপারিশ-পত্রগুলির নিকট একটি মূষিক ঘুরঘুর করিতেছে। ওগুলি যদি সিদ্ধির সন্ধান না দিতে পারে মূষিকটি ওগুলিকে উদরসাৎ করিবে। অর্থ ও

মস্তিষ্কও সিদ্ধিদানে অকৃতকার্য হইলে তাহাদিগকে কলা দেখাইবার জন্য কলাগাছটি মজুত আছে।

সিদ্ধিদাতার সংশয়-অঙ্কুশ-মূর্তি!

অকস্মাৎ কল্পনা-স্রোতে ব্যাহত হইল।

তবলা ও হার্মোনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে এক দল ছোকরা আসিয়া উপস্থিত।

ব্যাপার কি? কি চাই?

তাহারা সঙ্গীত দ্বারাই মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

হৃদয়ঙ্গম করিলাম, জাপান-বিধ্বস্ত চীনদেশের দুঃখে তাহারা বিগলিত এবং তাহাই সুর-লয়-তাল-সংযোগে প্রকাশ করিতেছে।

অবশেষে একটি কথা তাহারা নীরস গদ্যে নিবেদন করিল, চাঁদা চাই।

কিসের চাঁদা?

চীনাদের জন্য জগজ্জননী দুর্গার কৃপা আকর্ষণ করিতে হইবে, এবং তজ্জন্য স্পেশাল চণ্ডীপাঠ ও স্পেশাল অঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিছু অর্থ পাইলে পুরোহিত মহাশয় তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম।

চাঁদা লইয়া যুবকবৃন্দ চলিয়া গেলে পুনরায় দুর্গাপ্রতিমার আধুনিক রূপ বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, মন আর তেমন উৎসাহভরে সাড়া দিতেছে না। পীড়াপীড়ি করাতে হাসিয়া বলিল, দেখ, ইহা লইয়া বৃথা কেন মাথা ঘামাইয়া মরিতেছ। আমাদের যতই না কেন প্রগতি হউক, এখনও বেশ কিছুদিন মাটি ও খড় দিয়াই এ দেশে পুতুলরূপে শক্তি-প্রতিমা নির্মিত হইবে।

মনের এতাদৃশ চিন্তা-পরাঙ্মুখতা দেখিয়া বুঝিলাম, আর একবার তামাক খাওয়া প্রয়োজন। তামাক খাইলেই মন বোধ হয় আবার সক্রিয় হইয়া উঠিবে এবং চিন্তা করিতে থাকিবে।

সুতরাং ভুতোকে ডাক দিলাম।

আমার বিশ্বাস, প্রাণকান্ত ভুল করিতেছে।

গণেশ পপুলার লোক। জনপ্রিয় হইতে হইলে যে সকল গুণাবলী থাকা নিতান্তই প্রয়োজন গণেশের সে সকল আছে। সংক্ষেপে, সে মিথ্যাবাদী, মিষ্টভাষী এবং প্রয়োজনীয়। অনর্গল মিথ্যাভাষণ সত্ত্বেও তাহার মিষ্টবচনে আমরা বিগলিত হইয়া যাই এবং নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। গণেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে প্রাণকান্তের পরাজয় অনিবার্য।

জনপ্রিয় বলিয়া গণেশ যে অজাতশত্রু এমন কথা বলিতেছি না। জনপ্রিয় বলিয়াই তাহার শত্রু আছে। কিন্তু এই সকল শত্রু এখনও পরোক্ষচারি। প্রকাশ্যত গণেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত শক্তিসংগ্রহ এখনও তাহারা করিতে পারে নাই। মনে মনে তাহারা গণেশ-চরিত্রের ছোট বড় নানা দোষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে এবং সুযোগ-সুবিধামত সেগুলিতে নানা রঙ ফলাইয়া আড়ালে কলাও করিয়াও থাকে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহারা প্রাণকান্তের সহযোগিতা করিবে এমন আশা করি না। মাঝে মাঝে গণেশের কথা ভাবিয়া মর্মাহত হই। লোকটা পপুলার বলিয়াই বোধ হয় তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু খুব কম। সকলেই স্বার্থের খাতিরে তাহার সহিত লৌকিক ভদ্রতা রক্ষা করে, মৌখিক বিনয় প্রকাশ করে, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশ লোকই তাহার উপর অপ্রসন্ন। হিতৈষী বন্ধুর মত দোষ দর্শাইয়া দুই-চারিটা কথা শুনাইয়া দিবে এমন লোক গণেশের জীবনে নাই বলিলেই চলে। সকলেই তাহাকে খাতির করে, ভোট দেয়, কিন্তু ভালবাসে না। কাগজে কলমে সে জনপ্রিয়, কিন্তু কাহারও অন্তরলোকে তাহার স্থান নাই।

শুধু গণেশ নয়, পৃথিবীসুদ্ধ পপুলার লোকের এই দুর্দশা। নিখুঁত মানুষ কখনও পপুলার হইতে পারে না ;—চরিত্রে, শিক্ষায়, দীক্ষায় রীতিমত ভেজাল না থাকিলে পপুলার হওয়া শক্ত। খাঁটি সোনা দৈনন্দিন ব্যবহারের পক্ষে অচল, স-খাদ গিনি সোনারই বাজারে সমধিক প্রচলন। প্রচলন বটে, কিন্তু খাদের সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি না। রীতিমত কষিয়া আমরা তাহার পরিমাণ নির্ধারণ করি এবং খাঁটি সোনার সহিত তুলনামূলক

সমালোচনা করিয়া অ-খাঁটি সোনাকে হীনতর স্থান দিয়া থাকি। তেমনই স-খুঁত চরিত্র লইয়া এবং স-খুঁত চরিত্রের জোরেই কোনক্রমে যেই একটি মানুষ পপুলার হইয়া উঠেন অমনই তাঁহার চারিত্রিক খুঁতগুলিও লোকচক্ষে স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হইয়া নিন্দার স্থায্য খোরাক যোগাইতে থাকে। পপুলারিটি-গগনে ক্রমে ক্রমে মেঘ-সঞ্চার হয় এবং অকস্মাৎ হয়তো ঝঞ্ঝাবৃষ্টির সূচনাও করে।

সুতরাং বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দেখা যাইতেছে যে নির্দোষ লোক পপুলার হয় না, এবং পপুলার হইবার পরই তাহার দোষগুলিও পপুলার হইয়া পড়ে।

চন্দ্র পপুলার তাহার কলঙ্কটাও পপুলার।

সূর্য পপুলার, তাহার স্পটগুলিও ক্রমশ পপুলার হইয়া উঠিতেছে।

সুতরাং পপুলারিটিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধান করিয়া দেখা কর্তব্য যে, যে সকল চারিত্রিক ত্রুটিকে মূলধন করিয়া তিনি জনসমাজে আধিপত্য বিস্তারের আশা করিতেছেন সেই সকল ত্রুটি পরে যদি ঘরে ঘরে আলোচিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহা নির্বিকারচিত্তে সহ্য করিতে পারগ কি না!

যদি অপারগ হন, তাহা হইলে তাঁহার ও-পথ ত্যাগ করাই উচিত।

প্রাণকান্ত ভোট-যুদ্ধে গণেশের সহিত পারিবে কি না তাহা আলোচনা করাও এ ক্ষেত্রে আমি অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতেছি। কারণ প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তকে যতদূর জানি তাহাতে পপুলারিটি-মার্গে স্বচ্ছন্দে চলিবার মত চলিষ্ণুতাই তাহার নাই।

সে সমালোচনা-অসহিষ্ণু। প্রায়ই সত্য কথা বলে। তাহার মনের কথার এবং মুখের কথার অসঙ্গতি খুব বেশি লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ধর্মানুমোদিত বিবেকবাঞ্ছিত পথে চলিবার দিকেই তাহার ঝোঁক বেশি। এরূপ লোক ভোট সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে পপুলার নেতা হইয়া উঠিবে এমন আশা দুরাশা। কুব্জপৃষ্ঠ উষ্ট্রের পক্ষে সূচের ছিদ্রপথ দিয়া ল্যাজ দেহটা পার করিয়া লওয়া সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রাণকান্তের পক্ষে পপুলার নেতা হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং তাহাকে ও-পথে যাইতেই দিব না।

আমি গণেশকেই ভোট দিব। বন্ধু বলিয়াই প্রাণকান্তকে এ বিপদ হইতে

রক্ষা করা আমার কর্তব্য। আগামী উনিশে তারিখে পোলিং। মাঝে আর তিনটা দিন বাকি। পোলিং-স্টেশনও আবার ভিন্ন গ্রামে। গাড়িটা বলিয়া রাখিতে হইবে। গণেশকে ভোটটা দিয়া আসিব এবং চেষ্টা করিব যাহাতে আরও সকলে গণেশকেই ভোট দেয়।

প্রাণকান্ত কোনকালে নেতা হইতে পারিবে না। মাঝ হইতে আমার সান্ধ্য আড্ডাটা মাটি হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে ভোট দিব না।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছি।

প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিল।

দুই-চারি কথার পর আমার মনোভাব প্রাণকান্তের নিকট ব্যক্ত করিলাম এবং আমার যুক্তির সারবত্তা তাহার নিকট প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইলাম। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া প্রাণকান্ত বলিল, ডাক্তার দেখাও।

মানে ?

মানে, আমার ভোটের জন্য ভাবিতেছি না। কিন্তু তোমার বক্তৃতায় স্বাস্থ্যহানির আভাস পাইতেছি। সম্ভবত মস্তিষ্কটাই বিগড়াইয়াছে। অবিলম্বে ডাক্তার দেখাও।

বলিলাম, যতই না কেন রসিকতা কর, ভোট আমি তোমায় দিব না।

তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু নিজের চিকিৎসা করাও। তোমার যখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে আমরা যুক্তি অনুযায়ী সমস্ত কার্য করি, তখন তোমার মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার ঘোরতর আশঙ্কা হইতেছে।

অর্থাৎ তুমি কি বলিতে চাও যে, কোন কার্যই আমরা যুক্তি অনুযায়ী করি না ?

আমরা সকল কার্যই খুশি অনুযায়ী করি এবং সংস্কারমুগ্ধ স্বকীয় বিবেকের নিকট এবং আর পাঁচজনের নিকট সাফাই গাহিবার জন্য পরে একটা যুক্তি খাড়া করি—বিচারালয়ে বিচারপতি ও জুরির নিকট সাফাই গাহিবার জন্য উকিল খাড়া করার মত।

বুঝিতে পারিলাম না।

অগ্রে ভূতোকে ডাকিয়া চা ও তামাকু দিতে বল। মনে হইতেছে, অনেকক্ষণ ধূমপান কর নাই।

ভূতোকে হাঁক দিলাম। যথাসময়ে চা ও তামাক আসিল। উভয়ে নীরবেই চা ও ধূমপান করিলাম।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রাণকান্ত আবার বলিল, চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, জীবনে যে সকল কার্য করিয়া প্রকৃত আনন্দলাভ করিয়াছ সেগুলির প্রেরণা কে যোগাইয়াছে? যুক্তি, না, খুশি? হাঁ, ভাল কথা, তোমার গৃহিণীর দুলজোড়া স্যাকরা দিয়া গিয়াছে, এই নাও।

দুলের বাক্সটি লইয়া টেবিলে রাখিলাম।

কয়েকদিন পূর্বে প্রাণকান্তের গৃহিণীর নূতন কর্ণভূষণদ্বয় আমার গৃহিণীকেও স্বকর্ণ অনুরূপভাবে অলঙ্কৃত করিতে প্রবুদ্ধ করে। প্রবুদ্ধ গৃহিণীর বাসনা-পূরণার্থে প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। কারণ যে আদর্শ আমার গৃহিণীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সে আদর্শ প্রাণকান্তের স্ত্রীর কর্ণেই দোদুল্যমান। সুতরাং প্রাণকান্তকেই গহনাটি গড়াইবার ভার দিয়াছিলাম।

এই সামান্য ঘটনাটিই এখন অসামান্যতা লাভ করিল। প্রাণকান্ত বলিতে লাগিল, স্ত্রীকে অলঙ্কার গড়াইয়া দিবার স্বপক্ষে তোমার কি যুক্তি আছে বলিতে পার? স্ত্রীলোক অলঙ্কার পরিধান করে পুরুষের মনোহরণ করিবার জন্য। আশা করি, তোমার স্ত্রীর সজ্ঞানভাবে অন্য পুরুষের প্রতি লক্ষ্য নাই। ধরিয়া লইতেছি, তুমিই তাহার লক্ষ্যস্থল। তোমার মনোহরণ করার জন্য তোমার স্ত্রীর কি আর অলঙ্কার পরার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে কর? প্রয়োজন থাকিলেও সে অলঙ্কার তোমাকেই যোগাইতে হইবে, এতদপেক্ষা অধিক হাস্যকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ইহার সরল অর্থ কি ইহাই দাঁড়ায় না—গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া মনোহরণ করিবার জন্য সাজ-সরঞ্জামাদি সব আনিয়া দিলাম, মন উন্মুক্ত করিয়া বসিলাম, এইবার নাও, আমার মনটি হরণ কর? যেন বঁড়শিবিদ্ধ শফরী ছিপধারী মৎস্য-শিকারীকে সটোপ আর একটি বঁড়শি কিনিয়া দিয়া বলিতেছে, এইটিও বাগাইয়া একবার ফেল তো বাপু, গিলিয়া ধন্য হই।

প্রাণকান্ত ক্ষেপিলে প্রাণান্তকর ব্যাপার ঘটে।

কিন্তু প্রাণকান্তের সহিত তর্ক করা অপেক্ষা তাহাকে একটা ভোট দেওয়া ঢের সহজ। সুতরাং বলিলাম, যাক, আর কথা বাড়াইয়া দরকার নাই, ভোট তোমাকেই দিব।

তোমার সুমতি দেখিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু ভোটিং শেষ হইয়া গিয়াছে, তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না!

সে কি ! পোলিং শুনিয়াছিলাম উনিশে, আজ তো মাত্র পনরই !

তুমি বাংলা তারিখ বলিতেছ, পোলিং হইয়া গিয়াছে গত ইংরাজী মাসের উনিশে।

আকাশ হইতে পড়িলাম।

ফলাফল কি হইল ?

হারিয়াছি, এক ভোটের জন্য।

আমার কাছে একটা লোক পাঠাইলেই পারিতে।

আমি কাহারও কাছে লোক পাঠাই নাই। ভোটে হারিয়াছি বটে, কিন্তু বাজি জিতিয়াছি। হরেনের সহিত বাজি রাখিয়া আমি ভোট-যুদ্ধে নামিয়াছিলাম। হরেন বলিয়াছিল, আমি জিতিবই ; আমি বলিয়াছিলাম, হারিবই। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে হরেনই আমার হইয়া ক্যান্‌ভাসিং করিয়াছে, আমি কিছুই করি নাই। যখন পোলিং হইতেছিল, তখন আমি চকদিঘিতে মাছ ধরিতেছিলাম। সেই বাজির টাকা দিয়াই তোমার গৃহিণীকে দুলজোড়া গড়াইয়া দিলাম। তোমাকে ইহার মূল্য দিতে হইবে না। এখন দেখ, দুলজোড়া শ্রীমতীর পছন্দ হইবে কি না !

খুলিয়া দেখিলাম। অপরূপ !

আবার আকাশে ফিরিয়া গেলাম।

শিশু

শিশুকে এত ভাল লাগে কেন ?

আমার নবাগত দৌহিত্রটি সম্প্রতি আমার মনে এই চিন্তাটি উদ্রিক্ত করিয়াছে। পাঁচ বৎসরের শিশু, কিন্তু তাহাকে লইয়াই সমস্ত দিন মাতিয়া আছি, অন্য কিছু করিবার আর অবসর নাই। কখনও তাহাকে কাগজের নৌকা বানাইয়া দিতেছি, কখনও জাহাজ, কখনও দোয়াত, কখনও ঘুড়ি। শুধু তাই নয়, তাহাকে আমার গৃহিণীর কল্পিত প্রণয়ী ধরিয়া লইয়া তাহার সহিত নানারূপ ছদ্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বালকটি শিষ্ট নহে, শান্ত তো নহেই।

ইতিমধ্যেই সে আমার হুঁকা উল্টাইয়াছে, কলিকা ভাঙিয়াছে, চশমার খাপটি বারম্বার খুলিয়া চশমাটি অধিকার করিতে চাহিতেছে। ধূলিধূসরিত দেহ লইয়া ক্রমাগত আমার ঘাড়ে পিঠে পড়িতেছে। বালাপোশখানার দফা রফা হইয়া গেল।

তথাপি কিছুতেই তাহার উপর চটিতে পারিতেছি না। মাঝে মাঝে দুই-একবার ধমক দিতেছি বটে, কিন্তু সে ধমকের অন্তঃসার-শূন্যতা অবিলম্বেই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। দুষ্টটা হাসিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাসিতেছি।

খবরের কাগজটা আসিবামাত্রই সে দখল করিয়াছে, খানিকটা ছিঁড়িয়াছে এবং খবরের কাগজের প্রত্যেক ছবিটির বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিযাছে। তাহাকে যাহা হউক একটা উত্তর দিয়া স্তোক দিতেছি বটে, কিন্তু নিজের অজ্ঞতায় ও অক্ষমতায় মনে মনে লজ্জিত হইতেছি। ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, সরল শিশুর সরল প্রশ্নগুলি কি ভীষণ সরল!

দাদু, খবরের কাগজে কি লেখা থাকে?

খবর।

খবর কি?

ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন হইল। সুতরাং বলিলাম, নানা দেশের সব গল্প লেখা আছে ওতে। দাও, রেখে দিই, নষ্ট করতে নেই।

গল্প বল না দাদু, একটা ওর থেকে। দেখ, দেখ, ওটা কি দেখ!

দেখিলাম একটা টিকটিকি একটা পতঙ্গকে ধরিয়াছে।

মুমূর্ষু পতঙ্গটা ছটফট করিতেছে।

উত্তেজিত বালক খবরের কাগজ ফেলিযা বালিশটার উপর দাঁড়াইয়া উঠিল।

বলিলাম, টিকটিকি ফড়িং ধরে খাচ্ছে।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শিশু কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, টিকটিকি দুধ খায় না বুঝি?

না।

ভাত?

না। ভাত কে রেঁধে দেবে বল ওকে?

ওর বুঝি মা নেই ?

বিপদ আসন্ন বুঝিয়া কৌশলে বিষয়ান্তরে উপনীত হইলাম।

বালিশ থেকে নেমে দাঁড়াও, তোমার মা দেখতে পেলে বকবে।

বালিশে দাঁড়ালে মা বকে কেন দাদু, তুমি তো বকো না ?

এই উক্তির পর বালিশ পদদলিত করার জন্ত তিরস্কারবাণী উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তাহার জননীর অযৌক্তিক ক্রোধের দোহাই দিয়াই বালিশটি রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

তোমার মা যে ভয়ঙ্কর রাগী। দেখতে পেলে তোমাকেও বকবে, আমাকেও বকবে। বালিশ থেকে নাব।

মা তো এখন রান্নাঘরে।—এই বলিয়া দুর্বৃত্তটা একটি পদ বালিশে রাখিয়া অন্য পদটি টেবিলে স্থাপন করিল। উদ্দেশ্য—টিকটিকিকে পর্যবেক্ষণ করা।

বুঝিলাম, টেবিলস্থিত দোয়াতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কালি তো পড়িবেই, দোয়াতটাও না ভাঙে!

সুতরাং ভ্রমরবেশী রাজপুত্রের গল্প ফাঁদিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইলাম।

এই ভাবে সমস্ত দিন চলিতেছে।

কিছুতেই ছোকরাকে বাগাইতে পারিতেছি না, এবং পারিতেছি না বলিয়া মনে কোন প্রকার ক্ষোভও হইতেছে না। উপরন্তু খুশিই হইতেছি।

কিন্তু, কেন ?

একা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছি।

বাহিরের ঘরটাতে আমি একাই শয়ন করি। এতক্ষণ সে আমার কাছেই ছিল, এইমাত্র তাহার মা আসিয়া খাইবার জন্ত তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। সে যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, সে রাত্রে আমার নিকটেই শয়ন করিবে এবং ভ্রমরবেশী রাজপুত্রের উপাখ্যানটি শেষ পর্যন্ত শুনিবে। বলা বাহুল্য, আমার ইহাতে আপত্তি নাই! কিন্তু তাহার মায়ের দেখিলাম ঘোরতর আপত্তি রহিয়াছে। আসলে ছেলেটিকে কাছে না লইয়া শুইলে তাহার ঘুম হয় না, কিন্তু সে কারণ দর্শাইল অন্তরূপ। বলিল, বালকটি ঘুমের ঘোরে এমন ঘুরপাক খায় যে, তাহাকে কাছে লইয়া শুইলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণকেও জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

আমি কুম্ভকর্ণ নহি, তথাপি কিন্তু ভীত হইলাম না। নাতিও আমার কানে কানে চুপি চুপি বলিয়া গেল যে সে ঠিক আসিবে, আমি যেন কপাটটা খুলিয়া রাখি।

খুলিয়া রাখিয়াছি, এবং শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছি, শিশুকে এত ভাল লাগে কেন?

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিতে বাধ্য যে, শিশুমাত্রেই বর্বর—অমার্জিত অসভ্য নগ্ন পশু। আমরা অমার্জিত অসভ্য নগ্ন পশু-প্রকৃতির প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে তো সহ্য করি না। শুধু যে সহ্য করি না তাহা নয়, এই সকল অমার্জিত অসভ্য নগ্ন পশু-প্রকৃতিকে দমন করিবার জন্য আমরা অর্থাৎ সুসভ্য মানবসমাজ যুগে যুগে নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। আইন, আদালত, জেলখানা, ফাঁসিকাঠ, শাস্ত্র, বচন, উপদেশ, নীতিকথা, নরক-ভীতি ইহাদের প্রত্যেকটিই পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে এই পশু-প্রকৃতি দমনার্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। মানব-মনের ও মানব-সভ্যতার একটা প্রধান দিকই এই সব লইয়া ব্যাপৃত। অথচ শিশুর মধ্যে সেই বর্বরতাই আমাদিগকে আনন্দ দান করে।

কেন?

লেপটা মুড়ি দিয়া তামাক টানিতে টানিতে চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনেক চিন্তার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা এই যে, শিশুরা অসহায় বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের প্রতি সভ্য মানবমাত্রেই একটা সহজ অনুকম্পা আছে এবং এই অনুকম্পাই ক্রমশ অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। শুধু শিশুকে নয়, আমরা নারীকেও যে ভালবাসি এবং তাহাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করি, তাহারও মূল কারণ বোধ হয় তাহাদের অসহায় অবস্থা। অসহায় এবং অক্ষমকে ভালবাসিয়া, রক্ষা করিয়া, সম্মান করিয়া সভ্য পুরুষ নিজের পৌরুষকেই সার্থক করে। শিশু ও নারী যদি দুর্বল না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাদের নানাবিধ অযৌক্তিক অত্যাচার সহ্য করিতাম না। নারী পুরুষ হইলে, শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আর আমাদের মনোহরণ করিতে পারে না। তাহাদের অক্ষমতাই তাহাদের অস্ত্র।

সুতরাং বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, অসহায় বলিয়াই আমরা তাহাদের সহায় এবং অসহায়ের প্রতি স্নেহশীল হওয়াটা সমর্থ পুরুষের অপরিহার্য মনোবৃত্তি।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই।

রাত্রে মনে হইল, আমার দৌহিত্রপ্রবর আসিয়া ঢুকিয়াছেন। পাশ-বালিশটার ও-ধারে গুটি মারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছেন এবং সম্ভবত মায়ের ভয়েই নীরব আছেন। মা টের পাইলে এখনই তুলিয়া লইয়া যাইবে। আমারও ঘুম ধরিয়াছিল, আমিও আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলাম না। লেপটা ও-ধারে আর একটু প্রসারিত করিয়া দিলাম।

ভোরে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

ভাবিলাম, দস্যুটাকে এইবার জাগানো যাক। ভ্রমরবেশী রাজপুত্রের গল্পটাও এই অবসরে শেষ করিয়া ফেলি। তাহা না হইলে সমস্ত দিন আমার পরিত্রাণ নাই।

বলিলাম, ওঠ হে! ভ্রমরবেশী রাজপুত্র টুকটুকে লাল ডালিম ফুলে ফুলে গুনগুন ক'রে বেড়াচ্ছে যে! ভোর হ'ল—

ভায়ার সাড়া-শব্দ নাই।

কই হে, সাড়া-শব্দ নেই যে!

ভায়া নীরব।

ভাবিলাম, লেপটা তুলিয়া দিয়া একটু স্থূলগোছের রসিকতা না করিলে ভাযার নিদ্রাভঙ্গ হইবে না।

লেপটা তুলিয়া দিলাম।

লেপ তুলিয়াই কিন্তু খড়ম তুলিতে হইল।

নাতি নয়, একটা লোম-ওঠা কুকুর। সমস্ত রাত এক লেপের তলায় আমার সঙ্গে শুইয়া ছিল!

কপাট খোলা ছিল, চুপচাপ কখন ঢুকিয়াছে।

* * *

খড়মটা বোধ হয় জোরেই লাগিয়াছিল।

কুকুরটা বাহিরে একটানা চিৎকার করিয়া চলিযাছে—অসহায় আর্ত ক্রন্দন।

মনে হইল, যেন আমার গত রাত্রির থিয়োরিটাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দুর্গা, শ্রীহরি!

একটু পরেই বন্ধু ত্রিপুরাচরণ আসিয়া দর্শন দিলেন।

ত্রিপুরাচরণ মুসোলিনি-ভক্ত। সুতরাং দুই-চারি কথার পর আস্ফালন-সহকারে তিনি মুসোলিনির গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া যাইতে

লাগিলাম—বস্তুত না শুনিয়া উপায় ছিল না। মুসোলিনির চরিত্র-বলিষ্ঠতার ও বীরত্বের নানা কাহিনী শেষ করিয়া ত্রিপুরাচরণ বিদায় লইলে আমার মনে এই প্রশ্নের আর একটা দিক প্রকট হইল। মনে হইল, এই সব প্রবল প্রতাপশালী ডিক্টেটরগণও তো এক হিসাবে কম বর্বর নহেন, ইহাদিগকে অসহায়ও বলা চলে না। অথচ সভ্য সমাজ তো ইহাদের স্বচ্ছন্দে সহ্য করিতেছে। শুধু সহ্য করিতেছে নয়, সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় গলিয়া পড়িতেছে।

কেন ?

প্রকৃষ্টরূপে চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে শেষে উপনীত হইতে বাধ্য হইলাম : যে যে কারণে আমরা প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়কে সহ্য করি, মৃত্যুকে সহ্য করি —শুধু সহ্য করি নয়, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া নানারূপ কবিত্ব করি এবং তাহাদের আবির্ভাবের হেতু ও যৌক্তিকতার মূল কারণ নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া অবশেষে অজ্ঞাত ভগবৎ-শক্তির আশ্রয় লই, ঠিক সেই কারণেই আমরা শিশু, নারী ও মুসোলিনিকে সহ্য করি এবং উহাদের লীলা দেখিয়া আনন্দিত হই।

অর্থাৎ গত্যন্তর নাই।

উহারা অসহায় নহে—আমরাই অসহায়। উহাদের স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্রাণশক্তিকে রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই এবং নাই বলিয়াই উহাদের নানা উপদ্রবের মধ্যে একটা সৌন্দর্য, একটা লীলা আবিষ্কার করিয়া আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের অক্ষমতা-জনিত লজ্জাকে চাপা দিয়া জ্ঞাতসারে পুলকিত হইয়া উঠি। অমোঘ অদম্য শক্তির নিকট নতি-স্বীকার-জনিত গ্লানিকে আমরা লীলাদর্শনের আনন্দে মুছিয়া ফেলিতে চাই।

লোম-ওঠা কুকুরকে খড়ম মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু শিশুকে—বিশেষ করিয়া দৌহিত্রকে, প্রেয়সীকে অথবা ডিক্টেটরগণকে অত সহজে বিদায় করা চলে না। বস্তুত, তাহা অসম্ভব—আমাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং তাহাদের আমরা স্নেহ করি, ভালবাসি, পূজা করি।

তুমি কেন কাল আমাকে নিয়ে শোও নি ?

এক পা ধুলা লইয়া ও হাতে গুড় মাখিয়া দৌহিত্র আসিয়া বিছানায় উঠিল।

সহাস্য মুখে তাহাকে সম্বর্ধনা করিলাম।

কয়েক দিন অত্যন্ত সশঙ্কিত অবস্থায় কাটিয়াছে।

এখন শঙ্কা অপনোদিত হইয়াছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা দার্শনিক চিন্তার খোরাক যোগাইতেছে। ঘটিয়া যাইবার পর অধিকাংশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারই দার্শনিকতার খোরাক যোগাইয়া থাকে, সেদিন যেমন ঘটিল। নিতাইবাবু ধার-কর্জ করিয়া অনেক কষ্টে ছেলেটিকে মানুষ করিতেছিলেন। ছেলেটিও ভাল—যেমন দেখিতে, তেমনই পড়াশোনায়। বলা নাই, কহা নাই, অকস্মাৎ ছেলেটির হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া গেল এবং ছেলেটি মারা গেল। আমরা ইহা লইয়া সকলেই পরিতাপ করিতেছিলাম, এমন সময় নিতাইবাবু নিজেই আসিয়া আমাদের প্রবোধ দিলেন। বলিলেন যে, ইহা লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা; করুণাময় ভগবান একে একে তাঁহার বন্ধনগুলি মোচন করিতেছেন, ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে কেন? গত বৎসর স্ত্রী গিয়াছে, এ বৎসর ছেলেটি গেল। বাকি আছে ছোট একটা মেয়ে; কিন্তু তাহারও শরীরের যা অবস্থা—প্রত্যহই জ্বর হইতেছে, সুতরাং হয়তো শীঘ্রই তাঁহাকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত হইতে হইবে।

এই বলিয়া নিতাইবাবু একটু হাসিলেন। যদিও তাঁহার এই মলিন হাসিটুকু ক্রন্দন অপেক্ষাও অধিক মর্মান্তিক, তথাপি ইহা বেশ প্রতীয়মান হইল যে, একটা দার্শনিক প্রশান্তি আসিয়া তাঁহার শোককে স্নিগ্ধ করিয়াছে। সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, দার্শনিক চিন্তা শুধু যে আমাদের জীবনে অনিবার্য তাহা নয়, ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। সংসারটাকে যদি মরুভূমির সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দার্শনিক চিন্তাগুলিকে 'ওয়েসিস' বলিতে হয়। কারণ দেখিতেছি, এই সংসারে উহাদেরই আশ্রয়ে খানিকটা শান্তিলাভ করা সম্ভব। এই মরুভূমিতে উহাদেরই উদ্দেশে মানুষ, উট—সকলেই ছুটিতেছে। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনারই একটা না একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা খাড়া না করিলে আমাদের যেন নিদ্রাই হয় না।

এইবার যে কথাটা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

আসল কথাটা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু অবান্তর-কথা-প্রসঙ্গে আর একটি অবান্তর কথা লেখনীমুখে আসিয়া

পড়িতেছে। কথাটা এই যে, শাখা-প্রশাখা না থাকিলে বৃক্ষ নদী (বা সম্মিলন) যেমন সার্থকতা লাভ করে না, প্রসঙ্গত কয়েকটি অবান্তর কথার উল্লেখ না করিলেও তেমনিই কোন প্রসঙ্গই জমে না। প্রজাবৃদ্ধি ব্যাপারে ঢাক ঢোল শানাই পুরোহিত কতকগুলি মন্ত্র (অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানটাই) অবান্তর, এবং বিবাহ ব্যাপারেও বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর দল নিরর্থক। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই যে, প্রজা-বৃদ্ধিমানসে যে ঢাক ঢোল সানাই বাজাইয়া বিবাহ করিবে, এবং বিবাহ করিতে গিয়া একদল বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী জুটাইবে; অবান্তর হইলেও এ সব অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য।

আর নয়, এইবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

কয়েক দিন অত্যন্ত সশঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম। এই জাতীয় শঙ্কা বাল্যকালের পরীক্ষার পূর্বে অনুভব করিতাম। মনে হইত, কাল প্রশ্নপত্রে কি বিভীষিকাই না জানি দেখিব! পরীক্ষাসাগরে অনেক নাকানি-চুবানি খাইয়া তরী বহুকাল পূর্বে তীরে ভিড়াইয়াছি, পরীক্ষিত বিষয়গুলির একটি বর্ণও এখন আর মনে নাই, কিন্তু পরীক্ষাটা যে সত্য সত্যই পরীক্ষা ছিল তাহা এখনও মনে রীতিমত জাগরূক আছে। সে ভীতি বিস্মৃতির তলায় এখনও তলাইয়া যায় নাই। সেদিনও তৎসম ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, যখন ডাকযোগে একখানি পত্র আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিয়া গেল যে, দামোদরবাবু আসিতেছেন।

সর্বনাশ!

দামোদরবাবু লোকটি আমার অদৃষ্টপূর্ব হইলেও অশ্রুতপূর্ব নহেন। ইঁহার বিষয় অনেক কিছুই শুনিয়াছি এবং শুনিবামাত্রই বিশ্বাস করিয়াছি। পরের কথা বিশ্বাস করিতে অথবা পরের সম্বন্ধে চর্চা করিতে কোন অর্থব্যয় হয় না বলিয়াই বোধ হয় আমরা তাহা এত সহজে করি। ভাগ্যে হয় না! হইলে তো মারা গিয়াছিলাম।

দামোদরবাবু-প্রসঙ্গে মন্দ অবশ্য কিছু শুনি নাই। পরন্তু যাহা শুনিয়াছি তাহা এত বেশি রকম ভাল যে, সেই কারণেই ভয় ধরিয়া গেল।

জনশ্রুতি, দামোদরবাবু অতি উচ্চস্তরের প্রাণী। ঘোর মর‍্যালিস্ট, তাঁহার নিজস্ব একটা নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী তিনি জীবনধারণ করেন। পুলিসে

চাকুরি করেন, কিন্তু কখনও ঘুষ গ্রহণ করেন নাই ; মিথ্যা কথা বলেন না। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু। ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন। মস্তকে টাক টিকি দুই-ই আছে। অর্থাৎ এইরূপ চরিত্রবান উন্নতমস্তক নিষ্কলঙ্ক লোক বর্তমান যুগে দুর্লভ।

এহেন দামোদরবাবু আমার অতিথি হইবেন শুনিয়া ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দামোদরবাবু না আসিয়া সুন্দরবনের কোন ব্যাঘ্র যদি আমার অতিথি হইতে আসিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় এতটা ভীত হইতাম না। নিখুঁত-চরিত্র দামোদরবাবুকে লইয়া আমি যে কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। অপরাধের মধ্যে আমি তাঁহার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। সম্পর্কেও আবার গুরুজনস্থানীয়—আমার স্বর্গীয়া বৈমাত্রের ভগিনীর মামা-শ্বশুর তিনি। আমার সহিত তাঁহার গোপনীয় কি সব কথাবার্তা নাকি আছে যাহা পত্রযোগে হওয়া অবাঞ্ছনীয় ; সুতরাং, তিনি সশরীরে আসাই স্থির করিয়াছেন। এইরূপ সর্বগুণান্বিত আত্মীয়কে অতিথিরূপে লাভ করা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। কিন্তু সত্য বলিতেছি, আমি মনে মনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রামা, শ্যামা, হরি, যদু নহে—স্বয়ং দামোদরবাবু। কি ভাবে তাঁহার সহিত চলিব, কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলিব, কোন্ কথায় হাসিব, কোন্ কথায় গম্ভীর হইয়া থাকিব, কিসে সায় দিব, কিসে আপত্তি করিব—ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কূলকিনারা করিতে পারিলাম না।

মনে মনে অনর্গল ঘামিতে লাগিলাম।

বাল্যকালের পরীক্ষার পূর্ববর্তী দিনগুলি যেন ফিরিয়া আসিল।

নির্ধারিত দিবসটিতে পরীক্ষা যেমন অনিবার্যভাবে শুরু হইয়া যায়, দামোদরবাবুও তেমনই আসিয়া পড়িলেন।

আমার পুত্র তাঁহার সম্বর্ধনাকল্পে স্টেশনে গিয়াছিল।

আমি গৃহকোণে কৃতসংকল্প হইয়া বসিয়াছিলাম যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত যদি আলোচনা করিতেই হয়, ধর্ম-প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিব। সম্প্রতি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'খানা পড়িয়াছি।

সুতরাং খানিকক্ষণ বেশ চালাইতে পারিব।

অন্তঃপুরে শুদ্ধাচার-নিষ্ঠাচারের দিকে কড়া নজর রাখিবার জন্য গৃহিণী তাঁহার গেঁটে-বাতকে উপেক্ষা করিয়া চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। সুতরাং সেদিকে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।

আমার আচরণে কোন অসঙ্গতি না প্রকাশ পায়, এই ভয়েই আমি মনে মনে তটস্থ হইয়া বসিয়া ছিলাম।

স্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া গেটে থামিল।

কৃষ্ণকায়, বেঁটে, মোটা, ঘাড়ে-গর্দানে এক ব্যক্তি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন দেখিলাম। টাক ও টিকি রহিয়াছে; সুতরাং উনিই নিঃসন্দেহে দামোদরবাবু। ভদ্রলোকের রক্তাভ চক্ষু দুইটি এত বড় যে, মনে হয় যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মুখখানি গোলাকার, রোমহীন। কাঁচাপাকা একজোড়া পুষ্ট ভ্রূ আছে। গলাবন্ধ জিনের কোট পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। কণ্ঠলগ্ন তুলসীর মালাটিও দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সম্বন্ধে এতকাল যাহা শুনিয়াছি তাহার সমলকত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

তিনি নিকটে আসিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তাঁহার প্যানেলা জুতা হইতে কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া শিরোধার্য করিয়া ফেলিলাম।

গুরুজন!

বয়সে কিন্তু আমার অপেক্ষা প্রবীণতর বলিয়া তাঁহাকে মনে হইল না। দামোদরবাবু সস্মিত মুখে বলিলেন, থাক্ থাক্, বড় আনন্দিত হলাম বাবা, তোমাদের সব দেখে। বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও সব। নিজেদের লোক, অথচ চাক্ষুস পরিচয় নেই। কার্য-কারণের যোগাযোগ না ঘটলে হয়তো দেখাই হ'ত না। ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স।

অনুমতি পাইয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

দামোদরবাবুও বসিলেন।

দুই-চারি কথার পর তিনি বলিলেন, আমায় নিরিবিলি দেখে একটা ঘর দিতে হবে বাবা, বাইরের দিকে হ'লেই ভাল হয়, পুজো-আচ্চা সাধন-ভাজন নিয়ে থাকি আমি—

সৌভাগ্যক্রমে বাহিরের দিকে একটি ঘর খালি ছিল। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি নিজের জিনিসপত্রসহ সেই ঘরেই গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আমি সম্ভ্রমসহকারে সমস্ত দিনটা দূরে দূরেই কাটাইলাম।

ভদ্রতা রক্ষার নিমিত্ত একবার তাঁহার ঘরটিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দামোদরবাবু বলিলেন (এবং তাঁহার ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুইটি দেখিয়া বুঝিলাম),

ট্রেনে সমস্ত রাত চোখের পাতা এক করতে পারি নি। চারটি খেয়ে ঘুমুতে হবে, স্নানটা সেরে ফেলা যাক ; সন্ধ্যাবেলা সব কথা হবে।

স্নানাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

শুনিলাম, স্নানান্তে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আহ্নিকাদি করিয়াছেন। এই বার্তায় গৃহিণী গদগদ হইয়া গঙ্গাজলে তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদি পাক করাইলেন, এবং সিন্দুক খুলিয়া শ্বেত পাথরের থালা বাটি গ্লাস বাহির করিয়া গঙ্গোদকে সেগুলিকে পরিমার্জিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, আমাদের ম্লেচ্ছস্পর্শদুষ্ট তৈজসপত্রে দামোদরবাবুর মত নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণকে খাইতে দিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও সে কথার সমর্থন করিলাম।

গৃহিণীর ধর্মানুমোদিত ব্যবস্থায় ও তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে আহারাদিও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। দামোদরবাবু আতপ-তণ্ডুল, গব্য-ঘৃত এবং নিরামিষ আহার করিয়া হরীতকী চিবাইতে চিবাইতে নির্দিষ্ট বাহিরের ঘরটিতে চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত দিন আপন মহিমা লইয়া উক্ত ঘরটিতেই নিবদ্ধ রহিলেন।

অর্থাৎ দিনটা একরূপ ভালয় ভালয় কাটিল।

সন্ধ্যা হইল।

পৌত্রের নিকট খবর পাইলাম, দামোদরবাবু নাকি মহাসমারোহে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। ভৃত্য ভূতনাথ জলখাবার লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পূজারত দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

দারুণ ব্যাপার !

আর একটু পরে খবর লইয়া জানিলাম, তিনি সান্ধ্যকৃত্যাদি সমাপন করিয়াছেন। কি কথা বলিবার জন্য তিনি এতদূর কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কোন আভাস তো এখনও পাইলাম না। ভাবিলাম, যাই, নিজেই গিয়া একবার খোঁজ-খবরটা লইয়া আসি।

গিয়া দেখিলাম, কপাট বন্ধ।

অত্যন্ত সমীহভরে একবার গলা-খাঁকারি দিলাম।

কোনও শব্দ নাই।

দ্বার অর্গলবদ্ধ নাকি ?

ঠেলিয়া দেখিতে গিয়া কপাটটা খুলিয়া গেল এবং চোখে পড়িল, তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া মুছিয়া দামোদরবাবু কাচের গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখিতেছেন। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই তিনি সস্মিত মুখে সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, এস, দাদা, এস।

এরূপ সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বোধনে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

সকালে 'বাবা' ছিলাম, সন্ধ্যাবেলায় কি করিয়া 'দাদা' হইয়া গেলাম—চিন্তা করিতে গিয়া নিকটেই টুলের উপর ছোট বোতলটি নজরে পড়িল এবং অচিরাৎ চিন্তামুক্ত হইলাম।

ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল যেন।

আরও আনন্দিত হইলাম এই দেখিয়া যে, তিনি সেই সনাতন অজুহাতটির দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন অনুসারেই খেতে হচ্ছে ভায়া এই অখাদ্যগুলো। উপায় কি!

সত্যই উপায় নাই। আমরাও এককালে বলিতাম। ঠিক মিলিয়া যাইতেছে।

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, যাক, স্ব-গোত্রই তাহা হইলে এবং প্রকৃতই আত্মীয়।

অনার্থক এতক্ষণ ঘামিয়া মরিতেছিলাম!

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরাদস্তুর জমিয়া উঠিল।

এমন কি, গোপনে তাঁহার জন্য পেঁয়াজি-বড়া, কাটলেট প্রভৃতিও আনাইয়া দিতে হইল, এবং বহুকাল পরে দুই-চারি ঢোক পান করিয়া আমিও বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ডাক্তারী ব্যবস্থার গুণে দামোদরবাবু অন্তরের সমস্ত দ্বারগুলি একে একে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন।

দেখিলাম, হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। আমার সহিত দামোদরবাবুর কোন তফাতই নাই।

অকস্মাৎ দামোদরবাবু আমার হাত দুইটি ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন যে, ঋণে তাঁহার মাথার চুল পর্যন্ত বিকাইয়া গিয়াছে এবং এখনও বিবাহযোগ্যা দুইটি অনূঢ়া কন্যা তাঁহার মাথার উপর খড়্গের মত ঝুলিতেছে। আমার নিকট তিনি আসিয়াছেন কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য। যদি আমি দয়া করিয়া—

আর তিনি বলিতে পারিলেন না।

আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কাল দামোদরবাবু চলিয়া গিয়াছেন।

অত্যন্ত বেদনাভরে তাঁহার কথা একান্তে বসিয়া স্মরণ করিতেছি। দামোদরবাবু যদি কোন যুবতী হইতেন, তাহা হইলে মর্মদর্শী কবিগণ হয়তো আমার এ বেদনাকে বিরহ-বেদনা নামে অভিহিত করিতেন। সত্যই দামোদরবাবুর বিরহে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতেছি। সত্যই তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য হইয়া মনকে প্রশ্ন করিতেছি, কেন?

যতক্ষণ তাঁহাকে নির্মলচরিত্র নিষ্ঠাবান নিখুঁত ব্যক্তি বলিয়া জানিয়াছিলাম ততক্ষণ সভয়ে তাঁহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতেছিলাম, কিন্তু যেই তাঁহাকে নেশাখোর ও দেনাগ্রস্ত বলিয়া জানিতে পারিলাম, অমনই তাঁহাকে ভাল লাগিয়া গেল। আশ্চর্য তো! নৈতিক আদর্শের দিক হইতে এরূপ মনোবৃত্তি মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে।

মন উত্তর দিতেছে—কিন্তু ইহাই সনাতন মনোবৃত্তি। আমরা মহৎকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভালবাসি তাহাকেই যাহার শত দোষ সম্বন্ধে আমরা সচেতন। যে কারণে স্ত্রীকে, পুত্রকে এবং নিজেকে বহু-দোস সত্ত্বেও ভালবাসি, ঠিক সেই একই কারণে দামোদরকেও ভালবাসিয়াছি। দোষ আছে বলিয়াই দামোদরের সহিত নিজের একত্ব ও আত্মীয়তা এত সত্যভাবে অনুভব করিতেছি। একই আমরা! নানা দোষে দুষ্ট—নির্মম প্রকৃতির তাড়নায় অসহায়—দুর্বার জীবন-স্রোতে বিপর্যস্ত। উভয়েই অসহায় বলিয়া পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই। বিগত ভূমিকম্পের সময়ে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, সভ্য-অসভ্য অত্যন্ত অসহায়ভাবে কয়েক দিনের জন্য নীল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া যে কারণে একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলাম, ঠিক সেই একই কারণে মদ্যপায়ী দেনাগ্রস্ত আমি, মদ্যপায়ী দেনাগ্রস্ত দামোদরের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। এখন তাহার সত্যমূর্তি দেখিতে পাইয়াছি। মিথ্যা জনশ্রুতির কুজ্ঝটিকা যেন চিরপরিচিত বটগাছটাকে কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যে পরিণত করিয়াছিল। কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে, বটগাছটার সনাতন রূপ দর্শন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছি। দামোদর এতদিন নামেই আত্মীয় ছিল, এইবার সত্য সত্যই তাহার আত্মার আভাস পাইয়াছি।

মনের যুক্তির উত্তরে কি বলিব মাথায় আসিল না।

এখন ভাবিতেছি, দামোদরকে কি উপায়ে কিছু অর্থ-সাহায্য করা যায়! তাহাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া বিদায় করিয়াছি। ভাগ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ, ছুটি ছিল। তাহাকে বলিয়াছি যে, ব্যাঙ্ক খুলিলেই টাকা বাহির করিয়া কিছু তাহাকে পাঠাইয়া দিব।

হায়, দামোদর আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের খবর যদি রাখিত! অকপটে তাহার নিকট স্বীকার করিলেই চুকিয়া যাইত। কিন্তু কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হইল—পারিলাম না। আহা, বেচারী এত আশা করিয়া আসিয়াছে! ধার করিয়াও দিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রেস্‌টিজ! প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া দেখিতেছি উপায় নাই। সে সম্প্রতি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বাবদ কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ইচ্ছা করিলে কিছু দিতে পারে। কিন্তু সরল সত্য কথাটি বলিলে সে এক পয়সাও দিবে না। তাহাকে তো চিনি!

কি জাতীয় মিথ্যা গল্প রচনা করিলে প্রাণকান্তের মন বিগলিত করিতে পারিব—ব্যাকুল অন্তরে তাহাই চিন্তা করিতেছি। দামোদরের অশ্রুভারাক্রান্ত ড্যাবডেবে চোখ দুইটা বারম্বার মনে পড়িতেছে।

শরীর, মন ও মানুষ

কান কটকট করিতেছে।

মনে হইতেছে, গত রাত্রির দুষ্কৃতির জন্য কোন অদৃশ্য গুরুমহাশয় যেন নির্মমভাবে কানটিকে মলিয়া দিতেছে। অন্তরাত্মা অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। গত রাত্রের দুষ্কৃতিটি কি, তাহা বলিতেছি। বেশ বুঝিতে পারিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অভিমত প্রকাশ করিবেন যে—আমার দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল, যে শাস্তি আমি ভোগ করিতেছি তাহা ন্যায্য এবং অপরাধের উপযুক্ত। এইটুকু শুধু আশা যে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বিজ্ঞ নহেন। অভিজ্ঞগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং সহানুভূতি মিলিলেও মিলিতে পারে।

গতকল্য সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গ্রামপ্রান্তের নদীতীরে গিয়া উপবেশন করিয়াছিলাম। অনেক দিন বাড়ি হইতে বাহির হই নাই—নদীতীর বড় ভাল লাগিল। আবাল্যপরিচিত এই নদীই মনে অবর্ণনীয় মোহ-সঞ্চার করিয়া

বসিল। অনেকক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অস্তমান সূর্য, উদীয়মান চন্দ্র, শুভ্র বালুকাময় তটভূমি, শীর্ণকায়া নদীটির স্বচ্ছ তরল তরঙ্গ-ভঙ্গিমা, ঘনায়মান অন্ধকার—সকলে যেন আমাকে পাইয়া বসিল, উঠিতে দিল না। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কেন বসিয়া রহিলাম, কি লাভ হইল—এ সব লইয়া বাগ্‌বিন্যাস করা বৃথা। আসল কথা, মন বলিল—বসিয়া থাক, আমিও বাধ্য বালকের মত সশরীরে বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভরিয়া উঠিয়াছে। সহসা নজরে পড়িল জ্যোৎস্নামণ্ডিত নদীস্রোতে একটি শ্বেতকমল ভাসিয়া আসিতেছে। সুন্দর ফুলটি। জলের কাছেই বসিয়া ছিলাম। লাঠিটা বাড়াইয়া ফুলটিকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। হঠাৎ কেমন যেন ঝোঁক চাপিয়া গেল, ফুলটাকে লইতে হইবে। জুতা খুলিয়া জলে নামিলাম, হাঁটু-জল পর্যন্ত আগাইয়া গেলাম, ফুল তবু কিন্তু নাগালের মধ্যে আসিল না। আরও খানিকটা গিয়া লাঠিটা বাড়াইলাম। ঠিক কি ঘটিল জানি না, সম্ভবত শরীরের ভারকেন্দ্রেই কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিয়া থাকিবে, টাল সামলাইতে পারিলাম না, পড়িয়া গেলাম। কাপড়-জামা তো ভিজিলই, কর্ণকুহরেও জলবিন্দু প্রবেশ করিল। সেই বিন্দু এখন সিন্ধুপ্রমাণ হইয়া আমার সমস্ত সত্তাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

বলা বাহুল্য, গৃহিণীর নিকট সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত চাপিয়া গিয়াছি। নদীতীর হইতে সিধা প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের বাড়িতে গিয়া পরিচ্ছদাদি পরিবর্তন করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছি। প্রাণকান্ত ব্যাপারটা জানে।

যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে এখন চিন্তা করিতেছি যে, এই অশক্ত শরীরের সঙ্গে অত্যুৎসাহী বালক-স্বভাব মনের এই সংযোগ কেন? এ সংযোগ না ঘটিলে তো এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না!

শরীরের সহিত মনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই ঘনিষ্ঠতা বিস্ময়কর। উভয়ের মধ্যে মিল তো কিছুই নাই, বরং অমিলই বেশি। একের ধর্ম রুচি আচরণ অপরের ধর্ম রুচি ও আচরণের বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

দেহ জড়ধর্মী। তামসিক প্রকৃতি তাহার মজ্জাগত। মনের আধ্যাত্মিক

বিলাসের কথা দূরে থাক্, রাজসিক বিলাসও শরীর বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া মন ইন্দ্রিয়াতীত লোকে বিহার করিতে চায়, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রধান বাধা। দেহ বস্তুসর্বস্ব স্থূল, সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর। মন সূক্ষ্মমর্মী, অতীন্দ্রিয়বিলাসী, অমৃতকামী। স্বপ্ন-সরণির পথিক সে। অতি-বাস্তব এই দেহটা সে পথে তাহার সঙ্গী হইতে পারে না। কানে এক ফোঁটা জল ঢুকিলেই সে কাবু হইয়া পড়ে। মনের বিলাস-প্রেরণার সহিত পাল্লা দিবার ক্ষমতা দেহের নাই। চির-উৎসুক চির-কৌতূহলী চির-ঊর্ধ্বগ মনের সহিত মাধ্যাকর্ষণ-ক্লিষ্ট স্থূল স্থবির দেহটা কিছুতেই নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে না। শরীর ও মনের এই শোচনীয় দ্বন্দ্বের নিদর্শন আমরা হিমালয়-অভিযানে, উত্তরমেরু-আবিষ্কারে, বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে, ভগ্নস্বাস্থ্য লেখকের সকরুণ মুখচ্ছবিতে দেখিতে পাই। অর্থাৎ দেখিতে পাই যে, কল্পনাবিলাসী মন আপন আদর্শের যূপকাষ্ঠে দেহটাকে বলিদান দিতেছে।

মানুষের মন কবে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছে, দেহটা আজও সেখানে পৌঁছিতে পারিল না। যদি কোন দিন পৌঁছিতেও পারে, গিয়া দেখিবে—মন সেখানে নাই, সে ঊর্ধ্বতর কোন লোকে গিয়া বসিয়া আছে। গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় নীহারিকা-মণ্ডলীর অজাত জ্যোতির্বাষ্পে অসীম ঔৎসুক্যভরে মন সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে: মনের এই অনন্ত পর্যটনের সঙ্গী হওয়া দেহের পক্ষে অসম্ভব।

কারণ উভয়ে ভিন্নধর্মী।

সহজভাবেই দেখুন না, দেহের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন খাদ্য। কিন্তু মনের পুষ্টির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অখাদ্য, অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান,—চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় কোন পর্যায়েই পড়ে না। শরীরের পক্ষে উপযোগী টাটকা জিনিস, কিন্তু মনের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। বরং বিপরীত নিয়মটাই মনের পক্ষে প্রযোজ্য। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব যত বাসী অর্থাৎ পুরাতন হইবে ততই তাহা মনের পক্ষে উপকারী। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত অধিকাংশ জিনিসই মনের পথ্য হয় না। এ বিষয়ে মন কুম্ভীর-প্রকৃতির—প্রাচীন পচা জিনিসেই তাহার পুষ্টি ও তৃপ্তি। টাটকা তত্ত্ব বা তথ্য সে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে বটে, কিন্তু সে নির্ভর করে পুরাতনের উপর। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও

ইহা সত্য। বন্ধুত্ব বলুন, প্রেম বলুন, যত বাসী হইবে ততই মূল্যবান। 'ভালবাসি' কথাটাই হয়তো মনের এই বাসী-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনের সহিত শরীরের অমিল যথেষ্ট। অথচ এই দুই অসদৃশ বস্তু (মনকে বস্তু বলা যায় কি না জানি না) পরস্পর নির্ভরশীল।

চমকাইয়া উঠিলাম।

মস্তকে কে খানিকটা জল ছিটাইয়া দিল।

গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা! গৃহিণী তাঁহার দৈনন্দিন পূজা সমাধা করিয়া চতুর্দিকে গঙ্গাজল ছিটাইতেছেন। রসিকতা করিয়া কিছু বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—

গেল—গেল—গেল—হ-উ-স্—বড়িগুলোতে মুখ দিলে কাগে আঃ, মুখপোড়া কাগের জ্বালায় পাগল হলাম যে গা! ভূতো, তুই কি চোখের মাথা খেগেছিস না কি?—চর্বি আন্দোলিত করিয়া বায়সের উদ্দেশ্যে গৃহিণী প্রধাবিত হইলেন। আমি মাথাটা কোঁচার খুঁটে মুছিয়া ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমার ন্যায় সংশয়ী, দার্শনিকতাপ্রবণ ব্যক্তিটির সহিত যে বিধাতা এই মেদবহুলা, ভক্তিগর্ভা বড়িপরায়ণা রমণীটির মিলন সংঘটিত করিয়াছেন, জড়ধর্মী শরীরের মধ্যে প্রেরণাধর্মী মনঃসংযোগ সম্ভবত তাঁহারই কীর্তি।

নাতিনী আসিয়া দেখা দিলেন।

দাদামশাই, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুলটি!

দেখিলাম। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম, হয়তো কোন বিলাতী মরসুমী ফুল। কিন্তু কি চমৎকার! কালোর উপর সাদা সাদা ফোঁটা—অপরূপ!

বলিলাম, খাসা ফুল তো! এস, খোঁপায় গুঁজে দি তোমার।

খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া নাতিনী চলিয়া গেলেন।

আমার মনে নূতন আলোকপাত হইল।

সর্ববিষয়েই দেখিতেছি, পরস্পরবিরোধী দুইটি বস্তুর সংযোগ সাধন করাই যেন বিধাতার লক্ষ্য। ভাব ও ভাষা, কবিতা ও ছন্দ, জীবন ও মৃত্যু, জল ও স্থল প্রভৃতি বহু বিপরীতধর্মী জিনিসকে একত্রে গ্রথিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, উভয়ের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

এরূপ না করিলে হয়তো সৃষ্টির সমতা রক্ষা হইত না—হ্রস্ব-দীর্ঘের সুনিপুণ সম্মিলন না ঘটাইলে হয়তো তাঁহার এই মহাকাব্যের ছন্দ-পতন হইত। যতই

চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই স্পষ্টতর হইতে লাগিল, পরস্পরবিরোধী শক্তির মিলনই সম্মিলন—সার্থক মিলন।

এই মিলনের ফলেই জড়তা চাঞ্চল্য অনুভব করে এবং অতিচঞ্চল প্রশমিত হয়। সংসার-বিরাগী শিবকে বন্দী করে উমার বাহুপাশ, এবং মায়াময়ী উমাকে ভূমা-উন্মুখ করেন শ্মশানবিলাসী শিব। সহসা যেন বুঝিতে পারিলাম, পরস্পরবিরোধী শক্তির মিলনই সৌন্দর্যের উৎস। আলোক অন্ধকারের মিলন-মহিমাই সন্ধ্যা-উষার বর্ণ-বৈচিত্র্য, বায়বীয় পুষ্পসুরভি বৃন্ত-বন্দিনী পুষ্পকলিকার মর্মবাণী, বিপরীতধর্মী দুই বিদ্যুৎ-প্রবাহের সমন্বয়ই বিদ্যুৎ-লীলা। শরীর ও মন, স্বামী-স্ত্রী···

চিন্তাস্রোত পুনরায় ব্যাহত হইল।

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আসিয়াই তিনি অতিশয় বস্তুতান্ত্রিক একটি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, ওহে, তোমার নাতির বিয়ে কি বুড়ির সঙ্গেই দেবে না কি ? মেয়েটি কিন্তু কুচকুচে কালো—একেবারে ইথিওপ, তা ব'লে রাখছি।

অবিচলিতকণ্ঠে বলিলাম, কালো ব'লেই দেব।

মানে ?

মানে, নাতি আমার ফরসা—রাধাকৃষ্ণের মিলনই আদর্শ মিলন।

বিপরীতধর্মী দুই বস্তুর মিলন যে কিরূপ হৃদয়গ্রাহী এবং কিরূপে তাহা সৃষ্টির সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিধাতার অভিপ্রায়কে সার্থক করিয়া তুলিতেছে, ওজস্বিনী ভাষায় তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রাণকান্ত কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, আমার বিশ্বাস, কান দিয়া জল তোমার মস্তকের ভিতরেও ঢুকিয়াছে। তাহা না হইলে ইহা বোঝা তোমার পক্ষে মোটেই শক্ত হইত না যে, বিধাতার অভিপ্রায় অনুসারে না চলাই মনুষ্যত্ব। মৃত্যু বিধাতার বিধান, মানুষ অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে। বিধাতা মানুষকে ডানা দেন নাই, মানুষ আকাশে উড়িতেছে। বিধাতা মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেন দিয়াছেন তিনিই জানেন, কিন্তু মানুষ তাঁহার সে নির্দেশকে অগ্রাহ্য করিয়া টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, রেডিও বানাইয়া বসিয়াছে। নারীমাত্রেরই গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবার ক্ষমতা ও প্রবণতা পুরুষমাত্রকেই দিয়াছেন, কিন্তু সে ইচ্ছা

যাহারা চরিতার্থ করিতে চায়, আমরা তাহাদের মানুষ বলি না—জানোয়ার বলি। বিধাতার বিধানের বিপরীত বিধানই মানুষের পক্ষে শোভন ; সুতরাং তোমার যুক্তিকে সত্য বলিয়া ধরিলে তোমার নাতির জন্য ফরসা মেয়েই দেখিতে হয়। বুড়ি অবশ্য আমার ভাইঝি এবং আমাকেই তাহার বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমার একটা বাজে যুক্তির আমি সমর্থন করিতে পারি না।

ব্যথিত কর্ণমূলে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, প্রাণকান্তও বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী

গভীর অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিতেছিলাম।

সাহিত্য-চর্চা যখন করি, তখন বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে চিন্তিত না হইয়া উপায় নাই। সুতরাং চিন্তা করিতেছিলাম। চিন্তা করিতেছিলাম, প্রবন্ধ না লিখিয়া বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসব কি অন্য কোন সদুপায়ে সুসম্পন্ন করা যায় না? বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া বাগ্‌বিস্তার করিতেই হইবে? ভাগীরথীর সলিল বিশ্লেষণ করিয়া ভগীরথের মাহাত্ম্য-কীর্তন!—কেমন যেন মনঃপূত হইতেছে না। বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া লাভ কি? যাঁহারা সাহিত্য-রসিক তাঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্যরস পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন অথবা হইবেন। প্রবন্ধ-রূপ ফিডিং-বট্‌লের তাঁহাদের কোন প্রয়োজনই নাই। আর যাঁহারা সাহিত্য-রসিক নহেন, সত্যকার রসবোধ যাঁহাদের নাই, প্রবন্ধ গিলাইয়া তাঁহাদের সুরসিক করিয়া তোলা অসম্ভব। অন্ধকে হাত ধরিয়া মনুমেণ্টের উপর চড়াইয়া দিলেই তাহার দৃষ্টি দিগন্তপ্রসারী হইয়া উঠে না। অরসিক পাঠক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ গলাধঃকরণ করিয়া সাধারণ দর্শকের মনে আতঙ্ক অথবা বিস্ময় সঞ্চার করিতে পারে বটে, কিন্তু দ্রষ্টাকে প্রতারিত করিতে পারেন না, কিন্তু বিব্রত করিতে পারেন। চতুর্দিকে পাণ্ডিত্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। সাহিত্য-কানন ইডেন গার্ডেন না হইয়া কিচেন-গার্ডেন হইয়া উঠিয়াছে। রসিকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতিথি-উৎসবে আর লাউ, কচু, কুমড়া, কদলী আমদানি করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।

প্রতিভাবান প্রবন্ধ-লেখককে ভয় করি না। ভয় করি প্রবন্ধ-আস্ফালককে। কোন মনীষী-ময়ূরের পক্ষে দুই-চারিটি প্রবন্ধ-পালক ত্যাগ করা অসম্ভব অথবা অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু পুরাতন সেই গল্পটি মনে উদিত হইলে স্বতই বলিতে ইচ্ছা করে—হে ময়ূরগণ, ভগবৎপ্রসাদে তোমরা নয়নরঞ্জন পালকের অধিকারী হইয়াছ স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, তোমরা ইচ্ছা করিলেই দুই-চারিটি পালক ছাড়িতেও পার, কিন্তু দোহাই তোমাদের, যেখানে-সেখানে এবং যখন-তখন পালক মোচন করিও না; কারণ পৃথিবীতে দাঁড়কাক আছে!

আর একটা কথাও বিবেচ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ-বাজি অথচা গলা-বাজি করিলে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা নিজেকেই কি বেশি জাহির করা হয় না? যেমন দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি বৎসর হাক পোদ্দার কাড়া-নাকাড়া-দামামা পিটাইয়া আত্মঘোষণা করেন, দেশসেবা উপলক্ষ্যে যেমন খ্যাত অখ্যাত খদ্দরধারী কত আত্ম-প্রচারক নানা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া সনির্ঘোষে নিজেদের ও দেশসুদ্ধ লোককে ঘর্মাক্ত করিয়া তোলেন, ক-বাবুর ছেলের বিবাহ উপলক্ষ্যে অথবা খ-বাবুর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে খাইতে গিয়া গ-বাবুর পত্নী অথবা ঘ-বাবুর কন্যা যেমন নিজেদের বস্ত্র অলঙ্কার রূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া বেড়ান—আমরাও কি সেইরূপ বঙ্কিমের জন্মতিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেদের নিজেদের বিদ্যা-আস্ফালন করিতে থাকিব?

অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, থাকিব—আলবৎ থাকিব। সাহিত্য-চর্চা করি বলিয়া আমরা মনুষ্যধর্মচ্যুত হই নাই। মনুষ্যোচিত সমস্ত দুর্বলতা আমাদের আছে এবং আমরা এ সুযোগ কিছুতেই উপেক্ষা করিব না। করিবার হেতু কি থাকিতে পারে? মন কিন্তু বলিতে লাগিল, আর যাই কর, প্রবন্ধ লিখিও না। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মনিশীথে ছাদের উপর বসিয়া নানা রঙের বড় বড় ফানুস ছাড়। অন্ধকার মহাশূন্যে লাল, নীল, পীত, হরিৎ—নানা বর্ণের এক শত ফানুস সারি সারি উড়াইয়া দাও। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া অন্ধকারের বক্ষে আলোর আলিপনা আঁকো। আলো কিছুক্ষণ পরে নিবিয়া যাইবে। তোমার প্রবন্ধই কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে? আজিকার দিন পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করিবার দিন নয়, সকলে মিলিয়া আনন্দ-প্রকাশ কর। রোমে যেমন কার্নিভাল উৎসব হইত, তেমনই একটা উৎসবের অনুষ্ঠান কর না

কেন? বহুবর্ণ বিচিত্রিত পরিচ্ছেদে মাংসময় দেহটাকে আবৃত করিয়া কৃত্রিম ছদ্মবেশে নিজেদের কৃত্রিমতার ঝুঁটা ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া আজ রাজপথে বাহির হইয়া পড়। সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়ুক, সমস্ত বাধা সরিয়া যাক। মহানন্দে আজ সকলে উৎসবে মাতিয়া উঠ। হেদুয়া পুষ্করিণীর জল তুলিয়া ফেলিয়া রক্তের মত গাঢ় লাল রঙে তাহা পরিপূর্ণ কর। এমন দিনে আষাঢ় মাসে হোলি খেলিলেও অশোভন হইবে না। গোলদীঘিতেই বা জল থাকিবার প্রয়োজন কি? উৎকৃষ্ট সুরায় তাহা কানায় কানায় ভরিয়া দাও। পার্কে পার্কে রূপের হাট বসিয়া যাক, মাঠ ঘাট বাট আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া, বক্তৃতা নয়—একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন কর। দেশের সমস্ত আবর্জনা স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দাও। লকলকায়িত অনলশিখা গগনস্পর্শী হইয়া উঠুক। তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ। প্রবন্ধ লিখিয়া কি হইবে?

উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পড়িল।

দ্বারপ্রান্তে একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা দিল। শীর্ণকান্তি প্রৌঢ় একটি ব্রাহ্মণ। পরিধানে অর্ধমলিন বস্ত্র, পায়ে ধূলিধূসরিত চটি, হস্তে থেলো হুঁকা। নগ্নগাত্রে শুভ্র উপবীত গুচ্ছ শোভা পাইতেছে। কোটরগত চক্ষু দুইটি উন্মীলিত, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন নহে। কেমন যেন তন্দ্রাতুর—স্বপ্নাচ্ছন্ন।

যদি অনুমতি করেন প্রবেশ করি।

আসুন আসুন, বসুন। কি চান আপনি?

ব্রাহ্মণ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, দেখুন, চাহিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। সরলভাবে আজকাল কেহ কিছু চাহে না, সরলভাবে কেহ কিছু দেয়ও না। বর্তমান কালে প্রার্থী মানেই ভেকধারী, দাতা মানেই নির্বোধ। দাতা-গ্রহীতার মধুর সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সে দিন আর নাই, যখন দাতা দান করিয়া ধন্য হইত এবং গ্রহীতা দান গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিত এবং উভয়েই তাহা সরলভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং আজকাল প্রকৃত প্রয়োজন থাকিলেও চাহিতে ভরসা হয় না।

সঙ্কোচভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তো—

মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন থাকে। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই পরের প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থ, সুযোগ অথবা সহৃদয়তা থাকে না। বর্তমানে আমার যাহা

প্রয়োজন, তাহা আধ্যাত্মিক নহে, নিতান্তই আধিভৌতিক। সেই জন্য ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হইতেছি অর্থাৎ আমি কিছু অর্থ-সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ বলিয়া চলিলেন, আপনার আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করিলেও করিতে পারেন। প্রথমেই আপনাকে জানাইয়া দিতেছি যে, আমি নিজের জন্য কখনও কাহারও নিকট অর্থ ভিক্ষা করি নাই, আজও করিতেছি না। আজ আপনারা বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসব করিতেছেন। আমিও আজ সেই উৎসব করিব। কিন্তু আমি নিজের মত করিয়া করিব।

উৎসাহিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি রকম?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি বিবাহ ও একটি ভোজ আমি দিতে চাই। আপনারা যেভাবে উৎসব করিতেছেন, তাহা আমার মনঃপূত হইতেছে না! কিন্তু আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার কল্পনা আছে, অর্থ নাই। আপনারা যদি সাহায্য করেন, আমার কল্পনাকে রূপ দিতে পারি।

লোকটা পাগল নয় তো!

প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না, বিবাহ? কাহার বিবাহ?

ফুলের বিবাহ। সত্য সত্যই আজ মহাসমারোহে মল্লিকার সহিত গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। আপনারা কি দেখিতে পান না—আজকাল শত শত মল্লিকা ফুটিয়া ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, শত শত গোলাপ বিশুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে? তাহাদের বিবাহ আজকাল আর হয় না। হইবার উপায় নাই। বঙ্কিমের জন্মতিথি-উৎসবে আমি মহাসমারোহে একটি মল্লিকার সহিত একটি গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। কিন্তু তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেকালে মল্লিকার সহিত গোলাপের বিবাহ দিতে গেলে বিশেষ কিছু খরচ হইত না। ভ্রমর ঘটকালি করিত, উচ্চিঙ্গড়া নহবত বাজাইত, মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইত, খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিত, আকাশে তারাবাজি হইত, কোকিল আগে আগে ফুকরাইত। সর্বশেষে একখানি কোমল হস্ত তাহাদের তুলিয়া লইয়া এক সূত্রে এক মালায় গাঁথিয়া দিত। কিন্তু এখন সে সব দিন আর নাই। ভ্রমর, উচ্চিঙ্গড়া, মৌমাছি, খদ্যোত, কোকিলরা মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পায় না। চারিদিকে পাকা বাড়ি, পাকা রাস্তা, চতুর্দিক প্রস্তরময়। সব শান-বাঁধানো—এতটুকু ঘাস গজাইবার উপায় নাই। সমগ্র সভ্যসমাজ মৃত্তিকাহীন।

মল্লিকা ও গোলাপ বহু স্থানে টব আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। আজিকার দিনে মল্লিকার সহিত তাই গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। তাহাদের বড় দুঃখ। উৎসবের দিনে দুঃখীরাই যদি সুখ না পাইল, তবে কিসের উৎসব? শহরের যত আলো ও যত বাজনা আছে, সমস্ত একদিনের জন্য ভাড়া করিয়া একটি মল্লিকার সহিত একটি গোলাপের বিবাহ দিয়া আজিকার উৎসব সার্থক করিতে চাই। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন?

আমার মুখে কথা সরিতেছিল না।

পরস্পরের দিকে চাহিয়া উভয়েই কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলাম। বাক্যস্ফূর্তি হইলে প্রশ্ন করিলাম, ভোজ দিবেন কি বিবাহ উপলক্ষ্যেই?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, না। বিড়াল-ভোজন করাইব।

বিড়াল-ভোজন!

হাঁ, বিড়াল-ভোজন। "বিড়ালদেরও আজকাল বড় দুঃখের দিন আসিয়াছে। তাহাদের সকরুণ মেও-মেও ধ্বনি কি শুনিতে পান না? শুনিতে পান না কি—তাহারা দিবারাত্রি বলিতেছে, আমাদের দশা দেখ! আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও—মেও। খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্যে মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও-মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যে দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।" বুভুক্ষু বিড়ালদের এ ক্রন্দন শুনিতে পান না কি? দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট বিড়ালদের সংখ্যা আজকাল খুব বাড়িয়াছে। আজিকার এই উৎসবের দিনে—অন্তত একটা দিনের জন্যও—প্রাণ ভরিয়া তাহাদের খাওয়াইতে চাই। কিন্তু আমি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ। আপনারা যদি অর্থ সাহায্য করেন, তবেই আমার বাসনা চরিতার্থ হয়। আজ আপনারা সকলে হুজুগে

মাতিয়াছেন, সেই জন্ত ভরসা হইতেছে যে উপযুক্ত স্থানে নিবেদন করিলে হয়তো আমার আশা ফলবতী হইতে পারে। কারণ হুজুকে না মাতিলে বাঙালী কিছুই করে না। আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। কিছু সাহায্য করিবেন কি ?

বলিলাম, আপনার প্রস্তাব খুবই উত্তম। কিন্তু আমার একার সাধ্যে কুলাইবে না। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি সংগ্রহ করিতে পারি।

ব্রাহ্মণ উঠিয়া পড়িলেন।

ভাল কথা, আমিও আরও কয়েক স্থানে চেষ্টা করিয়া দেখি।—এই বলিয়া তিনি গমনোন্মুখ হইলেন।

প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না, আপনার নামটা জানিতে পারি কি ?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

পর-মুহূর্তেই দ্বারপথে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আমি বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

দড়াম করিয়া শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম।

জানালাটা সশব্দে খুলিয়া গেল।

বাতায়ন-পথে দেখিলাম, আষাঢ়-গগনে মহিমময় মেঘসমারোহ। বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। খরবেগে বাতাস বহিতেছে। ঠিক এক শত বৎসর পূর্বে আষাঢ় মাসের এমনই এক রজনীতে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতকার লিখিতেছেন—সেদিন আকাশ নির্মল ছিল। ছিল কি ?

ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আমার যে কলিক হইয়াছিল তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন, ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার পর ঘুম হয়েছিল ?

না, ঘুম হয়নি। তবে ব্যথাটা আর নেই।

মর্ফিয়া নিয়েও ঘুম হ'ল না আপনার ? আশ্চর্য তো ! আচ্ছা, এই ওষুধটা খাবেন তা হ'লে।

প্রেসক্রপ্‌শন লিখিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মর্ফিয়া !

তীক্ষ্ণ সূচিমুখে কমলাকান্তের প্রেতাত্মা শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন বুঝিলাম।

একটু পরে নাতি আসিলেন।

খান-দুই বাঁধানো বই আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, এখানকার লাইব্রেরিতে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী সব নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে এইগুলো পেদুম। প্রবন্ধগুলো একেবারে নেই।

আমি এককালে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত পুস্তকই খরিদ করিয়াছিলাম। কে কোথায় লইয়া গিয়াছে, বাড়িতে এখন একখানাও নাই। নাতিকে সেজন্য স্থানীয় পাঠাগারে পাঠাইয়াছিলাম।

নাতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভূতে বিশ্বাস করিস ?

হঠাৎ ভূতের কথা কেন ?

বল্ না, করিস কি না ?

নিশ্চয়ই না।

সেইজন্যেই তোদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

একটু হাসিয়া নাতি ভিতরে চলিয়া গেল।

বসুমতী-সংস্করণের কীটদষ্ট পীতাভ পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য, মাত্র এক শত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ—

শুইয়া শুইয়া 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িতেছিলাম।

"সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল, নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল, কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল, গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্ধব্যক্ত কেকার অপরার্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্য-বীথিকায় দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল, সিংহাসন হইতে শালগ্রাম-শিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনা রোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢতর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেব-মন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কূলতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার…"

পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

স্বপ্নে আবার কমলাকান্ত আসিয়া দেখা দিলেন। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। বলিলেন, আমার অত টাকার আর প্রয়োজন নাই। কোন রকমে গয়ার ভাড়াটা যোগাড় করিয়া দিতে পারেন?

কেন?

পিণ্ড দিব।

সে কি। কাহার?

সকলের। খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কেহ বাঁচিয়া নাই।

ঘুম ভাঙিয়া গেল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, ঘনকৃষ্ণ মেঘের স্তর ভেদ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উদিত হইতেছেন। আর্দ্র-ধরণী জ্যোৎস্না-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পত্রে পত্রে, তৃণে তৃণে, তরঙ্গে তরঙ্গে, সৌধশীর্ষে, কুটীর-প্রাঙ্গণে আলোকের জয়ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

"আমি আছি। সমস্ত মেঘ সত্ত্বেও আমি আছি।"

কে এ কথা বলিল?

আকাশবিহারী বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছেন।

অদ্ভুত অট্টহাস্য!

দেখিলাম, নিরুদ্ধ হাস্যবেগে তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে রজতসন্নিভ ধবলকান্তি রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তূপে আগুন লাগিয়াছে।

সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, এ তো চন্দ্র নহে—এ যে সূর্য!

অন্ধকার সরিয়া যাইতেছে।

সভয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলাম—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

* * *

ঠিক করিয়াছি, আফিম ধরিব।

বিবেক

॥ ১ ॥

দেখিতেছি এবং শুনিতেছি। চক্ষু কর্ণ এখনও বিকল হয় নাই। সুতরাং অনেক রকম দেখিতে ও শুনিতে হইতেছে। এই সকল দর্শন-শ্রবণের ফলে যাহা ঘটিতেছে, তাহাকে অঘটন আখ্যা দেওযাই সঙ্গত। অঘটন ঘটিতেছে, কারণ শুধু চক্ষু কর্ণ নহে, রসনা এবং দক্ষিণ হস্তখানিও এখনও সক্রিয় আছে। কিন্তু রসনা ও দক্ষিণ হস্তের উত্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেক চঞ্চল হইযা উঠিয়াছে। কারণ শুধু চক্ষু কর্ণ রসনা এবং হস্ত নহে, বিবেক নামক বস্তুটিও এখনও রীতিমত জাগ্রত রহিযাছে। মুশকিলে পড়িয়াছি।

সেদিন চক্ষু বলিল, দেখ দেখ, রামের গাছ হইতে শ্যাম জোর করিয়া আম পাড়িয়া লইযা সরিযা পড়িতেছে।

কর্ণ বলিল, শুধু তাহাই নহে, ওই শুন শ্যাম নিজেকেই সুদক্ষ বীর বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, এবং শ্যাম বড়লোক বলিয়া সকলে তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া জয়ধ্বনি দিতেছে।

রসনা চুলবুল এবং হাত নিশপিশ করিয়া উঠিল।

তর্জনী আস্ফালন করিয়া বিবেক কহিল, খবরদার, কিছু বলিও না বা করিও না। কেবল নীরবে দেখিয়া যাও এবং শুনিয়া যাও।

সবিনয়ে প্রশ্ন করিলাম, নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করিতে ক্ষতি কি?

বিবেক উত্তর দিল, মতামত কখনও নিরপেক্ষ হয় না। তোমার মতামত তোমার কাছে অথবা তোমার মত বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছে মূল্যবান হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীতে বিভিন্ন মতের এবং বিভিন্ন আদর্শের লোকের অসদ্ভাব নাই। তোমার মতামতের মানদণ্ডটি সাড়ম্বরে আস্ফালন করিলে তুমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষচারী কতকগুলি শত্রু সৃজন করিবে মাত্র। পৃথিবীতে শত্রু সৃজন করা লাভজনক নহে। সুতরাং রসনা ও হস্ত সংযত করিয়া কেবল দেখিয়া ও শুনিয়া যাও। ইহাই হিতবাক্য।

বলিলাম, বহির্জগতের উত্তেজনা অথবা অবসাদে উত্তেজিত অথবা অবসন্ন হওয়া জীবমাত্রেরই প্রাণধর্ম।

বিস্মৃত হইও না, তুমি সাধারণ জীব নহ—তুমি মনুষ্য।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ বাহ্যিক আন্দোলনে খামকা বিচলিত হওয়া প্রকৃত মনুষ্যের পক্ষে অকর্তব্য।

অবিচলিত পাষাণই কি তাহা হইলে মনুষ্যত্বের আদর্শ ?

কে বলিল, পাষাণ বিচলিত হয় না ? যে গাণিতিক নিয়মানুসারে পাষাণের আপাতস্থৈর্য দৃষ্টিগোচর করিতেছ, সেই গাণিতিক নিয়মানুসারেই পাষাণকেই অস্থির করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। পাষাণের উপর ক্রিয়াশীল শক্তির তাবতম্যের উপর তাহা নির্ভর করে। পাষাণ মনুষ্যত্বের আদর্শ নহে। স্বকীয় শক্তিবলে বিক্ষোভকারী শক্তির প্রতিরোধ করিয়া নির্বিকার থাকাই বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্তব্য।

নির্বিকার থাকিয়া লাভ কি ?

লাভ ? আধিভৌতিক লাভ কিছু নাই। শান্তি পাইবে। মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে তাহাই পরম কাম্য।

আধিভৌতিক শরীর ধারণ করিয়া আধিভৌতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করি। সুতরাং আধিভৌতিক লাভ ক্ষতি কি নিতান্ত অবহেলার বস্তু ?

অবহেলার বস্তু নহে, অশান্তিজনক। সেই জন্যই পরিত্যাজ্য।

পরিত্যাজ্য বস্তুমাত্রেই পরিত্যাগ করা সহজ নহে। আধিভৌতিক জগতের উত্তাপ ও শৈত্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে অহরহ অভিভূত করিতেছে। সুতরাং বরফ এবং অগ্নির সাহায্য না লইলে চলিবে কেন ?

সাহায্য লও, কিন্তু প্রয়োজনমত এবং নির্বিকারে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ বরফ অথবা অগ্নি লইয়া আতিশয্য করিও না। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়া প্রয়োজনমত তাহাদের সাহায্য লও। তাহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিবার আবশ্যকতা নাই।

রামের প্রতি শ্যামের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে উচিত কি অনুচিত তাহা সরল বাংলায় ব্যক্ত কর।

চলিত বাংলায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, চাপিয়া যাও।

কেন ?

রামের পক্ষ লইয়া শ্যামের বিরাগভাজন হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

আমি ন্যায়ের পক্ষ লইতে চাই।

ন্যায়শাস্ত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে হৃদয়ঙ্গম করিবে, ন্যায়-অন্যায়ের স্বরূপ সম্যক নির্ধারণ করা স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে অসম্ভব। উহা লইয়া অনর্থক মস্তিষ্ক আলোড়িত করিও না। স্বকীয় চরকায় নির্বিকারভাবে তৈলনিষেক করত শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা কর। রাম-শ্যামের মামলার নিষ্পত্তি তাহারা নিজেরাই করুক। ইহা লইয়া তোমার উত্তেজিত হইবার প্রয়োজন দেখি না।

প্রয়োজন নাই বুঝিলাম। কিন্তু আমি যে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছি। এখন উপায় কি ?

প্রশমিত হও।

বেখাপ্পা বিবেকের সহিত আর বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এই জন্যই বোধ হয় সাধারণ মানুষ একা থাকিতে পারে না। একা থাকিলেই বিবেকের সহিত মুখামুখি হইতে হয় এবং তাহা প্রায়ই সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ সংসারী পাপী তাপী মানুষের বিবেক দংশনোন্মুখ, এবং তাহার দংষ্ট্রা বড় তীক্ষ্ণ। এই জন্যই বোধ হয় অধিকাংশ লোক কাজে কর্মে আড্ডায় গল্পে গুজবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া নিজের বিবেকের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করে! একা থাকিলে বিবেক খুন করিয়া ফেলিবে।

রাম-শ্যাম-ঘটিত গল্পটি নিম্নলিখিত প্রকার।

রামবাবু আমাদের পাড়ার লোক। বেচারী ছাপোষা গরিব গৃহস্থ। কিন্তু তাঁহার আমগাছটির এ অঞ্চলে নাম আছে। বড় বড় আম, সুমিষ্ট, আঁশ নাই, অথচ পেট ভার করে না। রামবাবু প্রতি বৎসর আমগুলি বিক্রয় করিয়া থাকেন, এবং প্রতি বৎসর আমিই সেগুলি কিনিয়া থাকি। এবার শ্যামবাবুও ক্রেতারূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্যামবাবুর প্রস্তাবিত মূল্য কিন্তু রামবাবুর মনঃপূত হইল না এবং তিনি শ্যামবাবুকে আম্র বিক্রয় করিতে অসম্মত হইলেন। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে এ বৎসরও আমি আম্রগুলি পাইতে পারিব। কিন্তু অকস্মাৎ শ্যামবাবু পাঁচ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিবা-দ্বিপ্রহরে রামবাবুর সমস্ত আমগুলি পাড়াইয়া লইয়া গেলেন। শোনা কথা নয়, আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। দরিদ্র রামবাবুর বিপন্ন মুখচ্ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। ভীমদর্শন বরকন্দাজগুলার সগুম্ফ হমকিও দেখিতে পাইতেছি। নাঃ, ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে।

পথে যাইতে যাইতে প্রবীন দিগম্বর সিঙ্গির সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলিয়া বলিলাম।

শুনিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন, কপালে তর্জনী ঠেকাইলেন এবং সর্বশেষে হাত দুইটা উল্টাইয়া আকাশের দিকে চক্ষু দুইটি তুলিলেন। সিঙ্গি মহাশয় স্বল্পভাষী লোক। তাঁহার বক্তব্য সাধারণত তিনি ইঙ্গিত দ্বারাই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ইঙ্গিতগুলির দ্বারা তিনি ঠিক কি ব্যক্ত করিলেন, তাহা সম্যক প্রকারে না বুঝিলেও রামবাবুর প্রতি তিনি যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছেন তাহা বুঝিলাম। আর একটু গিয়াই ভট্টাচার্যের দর্শন পাইলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রামের গেজেট। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, শুনেছ ভায়া, মাগী সরেছে। আগেই বলেছিলাম, ও চিড়িয়া উড়বে—

প্রশ্ন করিলাম, কোন্ মাগী?

তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে হে! ওই তোমাদের মিস্ট্রেস—বালিকা-বিদ্যালয়ের বিদ্যেধরী—এখন নো ট্রেস। শাড়ির চটক দেখেই বুঝেছিলাম আগেই—

রাম-শ্যাম-সংবাদটিও ভট্টাচার্যের কর্ণগোচর করিলাম। ভট্টাচার্য বলিলেন, শ্যাম যে ও-রকম করবে তার আর বিচিত্র কি, মুখখানা দেখ নি ওর? ব্যাটা যেন রাঘব বোয়াল। রামবাবুকে বল, ঠুকে দিক এক নম্বর। হেবোকে বললেই সে সব ঠিক ক'রে দেবে। এ মগের মুলুক নয়, ইংরেজ রাজত্ব, ট্যাঁ-ফোঁ চলবে না, হেঁ-হেঁ, হেবোকে পাকড়াও গিয়ে।

প্রতিশ্রুতি দিলাম, প্রয়োজন হইলে সদ্য-পাস-করা উকিল ভট্টাচার্য-তনয় হাবুলেরই শরণাপন্ন হইতে রামবাবুকে প্ররোচিত করিব। ভট্টাচার্য উৎসাহ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের পর যথাক্রমে চানি ঘোষাল, সতু ঘোষ, হীরু মিত্তির, বীরু মুখুজ্জে, কাতু সরকার এবং ফড়িং মামার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল, এবং সকলের নিকটেই শ্যামবাবুর অমানুষিক অত্যাচারের কথা যথাশক্তি নিবেদন করিলাম। সকলেই নিজস্ব ধরনে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে থানার নিকটবর্তী হইয়াছিলাম। দারোগাবাবুর সহিত স্বল্প চেনাশোনাও ছিল। কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহার সহিতও এ বিষয়ে আলাপ করিলাম। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, আইন কাহারও খাতির করে না। রামবাবু যদি নালিশ করেন এবং শ্যামবাবু যদি দোষী সাব্যস্ত

হন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাজা হইয়া যাইবে। ধনী বলিয়াই তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন না।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

॥ ২ ॥

উপরোক্ত ঘটনার পর এক মাস অতীত হইয়াছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সংবাদগুলি প্রণিধানযোগ্য। বিনা মেঘে বজ্রপাত কথাটা নিতান্ত বাজে কথা নয়।

১। রামবাবুর সহিত শ্যামবাবুর হরিহর-আত্মা-জাতীয় মিলন সংঘটিত হইয়াছে।

২। পাঁচ হাজার টাকার দাবি করিয়া শ্যামবাবু আমার নামে মানহানির মকদ্দমা দায়ের করিবেন বলিয়া উকিলের চিঠি দিয়াছেন। হাবুলই উকিল।

৩। দিগম্বর সিঙ্গি, ভট্টাচার্য মহাশয়, চানি ঘোষাল, সতু ঘোষ, হীরু মিত্তির, বীরু মুখুজ্জে, কাতু সরকার, ফড়িং মামা এবং থানার দারোগা সত্যনিষ্ঠার খাতিরেই সম্ভবত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ইঙ্গিতপ্রবণ দিগম্বরই প্রধান সাক্ষী শুনিতেছি। রামবাবুও শুনিলাম বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সুস্থ-মস্তিষ্কে তাঁহার গাছের আম শ্যামবাবুকে বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়াছেন এবং রসিদ লিখিয়া দিয়াছেন।

পাঁচ হাজার টাকা আমার নাই। সুতরাং জেল অনিবার্য।

॥ ৩ ॥

হিতৈষী প্রতিবেশী চৌধুরী মহাশয় এইমাত্র বলিয়া গেলেন যে, আমি গিয়া শ্যামবাবুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেই সমস্ত ব্যাপার অবিলম্বে মিটিয়া যাইবে। কারণ তাঁহার মতে শ্যামবাবু লোকটি একটু রগ-চটা হইলেও দিল-দরিয়া। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে কঠোরকণ্ঠে বিবেক কহিল, ক্ষমা-প্রার্থনা করিও না।

কেন ?

শান্তিই মনুষ্যের কাম্য। এ অবস্থায় জেলের ভিতরেই তুমি অধিক শান্তি পাইবে। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য কিছুদিন কারাবরণ করিলে তোমার কিছুমাত্র অমর্যাদা হইবে না।

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, এবং কিছু শিক্ষাও হইবে।

এমন সময় আর একটি বজ্র পড়িল। এটিও বিনা মেঘে।

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমার সময় কম, মাছ ধরিতে যাইতেছি। কেবল একটি সুখবর দিতে আসিয়াছি। জজ সাহেব বদলি হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার প্রিয়তমা শ্যালিকার পাণিপীড়ক, অর্থাৎ আমার ভায়রাভাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বদলি হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানেও সৌভাগ্যক্রমে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার বাল্যবন্ধু। সুতরাং চল, এই সুযোগে শ্যামবাবুকে একদিন চাবকাইয়া আসা যাক। আমার নিকট খুব ভাল একটা হান্টার আছে।

মুচকি হাসিয়া প্রাণকান্ত চলিয়া গেলেন।

॥ ৪ ॥

দামী কার্ডখানা হাতে লইয়া বসিয়া আছি। ইহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে, শ্যামসুন্দর দে অত্যন্ত বাধিত হইবেন, যদি আমি অদ্য সন্ধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উদ্যান-উৎসবে যোগদান করি। ইংরেজীটুকুর অনুবাদ করিলে ইহাই অর্থ হয়। যিনি কার্ডটা দিয়া গেলেন, তিনি ইহাও বলিয়া গেলেন যে, নবাগত জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রাণকান্তও।

একটু পরে প্রাণকান্ত আসিলেন। বলিলেন, আর ঝগড়াঝাঁটি করিয়া কাজ নাই। মধুরেণ সমাপয়েৎ করাই ভাল। পরে প্রয়োজন হইলে হান্টার তো আছেই। এখন ভোজটা ছাড়ি কেন?

॥ ৫ ॥

ভূরিভোজনের পরে যখন ফিরিলাম, তখন রাত্রি অনেক। আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন!

একটা ভীষণদর্শন বলিষ্ঠ লোক কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাতে প্রকাণ্ড একটা কলসী। প্রশ্ন করিলাম, কি খুঁজিতেছেন?

আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, দড়ি।

দড়ি? আপনি কে?

তোমার বিবেক, রাস্কেল!

বিবর্তন

প্রত্যেক জিনিসই তলাইয়া দেখা উচিত—ইহাই জ্ঞানীগণের পরামর্শ। কিন্তু মুশকিল এই যে, প্রত্যেক জিনিসই অতলস্পর্শী। কোন কিছুরই তল খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। সামান্য ধূলিকণারও সম্পূর্ণ রূপ, সম্পূর্ণ ইতিহাস, সম্পূর্ণ রহস্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন সম্পূর্ণ বুদ্ধি আমাদের শিরোভাণ্ডে নাই। যতটুকু আছে ততটুকু লইয়া কেবল দিশাহারা হইয়া পড়া ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যৎসামান্য মস্তিষ্ক না থাকিলেই যেন ভাল হইত। নির্বিকারভাবে খরস্রোতের টানে অনন্ত-কাল ভাসিয়া যাইতাম, অথবা যেখানে ঠেকিবার ঠেকিয়া থাকিতাম। অনিবার্য খরস্রোতের টানে ভাসিয়াই তো চলিয়াছি; এই দুর্নিবার স্রোতের প্রতিরোধ করি, এমন শক্তি তো নাই। কিন্তু কিছুতেই নির্বিকার থাকিতে পারিতেছি না। অত্যল্প বুদ্ধি-প্রভাবে উচ্চিংড়ার মত ক্রমাগত তড়পাইতেছি। 'এটা কর,' 'ওটা কর,' 'এটা করিলে ভাল হইত,' 'আহা, এ কথাটা যদি আগে ভাবিতাম' প্রভৃতি নানারূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিক্ষোভ চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে। অনতিদূরপ্রসারী জ্ঞানের প্ররোচনায় পড়িয়া জলকে সোজাসুজি জল ভাবিয়া তৃপ্তি পাইতেছি না। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, তাহাদের মধ্যে মলিকিউল অ্যাটম ইলেকট্রন, তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক লীলা এবং তাহারও পশ্চাতে একটা অজ্ঞাত শক্তির আভাস পাইয়া বিব্রত হইয়া উঠিতেছি। ইহাই হয়তো বিজ্ঞান এবং সর্পের মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অথবা ব্রহ্মের মধ্যে সর্পের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা, হয়তো সূক্ষ্ম বুদ্ধি, কিন্তু এই বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি লইয়া আমরা ডুবিতে বসিয়াছি। সত্য-মিথ্যার এমন একটা জট পাকাইয়া গিয়াছে যে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিবার মত মানসিক শক্তিও তো নাই। সমস্ত জিনিসটা তলাইয়া দেখিবার অদম্য বাসনা এবং নিজের বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে অকথ্য অহঙ্কার—এই দুই প্রস্তর-খণ্ড স্কন্ধে বাঁধিয়া আমরা জীবন-প্রবাহে স্বচ্ছন্দে ভাসিতে পারিতেছি না। সহজ গতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিতেও পারিতেছি না, এ ক্ষেত্রে আমার কি বক্তব্য বা কর্তব্য! নরোত্তম নামক যুবকটির সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমাগত পরিবর্তন করিয়াও

তো কোন কূল-কিনারা পাইতেছি না। মনে হইতেছে, নরোত্তম নামক যুবকটির আরও না জানি কত প্রচ্ছন্ন রূপ আছে! অপ্রত্যাশিতপূর্ব ইহারই নাম কি বিবর্তন?

নরোত্তমকে হিন্দুবংশাবতংস বলিয়াই জানিতাম।

যখন সে সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল তখন স্বীকার করিতে বাধা রহিল না যে, ছেলেটি বিদ্যানুরাগীও। তাহার বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে পুলকিত হইলাম। এবং তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিলাম। দীর্ঘ জীবন হয়তো সে লাভ করিবে, কিন্তু আমার পুলক বেশিক্ষণ টিকিল না। তাহার বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে ধারণাটি মনে যখন সানন্দে দৃঢ় করিয়া আনিতেছিলাম, তখন সহসা নরোত্তম এমন একটি কাণ্ড করিয়া বসিল যে, তাহার বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে ধারণা এবং তজ্জনিত আনন্দ যুগপৎ আমার মন হইতে বিলুপ্ত হইল। দেখিলাম, নরোত্তম দাস খদ্দর ধারণ করিয়া স্কুল-কলেজ-বর্জন-অভিযানে উদ্যত-প্রহরণ হইয়াছে। প্রহরণটি অবশ্য সাংঘাতিক কিছু নয়, নরোত্তমেরই অহিংস রসনা। কিন্তু তাহার অহিংস রসনাটিতেই এমন সহিংস বাণীমূর্তি বাঙ্ময় হইয়া উঠিল যে, আমরা অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিদ্যালয়-গমনোন্মুখ বালক-বালিকাদলকে ঘর্মাক্ত-কলেবরে হস্তপদ আস্ফালন করিয়া অহিংসভাবে নরোত্তম ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, বর্তমান অবস্থায় লেখাপড়া শিখিবার প্রয়াস কেবল যে হাস্যকর এবং অনর্থক তাহাই নহে—মহাপাপ। মৃতপ্রায় দেশমাতার কণ্ঠনালীতে যেটুকু প্রাণ ধুকধুক করিতেছে, চরকা না ঘুরাইয়া লেখাপড়া শিখিতে গেলে সেটুকুও অবিলম্বে বাহির হইয়া যাইবে। দলে দলে বালক-বালিকা যুবক-যুবতী স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কাপড় পুড়াইতে ও চরকা ঘুরাইতে প্রবৃত্ত হইল। সকলেই দেখিলাম, ধৃতখদ্দর গান্ধীটুপি-পরিহিত নরোত্তমের বিশুদ্ধ স্বদেশীয় প্রতিভার নবারুণচ্ছটায় বিদ্যানুরাগী কোমলস্বভাব নরোত্তমচন্দ্র ম্রিয়মাণ হইয়া লজ্জায় আত্মগোপন করিতেছে। আমিও নরোত্তম সম্বন্ধে আমার ধারণাটি পরিবর্তন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। কিন্তু বেশি দিন নয়, আবার নিশ্বাস টানিয়া রুদ্ধশ্বাস হইতে হইল। বহু বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বলিতে

পুনরায় ধারণা পরিবর্তন করিবার সঙ্গত কারণ ঘটিল। একদিন সন্দেহ হইল, আমার বোতল হইতেও সে কিঞ্চিৎ সুরা অপহরণ করিয়াছে। অনিবার্যভাবে তাহার সম্বন্ধে ধারণা যদিও পরিবর্তিত হইল, কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাহার এই সর্বদিক-রক্ষাকারী প্রতিভার অসামান্যতা মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। নিজের বোতলটি সাবধানে রক্ষা করিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। না লক্ষ্য করিলেই ভাল করিতাম। কারণ লক্ষ্য করিতে গিয়া বিস্ময় কাটিয়া গেল এবং মুগ্ধ ভাবটাও টিকিল না। একদিন শুনিলাম, গভীর রাত্রে সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ি পৌছাইয়া দিয়াছে, মুক্তকচ্ছ হইয়া নর্দমায় নাকি পড়িয়াছিল। মনে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু আবার ধারণা পরিবর্তিত করিতে হইল। যাহাকে শ্যাম এবং কুল-বজায়কারী নীতিকুশল ভাবিয়াছিলাম, সক্ষোভে স্বীকার করিতেই হইল যে, সে নিতান্ত সাধারণ মদ্যপ। ইহার পর সহসা সে ডুব মারিল। কোথায় এবং কি কারণে, তাহা জানিতে পারিলাম না। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে শেষ ধারণাটাই মনের মধ্যে বনিয়াদী হইতেছিল। এমন সময়ে একদিন প্রাতঃকালে ফুর ও ফেজক্যাপ-ধারী নরোত্তম আসিয়া আমাকে আদাব করিল এবং বার দুই পিচ ফেলিয়া বলিল যে, সে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমানে তাহার নাম নরোত্তম নয়—নুরুদ্দিন। সম্ভবত আমার নয়নের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে একটু মৃদু হাসিল এবং নুরে বার-দুই হাত বুলাইয়া সবিনয়ে বলিল, যদি অনুমতি করেন, সমস্ত খুলিয়া বলি।

অনুমতি করিলাম।

সে বলিতে লাগিল, দেখুন, অনেক চিন্তা করিয়াই আমি এ কার্য করিয়াছি। আমি নিতান্ত মূর্খ নই এবং জীবনের নানাপ্রকার অভিজ্ঞতাও আমার হইয়াছে। সুতরাং যাহা করিয়াছি, তাহা হঠকারিতা নহে—অনেক চিন্তার ফল। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সকল ধর্মই মূলত এক। আমিও তাহা স্বীকার করি এবং আশা করি আপনিও করেন। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে এই জ্ঞানগর্ভ সত্যটি স্বীকৃত হইতেছে না। শুধু তাহাই নয়, বর্তমানে রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটি ধর্মকে প্রশ্রয় দিয়া অন্য এক ধর্মকে নির্যাতিত করাই প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কথা আশা করি আপনার অবিদিত নাই যে,

পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। এ অবস্থা যে মোটেই শান্তিজনক নহে, চাকুরি অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। নরোত্তমরূপে আমার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতেছিল, কিন্তু মুরুদ্দিন হইবামাত্রই আমার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। সকল ধর্মই যদি মূলত এক হয়, ধর্মান্তরগ্রহণের কোনরূপ নৈতিক বাধা নাই ; অথচ রাজনৈতিক সুবিধা রহিয়াছে। আমার মনে হয়, আর কিছুর জন্য না হউক, রাজনৈতিক চাল হিসাবেই এখন সকলের দলবদ্ধভাবে মুসলমান হইয়া যাওয়া কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র উপায়। আপনি হয়তো বলিবেন, মুসলমানেরাই হিন্দু হউক না কেন! তদুত্তরে আমি বলিব যে, মুসলমানেরা আমাদের অবুঝ ভাই, তাহারা এ যুক্তি কিছুতেই বুঝিবে না। তাহা ছাড়া, যে পরিমাণ মানসিক বিস্তার থাকিলে অনায়াসে ধর্মান্তর গ্রহণ করা যায়, সে পরিমাণ ঔদার্য, যে কোন কারণেই হউক, মুসলমানদের সম্প্রতি নাই। মুসলমানদের নাই, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাঙালী হিন্দুদের তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। আমরা সর্বধর্মের মূলমর্ম বিষয়ে সর্বদাই ওয়াকিবহাল। আমাদের দার্শনিকতার জোরে আমরা সমস্ত কিছুই পরিপাক করিতে সক্ষম। মুসলমানই বা হইতে পারিব না কেন? একদিন যে যুক্তিবলে আমরা দলে দলে স্কুল-কলেজ ও চাকরি ছাড়িয়া খদ্দর পরিয়া চরকা ঘুরাইয়াছিলাম, সেই যুক্তিবলেই আমরা এখন দলে দলে মন্দির ছাড়িয়া মসজিদে গিয়া কলমা পড়িতে পারিব না কেন? কিসের বাধা? ইহাতে কত বড় একটা সমস্যার সুন্দর সমাধান হইয়া যাইবে ভাবিয়া দেখুন দেখি। রসুন পেঁয়াজ মুরগি মুসলমান না হইয়াই তো আমরা স্বচ্ছন্দে হজম করিতেছি, লুঙ্গি পরটাও আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের মন যেরূপ উদার, তাহাতে কোরান অথবা কলমা পড়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। অথচ তাহাতে সুবিধা কত! আমাদের জাতীয় জঠরের পরিপাকশক্তি এরূপ প্রবল যে, আমার ধারণা, আমাদের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। ইতিপূর্বে অর্থাৎ কংগ্রেস যখন হয় নাই, তখন আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নব নব আদর্শ অতি সহজেই হজম করিয়াছিলাম এবং সম্ভবত তাহারই উত্তেজনায় কংগ্রেসের জন্মদান করিয়াছিলাম। পুত্রের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পিতাকে যেমন অনেক সময় প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হইতে হয়, কংগ্রেসের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সেইরূপ মুসলমানধর্মের আশ্রয় লইতে হইবে।

আমার বিশ্বাস, আমরা তাহা পারিবও। কারণ কবি বলিয়াছেন, "শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।" আমরা তুচ্ছ নহি; প্রয়োজন হইলে আমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারি। আমি এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ, আপনার নাতিটি বেকার বসিয়া আছে। সে আমার সহপাঠি ছিল, এবং সে যে তীক্ষ্ণধী এ বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বাঙালী হিন্দু। তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে। সে যদি মুসলমান হইয়া যায়, অবিলম্বেই তাহার চাকুরি জুটিয়া যাইবে! আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?

প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রস্তুতভাবে একটা ঢোক গিলিয়া ফেলিলাম। তাহার পর বলিলাম, আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি।

হুরুদ্দিন চলিয়া গেল।

জ্ঞানীগণের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত জিনিসটা তলাইয়া দেখিতেছি; কিন্তু মনে হইতেছে, সমস্তই অতল।

দুই বন্ধু

জনৈক বাল্যবন্ধু পত্রযোগে অনুযোগ করিয়াছে, আমি কেন তাহাকে এখনও মনে করিয়া রাখি নাই। শ্লেষও করিয়াছে—এখন বড়লোক হইয়াছি, তাহার মত নগণ্য ব্যক্তিকে মনে রাখিবই বা কেন? আমিও অবাক হইয়া ভাবিতেছি, যাহার একদিনের অদর্শনে বিশ্বভুবন অন্ধকার হইয়া যাইত তাহাকে বেশ স্বচ্ছন্দে ভুলিয়াছি তো—বৎসরান্তেও তাহার কথাটা একবার মনে পড়ে না! আমি ইচ্ছা করিয়া, জোর করিয়া অথবা বদমায়েসী করিয়া তাহাকে ভুলিয়া যাই নাই। মন আপনি তাহাকে ভুলিয়া বসিয়া আছে এবং এতদিন পরে তিরস্কৃত হইয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি।

কিন্তু কেন? মনের এরূপ আচরণের কারণটা কি?

চিন্তা করিতে লাগিলাম। সম্যকরূপে চিন্তা করিবার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা বিস্ময়কর। সিদ্ধান্তের জবরদস্তিতে পড়িয়া আমাকে স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, আমি মারা গিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে ভুলিয়াছি। একবার দুইবার নয়, এ জীবনে বহুবার মরিয়াছি এবং বহুবার নবজন্ম লাভ করিয়াছি। পূর্বজীবনের আসবাব-পত্র নবজীবনে অচল। নবলব্ধ

জীবনের পারিপার্শ্বিক, দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ-সংঘাত, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা পূর্বজীবন হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, পূর্বজীবনের কোন কিছু তাহাতে খাপ খায় না, এবং খাপ খায় না বলিয়াই ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে হইতে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায়। ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যেমন সহসা-প্রাপ্ত শিলালিপি, অস্থিখণ্ড অথবা তৈজসাংশ অবলম্বন করিয়া অতীত যুগের প্রাক্তন পৃথিবীর রূপ রস চালচলনের আভাস পান, আমরাও তেমনই ইতস্ততবিক্ষিপ্ত দুই-একখানা পুরাতন চিঠি, বিবর্ণ ফোটো অথবা ঠাকুমা-মুখ-নিঃসৃত স্মৃতি-কথার প্রভাবে আমাদের বিগত মৃতজীবনের পরিচয় পাইয়া নানাভাবে বিচলিত হইয়া উঠি। বর্তমানে ঝালমাংসলোলুপ আমি যে অতীত কালে দুধ-ভাত ছাড়া আর কিছুই পছন্দ করিতাম না, ব্যঞ্জনে সামান্য ঝালরস থাকিলেও যে আমি গলদশ্রু-লোচনে বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতাম—এ কথা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। আমার ভিতর ও বাহিরের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। সেকালের দুধ-ভাতপ্রিয় সাত্ত্বিক বালকটি আজকাল প্রত্যহ কড়মড় করিয়া অস্থি চর্বণ করিতেছে এবং মাংসে ঝাল কিঞ্চিন্মাত্রও কম পড়িলে সগর্জনে পাচকের উপর ঝাল ঝাড়িতেছে। ইহা বিস্ময়কর বটে, কিন্তু সত্য। দুধ-ভাতকে ভুলিয়াছি। এই বিস্মৃতির জন্য সেই দুধভাত অভিমানভরে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। কি করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। অনেক ভাবিয়া শেষে সরল সত্য কথাই লিখিলাম। লিখিলাম, বাল্যকালে দুধ-ভাত আমার প্রিয়বস্তু ছিল, এখন মাংস ধরিয়াছি। বাল্যকালে তোমার সাহিত্যপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করিত, এখন সাহিত্য ছাড়িয়া আমি পাটে মন দিয়াছি। সুতরাং তোমাকে ভুলিব ইহা বিচিত্র নহে। এতদিন পরে তুমি আমাকে স্মরণ করিলে কেন? ইহাই আমার বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে।

বন্ধুর উত্তর আসিল। লিখিয়াছে, আমরা এই জীবনেই নব নব জন্মলাভ করি—তাহা অতীব সত্য। তোমার দুগ্ধপ্রিয়তা মাংসপ্রিয়তায় এবং মাংস-প্রিয়তাও হয়তো কালক্রমে অবশেষে সাগু অথবা হর্লিক্স-প্রিয়তায় পরিণতি

নেশা অর্থের নেশায় পর্যবসিত হইয়া শেষ পর্যন্ত যশের নেশায় দিশাহারা হইয়া পড়ে, তাহাও অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু, বন্ধু, তুমি তোমার নিজের দিকটাই কেবল দেখিতেছ কেন? আমার দিকটাও দেখ! তুমিই কেবল নব নব জন্ম লাভ করিতেছ, তোমার গুটিপোকাই কেবল প্রজাপতি হইয়া যাইতেছে, আর আমরা স্থাণুবৎ এক স্থানে অচল হইয়া রহিয়াছি—এ কথা ভাবিলে কিরূপে? আমিও চুপ করিয়া বসিয়া নাই, আমারও বিবর্তন ঘটিয়াছে। সংক্ষেপে, আমিও পাটের দালালি শুরু করিয়াছি। পরম্পরায় শুনিলাম, তুমিও পাট-জগতে প্রবেশ করিয়াছ, সেইজন্যই পত্র লিখিয়াছিলাম। অকারণে নয়, অতিশয় সকারণে পূর্বপত্রখানি ভূমিকাস্বরূপ ছাড়িয়া-ছিলাম। আইস, উভয়ে মিলিয়া ব্যবসায় করি! তুমি আমার বাল্য-বন্ধু এবং··· ইত্যাদি।

অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। শুধু তাহাই নয়, তাহার সহিত ব্যবসায়-বন্ধনে সাগ্রহে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত এক দীর্ঘ পত্রও তাহাকে লিখিয়া ফেলিলাম। লক্ষ্মীতুলালকে ব্যবসায়-সঙ্গীরূপে পাইব, ইহা যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার! উৎসুকভাবে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কয়েকদিন পরে বন্ধু প্রাণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। প্রাণকান্তের নিকট প্রায় কোন কথাই আমি গোপন রাখি না। এটিও রাখিলাম না। শুনিয়া প্রাণকান্ত অভ্যাসমত খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, লক্ষ্মীতুলাল শুঁই? তালতলার? সে তো পয়লা নম্বরের জোচ্চোর। শুনিয়াছি, তিনজন লোকের গলা সে অতিশয় চতুরতার সহিত কাটিয়াছে।

প্রশ্ন করিলাম, চতুরতার সহিত কাটিয়াছে মানে?

মানে, যখন ছুরি চালাইতেছিল, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। একজন তো ভাবিয়াছিল, তাহার হিতার্থেই অস্ত্রোপচার করা হইতেছে।

লক্ষ্মীতুলালের এবম্বিধ অস্ত্রপটুতার কথা জ্ঞাত ছিলাম না। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ঢোক গিলিলাম।

প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, আমাকে ঘুণাক্ষরে কিছু না জানাইয়া তুমি গলাটা স্বচ্ছন্দে বাড়াইয়া দিলে। বেশ তো।

বলিলাম, বাল্যবন্ধু, অর্থাৎ—

বাল্যবন্ধু হইলেই যুধিষ্ঠির হইতে হইবে, কোন্ আইনে তাহা লেখে ?

আইন কোন নাই, সত্য। কিন্তু যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে আমার পক্ষে পশ্চাৎপদ হওয়া এখন শক্ত! এক রকম অসম্ভব—মানে, ইয়ে আর কি! দেখা যাক না, কি লেখে সে।

প্রাণকান্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর 'যা খুশি কর' বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

কয়েকদিন অতিশয় ভয়ে ভয়ে কাটাইলাম। হে ভগবান, হে দয়াময় হরি, লক্ষ্মীদুলালের বুদ্ধিভ্রংশ কর, সে যেন কিছুতে না রাজী হয়। আমার মত ক্ষীণগ্রীব প্রাণীকে বাগে পাইলে সে তো নিমেষে শেষ করিয়া ফেলিবে।

দিন দশেক পরে লক্ষ্মীদুলালের উত্তর আসিল।

অত্যন্ত হর্ষভরে পড়িলাম—ভাই রামরতন, এখন আমি নানা ঝঞ্ঝাটে বিপন্ন, আগামী যুদ্ধেরও কোন স্থিরতা নাই। চেম্বারলেন মন্ত্রী থাকাকালীন নূতন কিছু আরম্ভ করিতে ভরসা পাইতেছি না। ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে ব্যবসা ফাঁদিতে দেরি হইবে না, আপাতত উহা স্থগিত থাক্।

দুর্গা শ্রীহরি! ভগবান তাহা হইলে আছেন।

পর-মুহূর্তেই কিন্তু আস্তিক্য-বুদ্ধিতে ঘা লাগিল।

প্রাণকান্ত আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার লক্ষ্মীদুলালের খবর কি হে ?

পত্র আসিয়াছে, সে রাজী নয়।

সস্মিতমুখে পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রাণকান্ত বলিলেন, চালটা অব্যর্থ হইয়াছে দেখিতেছি।

কিসের চাল ?

দাবার হে দাবার। দাবা খেলা না জানিলে এ দুনিয়ায় কাহাকেও দাবানো শক্ত। শেখ, দাবা খেলাটা শেখ।

খুলিয়া বল।

বর্তমানে লক্ষ্মীদুলালের যিনি মন্ত্রী, তাঁহার নাম শশী হালদার। সেই শশী হালদারের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ যিনি, তিনি আমারও সুহৃৎ, নাম—জগবন্ধু। সেই জগবন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলাম।

কি লিখিয়াছিলে ?

লিখিয়াছিলাম—পরম্পরায় অবগত হইলাম যে, লক্ষ্মীতুলালবাবু নাকি আমাদের রামরতনবাবুর সহিত পার্টনারশিপে ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। রামরতনবাবুকে ভাল করিয়া চিনি বলিয়াই গোপনে তোমাকে জানাইতেছি যে, পার তো লক্ষ্মীতুলালবাবুকে সাবধান করিয়া দিও। রামরতনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, এ দিকে কথায় কথায় সে নিরীহতার প্রতিমূর্তি, আসলে কিন্তু সে নর-রূপী এম্‌ডেন। বহু জাহাজ ডুবাইয়াছে। লক্ষ্মীতুলালবাবু শুনিয়াছি সজ্জন, তিনি আসিয়া রামরতনের ফাঁদে যেন পদক্ষেপ না করেন।

একটু থামিয়া প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, ফল ফলিয়াছে দেখিতেছি; তাহা ছাড়া তুমি তো চোরই, ফাঁকি দিয়া আমার নিকট হইতে কতকগুলো টাকা ওই মাতাল দামোদরটাকে ধার দিয়াছ। আমি কিছু বুঝি না যেন।

আমার বলিবার কিছু ছিল না, চুপ করিয়া রহিলাম। সহসা মনে হইল, প্রাণকান্ত লক্ষ্মীতুলালের খবর পাইল কি করিয়া? বলিলাম, লক্ষ্মীতুলাল যে জুয়াচোর—এ সংবাদ তোমাকে দিল কে?

কেহ নয়, আমি জানি।

প্রাণকান্তের চক্ষু দুইটি চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সহসা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রাণকান্ত বলিয়া উঠিলেন, তোমার এ বয়সে পাটের ব্যবসা করার কোন মানে হয়? ঋণে তোমার চুল বিকাইয়া রহিয়াছে, পুনরায় ঋণ করিয়া পাটের ব্যবসা করার অর্থ কি?

লাভ হইলে ঋণ শোধ করিব।

পৃথিবীতে একদল লোক কবিতা লেখে এবং আর একদল লোক তাহা পড়ে। একদল লোক ঋণ করে এবং আর একদল লোক তাহা শোধ করে। তুমি প্রথম দলের লোক, ঋণ শোধ করা তোমার কর্ম নয়। ব্যবসা করা তোমার পক্ষে অব্যাপার।

সোজাসুজি মানা করিলেই পারিতে।

সহজভাবে মানা করিলে কেহই কিছু শুনে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ শুনিতে বাধ্য না করিলে কেহ কিছু শুনে না।

মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। সহসা মনে একটা কৌতূহল হইল, প্রাণকান্ত ছেলেবেলায় কেমন ছিল কে জানে।

প্রাণকান্ত, ছেলেবেলায় তোমার জীবনের বিশেষত্বটা কি ছিল বল তো ?

হঠাৎ ?

বল না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া প্রাণকান্ত বলিলেন, খুব ছেলেবেলায় অঙ্কে জিরো পাইতাম।

বলিয়া তিনি হাসিলেন, তাঁহার সেই চাপা কৌতুকপূর্ণ হাসি।

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। কারণ প্রাণকান্ত এম-এ তে গণিতে প্রথম হইয়াছিলেন, ইহা আমি জানি।

আত্মদর্শন

॥ ১ ॥

যাহার একদিন এত উপকার করিয়াছিলাম, সেই কিনা শেষকালে এই করিল—এই জাতীয় খেদ করিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য অনেকেরই হইয়াছে। আমার হইয়াছে এবং আমিও হয়তো অনেকের এই জাতীয় খেদের কারণ হইয়াছি। জিনিসটা অভাবনীয় অথবা অচিন্ত্যপূর্ব নয়, এতকাল মানব-সমাজে বাস করিতেছি, মনে কড়া পড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছি, এত আঘাত সত্ত্বেও মনের কোমলতা (অথবা অহমিকা) কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। দামোদরের কৃতঘ্নতায় মন বেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। দামোদর আত্মীয় বলিয়া, নানা দোষে দুষ্ট অভাবগ্রস্ত অসহায় বলিয়া একদা তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলাম এবং প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাগুলি মিথ্যা চাতুরি দ্বারা সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন দামোদরকে দিয়াছিলাম, এবং ইহাও মনে পড়িতেছে, বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। মূঢ়ের মত বিশ্বাস করিয়াছিলাম। দামোদর যথাসময়ে টাকাগুলি প্রত্যর্পণ করিবে এবং আমার সহৃদয়তায় জন্য শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসা করিবে। প্রাণকান্ত অবশ্য ব্যাপারটা এখন জানিতে পারিয়াছে এবং ইহা লইয়া যখন-তখন তাহার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণতায় টিপ্পনীও কাটিতেছে। স্থির করিয়াছি, যেমন করিয়া হউক, প্রাণকান্তের টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিব। 'যেমন করিয়া হউক' বলিতেছি বটে, কিন্তু উপায় একটিমাত্রই

আছে—গৃহিণীর গহনাগুলি। গৃহিণী বৃদ্ধা হইয়াছেন, অলঙ্কারে আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়াই বোধ হয় প্রয়োজন আরও বেশি। গৃহিণীকে কি ভাবে ভুলাইয়া গহনাগুলি হস্তগত করিব, তাহাও একটা সমস্যা বটে। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, গৃহিণীকে সম্মোহিত করিবার দুইটি অস্ত্র বেহাত হইয়া গিয়াছে। যৌবনও নাই, উপার্জনক্ষমতাও নাই। যাক সে কথা, দামোদরের কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

বলা বাহুল্য, দামোদর টাকাটা প্রত্যর্পণ করে নাই। শুধু তাহাই নয়, সেই বেঁটে কালো দামোদর নাকি উত্তেজনাভরে পায়ের অঙ্গুলিগুলির উপর দাঁড়াইয়া তর্জনী-উৎক্ষিপ্ত দক্ষিণহস্ত আস্ফালন-পূর্বক আমার নামে যেখানে-সেখানে অকথ্য ভাষায় নানা মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে। আমি যে নিখুঁত লোক, তাহা বলিতেছি না, আমি দামোদরের আচরণের কথা বলিতেছি। হিসাব-মত ইহার জন্য তাহার গলায় পা দিয়া জিভটা সজোরে টানিয়া বাহির করা উচিত এবং ভোঁতা ছুরি দ্বারা পোঁচাইয়া পোঁচাইয়া জিভটা আমূল কর্তন করিয়া তপ্ত তৈলে সেটি নিক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু দেশের আইন এবং আমার বর্তমান মনোবৃত্তি ইহার অনুকূল নহে। বার্ধক্যের জন্যই হউক, অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই হউক, যে সকল ঘটনা প্রতিহিংসা অথবা রোষবহ্নির ইন্ধন যোগাইত, বর্তমানে সেই সকল ঘটনাই দার্শনিকতার খোরাক যোগাইতেছে। দামোদরের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার অসদাচরণ আমার নিবন্ধটির মাল-মসলা সরবরাহ করিতেছে বলিয়া তাহার প্রতি একরূপ অদ্ভুত কৃতজ্ঞতাও অনুভব করিতেছি।

বিচিত্র মানুষের মন!

॥ ২ ॥

ভাবিতেছি, মানুষ এমন করে কেন? যাহার উপকার করিলাম, সেই এমন বদ্ধপরিকর কৃতঘ্ন হইয়া উঠে মনস্তত্ত্বের কোন্ নিগূঢ় নিয়ম অনুসারে? অথচ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে পড়িতেছে যে, সকলে তো এমন করে না। হিরু জেলেকে কবে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়াছিলাম, এবং ইহাও নিশ্চিত জানি যে, আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে নহে, নিতান্তই দৈবক্রমে তাহার কলিক বেদনাটি সারিয়া গিয়াছিল। হিরু কিন্তু আজও কৃতজ্ঞ। সেদিনও কুমড়ো-পাতায় মুড়িয়া কিছু মৌরলা মাছ সসঙ্কোচে উপহার দিয়া প্রণাম

করিয়া গেল। মৌরলা মাছ অবশ্য অল্পই, কিন্তু তাহার কৃতজ্ঞতার গভীরতা তো অল্প নয়।

আরও একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। বহুকাল পূর্বের ঘটনা। একবার একটা ডাক-বাংলোয় অবস্থান করিতেছিলাম। শীতকাল। সন্ধ্যার সময় বেশ একটু বর্ষা নামিয়া শীতটাকে জাঁকাইয়া তুলিয়াছিল। এমন শীতের সন্ধ্যায় যাহা প্রয়োজন, আমার বেতের বাক্সটিতে প্রায় তাহার সমস্ত আয়োজন ছিল। ধাপে ধাপে শুরু করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম ধাপেই থামিয়া যাইতে হইল। স্টোভ জ্বালাইয়া এক পেয়ালা কড়া কফি প্রস্তুত করাইয়া মহানন্দে পান করিতেছি, এমন সময় মসমস করিয়া এক সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সিক্ত সাহেব আসিয়াই ডাক-বাংলোর চাপরাসীকে চায়ের ফরমাস করিলেন। চাপরাসী করজোড়ে নিবেদন করিল যে, এই অসময়ে গ্রামের সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চায়ের সরঞ্জামই সে সংগ্রহ করিতে পারিবে না। শুনিলাম, সাহেব যে-সে সাহেব নহেন, স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। মোটর-যোগে সফর করিতেছিলেন, প্রায় মাইলখানেক দূরে মোটর বিগড়াইয়াছে। তিনি পদব্রজে আসিয়া ডাক-বাংলোয় আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার জিনিসপত্র সব মোটরে এবং তাঁহার আরদালীগণ সকলেই বানচাল মোটরের পরিচর্যায় নিযুক্ত। আমার ভদ্রতাজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। সাহেবের সহিত আলাপ করিলাম এবং সবিনয়ে বলিলাম, তিনি যদি আমার এক কাপ কফি পান করেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। ধন্যবাদ-জ্ঞাপনান্তে সাহেব বলিলেন, থাক্ কফির প্রয়োজন নাই। আমি ছাড়িলাম না, অনেক বলিয়া-কহিয়া সাহেবকে এক পাত্র কফি পান করাইলাম এবং উগ্রতর পানীয়েরও আভাস দিলাম। সাহেব একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, তিনি ওসব চাহেন না। আমিও আর সে রাত্রে ওদিকে গেলাম না। সেই সাহেব কিন্তু এখনও ভোলেন নাই। যত দিন ভারতে ছিলেন, নানারূপে আমার প্রত্যুপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন চাকুরি হইতে অবসর লইয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে পত্র লিখেন এবং প্রতিবার নববৎসরে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক কার্ড পাঠাইয়া থাকেন। এক কাপ কফির বিনিময়ে সাহেবের সৌহার্দ্য লাভ করিয়াছিলাম।

ভাবিতেছি, দামোদরেরাই এমন করে কেন?

বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া এবং অনেক মস্তক-কণ্ডূয়ন করিয়া যে কথাটি আমার মনে উদিত হইতেছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি। একটি সংস্কৃত কথা শুনিয়াছিলাম—শতং বদ, মা লিখ। সংস্কৃতটা নির্ভুল কিনা জানি না, উক্তিটি কিন্তু অভিজ্ঞতাপূর্ণ। যাহা লিখিব, তাহা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কোথাও না কোথাও হয়তো টিকিয়া থাকিবে এবং ভবিষ্যৎ যুগের কোন দামোদর হয়তো ইহারই উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ যুগের কুৎসাকামী শ্রোতাদের মনোরঞ্জন বিধান করিবে। এই লেখারই নজির দেখাইয়া বলিবে, দেখিতেছ, লোকটার বুদ্ধির দৌড়! বুঝবে না যে, একটি লেখা কথা বা আচরণের দ্বারা মানুষের বিচার করিতে যাওয়া অদূরদর্শিতার পরিচায়ক; নির্বুদ্ধিতা কথাটা আর ব্যবহার করিলাম না। মানুষ মেঘের মত ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। তাহার পরিবর্তনশীল রূপের সমন্বয়ই সে, কোন একটা বিশেষ রূপ লইয়া বিচার করিলে ভুল হইবে।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল দেখুন। এই তো আমাদের মহদ্দোষ। টু দি পয়েণ্ট অর্থাৎ নিক্তির ওজনে আমরা কিছুই করিতে পারি না। ছুঁচা মারতেও পাঁয়তাড়া কষি এবং মশা মারিবার জন্য কামান দাগি।

যাক, আর ভণিতা করিব না, আসল কথাটা ব্যক্ত করিয়া ফেলি। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, দামোদর-জাতীয় লোকের উপকার করিতে গিয়া আসলে আমরা অজ্ঞাতসারে তাহাদের অপমান করি এবং তাহাদের আহত আত্মাভিমান সুযোগ পাইলেই ফোঁস করিয়া উঠে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার বোধ হয়। দামোদর এবং আমি সমশ্রেণীর লোক। ঘটনাচক্রের সামান্য ইতরবিশেষের জন্য দামোদর ভিক্ষুক এবং রামতারণ (আমি) দাতা হইয়াছি। ঘটনাচক্রের অন্যপ্রকার ইতরবিশেষে ইহার বিপরীতটাও সম্ভব হইতে পারিত। ভিক্ষুক রামতারণের দাতা দামোদরের দ্বারস্থ হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব হইত না। কিন্তু ঘটনাচক্রের যোগাযোগে, গ্রহের চক্রান্তে অথবা পূর্বজন্মের কোন হেরফেরে, যে কোন কারণেই হউক, একদা দামোদরকে ভিক্ষুকবেশে রামতারণের কৃপাভিক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং রামতারণও বেশ আড়ম্বরসহকারেই (অর্থাৎ পরের নিকট হইতে ঋণ করিয়াও) সেই ভিক্ষুকের প্রসারিত ভিক্ষাপাত্রে কিছু ভিক্ষা দান করিয়াছিল। কিন্তু আসলে সে কি করিয়াছিল? আসলে সে সেই ভিক্ষুকটার আত্মসম্মানের মুখে সজোরে পদাঘাত করিয়াছিল। কথায় না বলিলেও কার্যত বলিয়াছিল—

ওরে অধম ভিক্ষুক, আহা তুই কষ্টে পড়িয়াছিস, তুই আত্মীয়, আয়, তোকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেছি, ভিক্ষাপাত্রটা ভাল করিয়া তুলিয়া ধর্। ভিক্ষুক তখন একটা ছন্ম-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দন্তসার হাসি হাসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্নিবাসী মনুষ্যটি উপকার-কশাঘাতের জ্বালায় ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল। আজ সে তাহারই প্রতিশোধ লইতেছে। উপকার তাহার নিকট কশাঘাতবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহার কারণ সে ও রামতারণ সমশ্রেণীর। সেও রামতারণ হইতে পারিত কিন্তু হইতে পারে নাই। ইহাই তো যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ। ইহার উপর আবার সেই রামতারণটার দ্বারেই ভিক্ষুকবেশে আসিতে হইল, এবং সে তাহাকে হাসিমুখে ভিক্ষাও দিল! এ অপমানের কি শেষ আছে, না, ইহা ভুলিবার? পরীক্ষায়-ফেল-করা ছেলে পরীক্ষায়-পাস-করা ছেলের সম্বন্ধে কোনদিনই আন্তরিক প্রেম পোষণ করে না; যে চাকরি পায় নাই সে, যে চাকুরি পাইয়াছে তাহার উপর অজ্ঞাতসারেই বীতশ্রদ্ধ। বিজয়ী ও পরাজিতের সম্পর্ক কখনও মধুর হইতে পারে না। এই একই কারণে পোষ্য-আত্মীয় পোষক-আত্মীয়ের নিন্দা করিয়া সুখ পায়। অসমর্থ ভ্রাতা সমর্থ ভ্রাতার সাহায্য লাভ করিয়াও অসন্তুষ্ট থাকে এবং দোষ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ে। যে ঘটনাচক্রে অবনত, সে ঘটনাচক্রে উন্নত সমশ্রেণীর ব্যক্তিকে কখনও ভাল চক্ষে দেখে না এবং তাহার নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে বাধ্য হইলে মরমে মরিয়া যায়। আসলে মর্ম কিন্তু মরে না, ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে, এবং সেই অন্তর্নিরুদ্ধ জ্বালা মধ্যে মধ্যে কুৎসা-উদ্‌গিরণ করিয়া মর্মান্তিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাহারা উহার মধ্যে একটু ভদ্র অর্থাৎ পালিশ-করা, তাহারা কুৎসাটা প্রকাশ্যত হয়তো উদ্‌গিরণ করে না, কিন্তু মনে মনে বিষাইয়া থাকে। তাহাদের বক্র হাসি, বক্র কথাবার্তা, বক্র ব্যবহার তাহাদের বিষ-বক্র অন্তরের পরিচয় বহন করে। সুতরাং সমশ্রেণীর লোকের যদি উপকার করিতেই হয়, প্রকাশ্যত করিতে নাই। গোপনে করাই শ্রেয়ঃ। ডান হাতের দান বাঁ হাতও যেন না জানিতে পারে। জানিতে পারিলেই উপকৃত ব্যক্তি তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। হতবুদ্ধি তুমি ভাবিতে থাকিবে, যাহার এত উপকার করিলাম, সে-ই কিনা শেষটা এমন করিল! তলাইয়া দেখিবে না যে, প্রত্যক্ষ উপকার করিয়াছিলে বলিয়াই এই প্রত্যক্ষ পরিণতি হইয়াছে, এবং ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

হিরু জেলে আমার সমশ্রেণীর লোক নহে। সে যে শ্রেণীতে বাস করে, তাহা বহুকাল হইতে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত এবং সেজন্য তাহার মনে ক্ষোভও

বোধ হয় নাই। সুতারাং সে আমার নিকট হইতে যে উপকার পাইয়াছে, তাহা সকৃতজ্ঞ প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করিয়াছে। শিশু যেমন বয়স্কদের নিকট হইতে সানন্দে উপহার গ্রহণ করে এবং তদ্দ্বারা যেমন তাহার আত্মাভিমান একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, হিরুরও আত্মাভিমান তেমনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। হিরু আমার সমকক্ষ নহে, সমকক্ষ হইবার কল্পনাও করে না। যে দিন করিবে, সেই দিনই এই সমস্যার উদ্ভব হইবে। সে দিনও বোধ হয় আসন্ন। হরিজনগণ ইতিমধ্যেই আমাদের সমপদবাচ্য হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে রক্ত ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ঘটিয়া সত্য সত্যই হয়তো সমতাপ্রাপ্ত হইবেন। হিরু জেলেকে তখন অসঙ্কোচে দয়া করা চলিবে না।

সেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সে দিন শীতসন্ধ্যায় আমার নিকট হইতে এক পেয়ালা কফি পান করা সত্ত্বেও কেন কৃতঘ্ন হইয়া উঠিলেন না তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতেছি যে, সেদিন কফি পান করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যতটা না কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাঁহাকে কফি পান করাইয়া আমি ততোধিক কৃতার্থ হইয়াছিলাম! অর্থাৎ সে দিন দয়ার্দ্র ভদ্র আমি শীতপীড়িত একজন মনুষ্যকে কফি পান করাই নাই, গদগদ দাসমনোভাবসম্পন্ন আমি একজন সাহেবকে কফি পান করাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। কই, শীতার্ত চাপরাসীটার কথা তো আমার মনে পড়ে নাই। সুতরাং সাহেবকে আমি কৃপা করি নাই, সাহেবই আমাকে কৃপা করিয়াছিল। কৃতঘ্ন হইতে হইলে আমারই হওয়া উচিত, এবং চিন্তা করিয়া সলজ্জভাবে স্বীকার করিতেছি যে, কৃতঘ্ন হইয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে সেই সাহেবটার উপর নয়, সমস্ত সাহেব জাতটার উপর মনে মনে চটিয়া আছি। তাহারা দয়া করিয়া আমাদের কাপে আমাদের প্রদত্ত কফি পান করিতেছে, বিনিময়ে পিঠ চাপড়াইয়া ধন্যবাদ দিতেছে, নানা রকমে উপকার করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমাদের এই জাতিগত দুর্বলতা জনিত অস্বস্তি নানা ভাবে আমরা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছি। আমাদের তথাকথিত স্বদেশপ্রেমের মূল কথা বোধ হয় ইহাই। অর্থাৎ ইংরেজ সম্পর্কে সকলেই আমরা দামোদর। হয়তো—

চিন্তাস্রোত ভিন্নমুখী হইল।

একটি ছোট মাটির ভাঁড় হস্তে প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং চেয়ার টানিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

॥ ৪ ॥

ভাঁড়টি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাড়িতে পুরাতন চাউলের জালা আছে ?

থাকা সম্ভব। কেন বল তো ?

তাহা হইলে তাহার ভিতর এই কাগজটি সযত্নে রাখিয়া দাও। চালের ভিতর বেশ করিয়া ঢুকাইয়া রাখিও।—বলিয়া একটি কাগজ তিনি পকেট হইতে বাহির করিলেন।

কি ওটা ?

হ্যাণ্ডনোট। পড়িয়া দেখ।

দেখিলাম, লেখা আছে—দামোদর চৌধুরী প্রাণকান্ত বিশ্বাসের নিকট হইতে শতকরা ছয় টাকা হার সুদে দেড় হাজার টাকা কর্জ করিতেছে। বিস্মিত হইলাম, ব্যাপার কি ?

নির্বিকার প্রাণকান্ত বলিলেন, হ্যাণ্ডনোটটি জাল। দামোদরের নিকট হইতে টাকাটা আদায় করিতে হইবে তো। হ্যাণ্ডনোটের জালরূপ লোপ করিবার জন্য পুরাতন চাউলের মধ্যে ওটিকে কিছুকাল রাখিতে হইবে—অভিজ্ঞদের ইহাই মত।

চিন্তিতকণ্ঠে বলিলাম, জাল ?

সইটা জাল নয়। দামোদরেরই স্বহস্তের সহি। কোন চতুর ব্যক্তির সহায়তায় মাতালটাকে মদ খাওয়াইয়া সাদা কাগজে সহি করাইয়া লইয়াছি। উপরের অংশটুকু অপরের লেখা।

চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, দুই মাস পরে নালিশ করিব। ইতিমধ্যে টাকার জন্য তাহাকে তাগাদা কর।

আমাকে নির্বাক দেখিয়া প্রাণকান্ত একটু উষ্মাভরেই বলিলেন, দেখ, তোমার ওসব ফিলজফি-টফি ছাড়। ঐ করিয়াই তুমি নিজে ডুবিয়াছ, আমাকেও ডুবাইতেছ। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—এটাও কিছু তুচ্ছ করিবার মত ফিলজফি নহে। চাণক্য লোকটা নিতান্ত বোকা ছিলেন না। সাপের মাথায় লগুড়াঘাত করাই সনাতন পদ্ধতি। লগুড় লইয়া মাথা ঘামাইতে গেলে সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। এখনই গিয়া চালের জালার মধ্যে কাগজটি পুরিয়া ফেল। দামোদর-ভুজঙ্গকে বশে আনিবার উহাই একমাত্র মন্ত্র।

হঠাৎ নজরে পড়িল, মাটির ছোট ভাঁড়টি হইতে কতকগুলি কেঁচো বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রাণকান্ত তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া কেঁচোগুলিকে ভাণ্ডস্থ করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন, দেখ, কেঁচো নিরীহ, জলের মধ্যে মাছও নিরীহ। কিন্তু যিনি কেঁচো ও মাছ সৃজন করিয়াছেন, তিনিই, কি উদ্দেশ্যে জানি না, আমার মধ্যেও মৎস্যলোলুপতা ও বুদ্ধির সমাবেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি নিরুপায়। বঁড়শিবিদ্ধ নিরীহ কেঁচোর টোপ ফেলিয়া প্রলুব্ধ নিরীহ মৎস্যকে গাঁথিয়া ডাঙায় আমাকে তুলিতেই হইবে। তোমার দামোদরটি কিন্তু গভীর জলের মৎস্য, সাধারণ টোপ সে গিলিবে না, তাই জালের ব্যবস্থা করিয়াছি। ওটাকে আজই জালায় পুরিয়া ফেল।

বলিলাম, তোমার বাড়িতে চালের জালা নাই ?

আছে। কিন্তু জালার সন্নিকটে গৃহিণীও আছেন। গৃহিণীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জালার নিকট যাওয়া হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে যাওয়ার অপেক্ষাও শক্ত। তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিবারও উপায় নাই, তিনি ধর্মপ্রাণা রমণী, অনর্থক একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া বসিবেন। যাঁহার সহিত এতকাল বাস করিয়াছি এবং বাকি জীবনটাও বাস করিতে হইবে, তাঁহার সহিত চটাচটি করিয়া সুখ নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহার জ্ঞাতসারে এমন কার্য করাও ঠিক নহে, যাহাতে আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা লাঘব হইবার সম্ভাবনা। তুমিই এটুকু কর ভাই।—বলিয়া প্রাণকান্ত উঠিলেন।

কোথায় যাইতেছ ?

আট্যিদের শ্যাম-সায়রে। শুনিয়াছি, সেখানকার রোহিতমৎস্যগুলি সত্যই নাকি অপরূপ। একদিনের জন্য ছিপ ফেলিবার অনুমতি পাইয়াছি।

এমন সময় দেখা গেল, আমার গৃহিণী সদলবলে অর্থাৎ পুত্রবধূ-নাতি-নাতনী সমভিব্যাহারে খিড়কি-দরজা দিয়া নির্গত হইলেন। নাতনীর বগলে পানের বাটা দেখিয়া বুঝিলাম, পাড়ায় কোন বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আসর বসিবে।

প্রাণকান্ত বলিলেন, এইবার যাই, দেরি করা ঠিক হইতেছে না। তুমি এমন সুযোগ নষ্ট করিও না।

মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম এবং পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষকালে জালিয়াতির সহায়তা করিব ? দামোদর টাকা লইয়াছে

তাহা ঠিকই, কিন্তু এই দলিলখানা তো মিথ্যা। দেড হাজার টাকাটাই কি বেশি! মাত্র দেড় হাজার টাকার জন্য সত্য-পথভ্রষ্ট হইব? সত্যনিষ্ঠার স্বপক্ষে বিবেক অনেক যুক্তি যোগাইতে লাগিল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেলাম।

চেতনা হইলে দেখিলাম, জালার ভিতর হাত পুরিয়া কাগজখানা চাউলের তলায় রাখিতেছি। দেড় হাজার টাকার জন্য নয়, দামোদর আমার নামে কুৎসা প্রচার করিতেছে বলিযাই তাহার শাস্তি হওয়া উচিত!

আত্মদর্শন করিয়া চমকিত হইলাম।

চিরন্তনী

সকাল হইতে লক্ষ্য করিতেছি, প্রিয়া-মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া মেঘসঞ্চার হইয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। গর্জন-বর্ষণ আশঙ্কা করিতেছি এবং ম্রিয়মাণ হইয়া রহিযাছি। পূর্বে উতলা হইতাম, আজকাল গৃহিণীর ভাবান্তরে শঙ্কিত হইয়া পডি! বিষণ্ণ অন্তরে চিন্তা করিতেছি, এই ভাবান্তরের কারণ আমিই কি না, তাহাই সর্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। এই বয়সে গৃহিণীর বিরাগভাজন হইবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং জ্ঞাতসারে এমন কিছু করি না, যাহা মেঘজনক। কিন্তু 'অজ্ঞাতসারে' বলিয়াও তো একটা কথা আছে, এবং এ সংসারে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়া এই সার-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছি যে, অপরাধ এড়াইবার সাধ্য মানুষের নাই। কায, মন অথবা বাক্য দ্বারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সর্বদাই কাহারও না কাহারও নিকট অপরাধী হইয়া পড়িতেছি। মানব-মনে ক্ষমা নামক সদ্‌গুণটির অস্তিত্ব না থাকিলে জীবনযাপন করা দুরূহ হইয়া উঠিত। বস্তুত গৃহিণীর নিকট জীবনে বহু প্রকারে অপরাধী প্রতিপন্ন হইযা এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাঁহাকে বিবাহ করাটাই আমার পক্ষে অপ্রতিষেধ্য গুরুতম অপরাধ এবং আজীবন ক্ষমাভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। তাহাই করিয়া চলিয়াছি। আজিকার এই ভাবান্তর কি জাতীয় এবং কি ভাবে অগ্রসর হইলে সুরাহা হইবে তাহাই ভাবিতেছিলাম, এমন সময় রঙ্গমঞ্চে বেণী দোলাইয়া 'গেজেট' অবতীর্ণা হইলেন। শুধু অবতীর্ণা হইলেন নয়, সমস্যাটির উপর আলোকপাতও করিলেন। আমার নয় বৎসরের দৌহিত্রীপ্রবরা পাড়ার সকলের হাঁড়ির খবর রাখেন, সুতরাং এ খবরটি যে রাখিবেন, তাহাতে আর

বিচিত্র কি! চোখ মুখ রহস্যময় করিয়া কর্ণ-কুহরের নিকট মুখখানি রাখিয়া বলিলেন, জান দাদু, মামা মামীকে এত্ত ভালবাসে!

উহার মামা মানে আমার পুত্র। সে একদিনের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিয়াছিল। আজ চলিয়া গিয়াছে। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সে ভাগিনেয়ীর নিকট তাহার পত্নী-প্রেমের পরিচয় কি করিয়া রাখিয়া গেল, জানিবার জন্ম কৌতূহলী হইলাম।

বলিলাম, যাঃ, বাজে কথা। কক্ষণও হতে পারে না।

নিশ্চয় বাসে। তা না হলে অমন একটা কাপড় আনলে কেন?

কি কাপড?

ও, তা জান না বুঝি! মামা মামীমার জন্যে এমন একটা শাড়ি এনেছে এত্ত সুন্দর; যেমন পাড, তেমনই রঙ—জান দাদু, লুকিয়ে এনে দিয়েছিল, আজ হঠাৎ মায়ের কাছে ধরা পডে গেছে।

যেন ভীষণ একটা ষডযন্ত্র ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এমনই মুখভাব করিয়া বলিলাম, বটে! তারপর?

তারপর সব জানাজানি হয়ে গেছে এখন। মামীর সে কি লজ্জা! মামীর ভয় হয়েছিল, দিদি বুঝি বকবে। দিদি বকতে যাবে কেন শুধু শুধু? এতে কেউ কখনও বকে, তুমিই বল না দাদু? সত্যি দিদি কিছু বকলে না, খালি বললে—বেশ তো।

এমন সময় লক্ষ্য করিলাম, দ্বারপ্রান্তে চাটুজ্জে-বাড়ির মন্টি চট করিয়া উঁকি মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মন্টি আমার নাতনীর সমবয়সী। এই উঁকির মধ্যে কি ইশারা ছিল বলিতে পারি না, নাতিনীও একছুটে বাহির হইয়া গেল। খানিকক্ষণ তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। সে ফিরিল না, সম্ভবত মন্টির সঙ্গে খেলায় মাতিয়াছে। আমিও চিন্তার খেলায় মাতিলাম। নাতিনী উপরোক্ত সমস্যাটির উপর আলোকপাত করিয়া গিয়াছিল। অন্তত সে আলোক এত যথেষ্ট যে, তাহা লইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেশ খানিকক্ষণ মাথা চুলকানো চলে।

॥ ২ ॥

অর্থশাস্ত্রের দিক দিয়া চিন্তা করিলে পুত্রের এবম্বিধ অপব্যয়-প্রবণতার নিন্দা করিতে হয়। বধূমাতার শাড়ির অভাব নাই, আবার শাড়ি কেন? অপব্যয়-প্রবণতা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, কিন্তু আমার গৃহিণীর মন-খারাপের অর্থ অর্থশাস্ত্রে নিহিত আছে—এ কথা স্বীকার করিতে মন ইতস্তত করিতেছে। এই রমণীটির সহিত বিগত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করিতেছি। ইহার চরিত্রে অন্যান্য নানা সদ্‌গুণ অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু অর্থশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছি বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বরং যতদূর মনে পরিতেছে, আমরা উভয়েই অর্থশাস্ত্র নয়, অনর্থ-শাস্ত্রের চর্চাতেই জীবনপাত করিয়াছি। অর্থশাস্ত্রের সাধারণ বিধান-গুলিকে বারম্বার অমান্য করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আমাদের। আজ সহসা অর্থশাস্ত্রের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার মত মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ কথা মনে করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইতেছি না! তবে মন-খারাপের কারণ কি? অর্থশাস্ত্র ছাড়িয়া ন্যায়শাস্ত্রের দিক দিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলাম। পত্নীকে শাড়ি কিনিয়া দেওয়া কি অন্যায়? নিরপেক্ষভাবে উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, না। প্রাক্‌জীবনে নিজেও বহুবার এ কার্য করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা গৃহিণীর বিরাগ নয়—অনুরাগই উৎপাদন করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে। বস্তুত পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা কোন উপহার দিয়াছে—এই অতিশয় ন্যায়সঙ্গত কার্যকে গৃহিণী দূরের কথা, কোন তীক্ষ্ণতম ন্যায়চঞ্চুও বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ করি।

তাহা হইলে—! সহসা লক্ষ্য করিলাম, অতিশয় ভুল পথে চলিতেছে। এ পথে চলিলে একটা নৈতিক তর্কজালে বিজড়িত হইয়া পড়িব মাত্র, আর কোন লাভ হইবে না। আসল কথা হইতেছে, মন-খারাপ হয় কিসে? যাহা অন্যায় এবং অসঙ্গত, তাহা দেখিয়াই যে আমরা সকল সময় বিরক্ত হই, তাহা তো নয়। আমাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার নিক্তিতে ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা সব সময়ে চলে না। গ্রীষ্মকালে উত্তাপাধিক্য এবং বর্ষাকালে সলিল-বহুলতা ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই আনন্দজনক নহে। বরং ইহাই সত্য কথা, যাহা বিরক্তিকর তাহা ন্যায়সঙ্গত হইলে আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। তাহাকে গালি দিবার অথবা প্রতিরোধ করিবার ন্যায্য উপায় না থাকায় তুষ্ণী ক্রোধ নিরুদ্ধ আক্রোশে গুমরাইয়া মরে। হয়তো পুত্রের এই কার্য অতিশয় ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই গৃহিণীর

মনোকষ্টের কারণ হইয়াছে। ইহা যদি আইন-অনুযায়ী প্রতিবাদযোগ্য হইত, তাহা হইলে হয়তো এ অশান্তি হইত না ; এমন কি পুত্রের এই অন্যায় অন্যায়ভাবে ক্ষমা করিয়াই গৃহিণী সুখী হইতেন। কিন্তু মনোকষ্ট হইল কেন ? হেতুটা কি ?

সহসা মনে হইল, ভৃত্যের সাহায্য ব্যতিরেকে এই অন্ধকারে কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাইব না। অবিলম্বে তাহাকে ডাকিলাম এবং তামাক দিতে বলিলাম।

॥ ৩ ॥

তাম্রকূটের বুদ্ধি-বিকাশিনী শক্তি আছে কি না জানি না, অন্তত সে সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করিতে আমি অপারগ। কিন্তু ইহা ঠিক যে, উপর্যুপরি দুই ছিলিম শেষ করিয়া তৃতীয় ছিলিমের প্রারম্ভে মনে হইল, অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

অকস্মাৎ মুদিত নয়নের সম্মুখে একটি ষোড়শী তন্বী মূর্তিপরিগ্রহ করিল। নবযৌবনের যাদুমন্ত্রে লাবণ্যময়ী মোহিনী মূর্তি, কিন্তু চোখে জল। গভীর নিশীথে একা বসিয়া কাঁদিতেছে। সম্মুখে ভাত ঢাকা রহিয়াছে। একটু পরে এবং একটু অপ্রস্তুতভাবে তাহার স্বামী আসিয়া প্রবেশ করিল এবং গলা খাঁকারি দিয়া সসঙ্কোচে বলিল, মানে, একটু রাত হয়ে গেল।

তন্বী নীরব।

যুবক আড়চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া সম্ভবত কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিল, কমলদার ওখানে, মানে—ও কি, তুমি কাঁদছ নাকি ?

ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার অবকাশ না দিয়া মেয়েটি বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং পাশ-বালিশ আঁকড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া যুবকটিও বিছানায় বসিল এবং আকুলভাবে যে সব কাণ্ড করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করিতে পারিব না। কারণ সেগুলি বর্ণনীয় নহে, অনুমেয়। মোট কথা, যুবকটির বাহাদুরি আছে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মিনিট দশেকের মধ্যেই সে পত্নীর মুখে হাসি ফুটাইয়া ছাড়িল। ঢাকা-দেওয়া-ভাত আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে যুবকটি যখন শয়ন করিল, তখন পত্নী পতির গলা

জড়াইয়া ধরিয়া বহুবারপৃষ্ট সেই প্রশ্নটি পুনরায় করিল, বল, তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাস না ? কক্ষণও বাসবে না ? কক্ষণও না ?

অবিচলিত-কণ্ঠে যুবক বহুবার-প্রদত্ত সেই উত্তরটি পুনরায় দিল, পাগল !

তোমার কমলদাকে বেশি ভালবাস, না, আমাকে ?

তোমাকে।

সত্যি বলছ ?

সত্যি।

আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বল তো ?

যুবক তাহাই বলিল। অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই, তাহা ছাড়া ভোরে উঠিয়াই কমলদার কাছে যাইতে হইবে, কথা দিয়া আসিয়াছে। স্ত্রীকে সে যে ভালবাসে না, তাহা নহে , কিন্তু কমলদাকেও সে ভালবাসে। স্ত্রী কিন্তু অবুঝ, শঙ্কিতা, অভিমানিনী। ভালবাসার ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রতিদ্বন্দ্বীও তাহার পক্ষে অসহ্য।

দৃশ্য পরিবর্তিত হইল।

কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বামীর প্রণয় একনিষ্ঠ কি না, সে প্রশ্ন করিবার আর অবসর নাই। যুবতীর কোলে শিশু। তাহাকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, কাজল-পরানো, ঘুম-পাড়ানো, সাজানো-গোছানো—ক্ষুদ্র শিশুকে ঘিরিয়া নানা ব্যস্ততা, নানা প্রয়োজন, নানা আয়োজন। তাহার অসুখে চিন্তা, সুখে আনন্দ। স্বামী আছে, অন্তরেই আছে, কিন্তু ঈষৎ অন্তরালে। স্বামীই এখন একমাত্র অবলম্বন নহে। শিশুপুত্রকে অবলম্বন করিয়া সুখ-স্বর্গ গড়িয়া উঠিয়াছে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য আসিতেছে ও যাইতেছে। বিগত জীবন-নাট্যের দৃশ্যগুলি দ্রুতচ্ছন্দে যেন পুনরায় মানসপটে মূর্ত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

শিশু বড় হইতেছে। মায়ের কোল হইতে পাঠশালা—স্কুল—কলেজ। কিন্তু মায়ের কাছে সে এখনও শিশু। এখনও তাহার জামা, খাবার, এমন কি বই খাতা কাগজ পেন্সিল সব গুছাইয়া দিতে হয়। বড় হইলে কি হইবে, মা না হইলে এক দণ্ড চলে না। সর্বদাই মা—মা। স্বামী ? স্বামী পুরুষকারের আবর্তে আবর্তিত। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই আছে, কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা

কবিত্বমূলক নহে, প্রয়োজনমূলক। এখন স্ত্রী স্বামীর কর্তব্যপরায়ণা সহধর্মিণী, প্রেমবিহ্বলা প্রণয়িনী নহেন। যুবক পুত্রই এখন তাহার নয়নের মণি। তাহাকে ঘিরিয়াই এখন যত স্বপ্ন, যত আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগ। তাহাকে সুখী করিবাই জন্যই যত আকুলতা, তাহার আনন্দ-বিধানের জন্যই জননীহৃদয় উন্মুখ।

জননীর আগ্রহাতিশয্যেই মহাসমারোহে পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। দেখা গেল, মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিয়াছে। বধূ শুধু রূপবতী নহে, গুণবতীও। আত্মীয়-স্বজন সকলেই প্রফুল্লিত। ক্রমশ স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পুত্রের মন-মধুকরও রূপবতী গুণবতী বধূর চতুর্দিকে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। পত্নীই এখন তাহার সব। সে-ই তাহার কাপড় গুছাইয়া দেয়, তাহার খাবার লইয়া যায়, তাহার সর্ব প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দেয়। পুত্রের উৎসুক মন, আকুল নয়ন এখন যাহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফেরে, সে জননী নহে—বধূ। বধূই এখন সব।

জননীর এখন প্রাণপণ চেষ্টা মুখের হাসিটুকু যেন বজায় থাকে। অনিবার্যভাবে তবু মাঝে মাঝে মেঘ দেখা দেয়।

॥ ৪ ॥

বাড়ির ভিতর গেলাম। শুনিলাম, গৃহিণী ঠাকুর-ঘরে। ধীর পদসঞ্চারে গিয়া দেখিলাম, ঠাকুরের সম্মুখে পট্টবস্ত্র-পরিহিতা নারী উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পাথরের ঠাকুরকে ঘিরিয়া নানা উপচার—থরে থরে ফুল ফল নৈবেদ্য, ধূপধুনা নীরবে পুড়িতেছে, ঘৃত-প্রদীপের অকম্পিতা শিখা ঊর্ধ্বমুখিনী। নারী-হৃদয় একা থাকিতে পারে না। অবলম্বন চাই, আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কিছু একটা চাই,—এমন একটা কিছু, যাহা চিরকাল তাহারই থাকিবে, অপর কাহারও হইবে না। রক্তমাংসে-গড়া নির্মম মানুষ থাকে না, চলিয়া যায়। সে চিরপরিবর্তনশীল, নিত্য নূতন নিগড় পরিতেছে ও ভাঙিতেছে। পাথরের দেবতা অনড়, অচল, অবিচলিত।

চিরন্তন প্রস্তর-দেবতার পদপ্রান্তে চিরন্তনী নারীকে অবনমিত দেখিয়া

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মানসপটে আবার সেই পুরাতন দৃশ্যটি ফুটিয়া উঠিল। তন্বী ষোড়শী স্বামীর গলা জড়াইয়া বলিতেছে—বল, তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাস না? কক্ষণও বাসবে না? কক্ষণও না?

নিবিড় পরিচয়

॥ ১ ॥

যুগলবাবু লোকটিকে আগে অবশ্য চিনিতাম, অল্প দিন হইতে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। কিছুকাল পূর্বে ভদ্রলোক সুগন্ধি কেশতৈলের ব্যবসায় করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখনও সে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু অধুনা গোপনে গোপনে (কেন যে গোপন করিতেছেন,জানি না) তিনি কেরোসিন তৈলের ব্যবসাতেও লিপ্ত হইয়াছেন শুনিতেছি। চোরাবাজারেও যাতায়াত আছে। রাই কুড়াইয়া একটি নয়, কয়েকটি বেলই তিনি বানাইয়াছেন—এইরূপ জনশ্রুতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অর্থবান বলিয়া ভদ্রলোকের এতটুকু অহমিকা নাই,তাঁহার নিজের হৃদয় তো সর্বদাই গলি-গলি করিতেছে, তাঁহার সংশ্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাও নিস্তার পান নাই—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

আসিয়াই বলিলেন, একটা সিগারেট দিন।

দিলাম। সিগারেট ধরাইয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একতাড়া নানা রঙের খামের চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, পঁচিশ জনের চিঠি, বাড়িতে আরও অনেক আছে।

উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সহসা বক্তৃতা দিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এই বাই আমার আছে এবং একবার চাগিলে রোধ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সোৎসাহে বলিলাম, একটি বক্তৃতা দিব শুনিবেন কি?

সিগারেটে টান মারিয়া যুগলবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। বলুন বলুন, আপনার কথা শুনিতে আমার বেশ লাগে।

হাঁটু দোলাইতে লাগিলেন। আমিও গলা-খাঁকারি দিয়া শুরু করিলাম, দেখুন, পুরাকালে ফুলবাগানের শখ ছিল। শখ ছিল, কিন্তু সুবিধা ছিল না।

যে বস্তু থাকিলে মানবের অধিকাংশ আধিভৌতিক অসুবিধাই বিদূরিত হয়, সেই বস্তুটিরই অভাব ছিল—টাকা ছিল না। অল্প মাহিনায় সর্বদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে যে সকল কলাকৌশল ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ব সরলতা-কপটতার চর্চা করিতে হয়, আমাকেও সে সকল করিতে হইয়াছিল। দারুণ দুর্যোগের মধ্যে ফুটা সংসার-তরণীটাকে ময়ূরপঙ্খীর মত সাজাইয়া সগৌরবে যে বিদ্যার জোরে সেটি তীরস্থ করিয়াছি, তাহাকে ভোজবিদ্যা আখ্যা দিলে অসঙ্গত হইবে না। বাক্‌চতুর বাজিকর অন্যমনস্ক দর্শকের মূঢ়তার সুযোগ লইয়া যেভাবে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়া দেখায়, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত আমিও সম্ভবত ভোজবিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়াই সেই ভাবে বাহিরের ভড়ং বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই জাতীয় কোন একটা অঘটন-পটিয়সী নিপুণতা না থাকিলে আমার অল্প আয় সত্ত্বেও শোভনতার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ কোন নিমন্ত্রণ বাড়িতে অথবা থিয়েটার-সিনেমায় গৃহিণীকে বেশবাস-অলঙ্কার-দৈন্যে কখনও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতে হয় নাই, বাড়ির ভোজ-কাজে শাকভাজা চচ্চড়ি হইতে শুরু করিয়া লুচি, পোলাও, দইমাছ, মাছের কালিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, মাংসের কোর্মা, কাটলেট, চপ, দ্বিবিধ ডাল, চাটনি, দই, পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশ, বুঁদিয়া, জিলাপি, পুডিং, কাস্টার্ড প্রভৃতি শালপাতার উপর থরে থরে সাজাইয়া হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীস্টান তিনটি সভ্যতারই মান-রক্ষা করিয়াছি ; নিজের দরিদ্র আত্মীয় অথবা আত্মীয়াকে অকারণে কখনও কিছু কিনিয়া দিবার সামর্থ্য হয় নাই বটে, কিন্তু লৌকিকতা-ব্যাপারে ছোট নজরের পরিচয় দিয়াছি—অতি বড় শত্রুও এ কথা বলিতে দ্বিধা করিবে। সংক্ষেপে চিঠির ভাষা ও ভাব যেমনই হউক না কেন (তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না), চিঠির কাগজ, বিশেষত চিঠির লেফাফা দ্বারা সকলকে সম্মোহিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। এই অসাধ্যসাধনের ইতিহাস একাধিক কুসীদজীবী মহাজনের খাতায় কড়ায় ক্রান্তিতে বিধিবদ্ধ হইয়া আছে।

অভিভূত যুগলবাবুর হাঁটু-নাচানো বহুক্ষণ পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সুযোগ পাইয়া তিনি কণ্ঠাগত প্রশ্নটিকে বাঙ্ময় করিলেন, "সবই বুঝিলাম, কিন্তু যাহা বলিলেন তাহার সহিত আমার এই চিঠিগুলির সম্পর্ক কি ?"

সম্পর্ক কিছুমাত্র নাই। বক্তৃতা দিতে হইলে অবান্তর কথা দুই-চারিটা

অনিবার্যভাবেই আসিবে, উহাতে কিছু মনে করিবেন না। আসল কথা, ফুলবাগানের শখ ছিল। কিন্তু তখন সমাজের যে স্তরে বিরাজ করিতাম, সে স্তরে এ শখের মূল্য কেহ দিত না; সুতরাং ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইতাম। দামী জুতা, শাল, গহনা অথবা শাড়ির জন্য অর্থ জুটাইতে হইত, কারণ সেগুলি প্রতিবেশীগণের অন্তরে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এবং হিংসার উদ্রেক করিয়া বিচিত্র পদ্ধতিতে আমাদের সুখোৎপাদন করিত। সংক্ষেপে ফুলবাগানের জন্য উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকিত না, এবং উঠানের এক কোণে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া-আনা কয়েকটি ফুলগাছ পুঁতিয়া সসঙ্কোচে মনের শখ মিটাইতাম। আমার সেই নগণ্য বাগান কোন লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু সে যুগের আমার লেফাফা-লাঞ্ছিত জীবনে উঠানের সেই ছোট বাগানটুকুই আমার প্রাণের সত্যকার আশ্রয় ছিল। ওইটুকুর মধ্যেই কোন লেফাফা ছিল না। বস্তুত সেই ছোট বাগানটিকে আজও আমি ভুলি নাই। সর্বসমেত বোধ হয় গুটি দশেক গাছ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি আমি চিনিতাম। প্রতি গাছের প্রতি ফুলটির উন্মেষ হতেই অবসান পর্যন্ত লক্ষ্য করিতাম। কোন্ গাছে কখন কুঁড়ি হইল, কুঁড়িটি কতদিনে ফুটিয়া ফুল হইল এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িল—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়াইত না। প্রত্যেক গাছের প্রতিটি আচরণ সাগ্রহে দেখিতাম। মনে হইত, উহাদের ভাষা যেন আমি বুঝি। প্রথম যেদিন গোলাপ গাছটায় কুঁড়ি হইল, সেদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মনে হইয়াছিল, গোলাপ গাছটার ডালে ডালে পাতায় পাতায় বেশ যেন একটু অহঙ্কার ফুটিয়াই উঠিয়াছে, বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন বলিতেছে—কেমন কুঁড়ি হইয়াছে, দেখিতেছ তো!

সেই ফুল ফুটিয়া যখন ঝরিয়া গেল, তখন তাহার নীরব শোকও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাহার পর দ্বিতীয় ফুলটি যখন ফুটিল, তখন তাহারও মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু তাহা বিষণ্ণ সশঙ্ক। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। প্রতিদিন দুই-একটি ফুল ফুটিত, দুই-একটি ঝরিত। প্রতি গাছটির হাসি-কান্না আমি শুনিতে পাইতাম। আমার বাগান নগণ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতেই আমি তন্ময় হইয়া থাকিতাম।

যুগলবাবু ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত করিয়া একবার আমার প্রতি চাহিলেন। একটু থামিয়া আমি পুনরায় শুরু করিলাম, তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে।

আমার প্রথম জীবনের অর্থকৃচ্ছ্রতা আর নাই। বাগান বড় করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি হইয়াছে এবং সত্য সত্যই বাগানকে বিস্তৃত করিয়াছি। এখন আমার বাগানখানা ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে অন্ততপক্ষে এক বেলা কাটিয়া যায়। অনেকখানি জমি, অনেক রকম যন্ত্র, অনেক রকম গাছ, অনেকগুলি মালী জুটাইয়া বাগানের খ্যাতি বাড়াইয়াছে। আভিজাত্যগর্বিত বহু দুর্লভ ফুল আমার বাগান আলো করিতেছে; কিন্তু আমার সেকালের সেই ছোট বাগানের শীর্ণ গাঁদা, কীটদষ্ট গোলাপ, অপরিপুষ্ট মল্লিকা, আলোক-বঞ্চিত রজনীগন্ধাকে আজিও ভুলি নাই। তাহাদের যত ভালবাসিতাম, ইহাদের তত ভালবাসি না। ইহাদের আমি চিনিই না। এই ভিড়ের সহিত আমার প্রাণের পরিচয় নাই। সহস্র সহস্র ফুল রোজ ফুটিতেছে ও ঝরিতেছে—খবর রাখা আর সম্ভবপর নহে। ইহাদের সকলের কুল, গোত্র, বংশপরিচয়, বৈশিষ্ট্য অবশ্য অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি। আপনিও পারিবেন, কারণ যে কোন ভাল ক্যাটালগে তাহা আছে। শুধু ফুল কেন, বইয়ের কথাই ধরুন না। সেকালে যখন বই কিনিবার ক্ষমতা ছিল না, অপরের বই চাহিয়া অথবা চুরি করিয়া যখন পড়িতে হইত, তখন কি আগ্রহেই না পড়িতাম! প্রত্যেকটি পুস্তকের সহিত, প্রতি পুস্তকের প্রতি পাতাটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। এখন নিজের লাইব্রেরি প্রকাণ্ড, প্রতিমাসে নানা দেশের বিখ্যাত লেখকদের বই কেনা হইতেছে, কিন্তু সে আগ্রহ তো আর নাই। আলমারিতে সারি সারি বই জমিতেছে, অধিকাংশ পুস্তকেরই বাহিরের সৌষ্ঠব দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছি, হয়তো দুই-একখানা খুলিয়া দুই-চারি-পাতা উল্টাইতেছি, উহাদের সম্বন্ধে দুই-চারিটা ধার-করা জ্ঞানগর্ভ বুলিও হয়তো আওড়াইতে পারি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না। যাহাদের চিনি, বহুপূর্বেই তাহাদের চিনিয়াছি। নূতন করিয়া চিনিবার আগ্রহ আর নাই। এখন যাহা আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার আগ্রহ।

যুগলবাবু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, এ চিঠিগুলার সম্বন্ধে কি বলিতে চান?

বলিতে চাই, আপনার বাগান অথবা লাইব্রেরিটি মন্দ নয়। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে বলে, এ গুড কালেক্‌শন। শত বাধাসত্ত্বেও কখনও লুকাইয়া কাহাকেও যদি ভালবাসিয়া থাকেন (বাসিয়াছেন কি না জানি না), তাহা

হইলে সেই একমাত্র ভালবাসা যাহা সত্য, এবং তাহাকে যদি আপনি সত্য-মর্যাদা না দিয়া থাকেন ঠকিয়া গিয়াছেন।

বাকিগুলি ?

বাকিগুলি আপনার অর্থ, খ্যাতি অথবা রূপের টানে স্বতই জুটিয়াছে অথবা আপনি জুটাইয়াছেন। বলিলাম তো, গুড কালেক্‌শন। কিন্তু উহারা আমার বর্তমান বাগানের ফুলের মত। আয়ত্তের মধ্যে থাকিয়াও অনায়ত্ত।

কেন ?

আসল কথা কি জানেন ? আমরা যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের প্রাণ সত্যই এত বড় অথবা মজবুত নহে যে, একাধিক নিবিড় পরিচয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারে। সত্যকার প্রেম বড় সঙ্গীন বস্তু। অধিকাংশ লোকের জীবনে তাহা আসেই না। কিন্তু মজা এই যে, অধিকাংশ লোকই একাধিক রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া মনে করেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই আদি-অন্ত তিনি নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। আসলে আমরা প্রায় সকলেই দরিদ্র দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, পিটুলি-গোলা পান করিয়া উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতেছি।

এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। সহসা মনে পড়িয়া গেল, প্রাণকান্তের নির্বন্ধাতিশয্যে সন্ধ্যাবেলায় এক গ্লাস সিদ্ধি পান করিয়াছি। বিবেকের ধমকে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বার দুই ঢোক গিলিলাম। যুগলবাবু বলিলেন, দিন মশাই, আর একটা সিগারেট দিন।

দিলাম।

যুগলবাবু সিগারেটটি ধরাইয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল, আহা, লোকটি মানুষ না হইয়া যদি গাছ হইত, বাগানে পুঁতিয়া রাখিতাম।

অবচেতনা

॥ ১ ॥

বহুকাল পরে একটি বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা হইল এবং বহুকাল পরে প্রাণ ভরিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়া ভারি আরাম বোধ করিলাম। কিন্তু সেই আরামজনক কথাগুলি যদি আপনাদের বলি, আপনারা কেহ হয়তো বিস্মিত হইবেন, কেহ বিস্মিত হইবার ভান করিবেন, কাহারও নাসা হয়তো

কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে। হওয়াই উচিত ; কারণ যে আলাপগুলি করিলাম, তাহা ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান অথবা সমাজনীতি-বিষয়ক তো নহেই, উপরন্তু দুর্নীতিমূলক—সামাজিক কর্ণ-গোচরযোগ্য নহে। আমার পুত্র অথবা পুত্রস্থানীয় কেহ এরূপ আলোচনা করুক, তাহা আমি চাহি না। নিজে কিন্তু করিয়া ভারি তৃপ্তি পাইলাম। অনেকদিন পরে মনটা যেন খোলসা হইয়া গেল।

সকলের নাসাই যে কুঞ্চনপ্রবণ নহে, তাহা জানি, আমি বাল্যবন্ধুটির সহিত কি আলোচনা করিলাম, তাহা জানিবার জন্ত অনেকেই হযতো উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। সংস্কারে বাধিতেছে। এখনও জামা-কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হই, হুটবিহারী-মুখনিঃসৃত অশ্লীল বচনগুলি অনাবৃতভাবে লিখিয়া ফেলিবার মত সৎসাহস সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। লেখা দূরে থাকুক, সকলের নিকট সে কথাগুলি বলিতেও বাধিবে। ইহা কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সকলের কাছে বলিতে না পারিলেও কথাগুলি শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি। পুলকিত হইয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি না এই কারণে যে, আমি জানি, অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট অশ্লীল কথা বলিয়া অথবা শুনিয়া (অথবা দুইই করিয়া) যাহারা পুলকিত হন, তাঁহারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নহেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? আমরা যাহাদের সহিত অশ্লীল প্রসঙ্গ করিতে পারি, তাহারা আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ। অতিশয় শ্লীল ভদ্রব্যবহার ও সম্ভ্রমপূর্ণ শিষ্টাচার-সঙ্গত যাহারা, তাঁহাদের কিন্তু আমরা বৈঠকখানা হইতেই বিদায় করি। অন্তরলোকে স্থান দিই তাহাদের, যাহাদের নিকট আমরা আবরণ উন্মোচন করিতে পারি। অধিকাংশ লোকের নিকট মন এবং মুখ খোলা চলে না তাহা সত্য , কিন্তু যাহাদের নিকট খোলা চলে, তাহারা অন্তরঙ্গ এ কথাও সত্য। সমাজে উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করা সুরুচির পরিচয় নহে তাহা ঠিক ; কিন্তু যে স্থানে আমরা অসঙ্কোচে উলঙ্গ হইতে পারি (যথা, বাথরুম) তাহা যে আমাদের অতিশয় প্রিয় স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'প্রিয় স্থান' বলিতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, 'প্রয়োজনীয় স্থান' বলিলে, আশা করি, তিনি প্রতিবাদ সম্বরণ করিবেন। যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই প্রিয় কি না, অনায়াসেই এ বিষয়ে খানিকক্ষণ বাগ্‌বিস্তার করা চলে—সুযোগও আসিয়াছে, তথাপি কিন্তু নিরস্ত হইলাম। আপনাদের প্রতি অনুকম্পাবশত নহে, বর্তমান বিষয়টিই বর্তমানে আমার মস্তিষ্ককে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। যাহাদের সহিত

অশ্লীল আলোচনা করি, তাহারা আমাদের প্রিয় কেন—এই চিন্তাই এখন চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে। ভাবিতেছি, ছুটবিহারীর আর তো কোন গুণ নাই, গুণের মধ্যে সে অনর্গল খারাপ কথা বলিয়া যাইতে পারে। শুধু তাহাই নয়; এমনই তাহার শক্তি যে, খানিকক্ষণ তাহার সাহচর্যে থাকিলে অন্তর্নিহিত অশ্লীলতাকে সে টানিয়া বাহির করিয়া আনে, এবং কিছুক্ষণ পরে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আমিও নিখাদ বৈদিক ভাষা পুরোদমে ব্যবহার করিতেছি। ভারি ভাল লাগে। কিন্তু কেন?

॥ ২ ॥

সভ্যতার ভাঁওতায় একটা কথা আমরা অহরহ ভুলিয়া যাই যে, আমরা পশু। যে কোন পশুর মতই আমাদের পাশবিক প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যে কোন পশুর মতই আহার-নিদ্রা-মৈথুন-প্রবৃত্তি মর্মান্তিকভাবে আমাদের মজ্জাগত। ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই প্রবৃত্তিত্রয়কে নানা ভাবে প্রশমিত করিবার প্রচেষ্টাই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা। বর্তমান সভ্যতার উজ্জ্বল শিখা যে প্রবৃত্তির তৈলেই জ্বলিতেছে, তাহা মনে রাখিলে অনেক অকারণ ক্ষোভের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আদিম অসভ্য মানুষ সমাজসৃষ্টিও করিয়াছিল এই প্রবৃত্তিরই বশে। পরস্পর মারামারি কাটাকাটি না করিয়া যাহাতে মনুষ্যনামধেয় পশুগুলি সুখে-স্বচ্ছন্দে তাহাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলির চর্চা করিতে পারে, অন্যান্য প্রাণী হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নিছক প্রাণী হিসাবেই যাহাতে তাহারা বাঁচিতে পারে, সমাজ এবং সমাজনীতি সৃষ্টি করিয়া মানুষ সেই ব্যবস্থায় করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যেই সেই ব্যবস্থাকে অব্যবস্থিত করিবার বীজ নিহিত থাকে। সামাজিক নীতির মধ্যেই সামাজিক দুর্নীতির বীজও নিহিত ছিল। সামাজিক নিয়ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত সামাজিক বিধানগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, এবং সেই জন্যই ব্যক্তির বিকাশের অথবা আনন্দের পক্ষে সকল সময়ে অনুকূল নহে। আরও মুশকিল এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রবৃত্তি মূলত এক হইলেও একেবারে এক নহে। আহার-নিদ্রা-মৈথুন বিষয়ে প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তিও যত, বৈশিষ্ট্যও তত। কোন একটা নিয়মে তাহাদের স্ফূর্তি না হইলে সমাজে নিত্যনূতন সমস্যার

আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মানুষ আহার-নিদ্রা-মৈথুন বিষয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য সততই উন্মুখ; বস্তুত উহা রক্ষা করিতে না পারিলে সে সুখী হয় না, এবং ঐ সুখটুকু লাভ করিবার জন্য সে সমাজের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে দ্বিধা করে না। আসলে সে নিজেকেই মানে, নিয়মকে নয়। অসুখের সময় নিষিদ্ধ আহারের জন্য মন প্রলুব্ধ হইয়া উঠে, ট্রেনে ভিড় হইলে বেশি করিয়া ঘুম পায়, চুরি করিয়া খাইতে অথবা অভদ্রতা করিয়া ঘুমাইতে আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করি না। আহার এবং নিদ্রার কথায় একটা কথা মনে হইতেছে। আহার এবং নিদ্রা বিষয়ে সমাজ যতটা উদার, মৈথুন বিষয়ে ততটা নয়। যাহা খুশি আহার করিয়া যেখানে খুশি নিদ্রা দিলে আজকাল খুব একটা গুরুতর অপরাধ হয় না। মৈথুন বিষয়ে 'যাহা খুশি' প্রবৃত্তিটা আছে, কিন্তু 'যাহা খুশি' স্বাধীনতাটা নাই। স্বাধীনতা না থাকিবার আরও একটা সঙ্গত কারণ আছে। আহার এবং নিদ্রার উপকরণ মানুষ নহে, কিন্তু মৈথুনের উপকরণ মানুষ। সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-অনিচ্ছা-বিবেচনা-বিশিষ্ট একটা মানুষকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং উদারতম সমাজেও এ ব্যাপারে কিছু না কিছু বিঘ্ন চিরকালই থাকিবে—'যা খুশি' চলিবে না, কারণ অপর পক্ষেরও 'যা খুশি' আছে। সেটা না মানিবা উপায় নাই। স্বপ্ন এবং হুটবিহারী সুতরাং অনিবার্য। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সম্বন্ধে চিরকালই গোপনে অনিবার্যভাবে আলোচনা করিবে এবং সব সময় তাহা যে শ্লীলতার সীমা মানিয়া চলিবে, তাহা বলিবার মত মিথ্যা-পটুতা আমার নাই। যাহারা এই সীমা লঙ্ঘনের সঙ্গী, তাহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা স্বাভাবিক, কারণ অমোঘ প্রবৃত্তির সূত্রই তাহাদের বন্ধন। সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রচলিত বিধান অমান্য করিতেছে বলিয়া এই বন্ধন আরও দৃঢ় এবং মধুর। বাল্যকালে নিস্তব্ধ দুপুরে গুরুজনদের নিদ্রার সুযোগে চুপি চুপি আচার চুরি করিয়া যাহার সহিত চাখিয়া চাখিয়া তাহার রসাস্বাদন করিতাম, যে নিয়ম অনুসারে সে আমার অন্তরঙ্গ ছিল, হুটবিহারীও সেই নিয়ম অনুসারে আমার অন্তরঙ্গ। যাহারা প্রতিভাবান এবং প্রবল, তাহারা স্বকীয় শক্তিবলে সমাজের বুকের উপর বসিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া সগর্বে খোলাখুলিভাবে ব্যক্তিত্ব-বিরোধী সামাজিক আইনকে অমান্য করে, আমাদের মত দুর্বলেরা করে লুকাইয়া। আমরা আলেক্‌জাণ্ডারের দলে নই, রবারের দলে। কিন্তু আইন অমান্য আমরা সবাই করি, করিয়া সুখ পাই বলিয়াই করি। নিরঙ্কুশভাবে

পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত সমাজের যেমন প্রয়োজন, অচরিতার্থ ব্যক্তিগত পশুপ্রবৃত্তিকে ভাষা দিবার জন্ত হুটবিহারীরও তেমনই প্রয়োজন। বিশ্বের অন্তান্ত প্রাণীগণের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত আমরা দলবদ্ধ হইয়া যেমন সমাজ গড়িয়াছি, তেমনই সমাজের প্রকোপ হইতে নিজেকে মুক্তি দিবার জন্ত হুটবিহারীকে আবিষ্কার করিয়াছি। অর্থাৎ যেখানে মানুষ পশু, সেখানেই তাহার দল চাই, সঙ্গী চাই, সমাজ চাই, হুটবিহারী চাই। যেখানে সে পশুত্বকে অতিক্রম করিয়াছে, সেখানে সে একক।

আর কতটা বাকি ?

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত নিঃশব্দে কখন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বুঝিতে পারি নাই। দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতেছে। লজ্জিতমুখে লেখনী সম্বরণ করিয়া বলিলাম, ব'স।

উপবেশনান্তে প্রাণকান্ত বলিলেন, দেখি।

খাতাখানা দিলাম।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। উপরোক্ত প্রবন্ধটি আত্মোপান্ত পাঠ করিয়া স্মিতমুখে তিনি মন্তব্য করিলেন, বেশ কায়দা করিয়া ভিন্ন পথ ধরিয়াছ দেখিতেছি। আমি মনে করিয়াছিলাম, নৃত্যের উপকারিতা বা চমৎকারিতা সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছ বুঝি।

মানে ?

প্রাণকান্ত বলিলেন, কাল রাত্রে নাচ দেখিবার পরই যে তোমার অবচেতন মন হুটবিহারীকে খাড়া করিয়াছে, তাহা তো পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে। নটীর নৃত্যঘটিত আঙ্গিক অশ্লীলতাকে তুমি হুটবিহারীর চিত্তঘটিত বাচনিক অশ্লীলতায় রূপান্তরিত করিয়াছ। মন্দ হয় নাই।

আরে, না না, কি যে বল তুমি !

প্রাণকান্ত নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, মেয়েগুলি নাচে ভালই। আমি তো ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়া আসিলাম, তুমি কতক্ষণ ছিলে ?

শেষ পর্যন্ত।

প্রাণকান্ত আর একটু হাসিলেন।

অতি-আধুনিকতা

॥ ১ ॥

সম্মুখের বৃদ্ধ বটগাছটায় নব পত্রোদ্গম হইয়াছে। কচি কচি সবুজ পাতায় সমস্ত গাছটা ভরা। বৃদ্ধ গাছের শাখায় শাখায় অতি-আধুনিকতার বিজয়-নিশান উড়িতেছে। একটুও বিসদৃশ মনে হইতেছে না, বরং ভালই লাগিতেছে। মানুষের অতি-আধুনিকতায় কেমন যেন একটা ডেঁপোমির গন্ধ থাকে, গাছের অতি-আধুনিকতায় তাহা নাই। অনাবশ্যক আতিশয্যে তাহা ভারাক্রান্ত নহে, সহজ সরল সুস্থ অভিব্যক্তি। অতি-আধুনিক মানব-মানবী কিম্ভূতকিমাকার জীব। অদ্ভুত ধরনের কাছা কোঁচা, শাড়ি পাজামা, বিচিত্র ঢঙের শেমিজ কামিজ ব্লাউজ পাঞ্জাবি, নানা ছাঁটের গোঁফ দাড়ি চুল ভাষা ভঙ্গি—অভূতপূর্ব একটা জগা-খিচুড়ি। স্বাতন্ত্র্য-প্রকাশের এই গা-জ্বালানো জবরদস্তি চুলে হেঁচকা টান মারিয়া চোখে খোঁচা দিয়া যেন বলে—দেখ না বাপু, একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখ। সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে ভালও যদি কিছু থাকে, তাহাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই। এই বুড়ো গাছটা কচি কচি সবুজ পাতায় সাজিয়াছে, একটুও তো খারাপ লাগিতেছে না, বরং উহার স্নিগ্ধশ্যামল রূপ দেখিযা চোখ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভাবিতেছি, কেন এমন হয়? গাছের অতি-আধুনিকতা এত সুশ্রী, মানুষের অতি-আধুনিকতা এত বিশ্রী কেন? গাছের মত মানুষও তো প্রাণের তাগিদেই নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষের প্রকাশ এমন শ্রীহীন হয় কেন?

॥ ২ ॥

চিন্তা করিতে গিয়া প্রথমেই একটা সমস্যায় পড়িয়াছি। আরও মুশকিল এই যে, সমস্যার সমাধান সহজ বলিয়া মনে হইতেছে না। কোন বিষয়ে সম্যকরূপে চিন্তা করিতে গেলে এমন মুশকিলে পড়িতে হয়! গাছের অতি-আধুনিকতা কেন সুন্দর তাহা চিন্তা করিতে বসিয়া হঠাৎ মনে হইতেছে, আমরা তো অপরের সব কিছুই সুন্দর দেখি। পরের স্ত্রী, পরের বাড়ি, পরের গাড়ি, পরের চেহারা, পরের সভ্যতা, পরের সব কিছুই আমাদের চোখে নিজের সব কিছুর অপেক্ষা সুন্দরতর। সমস্ত মানবজাতিটাই প্রলুব্ধ নয়নে পরের

দিকে চাহিয়া আছে। গাছ, পাখী, প্রজাপতি—অর্থাৎ যে সব জিনিস লইয়া আমরা কবিত্ব করি—তাহারা একেবারে অন্য পর্যায়ের জীব—চরম পর। সেই জন্যই কি ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের মোহ এত প্রবল? একটা গাছ আর একটা গাছ সম্বন্ধে হয়তো ততটা উচ্ছ্বসিত নহে, তাহারা হয়তো নিজেদের অতি-আধুনিকতা লইয়া মর্মর-ভাষায় পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং আমাদের ছাঁটা গোঁফ, লম্বা জুলফি দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কে জানে! পাখীরাও হয়তো তাই।

হয়তো-মূলক এই সম্ভাবনাটা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু ইহাও ঠিক, কেবল এইটাকে আঁকড়াইয়াই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিব না। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে হয়তো-সৃষ্ট একটা প্রকাণ্ড স্বপ্নলোক আছে, কিন্তু আমরা সে স্বপ্নলোকে বেশিক্ষণ থাকিতে পারি না, কল্পনা-কুহেলিকায় মন দিশাহারা হইয়া পড়ে। আমরা 'নয়তো' বলিয়া সেখান হইতে পলাইয়া আসি এবং বাস্তবলোকের কঠিন ভূমিতে দাঁড়াইয়া একটা স্পষ্ট কিছুকে আশ্রয় করিতে চাই।

এ সম্বন্ধে সুতরাং একটা 'নয়তো' খাড়া করা দরকার।

॥ ৩ ॥

চিন্তা করিতেছিলাম।

দৌহিত্র আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বক্র কটাক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, দাদু, আবার তুমি বালিশটাকে কনুই দিয়ে অমন করে ঠেসছ! ফের ফেটে যাবে। কালই তো দিদি সেলাই করে দিলে!

অপ্রস্তুত মুখে উঠিয়া বসিলাম।

এই ছোকরাই কয়েক বৎসর পূর্বে আমার তাকিয়ার উপর উলঙ্গ হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিত এবং তাকিয়া সামলাইতে আমাকেই গলদঘর্ম হইতে হইত। সে-ই এখন আমাকে তাকিয়া সম্বন্ধে সচেতন করিয়া ধমকাইতেছে। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে—

তাকিয়া-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বাটারফ্লাই গোঁফের দিকে চাহিয়া বলিলাম, অমন সুন্দর গোঁফ জোড়াকে বেঁড়ে করেছিস কেন বল্ তো?

এই তো সুন্দর।

সুন্দর! কিসে সুন্দর?

খোলে না। তোমাদের গোঁফ তো দিনরাত ঝুলেই আছে।

কুকুরের লেজ কাটলে কুকুর তেজী হয় শুনেছি, গোঁফও হয় নাকি ?

মুচকি হাসিয়া দৌহিত্র চলিয়া গেলেন।

খোলে না ! গোঁফটাকে অহরহ সমুদ্যত রাখাই হয়তো পৌরুষের লক্ষণ, কিন্তু বাহিরের গোঁফ উচাইয়া রাখিলে কি হইবে, মনের গোঁফ যে বারংবার ঝুলিয়া পড়িতেছে ! ভায়া বোধ হয় সে খবর এখনও পান নাই। মনের গোঁফ এখনও উঠে নাই সম্ভবত। যতদিন না উঠে, ততদিনই ভাল। ও-বাড়ির টুনটুনির সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর হইতেই ভায়ার প্রসাধনের নানা বৈচিত্র্য দেখিতে পাইতেছি। ওই তো রোগা লিকলিকে চেহারা, কেবল গোঁফ ছাঁটিয়াই যদি কেল্লা ফতে করিতে পারে, তাহা হইলে আজকাল ব্যাপার সহজ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যৌবনের (এমন কি বার্ধক্যেরও) সমস্ত সাজ-সজ্জার মূলে আছে যৌন-প্রবৃত্তি। পুরুষেরা নারীদের এবং নারীরা পুরুষদের প্রলুব্ধ করিবার জন্য দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া ধোপা, নাপিত, দরজী এবং মনিহারি দোকানের শরণাপন্ন হইতেছে। ধোপা, নাপিত, দরজী এবং মনিহারি দোকান পরিবর্তনশীল কালের সহিত তাল রাখিয়া মাল সরবরাহ করিতেছে। সেকালের রুচি একালের রুচি এক নয়। পূর্বে আলতা, ঘোমটা, মল, নোলক আমাদের কল্পনাকে আবিষ্ট করিত, আজকাল হাই-হীল জুতা, স্কন্ধ-কাটা জামা, চুনকাম-করা মুখ, হলব-করা শাড়ি না দেখিলে কল্পনা ডিজিতে রাজী হয় না। শ্রোণীভারাদলসগমনা আজকাল আমাদের আদর্শ নয়, আজকাল চাই স্মার্ট—তন্বী। স্কিপিং রোপ কিনিয়া ঘরে-বাহিরে তাই লাফালাফি শুরু হইয়াছে। অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে সকলে চলিতেছে।

চাহিদার নিত্যনূতন রূপ এবং তাহাই অতি-আধুনিকতার জনক কিংবা জননী (ব্যাকরণটা ঠিক করিতে পারিতেছি না)।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, চাহিদা বদলায় কেন ? জীব-জগতের অন্য কোথাও তো চাহিদা বদলায় নাই। আজও ময়ূর ঠিক তেমনই ভাবে পেখম মেলিয়া ময়ূরীকে মুগ্ধ করিতেছে, যেমন সে আগে করিত। পেখম ছাঁটিবার অথবা পেখমের উপর নূতন রকম রঙ ফলাইবার তো তাহার দরকার হয় নাই। সনাতন পেখম মেলিয়া সনাতন পদ্ধতিতেই সে ময়ূরীকে মুগ্ধ করিতেছে। মানুষের বেলাতেই নিত্যনূতন ভজকট কেন ?

॥ ৪ ॥

প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করার পর মনে হইতেছে, ভজকট না হইলে বিস্ময়কর হইত। যে নিঃস্ব, যে দেউলিয়া, সে বিপন্ন হইবে না তো কে হইবে? আমাদের তো কিছুই নাই। একদা আমাদেরও একটা নিজস্ব পেখম ছিল বটে, কিন্তু তাহা তো বহুকাল পূর্বেই আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের সে স্বাভাবিক সুস্থ রূপ আর নাই। বর্তমানে মোটা রোগা নানাভাবে বিকৃত কদর্য যে জীবগুলি মনুষ্য নামে পরিচিত, তাহাদের বহিরাবরণ না হইলে চলিবে কেন? নিজেদের যে কিছু নাই। এই বীভৎস নগ্নতাকে কোন একটা কিছু দিয়া আবৃত করা আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন। উলঙ্গ নিরাভরণ হইয়া কিছুক্ষণ আমরা যদি পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকি, মুগ্ধ হওয়া দূরে থাক্, খুন চাপিয়া যাইবে, উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে খুন করিয়া ফেলিব। প্রকৃতিদত্ত সুন্দর পেখম হারাইয়া ফেলিয়া ঝুটা পেখমের সন্ধানে তাই আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কারণ, পেখমবিহীন জীবন অসম্ভব। সুতরাং বাজারে যখন যেটা পাওয়া যায় ধার করিয়া, ভিক্ষা করিয়া, চুরি করিয়া, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাই আমরা কিনিতেছি। তাই পেখমের এত বৈচিত্র্য, আজিকার পেখম কাল অচল। বাজারে এক জিনিস চিরকাল চলে না। বুদ্ধিই পেখম কিনিবার পরামর্শ দিতেছে, বুদ্ধিই পেখমের কারখানা খুলিয়াছে, এই বুদ্ধি-মহাজনের পদপ্রান্তে আমরা দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছি।

ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ এই গ্রামে চিন্তা করিলে কি হইত বলা যায় না। হঠাৎ শ্যামবাবুর নূতন মোটরখানা সবেগে ধুলা উড়াইয়া চলিয়া যাওয়াতে চিন্তা ভিন্ন পথ ধরিল। শ্যামবাবু মোটরখানা অল্প কয়েকদিন হইল কিনিয়াছেন। পিছন দিকটা একটু বোঁচা-গোছের, কিন্তু নূতন মডেল। আগেকার গাড়িটা ঠিকই ছিল, কিন্তু নূতন মডেলের লোভ সম্বরণ করা শ্যামবাবুর পক্ষে শক্ত। শ্যামবাবু লোকটি হালে বড়লোক হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই সম্ভবত হালে পানি পাইতেছেন না। কি করিলে যে আত্ম-প্রচারটা সর্বতোমুখী হইবে, কিছুতেই যেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সর্বদাই অপ্রকৃতিস্থ। নিত্যনূতন মোটর, নিত্যনূতন রেডিও, নিত্যনূতন পোশাক, নিত্যনূতন বাড়ি, নিত্যনূতন নারী, নিত্যনূতন মদ, নিত্যনূতন ব্যাধি, প্রতিদিন নিত্যনূতন প্রকাশ। আমাদের

নিবারণবাবুরাও বড়লোক কিন্তু বনিয়াদী ঘর, বাড়াবাড়ি নাই। সাবেক কালের ল্যাণ্ডোতে চড়িয়াই বেড়াইয়া থাকেন, বৈঠকখানায় ঢালা ফরাসের বন্দোবস্ত, পুরাতন চক-মিলানো বাড়ির সাবেক মূর্তি, দরজা-জানালাগুলি পর্যন্ত সেকেলে। আচার-ব্যবহার চালচলন কোন কিছুতেই আধুনিকতার ছাপ পড়ে নাই। সহসা মনে হইল, জীব-জগতে মানুষও তো সেদিন মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বটগাছের মত সে তো বনিয়াদী নয়। বটগাছ প্রতি বৎসর একই ধরনের সনাতন সবুজ পাতায় সাজিতে ইতস্তত করে না, তাহার সাবেক চাল অব্যাহত আছে, কারণ তাহার ঐশ্বর্য বনিয়াদী। তাহার তুলনায় মানুষ তো সত্যই অতি-আধুনিক। ভুঁইফোঁড় শ্যামবাবুর মত নিত্যনূতন দামামা বাজাইয়া সে নিজেকে হাজির করিবে না তো কে করিবে? ইহাই যে তাহার স্বধর্ম। কিংবা হয়তো—। দূর ছাই, আর ভাবিতে পারি না। 'হয়তো' আর 'নয়তোর' দ্বন্দ্ব মিটানো আমার কর্ম নয়। ভূতোকে তামাক দিতে বলিলাম।

দৌহিত্র পুনঃপ্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, ত্রিপুরাবাবু মারা গেলেন। আমার সেই মুসোলিনি-ভক্ত বন্ধুটি কিছুদিন যাবৎ ভুগিতেছিলেন। বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হইলাম। ত্রিপুরাচরণ চিন্তায় কর্মে অতি-আধুনিক ছিলেন। সনাতন মৃত্যুর হাত কিন্তু এড়াইতে পারিলেন না। ভূতো তামাক দিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটা সুদীর্ঘ দার্শনিক টান দিলাম।


কবিতা

অঙ্গারপর্ণী

উৎসর্গ

কবি, কথা-সাহিত্যিক, রসস্রষ্টা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমাস্পদেষু

ফন্দী করি কবিতারে বন্দী করি ছন্দের শৃঙ্খলে
মনোরথে উড়াইয়া আনিয়াছি সাহিত্য-কাননে,
রাবণ একদা যথা এনেছিল সীতারে সিংহলে
রাক্ষসীয় বীর্যবলে—আখ্যায়িকা আছে রামায়ণে।

উপমা চেড়ীর দল অক্ষর অশোক বনে বসি'
সব-অঙ্গে ঝঙ্কারিয়া অনুপ্রাস-মিলের নিক্কণ·
নিয়ম-তর্জনী তুলি' কভু রুষি' কখনও বিহসি'
নানা তাল-লয়-মানে বন্দিনীরে করে নিরীক্ষণ।

নিত্য-নব পটভূমি—কভু আলো, কভু অন্ধকার,
শ্যামল, ঊষর কভু, কভু চন্দ্র, কখনও সবিতা ;
পাখী গাহে, পাখী থামে, ফুল ফোটে, ঝরে বারম্বার,
বিচিত্র বেষ্টনী মাঝে, অধিষ্ঠিতা বন্দিনী কবিতা।

সবই ভালো ঃ—ক্ষুদ্র প্রশ্ন আকুলিছে শুধু মনোবীণা
কবি রাবণের লাগি অপেক্ষিছে কোন রাম কিনা।

৬. ৫. ৪০
ভাগলপুর

স্বপ্ন চূর্ণ স্বাক্ষ

মস্তিষ্ক লইয়া হস্তে কহিনু, "বিধি নমস্তে,
চাহি না এ ফিরাইয়া লহো ;
এ জিনিস ও অঞ্চলে একেবারে নাহি চলে ;
ইহা লয়ে কী করিব কহো !

মস্তিষ্ক থাকিলে অশ্রু ঝরিবে, ভিজায়ে শ্মশ্রু
(অর্থাৎ শ্মশ্রু যদি থাকে)
ক্ষোভ দ্বন্দ্ব খেদ দুঃখ নানাবিধ স্থূল সূক্ষ্ম
ঘুরাইবে রজ্জু দিয়া নাকে !

এ অঞ্চলে যার পড়তা তাই কিছু দাও কর্তা,
মস্তিষ্কটা রাখো আপাতত ;
চাহি না উৎকর্ষ কৃষ্টি ওতে হয় অনাসৃষ্টি
মর্ম হয় ক্ষত ও বিক্ষত।

হে বিধাতা মহামান্য, চাহি মোরা ধন-ধান্য
মস্তিষ্কের প্রয়োজন নাহি,
সুতরাং পরিবর্তে হে বিধাতা, এই মর্তে
আটপহুরে 'সেন্টিমেন্ট' চাহি !"

শুনিয়া আমার বাক্য বিধাতার নলিনাক্ষ
হল ক্রমে রক্তবর্ণতর,
স্ফীত-নাসা—মুক্ত-কচ্ছ "রে ফাজিল, দূরে গচ্ছ"
বলি তিনি কম্পি থরথর

শির মোর করি লক্ষ্য ছুঁড়িলেন হস্তে দক্ষ
সুপবিত্র খড়মটি তাঁর ;
স্বপন হইল চূর্ণ মনস্কাম হল পূর্ণ
বিষয় মিলিল কবিতার !

আধ্যাত্মিক খুড়ো

ফুল ফুটে ঝরে যায় দুনিয়ার রীতি
আজ যার শুরু হয় কাল তার ইতি
বিয়ে হল অগ্‌ঘানে রায়েদের মেয়ে
বিধবা সে হয়ে গেছে দেখলাম যেযে,
হরি ঘোষ গাইটিকে দিত খোল খুদ
বাছুরটি মারা গেল হল নাক দুধ—

এইরূপ নানা কথা আধ্যাত্মিক
ভেবে ভেবে শেষে খুড়ো করলেন ঠিক
সুদ যত বাকি আছে এই বেলা হায়
তাগাদার তাড়া দিয়ে করে নি আদায়!
সোজায় না দেয় যদি আদালতে যাই
দেখি যদি তাতে তবু তাড়াতাড়ি পাই।
তাড়াতাড়ি করা ভালো, নাই কিছু ঠিক
মায়াময় দুনিয়ায় সকলি অলীক!

গভীর নিশীথে

১

কবিতা একটা লিখিতে হইবে
ভাবিতেছি মনে মনে।
কবিতা কিন্তু দেয় না যে ধরা
পলায় যে খনে খনে।
গভীর নিশীথে জাগি বসে একা
সিগারেট পুড়ে হাতে লাগে ছ্যাঁকা
এলোমেলো ধোঁয়া ওড়ে এঁকাবেঁকা
কল্পনা জাল বোনে!
কবিতা কিন্তু দেয় না তো দেখা
পলায় যে খনে খনে।

২

উঠিতেছে হাই বুঝিতেছি ছাই
মিথ্যাই পথ-চাওয়া
বিংশ শতকে সোজা নয় খুব
কবিতার দেখা পাওয়া
যদিও নারীর সেই হাসি ঠোঁটে
সাঁঝের আসরে জুঁই বেলি ফোটে
বসন্ত এলে আজও দেখি জোটে
কোকিল মলয় হাওয়া
তবু আজকাল সোজা নয় মোটে
কবিতার দেখা পাওয়া।

৩

শুষ্ক কাঠের টেবিলে বসিয়া
হস্ত রাখিয়া মাথে
মিথ্যা কালির আঁখর সাজাই
শুষ্ক খাতার পাতে!
কবিতা নহে তো মর্ত্যের প্রিয়া
ডাকিলে পরেই ছুল দুলাইয়া
হাজির হইবে সলাজ হাসিয়া
পানের ডিবাটি হাতে
পাউডারে রঙে মোহিনী সাজিয়া
কাপড়ে ও গহনাতে।

৪

গভীর নিশীথে কোন্ সে মন্ত্রে
কেমনে তাহারে ধরি
যাহার স্বপন চন্দ্র তপন
দেখে দিবা-বিভাবরী,

যাহার লাগিয়া তারায় তারায়
কত না আগুন জ্বলে নিবে যায়
ফুটে ঝরে যায় বন-বীথিকায়
কত শত মঞ্জরী,
সহসা আজিকে কী করিয়া হায়
বলো তো তাহারে ধরি।

৫

বুঝিতেছি সবই—তবুও বসিয়া
করি বাগ্-বিস্তার
সম্পাদক যে দিয়েছে তাগাদা
নাহি মোর নিস্তার।
জুটায়ে কমল চন্দ্র কোকিল
বজায় রাখিব ছন্দের মিল
রাত্রি ফুরায়ে যায় তিল তিল
কখন লিখিব আর
দোহাই ভারতী খোলো খোলো খিল
রুধিয়া রেখো না দ্বার।

অতি-আধুনিক

অতি-আধুনিক পিচ-ঢালা পথে, অতি-আধুনিক রবারের জুতা পায়ে,
অতি-আধুনিক কলার খোসায় চরণ পড়িতে গিয়াছিনু পিছলায়ে—
টাল সামলায়ে দাঁড়াইনু যেই, অতি-আধুনিক চকচকে কার 'কার',
অতি-আধুনিক ব্রেক কসে জোরে বাঁচাইয়া মোরে দিয়ে গেল ধিক্কার।
অতি-আধুনিক কাদাও ছিটাল অতি-আধুনিক ঔদাসীন্য ভরে
কেহ বা হাসিল, কেহ হাসিল না, উপদেশ দিল কেহ বা চটুল স্বরে।

একটু পরেই অতি-আধুনিক বন্ধুর সাথে হল মোর মোলাকাত
অতি-আধুনিক কাঁদুনি গাহিয়া অবশেষে তাঁর অতি-আধুনিক হাত
পাতিলেন তিনি ,—ধার চাই কিছু! অতি-আধুনিক মিথ্যা বচন দিয়া
বুঝাইনু তাঁরে হাতে টাকা নাই যদিও দুঃখে ফাটিয়া যেতেছে হিয়া।
বাড়ি ফিরে এসে দেখিলাম মোর অতি-আধুনিক জীর্ণ শীর্ণ প্রিয়া
অতি-আধুনিক 'রেডিও' খুলিয়া, অতি-আধুনিক সিনেমা-মাসিক নিয়া
অতি-আধুনিক দাঁতের ব্যথাটি ভুলিতে চেষ্টা করিছেন প্রাণপণে
অভিমান ভরে কহিলেন, "যাক—এতখন পরে তবু পড়িয়াছে মনে!"
অতি-আধুনিক অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া শয়ন করিনু পাশে
'কেরিজ'-দন্ত-বেদনা-বিধুরা অতি-আধুনিকা প্রিয়ার প্রণয়-আশে।
প্রভাতে উঠিয়া মনে হল যেন রাতারাতি ফের কোনো অতি-আধুনিক
ভর করেছেন অতীব প্রকোপে একেবারে মোর নাকের ডগায় ঠিক।
প্রিয়ারে ডাকিয়া কহিনু, "দেখো তো নাকের ডগায় হয়েছে কি কিছু কোনো?"
প্রিয়া কহিলেন, "ওমা, এ কী এ যে টকটকে লাল ছোট্ট একটা ব্রণ!"

পুরাতন প্রসঙ্গ

"চাহো গো কমল-কলি,
কোথা মন তব, ও কমল-বালা,
এনেছি বহিয়া সঙ্গীত-মালা
গুঞ্জন অঞ্জলি,
রয়েছি দাঁড়ায়ে আকুল হৃদয়ে
বারেক ফিরিয়া চাহো গো নিদয়ে
এসেছি মুগ্ধ অলি,
ও লাবণি-ভরা তনু-গৌরব
সঞ্চরমান মধু-সৌরভ
হিয়া ওঠে চঞ্চলি,
পাগল করিয়া রূপের সুরায়
লুকায়ে রেখেছ কোনখানে হায়
মনটি কমল-কলি।"

কমল রয়েছে চাহি
ঊষা-রঞ্জিত সুদূর গগনে
স্বপন রচিছে যেথায় তপনে
নয়নে নিমেষ নাহি।
নিরুপায় অলিকুল
মরিয়া হইয়া সব দলে দলে
রাখিল লম্বা চুল।
ছাঁটিল গুম্ফ, গাহিল গজল,
কখনও গরম কখনও সজল!
তবুও কমল-ফুল
চাহিয়া রহিল হায় অনিমিখে,
কনকোজ্জল সূর্যের দিকে
চিত্ত কিরণাকুল!
হ্রয়েডি-বচন প্রাণপণে শিখে
কপচায় অলিকুল।

ক্ষিপ্রলিপিকা

*

লিখিব অনেক ভাবি, জোটে না যে মিল
তালটারে সুতরাং করিতেছি তিল।

*

নদীজল স্রোতাবিল সমুদ্রটা লোনা
কূপমণ্ডুকের চিত্তে ইহাই সান্ত্বনা।

*

প্রিয়াকে বিবাহ করি বানায় 'ইস্তিরি'
যেজন সে কবি নয়, সেজন মিস্তিরি।

*

দারোগা হলেন যবে গোবর্ধন সেন
শালা তাঁর সেই সূত্রে গোঁফ রাখিলেন।

*

"এতখানি বাড়াবাড়ি মোটে ভালো নয়"
পুষ্পিতা লতারে হেরি অপুষ্পিতা কয়।

*

ফাঁকা গলি—শিশ দিনু—নীরব দুপুর
বাতায়ন খুলিল না, আসিল কুকুর।

*

বিড়াল ইঁদুরে কয়—ভয় কিরে ধন
তোদের বাঁচাব মোরা, তোরা হরিজন।

দুপুরে

মাথা খালি, খাতা খালি, যা তা খালি ভাবি অনর্থক,
মাথামুণ্ডহীন যত ছন্দোহীন কবন্ধ আবেগ;
দূরে ডোবাটার ধারে বসে আছে দু-চারটি বক,
পশ্চিম-আকাশে আছে স্তূপাকারে খানিকটা মেঘ।

সহসা দেখিনু চেয়ে, সাড়া-শব্দ নাহি ঘড়িটার,
দম দিতে ভুলিয়াছি!—উঠানেতে গজায়েছে ঘাস,
কাগজে যুদ্ধের কথা ভালো মোটে লাগে নাক আর,
পথ দিয়া চলিয়াছে পরিপূর্ণ একগাড়ি বাঁশ।

আকাশে উড়িছে ঘুড়ি, পাঁড়েজি পড়িছে রামায়ণ,
তুলসীদাসের দোঁহা পশিতেছে অলস করণে,
কন্যার বিবাহ দিব,—কিছুতেই জুটিছে না পণ,
সেই কথা মাঝে মাঝে ভাবিতেছি নানান্ ধরনে!

কীট্‌স ও শেলির কথা অনায়াসে যাইতেছে মিশে,
চাল-ডাল-ধোপা-দুধ-অসুখের সমস্যার সাথে—
'পলিসি' করেছে ল্যাপস্!—বুঝি না যে শান্তি পাই কিসে,
ও বাড়ির মেয়েটিও দেখিতেছি উঠিয়াছে ছাতে।

জানালা করিয়া বন্ধ পুন আসি করিনু শয়ন,
ভাবিনু আবার মনে জানালাটা বন্ধ-করা মিছে ;
উঠিয়া খুলিয়া দিয়া দেখিলাম তুলিয়া নয়ন,
ছাতের মেয়েটি নাই,—হয়তো নামিয়া গেছে নীচে।

গৃহিণী বাপের বাড়ি—হাই তুলি তিন-চার বার
প্রবন্ধ লিখিনু বসি—"বাঙালীর যৌথ কারবার।"

হেতু

গৃহিণীর আজ পেয়েছি সকালে চিঠি
পুনশ্চ দিয়ে "চুমু নিও" আছে তাতে ;
ছাতের মেযেটি হাসিয়া চেয়েছে মিঠি,
জুতোর পেরেক ঠুকিয়ে নিয়েছি প্রাতে
তবু আজ মোর মন কেন খিটিমিটি
—এমন শারদ রাতে !

বিগলিত স্নেহে শরতের চাঁদনীটি
খোঁচা-গোঁফে মোর আপনা হারায়ে লোটে,
পরমেশ মুদী ভালোই দিয়েছে ঘি-টি,
একটিও চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে নি মোটে
হায় তবু মোর মন কেন খিটিমিটি
—রয়েছি কেন যে চটে !

যে শালীটি মোর গৃহিণীর পিঠোপিঠি
তন্বী তরুণী হাবভাবে ঠারেঠোরে
অচিরাৎ যিনি হইবেন এম. এ. বি. টি.
তাঁরও চিঠি আজও পেয়েছি কপাল জোরে
অথচ আমার মন কেন খিটিমিটি
—কে কহিয়া দেবে মোরে !

সহসা দুয়ারে দেখা দিল কাবুলীটি
প্রকাণ্ড দেহ, হস্তে বিশাল ছড়ি !
পোস্ত ভাষায় চোস্ত সে কাকলীটি,
শুনিবামাত্র—উঠিলাম ধড়মড়ি
নিরুপায় হয়ে চাহিতেছি মিটিমিটি
—হাতে নাই কানা কড়ি !

লীলাবানের প্রতি লীলাবতী

উচ্চঞ্চু চকোরী-সম তব পত্র-কৌমুদীর আশে
বসিয়া আছিনু ক্ষিপ্ত দ্বিতলের বাতায়ন-পাশে,
বাহিরে প্রখর সূর্য অন্তরেতে বিরহ-শর্বরী
রিকশা, ট্রাম, মোটর, ঘর্ঘরি
ছুটিয়া চলিতেছিল যেন কার তীব্র কশাঘাতে
হাহাকারে আর্তনাদে ক্ষুব্ধ করি সুন্দর প্রভাতে।
চতুর্দিকে ক্রন্দনের ঝড়,
তারি মাঝে বাতায়নে ধ্যানমগ্ন একান্ত অনড়
উৎকণ্ঠার দীপখানি জ্বালাইয়া অতি সাবধানে
বসেছিনু চাহি পথপানে।
সহসা পিওন-চন্দ্র সমুদিল গলিটির মোড়ে !
সমস্ত আগ্রহ মন পুঞ্জীভূত হল যেন তোড়ে
যুগ-জঙ্ঘা-পেশী 'পরে.—প্রবাহ বহিল বৈদ্যুতিক—
দীর্ঘ এক লম্ফ দিয়া ঠিক
যেমনি নামিতে যাব,—ঘোরনাদে ফস্কাইয়া পদ
দারুণ পড়িয়া গেনু, ছিন্ন হল মর্ম-কোকনদ।
আর্তকণ্ঠে ডাক দিনু ঝিরে
সে আসি তুলিল মোরে কোনোক্রমে অতি ধীরে ধীরে।
আনি দিল মোটা খাম উন্মোচিয়া কপাটের খিল
চিঠি নয় কাপড়ের 'বিল' !
ত্বরিতে চলিয়া এসো, পত্র তব চাহি নাক আর
চলে এসো অবিলম্বে, জানু-অস্থি হয়েছে ফ্র্যাকচার।

চানাচুর

১

আকুলি মাধবীকুঞ্জ গিয়াছে মধুপপুঞ্জ
থেমেছে গুঞ্জন,
নয়নে নামিছে তন্দ্রা আকাশে নামিছে সন্ধ্যা
স্বপন-ভুঞ্জন !
মিলাইয়া সব ছন্দ জানালা করিয়া বন্ধ
ফেলিয়া মশারি,
শুইয়া আছিনু শ্রান্ত কাঁপাইয়া পথ-প্রান্ত
হাঁকিল পসারি :
"চাই চানাচুর খাস্তা !" শুনিয়া হল না আস্থা,
শয্যা তেয়াগিয়া
কহিনু খাঁকারি কণ্ঠ— "আরে এ যে সিতিকণ্ঠ
দেখি তো চাখিয়া—
ভালো হলে দিয়া মূল্য কিনিব, আমার তুল্য
পাবে না রসিক !"
দেখি, মুখে দেওয়া মাত্র পুলকিত হল গাত্র
খাস্তাই ঠিক।
দুঃখ হল দূর
কুড়মুড় করে চানাচুর !

২

চতুর্দিক নিস্তব্ধ নাহি কারো সাড়াশব্দ
ডাকে শুধু পেট ;
চানাচুর পাকযন্ত্রে নাহি জানি কোন মন্ত্রে
হয়েছে বুলেট !
ওষুধ দু-চারি বিন্দু খেয়েছি, কমে নি কিন্তু
জ্বলিতেছে ছাতি ;
উদর হয়েছে কুম্ভ সেথা শুম্ভ ও নিশুম্ভ
করে মাতামাতি !

একদা করিয়া উচ্চ যৌবন নাচাত পুচ্ছ
শাখে কল্পনার,
বুঝিনু কমেছে শক্তি চানাচুর 'পরে ভক্তি
চলিবে না আর!
অদৃষ্টের এ কী রঙ্গ ছাড়িয়া সকল অঙ্গ
কামড়ায় পেটে
বুঝেছি গতিক মন্দ জীবনের লোভ বন্ধ
যাক সব কেটে!

ওরে চানাচুর
চিত্তে আর তুলিস না স্বর!

এ জীবনে যশে বিত্তে আমার সকল চিত্তে
এনেছে বিক্ষোভ।
চানাচুর হোক তুচ্ছ তবু তার মুচ-মুচ্য
'পরে ছিল লোভ!
তাহারও হইল শাস্তি ঘুচিল সকল ভ্রান্তি
বুঝিনু প্রচুর,
আর যা-ই খাই খাদ্য এড়াইয়া যথাসাধ্য
যাব চানাচুর!
উদরে বাজিবে শঙ্খ! —জীবনের শেষ অঙ্ক
অভিনয়কালে
তবু বলে যাব গর্বে, মরণের মহাগর্ভে
যাবার প্রাক্কালে,
বলে যাব করি পষ্ট যদিও পেতেছি কষ্ট
এই চানাচুর
মুচমুচে হিং-গন্ধা জীবনের বহু সন্ধ্যা
করেছে মধুর!

এই চানাচুর
বহু দুঃখ করিয়াছে দূর।

আশ্রয়ের প্রতি কুক্কুর

১

লাঙ্গুল কাটিয়াছ—ছাঁটিয়াছ কর্ণ
কণ্ঠ বেড়িয়া দেছ শিকলিও শক্ত,
অমান্য করিলেই কথা এক বর্ণ
চাবুকের চোটে হায় ছুটায়েছ রক্ত।
জঙ্গলে আছিলাম—মোরা অতি বন্য
সভ্যতা শিখিয়াছি তোমাদেরি জন্য,
কেঁউ কেঁউ রবে কহি 'ধন্য গো ধন্য,'
বেঁড়ে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে আছি প্রভুভক্ত।
অমান্য করিলেই কথা এক বর্ণ
চাবুকের চোটে জানি ছুটাইবে রক্ত।
অনাহারে রাখ নাই, এক বেলা খেতে পাই—
হাড়কাঁটা মাঝে মাঝে দাও ভগ্নাংশ,
সামান্য কুকুরের এর বেশী কিবা চাই—
হাড়েতে লেগেও থাকে মাঝে মাঝে মাংস।

২

'কেনেলের' এক কোণে দেখি বসে স্বপ্ন
কর্তিত লাঙ্গুল করি উৎক্ষিপ্ত,
কবে তুমি ডাক দেবে ভাবি হয়ে মগ্ন,
শিশ দিয়ে করিবে গো কৃতার্থ চিত্ত।
ওগো প্রভু, তব গৌরব রক্ষার্থে
কোথায় ছুটিব কবে—বাঁচাইতে আর্তে,
কার টুঁটি ছিঁড়ে তব রক্ষিব স্বার্থে,
তাহারি স্বপ্ন দেখি বসে বসে নিত্য।
কেনেলের এক কোণে তন্ময়, মগ্ন
কর্তিত লাঙ্গুল করি উৎক্ষিপ্ত!
'বাঘ', 'ভুতো', 'টম্', 'ঝুনু' বল মোরে যাহা চাও,
সাথে করে লয়ে যাও সাগরে বা শৃঙ্গে,
কখনো বা কোলে কর—কভু পিঠ চাপড়াও,
সোহাগের মধু খায় কল্পনা-ভৃঙ্গে।

৩

বন্দুকধারী তুমি মার পশু-পক্ষী—
মুখে করে তুলে এনে দিই পদপ্রান্তে,
সিন্দুকে তব টাকা আমি তার রক্ষী,
বরফের দেশে আছি 'শ্লেজ' তব টানতে!
কখনও মেডেল দাও—কভু ছাপ চিত্র,
গুণ গাও মোরা অতি বিশ্বাসী মিত্র,
কিন্তু কী পোড়া মন হায় রে বিচিত্র—
মনেতে কত কী জাগে হায় যদি জানতে।
সিন্দুকে তব টাকা আমি তার রক্ষী,
বরফের দেশে আছি 'শ্লেজ' তব টানতে।
খেপে যাই মাঝে মাঝে কামড়াই মনিবেও—
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে—তবু জলাতঙ্ক,
ক্ষণিকের পাগলামি। শেষ হয়ে যায় সে-ও
একটি গুলিতে লভি ধরণীর অঙ্ক।

বিনামা

১

অয়ি জুতা, হে পাদুকা, হে বিনামা, চরণ-সঙ্গিনী
তোমারে ঘিরিয়া আজি কল্পনা যে হয়েছে রঙ্গিনী
কোরো তারে ক্ষমা
নানা ভাবে, নানা পদে, নানা ছন্দে তোমার বিহার
জানি না তো কোন বর্ণে করিব যে বর্ণনা ইহার,
অয়ি অনুপমা।

২

শত-তালি-ছিন্ন-বেশে যে দুর্ভাগা দরিদ্র-চরণে
মূর্তিমতী সেবা-রূপে জড়াইয়া আছ প্রাণপণে
কড়াগুলি চুমি
তাহারই পৃষ্ঠের 'পরে অতি উগ্র মিলিটারি বেশে
খটমটায়িত বুটে উদ্ধত যে ভাবি আমি কে সে?
দেখি এ যে তুমি।

৩

বেকার যুবক-পদে লপেটা-বেশিনি, ওগো সখি,
যে ব্যঙ্গ হাসিটি হাস মচমচি মুচকি মুচকি
রহিয়া রহিয়া
সে হাসি মধুরা হয়, হয় আরো মাদকতাময়ী
নাগরা-রূপেতে যবে মূর্ত হও তন্বীপদে, অয়ি,
মানস মোহিয়া।

৪

প্রাক্তনী ধরনে পুন কোন আর্য-চরণ নন্দিয়া
খড়মের কাষ্ঠস্বরে হাস্য তব উঠেছে ছন্দিয়া
ওগো সনাতনি,
খোট্টার চরণতলে তৈলসিক্ত বিগলিত স্নেহে
করিতেছ হাস্যমুখে বহুনাল-কাঁটি-বিদ্ধ-দেহে
কি কৃচ্ছ্র সাধনই।

৫

স্প্রিংহীন, স্প্রিংদার, কিড্, ক্রোম্, সফিতা, অফিতা
ক্যাম্বিস্ বা চর্মময় তব রূপ বর্ণিতে কবিতা
ছন্দ-হারা হয়
কভু পদে, কভু শিরে, কভু মর্মে মহিমা বিস্তারি
কখন কি ভাবে আছ জানি না তো নয়ন বিস্ফারি
গাহি তব জয়।

৬

বিহ্বল বসিয়া থাকি অকস্মাৎ হই সচকিত
নয়ন-সম্মুখে জাগে এ কী তব মূর্তি জুতাতীত
অনন্ত অশেষ
দেখি তুচ্ছ জুতা নহ—উচ্চতর তব আবেদন
দেশে দেশে যুগে যুগে করিতেছ সংশয় ছেদন
নিত্য নব বেশ।

৭

সমালোচকের মর্মে মূর্ত তুমি প্রবন্ধের সাজে
তিক্ত তীব্র শ্লেষ-রসে নিষ্করুণ শব্দে গন্ধে ঝাঁজে
সুতীক্ষ্ণ ভাষণ
কখনো কামান বেশে রণক্ষেত্রে উঠিছ গর্জিয়া
সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্যে কভু যাও রাজত্ব বর্জিয়া
ত্যজি সিংহাসন।

৮

তোমার অগণ্য মূর্তি অসংখ্য তোমার পরিচয়
হিটলার মুসোলিনী নর-রূপে তুমিই কি নয়?
উদ্ধত উদ্দাম!
কি যে তব সত্য রূপ, নানা মূর্তি রয়েছ ধরিয়া,
হে বিনামা ছদ্মবেশী, কহ কহ কহ বিবরিয়া
কিবা তব নাম!

না কি

১

আজকাল ঘরে ঘরে যত বিড়ালের নাকে
লাথি মারিতেছে নাকি ইন্দুর,
সধবারা করিতেছে অনাহারে একাদশী
বিধবারা পরিতেছে সিন্দুর।
গণেশটি উলটায়ে নীল বর্তিকা জ্বালি
যত মাড়োয়ারী নাকি কবিতা লিখিছে খালি,
স্ত্রীর ভগিনীকে নাকি বলা চলিবে না শালী,
বিস্তৃতি ঘটিতেছে বিন্দুর!

২

লুঙ্গি ছাড়িয়া যারা ধরেছিল স্লথ প্যাণ্ট
তাহারা ঝুঁকেছে নাকি ঘাগরায়,
মাথার মুকুট নাকি, পায়েতে পরিছে লোকে
মস্তক শোভিতেছে নাগরায়।

রুপো আর 'প্ল্যাটিনাম্' এক হয়ে গেছে নাকি,
ইতালির জয়-লাভ বোঝা গেছে সবি ফাঁকি,
মমতাজ বেগমের শোকেতে পরেশ চাকি
মূর্ছা গিয়াছে নাকি আগ্রায়।

৩

বহুটাকা বাকী রেখে বহু শত কাবুলীর
শ্রীগৌরাঙ্গ নাকি শেষটায়
সাগরে ঝাঁপায়েছিল!--প্রত্নতাত্ত্বিকেরা
টের পেয়েছেন বহু চেষ্টায়।
আর এক চণ্ডীদাস সিংভূমে আছে চাপা,
ভয় নাই তারও কথা মাসিকে হইবে ছাপা,
দলিলপত্র তার মিলিছে খুঁজিয়া ধাপা,
নাচিতেছে রামা, শ্যামা, কেষ্টায়।

৪

কাউনসিলেতে নাকি থাকিবে রিজার্ভ সীট
বেঁটে, কালো, ফরসা ও লম্বার।
গন্থ-ছন্দে লিখে মুদী পাঠাইবে বিল্
চাল ডাল নুন তেল লঙ্কার।
ক্যান্ভাসারের দল ওরিয়েণ্টালি ধাঁচে
আগেতে নাচিয়া নাকি কথা কহিবেন পাছে,
বিলাতি বেগুন হবে দেশী বেগুনের গাছে
কচুগাছে কাঁধি হবে রম্ভার।

স্বাস্থ্য

১

সিনেমা দেখিতে গিয়া শুকাইল চক্ষুর কণ্ঠ,
প্রাণটার কান ধরি হাজির করিল যেন ওষ্ঠে
প্রেম, খুন, গান, মদ, সিনারি ও বেস্তার ঘণ্ট
শ্যামলী ধবলী এল চড়িতে ট্যাক্সি চড়ি গোষ্ঠে
দুষ্ট কুষ্ঠব্যাধি-গলিতা
নাচিছে শিল্প-কলা ললিতা।

২

জ্বলিতে লাগিল সব স্নায়ু পেশী অস্থি ও মজ্জা
আসিনু বাহিরে উঠি,—আসি পুন হারাইল চিত্ত
সারি সারি ফুটপাতে অপরূপ চিক্কণ সজ্জা
—পণ্য রমণী নহে—অগণ্য মাসিক-সাহিত্য।
অবাক স্বয়ং দেবী ভারতী
করিছেন লক্ষ্মীর আরতি!

৩

বাংলার রাজধানী আজব শহর 'কলকাত্তা'
চারিদিকে এত আলো—আঁধার তবুও সূচীভেদ্য,
পদে পদে হারাইছে রাস্তা ও মনিব্যাগ আত্মা
পাত্তা মেলে না কিছু,—ঘুচিয়া গিয়াছে সব তো।
চারিদিকে জনতা ও জনতা
আকুল করিল তনু-মন তা।

আইস্—

১

গৃহকোণে বসে বসে ভাবিতেছে ল্যাংড়া
হিমালয়-অভিযান একেবারে ধাপ্পা
ঈশপের দাঁড়কাক ময়ূরের পুচ্ছে
পেখম তুলিয়া নাচে অপরূপ 'ট্যাঙ্গো'
রুই-কাতলার পরে খলিসা ও ট্যাংরা
বল্‌শেভি টোপ গিলে হইয়াছে খাপ্পা
বিলাত হইতে ফিরে আসি কহে উচ্চে
আধুনিক বাজারেতে মোর নামই ম্যাঙ্গো॥

২

শহরে গলিতে থেকে ভুগিছেন অগ্নি
অশ্বিনী-কুমারেরা বলেছেন যক্ষ্মা
পরচুলা বাঁধা দিয়া যত নক্ষত্র
ভিটামিনে ভিজাইয়া রেখেছেন টাকুকে

মহাদেব খুলেছেন কারবার লগ্নী
নন্দী-ভৃঙ্গী করে দলিলাদি রক্ষা
ব্রহ্মা লিখিছে বসে খালি প্রেমপত্র
এই শুনে ছি ছি করে সবে একবাক্যে॥

৩

স্বপ্ন ধরেছে নাকি সত্যের পাঞ্জা
মিথ্যা দেখিছে তাহা বিকাশিয়া দন্ত
মোটর করিছে বসে এরোপ্লেনে নিন্দা
গো-শকট মুছাইছে বাইকের অশ্রু
দুনিয়ার যত খাজা হয়ে গেলে খাস্তা
রমণীর হৃদয়ের পাওয়া যাবে অন্ত
অগস্ত্যে 'গো টু হেল্' করে নাকি বিন্ধ্য
মস্তক তুলে এবে কামাইবে শ্মশ্রু॥

৪

গোলদীঘি সেঁচে নাকি ভরে দেবে মদ্যে
খৈয়াম ওমারের জয়ন্তী-পর্বে
দুনিয়ার সাকী তাতে সাঁতরাবে হর্ষে
কবিকুল তীরে বসি চিবাইবে ঘুগনি
এবার কবিতা যদি লেখে কেহ গদ্যে
মুসোলিনি ছুটে এসে দফা শেষ কর্বে
কংগ্রেস থেকে নাকি এবার ফি বর্ষে
সাবুদানা পাবে যত রুগ্ন ও রুগ্নী!
অতএব বলো আর বাকী কিবা রইল?
আইস ঘুমাই তবে নাকে দিয়া তৈল।

ছোট্ট ছোট্ট

১

যতদূর বুঝি আমি—চুন আর নুন
যাবতীয় প্রাণীদের করিতেছে খুন।
ওদের প্রচার বন্ধ একেবারে হোক।
—বক্তৃতায় বলিলেন মহামতি জোঁক।

২

দালানে বেঁধেছে বাসা চটক-দম্পতী,
করিতেছে নানা লীলা নাহি কোনো ক্ষতি।
নানাবিধ সমস্যায় হারাতাম হুঁশ—
পাখি না হইয়া যদি হইত মানুষ।

৩

যন্ত্রের করিছে নিন্দা অ-যন্ত্রীর দল,
বাগযন্ত্র নহে শুধু তাদের সম্বল,
ফাউন্‌টেনে লেখা হয়, ছাপা হয় প্রেসে,
বেতারে গর্জন করি ফেরে দেশে দেশে।

৪

কম্বলে ঢাকিয়া দেহ কনকনে শীতে
কহে নর—'হে বিধাতা, সকৃতজ্ঞ চিতে
অকৃত্রিম ভক্তিভরে নমি তব পায়,
ভাগ্যে দিয়াছিলে লোম ভেড়াদের গায়।'

৫

সে যুগে বিদ্যুৎ ছিল তন্বীআঁখি-কোণে
দগ্ধ হয়ে ধন্য হত সুবিদগ্ধ জনে!
এ যুগে বিদ্যুৎ সব 'বাল্‌বে' বন্দিনী,
যতেক তরুণী তাই নাসিকা-ক্রন্দিনী!

৬

চোখটা খারাপ শুনি লভিনু সন্তোষ,
তা হলে ও কিছু নয়, চক্ষুরই দোষ।
চশমা কিনিয়া কিন্তু করিলাম ভুল,
সত্যই পাকিয়াছে গৃহিণীর চুল!

৭

সুরাপায়ী হইলেই হয় না খৈয়াম ;
জারজ অনেক আছে, কই সত্যকাম ?
চার্বাক হয় না শুধু হইলে নাস্তিক
কয়লা মাত্রেই সখা হীরা নয় ঠিক।

৮

ক্ষুধার্ত বসিয়া আছি, রহিয়াছে তাকে
আম, লিচু, আনারস, সুসজ্জিত থাকে
আপেল, আঙুর, কলা, আতা, বেল, পেঁপে
সমস্ত মাটির কিন্তু! বসে আছি খেপে।

৯

শুনিয়াছি একবার ঠকেছিল পিসি
বাজার হইতে যবে কিনেছিল মিসি।
আয়না খুলিয়া পিসি চমকায়ে ওঠে
ভুলিয়াই গিয়াছিল দাঁত নাই মোটে।

১০

প্রেয়সীরে বল যদি পাশের বালিশ
চকিতে চটিয়া যাবে প্রেমের পালিশ।
শুদ্ধভাষে জেনো ভাই মুগ্ধ রন তিনি
সুতরাং বলো তাঁরে পার্শ্ব-সঙ্গিনী।

১১

জানি না শ্রীচৈতন্যের চৈতন্য হইয়াছে কি না
নেহারিয়া নেড়া-নেড়ি পাল,
জ্ঞাত নহি গৌতমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছে কি না
বৌদ্ধ সৈন্য হেরি আজকাল ;
প্রগতি-পুঙ্গব হেরি স্বর্গবাসে শ্রীরামমোহন
জানি না গেছেন কি না খেপে—
জানি শুধু গান্ধী-ক্যাপ মহাত্মারে করে নি পাগল,
অতি কষ্টে রয়েছেন চেপে।

১২

ঘোড়া খায় হিমসিম
এ খবর সাচ্চা,
কিছুতে হয় না ডিম
হয় খালি বাচ্চা
অথচ বাজারময়
ঘোড়ার ডিমেরই জয় !
চিন্তিত ঘোড়া কয়,
'এ আপদ আচ্ছা !
যতই চেষ্টা করি হয় খালি বাচ্চা !'

সে

চেনো নাকি তারে তুমি ? চেনে তারে সকলেই
দুনিয়ার বহু কিছু আছে তার দখলেই।
নামটা গেলাম ভুলে—(মেমারি যে কিসে হয়) !
ডক্‌টর স্যানিয়াল্ তার আপন পিসে হয়।
মাস্‌তুতো ভাই তার নামজাদা ক্রিকেটার
মাতুলেরা লাখপতি—বিখ্যাত ঠিকেদার।
শালারা ব্যারিস্‌টার—নয় সে অকিঞ্চন
আপন ভায়রাভাই ডি. এস্. পি. তিনজন।
শ্বশুরেরা সব ভাই দল আই. সি. এসের
বৌদিদি, শালী, বোন আছে এম. এ. বি. এ. ঢের।
নিজের কিন্তু তার ডিগ্‌রির মোহ নাই
ঘরে বসে করে থাকে জ্ঞান-গাভী-দোহনাই।
প্রত্যেক বিষয়েই সু-শাণিত মত তার
তুলনাই মেলা ভার সে বিদ্যাবত্তার
রেডিও, সিনেমা, ছবি, সঙ্গীত, বিজ্ঞান,
সকল বিষয়ে তার আছে ঠিক ঠিক জ্ঞান।
সাহিত্য নিয়ে তার শোন নি কি লেকচার ?

কথায় সে কি গাঁথুনি যেন ঠিক রেক্‌তার।
প্যাশনের কোলে তার আলো যবে ঝলকায়
অধরের ফাঁকে ফাঁকে হাসিটুকু চলকায়
অতি মিহি আদ্দির—অতি-ঝোলা আস্তিন
দুলাইয়া দুলাইয়া আওড়ায় রাস্কিন
সকলের অন্তরে খেলে যায় হরষন
সুন্দর ছোকরা সে অতি প্রিয়-দরশন।
চলনে, বলনে, ভাবে করে দেয় খুশ দিল
মাঝে মাঝে ধার চায় এইটে যা মুশকিল।

যে কোনো অলিগলিতে

অমুক বড় তমুক ছোট আহা-হা তুমি বোঝ না—
(বিজ্ঞ-ভাবে নাড়িয়া মাথা চলিছে সমালোচনা)
গরম যারে দেখিছ আজ কখন সে যে জুড়োবে,
টিঁকিয়া যাবে কে মহাজন, কে অভাজন ফুরোবে,
মর্কটেরি ছদ্ম-বেশে শিব কোথায় লুকানো,
ফুটিয়া ওঠা উচিত কার, কার উচিত শুকানো,
হালকা যারে ভাবিছ তুমি আসলে সে যে কী ভারী,
জানিতে চাও ?—চলিয়া যাও, তৃষ্ণা এসো নিবারি
দেখিয়া এসো সব-সাগর-পারঙ্গম গুণীরে
ওষ্ঠে হাসি, হস্তে তুড়ি, বাক্যবাণ তূণীরে—
ভয়েতে যার লাট-বেলাট মুহুর্মুহু মরিছে
বাদশা-পীর রাজা-উজির সদাই থরথরিছে!
লালকে নীল, নীলকে শাদা, শাদাকে বলি বেগুনি
কর্ণ মলি বর্ণ-বোধ শিখায় সবে যে গুণী
দেখিয়া এসো তাহারে তুমি,—কিন্তু বেশী কাছেতে
যেও না ভাই, ঝলসি যাবে—গনগনানো আঁচেতে!
ঠিকানা চাও ? কী দরকার ? বর্তমান এ কলিতে
খুঁজিলে তারে পাবেই পাবে যে কোনো অলি-গলিতে।

রাম-যাদব-সতু-বঙ্কিম-মণ্টু-চণ্ডী-বংশী-রবীন সেন-নন্দ এবং রামের পত্নী—

(ক)

রামের পত্নী যবে যাদবের গণ্ডেতে
 অঙ্কিল শঙ্কিত চুম্বন
সতুর হাঁপানি-রোগ হল সেই দণ্ডেতে
 বঙ্কিম বিষণ্ণ উন্মন।
সম্মুখে খাড়া করি শাস্ত্র-শিখণ্ডী
যুদ্ধ করিল শুরু মণ্টু ও চণ্ডী,
 সুখ পেল বংশী
ক্রমাগত টিন টিন সিগারেট ধ্বংসি।
প্রবীণ রবীন সেন হাঁচি কন, 'হেঁচ্চ,
খবরটা পাকা কি না সেইটে বিবেচ্য!'
 কহিলেন নন্দ,
'ছেড়েছে কিন্তু বেড়ে ফোড়নের গন্ধ।'
টাকমাথা পেটমোটা মনভরা শান্তি
রাম যান আপিসেতে প্রসন্ন কান্তি।

(খ)

রামের পত্নী যবে কমনীয় কণ্ঠেতে
 লাগাইল রজ্জুর বন্ধন,
বহিল অশ্রু-নদী বঙ্কিম-গণ্ডেতে
 যাদবও করিল কিছু ক্রন্দন।
সতুর হাঁপানি গিয়ে হল ফের অর্শ
 মণ্টুর টিকি হল, চণ্ডীর হর্ষ।
 সিগারেট—বংশী
সিগারেট তেয়াগিল নস্যে প্রশংসি।
প্রবীণ রবীন সেন কহিলেন—'দেখ্, তো
মিছিমিছি করে গেল সকলকে ত্যক্ত।'

নন্দের দম্ভ
যা কহিল নাই তার আরম্ভ অন্ত।
রামবাবু টাক ভুঁড়ি মনভরা শান্তি
পুনরায় বর-বেশে হল নব-কান্তি।

নানাছন্দে দ্বাদশ পরিস্থিতি*

১

হঠাৎ কেন পটাৎ করে পদ্য লিখি লম্বা ?
হাস্যটুকুর ভাষ্য করি মুগ্ধ মহানন্দে ?
মুটকি, ভুঁদো, হুটকি, কুঁদো, উর্বশী বা রম্ভা
একটা কিছু জুটলে পরে উথলে উঠি ছন্দে ?
অবাক্ লাগে—সত্যি,
লজ্জা নামক বস্তু দেহে নেই বুঝি এক রত্তি !
মুখটি কারো, নাকটি কারো, কারো চোখের দৃষ্টি
কথা-বলার ভঙ্গী কারো বড্ড লাগে মিষ্টি
তন্বী কেহ, বঙ্কি কেহ, ঘটায় অনাসৃষ্টি
হোমরা চোমরা ভোমরা ভোলায় নানান রকম গন্ধে !
কদম, বেলা, চম্পা—
ডাকছে তবু হচ্ছে মনে করছে অনুকম্পা !

২

মনে পড়ে তারে
একাকিনী বসেছিল জানালার ধারে !
শরতের আতপ্ত কিরণ
সর্বাঙ্গে স্বজিতেছিল স্বপন হিরণ।

* যে দরদী যুবকটির মনোভাব এই কবিতাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার নাম আমি গোপন রাখিতে বাধ্য, কারণ তাহার নাম আমি জানি না।

নয়নেতে ছিল না নিমেষ
স্রস্ত বাস—মুক্ত বেণী—আলুথালু বেশ।
আত্মহারা সমস্ত পাশরি
অম্বরে শুনিতেছিল মুগ্ধ কার অন্তর-বাঁশরী।
দূর হতে চুপে চুপে দেখেছিনু তারে
দাঁড়াইয়া আলিসার ধারে।

৩

ধূ ধূ মাঠ চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলাম একেলা
অস্ত-রাগ-রক্ত নভে ম্রিয়মাণ গোধূলির বেলা।
বিসর্পিত রেল-পথ চলে গেছে যেন রে উদাসী
শব্দ হল! ফিরে দেখি—আসে ট্রেন বাজাইয়া বাঁশি।
ঊর্ধ্ব-শ্বাসে চলে গেল—চকিতে দেখিনু আঁখি তুলি
বাতায়নে বসে আছে!—চিত্ত মোর উঠিল আকুলি।

৪

চলে 'বাস' ঠমকি ঠমকি
ছিনু আমি ওধারের 'সীটে'
অকস্মাৎ উঠিনু চমকি
শাড়ি কার ঠেকিতেছে পিঠে।
দেখিলাম গ্রীবাটি বাঁকায়ে
দেখিলাম মানে ডুবিলাম
মোর পানে আছে সে তাকায়ে
হরষেতে আঁখি মুদিলাম।
শাড়িটুকু ঠেকে আছে পিঠে
কিছু নয়—তবু কত মিঠে!

৫

লাইব্রেরিতে—
মনে নেই?
সেই যে সেদিন ফোর্থ পিরিয়ডে!
ঝুঁকেছিলে তুমি কী একটা কেতাবের ওপর।

তোমার আনত দেহখানির দিকে চেয়ে চেয়ে
শেষে আমিও ঝুঁকলাম।
বস্তুত—না ঝুঁকে উপায় ছিল না আমার!
কিন্তু ওই পর্যন্তই—
ঝুঁকেই রয়ে গেলাম—
বাক্যি বেরুল না আর মুখ দিয়ে!
চেয়ে রইলাম খালি ফ্যালফ্যাল করে—
দেখে তুমি হাসলে একটু
কী সুন্দর মিষ্টি হাসি তোমার
ঠিক লেমন্ ড্রপ্স্ যেন!

৬

লোকজন চারিদিকে রীতিমত ভিড তো
তারি মাঝে অন্তর-সেতারের মীড তো
রণিয়া তুলিল ঠিক—সুর পড়ে ঠিকরি
অথচ চলিয়া গেলে—মুশকিল কী করি!
ফস করে চলে গেলে তুলে দিয়ে ঢেউ যে
এ-কথা কাহারে বলি বুঝিবে না কেউ যে।

৭

গৌর বর-হস্তে ঠোঙা মুচমুচে ডালমুট তাতে
কাজল-পরা উজল তব নয়ন ছুটি চঞ্চলি
সিনেমা থেকে বাহির হলে—আমিও ছিনু ফুটপাথে
জান কি সখি সেদিন গেছ কেমনে মোর মন ছলি!
করিনু 'ফলো' কিছুটা দূর—নামিল পোড়া বৃষ্টি যে
ভিজিয়া হনু গোবর সম ছাড়ি নি তব সঙ্গ তো
ঝাপটা লেগে ঝাপসা হল ছুটি আঁখির দৃষ্টি যে
ট্যাক্সি চড়ি চলিয়া গেলে—অসঙ্গত রঙ্গ তো!

৮

বর্ষণ-মুখর আজি শ্রাবণ-শর্বরী
ঘন কালো মেদুর আকাশ
কেতকী-কদম্ব-বনে উঠিছে মর্মরি
কার দীর্ঘশ্বাস।
অদেহী আমিই যেন বরষার নিবিড় আঁধারে
চলিয়াছি আনমনে একা একা কার অভিসারে ;
কোথায় দেখেছি তারে ? ট্রামে ? ট্রেনে ? লেকের কিনারে ?
অথবা সে 'বাস্‌'।
কেতকী-কদম্ব-বনে উঠিছে মর্মরি
কার দীর্ঘশ্বাস।

৯

সূর্য তখন পাটে
দেখেছিনু তোরে সেদিন সজনি
মোহন মধুর ঠাটে।
জানি না সেদিন কি তিথি পাঁজিতে
এসেছিলে তুমি বাসন মাজিতে,
ইমন রাগিণী ভাঁজিতে ভাঁজিতে
গিয়েছিনু আমি ঘাটে।
ঘোমটা টানিয়া দিয়েছিলে তুমি
মোহন মধুর ঠাটে।

১০

মাপ করুন
এবার
চাঁছা ছোলা গদ্য কবিতায় সাফ কথা বলতে চাই দু-চারটে !
দেখুন
তেপান্তরের মাঠ
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী
পক্ষীরাজ ঘোড়া

ঘুমন্ত রাজকন্যা
সব জানা আছে মশাই—
অর্থাৎ নিমতলাও চিনি—কাশী মিত্তিরও চিনি,
মরে রআছি এই যা দুঃখ।
রাজকন্যার কথা শুনবেন ?
দুঃখের কথা আর কত বলি মশাই !
সেকালের রাজকন্যাদের
সোনার কাঠি রুপোর কাঠিতেই চলত—
একালের রাজকন্যাদের প্ল্যাটিনামের কাঠি চাই—
তা না হলে মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে—
হ্যাঁ—হ্যাঁ—মশাই—প্ল্যাটিনাম !
মীনা-করা হলেই ভালো হয় !
আধুনিক রাজপুত্রদের ট্যাঁক গড়ের মাঠ,
ধূ ধূ করছে।
সুতরাং করবে কী ?
বিঁড়ি ফুঁকছে
আর প্রেমের কবিতা লিখছে !

১১

পরিপূর্ণ একখানি চড়
জানি তুমি মেরেছিলে গালে
বুকে তবু তুলেছিলে ঝড়
ভুলিব না তাহা কোনো কালে।

১২

বিচ্ছু সবাই বিচ্ছু—
পাজরা-খানা-ঝাঁজরা-করা বিষম কারো চোখ কি !
মর্মখানি মাড়িয়ে দিয়ে গেলেন কোনো লক্ষ্মী—
ঠুকরে দিয়ে উধাও কোনো বিম্বাধরা পক্ষী —
দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়ে গেলেন
কেউ না করে কিচ্ছু !
বিচ্ছু সবাই বিচ্ছু !

প্রচেষ্টা, আশা ও বাণী

প্রচেষ্টা

১

দুটি রক্তিম উৎসুক অধর,
বেগবান, অনাহত, একাগ্র !
আরও দুটি—
কাছাকাছি হয় তারা ক্রমশ
ব্যবধান কমে আসে আস্তে।
বেগ দুর্দমনীয় !
আরও কাছে—আরও—আরও
সংঘাত !
নিদারুণ, নিষ্করুণ—হিংস্র।
ঈথর-সমুদ্র
ভীষণ তরঙ্গাকুল হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই—
শব্দ হয় কিন্তু—ছোট্ট
মিষ্টি !

২

শাওন মেঘেতে আজি বাজে পিয়ানো
নয়ন ভরিয়া কেন চাহনি আনো !
উতলা পূরবী বায়ে জলের ছিটে
লাগিছে আজিকে সখি বড় যে মিঠে
বাঁকিয়া বেণীটি তব পড়েছে পিঠে
পোষা সাপ জিয়ানো।
বাদল মেতেছে আজি নীপের বনে
রিমঝিম রিমঝিম কি বরিষণে
এমন প্রভাতে সখি আমার মনে
ওগো, বলো কী আনো।

৩

জ্বেলেছি বাতি আহা কী নীল
ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আহা যে 'নিল্'
সাগর নীল, আকাশ নীল
নীল তোমার চোখ
সেই জোরেই চাঙ্গা দিল
সেই জোরেই ছন্দ মিল
সেই জোরেই এই নিখিল
চমৎকার হোক !

৪

কাহারে করিব ভয় ?
মৃত্যু মোরে দিয়েছে অভয়।
আসিবে সে একদিন পরম লগনে
ছিন্ন করি সর্ব জটিলতা।
বিলুপ্ত করিয়া মোর সকল কলুষ,
নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া অস্তিত্ব আমার,
মুক্তি দিবে মোরে।
হয়ে যাব শেষ।
তারপর ?
তারপর কিছু নাই।
বজ্রকণ্ঠে মহাকাল দিতেছে আশ্বাস
অমোঘ সে আশ্বাস-বচন
শুনিতেছে প্রতিক্ষণে শোণিতের প্রতি কণিকাটি।
কাহারে করিব ভয় ?

৫

ক্ষমা করো—
আমার সুকৃতি, দুষ্কৃতি,

পতন-উত্থান,
তার জন্য আমিই দায়ী !
তার ফলভোগ করব আমিই
তুমি শুধু শুধু চটে মন খারাপ করে থেকো না
আমায় ক্ষমা করো !
তোমার ভালোর জন্তেই বলছি
ক্ষমা করো !
চিঠির উত্তর দাও।

আশা

হলই বা ছোট—
তবু সে বাণী, বহন করে আনে তো !
দুখের বাণী, সুখের বাণী,
শোকের বাণী অন্তর্লোকের বাণী।
ছোট হলেও তাকে তুচ্ছ করবে কে ?
একদিন আরও ছোট ছিল।
ক্রমশ বাড়ছে
আকারেও—দামেও।
এক, দুই, আজকাল তিন
হয়তো আরও বাড়বে !
বাড়ুক !
বাড়া তো উচিতই
যদিও হাঁস নয়, পদ্মও নয়—
তবুও বাণী-বাহক
মেঘদূতের সগোত্র—ওই পোস্টকার্ড।

বাণী

"চৌবাচ্চার জল নিয়ে আমার কারবার,
হঠাৎ মাঝ-সমুদ্রে ফেলে দিলে পারি কি ?
হাঁপিয়ে পড়ব যে !
অমন লম্বা লম্বা চিঠি লিখো না বাপু তুমি !

আমার ভারি ভয় করে।
এমন কিছু কর যা জানি, চিনি, বুঝি,
যা রয় সয়।
এ সব কী ?
সেই নাকই তো দেখাবে শেষ পর্যন্ত,
অত ঘুরিয়ে দেখাবার দরকার কী ?
ভালো লাগে না আমার !"

চতুষ্কিকা

১

বিদ্যুৎ-শাবক যেন—ঝকমকি উঠে ঝলসিয়া
শাণিত ভ্রূ-ভঙ্গিখানি ! বিদীর্ণ করিল মোর হিয়া।
কী মধুর বিদারণ—পরিপূর্ণ কী পরম সুখ,
বিক্ষত বিধ্বস্ত হিয়া পুনরায় আঘাত-উন্মুখ !

২

বেসেছি তোমারে ভালো, বুঝি না—কেন যে কর রোষ,
এসেছি সমীপে তব, কহো সখি, কিবা তাহে দোষ !
যুক্তি কিছু নাহি জানি, ভাষা নাহি আসে রসনায
চুম্বক করিলে রাগ হতবাক্ লৌহ অসহায় !

৩

নীরব রয়েছ কেন ? দেখিতেছি অধরের তীরে
লজ্জারুণ হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিছে ধীরে ধীরে।
আনমিত নয়নেতে পড়িতেছে উপচিয়া যাহা
একবার, হে নিদয়ে, ভাষায় বল না কেন তাহা !

৪

অন্তরে জলিছে অগ্নি, বাহিরেতে আছ নির্বিকার,
নযনে কহিছ যাহা, রসনায কর না স্বীকার।
তোমার অসীম শক্তি শোভন হইত হলে কম,—
কামানের কী গৌরব মশকেরে করিয়া জখম।

হস্তী-প্রশস্তি

মুখখানি ঢলঢলে, চোখ তুটি সুন্দর।
মিলের খাতিরে নয় সত্যই কুন্দর
মতো তার দাঁতগুলি,—দেখে হয় তৃপ্তি
চোখে মুখে সলজ্জ বুদ্ধির দীপ্তি।
সংবৃত শাড়ি তবু সামলায় শতবার,
চোখে মুখে পড়ে চুল সরায় সে যতবার,
ঘন ঘন কনকনে অবাধ্য কঙ্কণ,
না-বলা কথার ভারে অধরের কম্পন
সুন্দর লাগে ভারি—সবটাই মিষ্টি,
আনমিত নয়নের সচকিত দৃষ্টি!

আর নয়! থামা যাক—এ প্রয়াস ছন্দের
হাত দিয়া হাতি দেখা অসহায় অন্ধের।
হাতির কর্ণে যবে ঠেকে তার হস্ত
"হাতি কি কুলোর মতো?" ভাবে কানা ত্রস্ত।
পায়েতে ঠেকিলে হাত কানা ভাবে, "হস্তী
হয়তো থামের মতো!" লাগে অস্বস্তি।
তারপর ফোঁস করে ওঠে যবে শুণ্ড
অসহায় অন্ধের ঘুরে যায় মুণ্ড।
সুতরাং থামিলাম। হে রূপসী তম্বী,
হয়তো বরফ তুমি, হয়তো বা বহ্নি!

সত্যই?

তুলেছে তোমার দাঁত অরসিক কোনো দন্তবিদ্?
সত্যই সাঁড়াশি দিয়া সবলে করেছে উৎপাটন?
দন্তহীনা তরুণী যে নিতান্তই নগণ্য উদ্ভিদ্
এই তথ্য তার কাছে করে নাই কেহ উদ্ঘাটন!

গোলাপেরে নিষ্কণ্টক করি যারা করে সংস্কার
বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় লঙ্কার ঝালত্ব করে দূর,
আমি কবি, দূর হতে তাহাদের করি নমস্কার
কণ্টকবিলাসী আমি ঝালে ঝাঁজে লোভ যে প্রচুর।

দংশন করিবে কিসে ? কিসে বল করিবে চর্বণ ?
মরীয়া অনেক মুণ্ড প্রতীক্ষা যে করিছে সাগ্রহে !
নকল দন্তের জোরে সফল কি হবে, কহো, রণ ?
অতি পক্ক খুলিগুলি মোটেই যে অমজবুত নহে।

কায়াহীন ছায়ালোকে অশরীরী যে কবিত্ব-ভূত
মায়াময় মিথ্যা দিয়া নানা ধোঁয়া করিছে সৃজন
শুনো না তাহার কথা, জুয়াচোর সে অতি অদ্ভুত
যে পথে লইয়া যাবে ফাঁকা তাহা—নিতান্ত বিজন।

ফণী হবে ফণাহীন, দন্তহীন হইবে দন্তুর,
বিজ্ঞানী অসুর শেষে গানেরও কাড়িবে নাকি সুর ?

অদ্ভুত

শ্রাবণের মেঘ কহে পিপাসায় চিত্ত দহে,
দাও বন্ধু, এক বিন্দু জল,
এসেন্সের করে দর চম্পক, যূথী, টগর,
গন্ধরাজ, গোলাপ, কমল।
সন্ধ্যা-উষা রুজ মাখে, খদ্যোতের টর্চ কাঁখে,
বজ্র খোঁজে লাউড স্পীকার,
পাউডার ঘষে চাঁদে, প্রজাপতি নানা ছাঁদে
পরে শাড়ি ব্লাউস নিকার।
জ্ঞানশূন্য দিগ্বিদিক নকল করিছে পিক
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের সুর,
প্রেমের প্রেরণা লাগি চখা-চখী আছে জাগি
সিনেমায় আঁখি-স্বপ্নাতুর।

হইবারে তেজীয়ান   সূর্য করে সুরাপান
প্রভঞ্জন ভাঁজিছে মুদ্গর।
মহাকাশ মুক্তি-তরে   ধ্যান-মগ্ন রুদ্ধ ঘরে
ভূমা-লাভ না হলে দুষ্কর।
যুবতী কাঁদিয়া মরে   যুবকের পায়ে ধরে
কহে, মোরে আলিঙ্গন করো,
পুষ্পধনু পঞ্চশরে   মোদক-জর্জর করে,
শঙ্কর জপিছে—হর হর।
সত্যের নিকটে ঋণী   কল্পনা সে ভিখারিণী
খগেশ্বর খপোত-লোলুপ
মোটর না হলে হায়   মনোরথ নাহি ধায়
মহাকাল মৃত্যু-ভয়ে চুপ!

নেতার উক্তি

ড্রয়িং-রুমে

১

মূল্য আমার আছে কি না আছে, কে করিবে বলো নির্ধারণ?
নর-মানুষের মূল্য লইয়া কেনই বা এত শিরঃপীড়া!
জনতার মন করেছি হরণ, মুগ্ধ জনতা মোর চারণ—
বাহাদুরি নাই? শুষ্ক কথায় ভিজাই কেমন শক্ত চিঁড়া!
মূল্য আমার থাক না থাক,
চিরকাল ধরে রেডিও কাগজে বাজিছে, বাজিবে আমারি ঢাক।

২

যাহা বলি, তার গভীর অর্থ এখনও বন্ধু বোঝ নি নাকি?
আপেল আঙুরে নিন্দা করিয়া চুম্বন করি কুমড়ো কদু,
বুলবুল শ্যামা তাড়াইয়া দিয়া পুষিয়াছিলাম ছাতারে পাখি,
তাহাও তাড়াব, মশা ছারপোকা চাহে আধুনিক রামা ও যদু।
আসল অর্থ কথার নয়,
আসল অর্থ ব্যাঙ্কেতে থাকে, দুনিয়া জুড়িয়া যাহার জয়।

৩

সেকেলে-মার্কা বিবেকের সখা, কী বলে এখনও দোহাই দাও ?
নতুন রকম নানান বিবেক ছেয়েছে বাজার, ভরেছে গোলা,
নাৎসি, জাপানী, খদরি, ফ্যাসিস্ত, লাঙল, কাস্তে—যা খুশি চাও,
তোমার বিবেক, আমার বিবেক ? শিকায় সে-সব থাকুক তোলা !
এবার বন্ধু কুম্ভীপাক,
কাকের পালক চুরি করে করে ময়ূরেরা সব সাজিছে কাক ।

ভীমসেন

চলিতেছে গদাযুদ্ধ : পরাক্রান্ত বীর ভীমসেন
রক্তচক্ষু, স্ফীতনাসা, তুঙ্গশির, ভীষণবদন
হুহুঙ্কারি উচ্চকণ্ঠে দুর্যোধনে ডাকি কহিলেন,
'রে দুরাত্মা, আজ তোরে পাঠাইব শমনসদন,
সাধ্য থাকে রোধ কর ।'
সচকিত গান্ধারী-কুমার
বাঁচাইল কোনোক্রমে শির ।
'সাধ আছে সমরের ?'
দন্ত কড়মড়ি ভীম হানিলেন গদা পুনর্বার ।
সে আঘাতও, কী আশ্চর্য, দুর্যোধন রোধিলেন ফের !
ক্ষুব্ধ হল ভীম-গুম্ফ !—বৃকোদরে অপমান হেন ?
সহসা তুলিয়া গদা উল্লম্ফিয়া ছাড়ি অট্টনাদ
মহাক্রোধে ক্ষিপ্ত ভীম করিলেন গদা-বৃষ্টি যেন ।
পেটে পিঠে বুকে মুখে—রহিল না কোনোখানে বাদ ।
'কী মুশকিল, যাত্রা এটা, কী আপদ, ওরে শোন শোন'—
আর্তকণ্ঠে নিবেদিল ভূপতিত ভীত দুর্যোধন ।

কাই-কুতু

১

কাই বলে, ওরে কুতু ভাই,
সেদিন তুলিয়াছিনু হাই
মুখ-ভঙ্গি সহকারে তুড়ি দিয়া বারে বারে
শব্দ করি বিচিত্র রকম,
ভেবেছিনু মাগী মদ্দ হাসিয়া হইবে হদ্দ,
একেবারে হইবে অধম।
কিন্তু চেয়ে দেখি ভাই, কারো মুখে হাসি নাই,
গুম হয়ে বসে আছে সবে!
কুতু বলে, শোনো বলি তবে—

২

ঈষৎ হাসিয়া কয় কুতু
আমিও ফেলিয়াছিনু থুতু
দন্তের ফাঁক দিয়া রসনাটি ঝুলাইয়া
কায়দা করি গলা খাঁকারিয়া,
ভেবেছিনু, হাসাইব, রস-স্রোতে ভাসাইব
ছেলে-বুড়া সকলের হিয়া।
কিন্তু কিছু ভাসিল না— কোনো ব্যাটা হাসিল না,
—হাঁ হাঁ, তুমি ধরিয়াছ ঠিক,
দুনিয়াটা অতি বেরসিক।

৩

কাই কয়, উপায় কী তবে,
আমাদের কিবা দশা হবে?
হাসিতে চাহে না কেউ, অথচ রসের ঢেউ
চিত্ত ভরি নিত্য উথলায়,
একাকী রসের বোঝা বহন করা কি সোজা?
বলো ভাই, করি কী উপায়?
কুতু কয়, ওরে কাই, আয় তবে দুজনাই
এক সাথে করি আক্রমণ,
কী করিব ভালো করে শোন।

৪

সকলেই অতি ঠ্যাটা, সহজেতে কোনো ব্যাটা
হাসিবে না জানি ইহা স্থির,
হাসি যদি খুবই পায় দুষ্টামি করিয়া হায়
মুখ টিপে রহিবে গম্ভীর।
তা বলে কি দেব ছেড়ে? ধরিতে হইবে তেড়ে,
বিপর্যস্ত করিব বগল,
অন্তত হাসিবে মুচকি না হাসিলে—আছে কুঁচকি
কণ্ঠ কুক্ষি করিব দখল।
কাই বলে, ওরে কুতু ভাই,
নাই তোর কোনো তুলনাই।

এবারেও

এবারেও আসিতেছে পূজা;
আসিছেন মহিষমর্দিনী দশভুজা
সন্দেহ নাহিক তায়।
প্রতি পঞ্জিকায়
স্পষ্টাক্ষরে শুভ-বার্তা লেখা
জগন্মাতা দেবী তাঁর বাৎসরিক দেখা
এবারও দিবেন আসি দীন ভক্ত-জনে।
স-ঝাঁপি স-পদ্ম লক্ষ্মী রীতিমত রত্ন-আভরণে
সাজিয়া প্রসন্ন হাস্যে রহিবেন পাশে
এবারেও ভক্তদের আশে।
রহিবেন বাণী
বঙ্কিম-ঠামেতে ধরি সনাতন সেই বীণাখানি।
কৌমার্য-ব্রতী
দৈত্য-নিসূদন বীর দেব-সেনাপতি
গুম্ফে চাড়া দিয়া

কোঁচা দোলাইয়া
প্রতিবারকার মতো এবারেও সুবেশ ধরিয়া
আসিবেন ময়ূরে চড়িয়া।
সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশ—অতি-পূজ্য দেবতা হিন্দুর—
হাঁ, তিনিও,—স-ইন্দুর
আসিবেন স-কদলীবধূ।
রামা শামা যদু
নিঃসন্দেহ সকলেই আসিতেছে পূজা
শক্তির প্রতীক দশভুজা
নির্ঘাত আসিতেছেন দশ-হস্তে বহি প্রহরণ।
কুম্ভকারগণ
প্রাণপণে জুটাইয়া মৃত্তিকা ও খড়
নানা ছাঁদে গড়িতেছে নানাবিধ মুণ্ড ও ধড়।
পূজার বাজার ভীত চিন্তিত কবির
কুঞ্চিত ললাটরেখা হতেছে গভীর।

পরস্পরা

রাগে হই দিশাহারা—
ভাবি নিজে মরি
আর সহ্য হয় না কো আত্মহত্যা করি।
সঙ্গে সঙ্গে ভাবি ফের
চাবকাই ধরি
আপাদমস্তক ওকে—সব দোষ ওরই।
......
বিবেক বারণ করে।
.. ...
আপনা সম্বরি
তাহারে হেরিতে থাকি ক্রুদ্ধ চক্ষু ভরি।
......
ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ফের।

......

জিহ্বায় ঘর্ঘরি
ছুটে আসে ভাষা-ট্যাঙ্ক ;
হই থরথরি
স্ফীতনাসা মুক্তকচ্ছ।
মর্মেরে বিদরি
শব্দ-শেল গর্জি ওঠে শূন্যেরে জর্জরি।

......

ক্লান্ত হই।

.. ...

ক্ষণ পরে এলায়ে কবরী
সেও গিয়া ছাতে বসে ;
পাড়ে জ্বলে জরি।

......

অস্তাচল 'পরি
মার্তণ্ড ঢলিয়া পড়ে।

......

নিরীক্ষণ করি।

......

অপরূপ ছন্দে যেন ঝামেলা-ঝামরী
রচে নব তন্ত্র-কাব্য।

.....

মহাত্মারে স্মরি
রহি মৌন,
হিংসা-হীন
জিঘাংসা-পাশরি।

......

আশ্চর্য ফল হয়।

.....

আসিলে শর্বরী
গদগদ কণ্ঠে কহি তুমি প্রাণেশ্বরী

তপোভঙ্গ

ছন্দ-মিলের বন্ধন পীড়িত করেছে প্রাণকে—
বন্ধন-মুক্ত হতে চাই।
তারি তপস্যা করছি।
দুঃসহ তপস্যা!
পুরাতন ছন্দ-মিলের নির্মম শৃঙ্খলে
বাঁধা আছে আমার কবি-মন।
উদার আকাশে অবাধ ভাবে উড়তে চায় কল্পনা-বিহঙ্গম,
অসীম সমুদ্রে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভেসে যেতে চায়
ভাবের তরণীখানি,
পারে না।
মিল এসে পথ-রোধ করে,
ছন্দ এসে বলে, নিয়ম মেনে চলতে হবে।
কল্পনা-বিহঙ্গমের পক্ষ আসে অবশ হয়ে
পরিচিত ঘাটের পরিচিত কিনারায় বাঁধা পড়ে ভাব-তরীখানি
প্রাচীন প্রথার সনাতন নিয়ম মেনে
ছন্দ-মিলের নোঙর-নিগড়ে।
কিন্তু এ নিগড় ছিন্ন করতে হবে
ছেদন করতে হবে মিল-মায়া-পাশ!
—এই পর্যন্ত অবলীলা-ক্রমে লিখে ফেলেছিলাম
এমন সময় কে যেন এসে হাত চেপে ধরলে,
লেখনীর গতি হল বন্ধ।
প্রশ্ন করলাম—কে তুমি?
"আমি পুরাতন ছন্দ!"
কলহাস্যে লুটিয়ে পড়ে সে আবার শুরু করলে:

আমি পুরাতন ছন্দ,
গহন নিশীথে তারার মেলায়
ভেসে যাই আমি মেঘের ভেলায়
কমলের বুকে প্রভাত-বেলায়
আমি সুমধুর গন্ধ।

কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জন করি
বন-মর্মরে উঠি যে গুমরি
কল্লোলিনীর কল্লোল ভরি
বহে মোর মহানন্দ।

বললাম—তোমায় তো চিনি আমি!
চিনি বই কি!
এতকাল তোমারই বন্ধনে যে বন্দী ছিলাম!
মধুর সে বন্ধন—
স্বপ্নময় সে দাসত্ব—
স্বীকার করছি।
কিন্তু তবু সে বন্ধন খুলতে চাই
ভুলতে চাই সে সব।
আমায় আর তুমি ভুলিও না,
মুক্তি দাও।
খঞ্জন-নয়ন দুটি তার
চঞ্চল হয়ে উঠল।
রাগে, অনুরাগে, না কৌতুকে?
জানি না।
আরক্তিম কপোল থেকে অলকগুলি সরিয়ে
বিম্বাধরের ফাঁকে কুন্দ দন্তের শোভা ছড়িয়ে
সে বলতে লাগল,
আমি শুনতে লাগলাম বিহ্বল হয়ে—

একদিন তব কাব্য-কাননে
নিবিড় বরষাকালে
মনের ময়ূর উঠিত নাচিয়া
আমারই নূপুর-তালে।
সে কথা ভুলিতে পার কি কখনও
মোর কাঁকনের সেই কন-কন!

বিজলী ঝলক সেই ঘন ঘন
মেদুর মেঘের জালে—
একদিন তব কাব্য-কাননে
নিবিড় বরষাকালে।
কহো কবি কহো, ভুলিবে কি তুমি
সে মধু শারদ নিশি—
জ্যোছনায়, গানে, স্বপনে, সোহাগে
টলমল দশ দিশি।
আনন্দ-ঘন ছন্দে ও মিলে
সে দিন যে সুধা তুমি বিতরিলে
আকাশে বাতাসে গগনের নীলে
আজও তা রয়েছে মিশি।
কহো কবি কহো, ভুলিবে কি তুমি
সে মধু শারদ নিশি।

তার সেই স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে
আকম্পিত কণ্ঠস্বরে
ভুজঙ্গায়িত বেণী-বিক্ষোভে
বিলোল কটাক্ষের মাদকতায়
আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি।
বললাম—
"অয়ি মোহিনী, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও
আর প্রলুব্ধ কোরো না।
তোমার মোহন বন্ধনে আর বেঁধে রেখো না আমায়!"
বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে
নয়নের দৃষ্টি হয়ে এল সকরুণ, বাষ্পাকুল—

বলতে লাগল—

মরি গো মরি,
তোমার বাঁশির সুর
কে নিল হরি।

আজও আকুল অলি
পড়ে মুকুলে ঢলি
শিমুল, পলাশ, জবা খেলিছে হোলি
ওই কানন ভরি।
ঝর্ণা নামিয়া আসে
উপল-পথে
বসন্ত আসে তার
কুসুম-রথে
সুর-মহোৎসবে
ওই মেতেছে সবে
তোমারই বাঁশিটি শুধু বেসুরা রবে ?
আমি দেখি কী করি !
রাখালেরা মাঠে মাঠে
করিছে খেলা
বধূরা চলেছে ঘাটে
সাঁঝের বেলা
ওগো আনত আঁখে
সেই কলস কাঁখে
সেই ঝুমকো-লতার শোভা পথের বাঁকে—
তাতে কি মঞ্জরী।
সন্ধ্যা ঘিরিয়া আজও
আঁধার নামে
জ্যোৎস্না তমালতলে
থমকি থামে
ওগো পুরানো মোহে
আজও কি সমারোহে
চাহিছে পরস্পরে প্রণয়ী দোঁহে
সারা হৃদয় ভরি।
মরি গো মরি,
তোমার বাঁশির সুর
কে নিল হরি।

সমস্ত অন্তর উৎসারিত হয়ে উঠল আমার,
রোমাঞ্চিত হলাম।
তপস্যা-লোলুপ বিবেক বলতে লাগল দৃঢ়স্বরে—
'না ; নিজেকে হারিয়ে ফেললে চলবে না !
অপ্সরীর আবির্ভাব তো হবেই।
এই তো পরীক্ষা !
যুগে যুগে এই রকম হয়ে এসেছে।'
নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে বললাম—
'তোমার সেবা তো বহুকাল করেছি, দেবি,
এবার ছুটি দাও।
সীমার পূজারী ছিলাম
এবার অসীম আমায় ডাক দিয়েছে
বিদায় চাই।'
তার মুখখানি সহসা গম্ভীর হয়ে এল
নয়ন-পল্লবে নেমে এল মেঘ-মেদুর বর্ষার নিবিড় শোভা
প্রশান্ত, সজল-স্নিগ্ধ।

জলদ-গম্ভীর স্বরে সে বলে উঠল—

বিদায়ের ছলে তুমি সঙ্গীতেরে করিবে লঙ্ঘন ?
পার কি লঙ্ঘিতে ?
অনবদ্য কণ্ঠে তব শেষ সুধা কর গো বণ্টন
অপূর্ব ভঙ্গিতে !
অন্তিম কাকলী-ছন্দে কাব্য-কুঞ্জ উঠুক মুঞ্জরি,
আসন্ন বিচ্ছেদ-শোকে অলিকুল কাঁদুক গুঞ্জরি.
কবিতা সুন্দরী
ছন্দোময় ক্রন্দনেতে আকুলিয়া তুলুক অম্বর,
গম্ভীর শোকের ছন্দে পূর্ণ হোক সবার অন্তর
বিচিত্র সঙ্গীতে !
তারপর হঠাৎ তার আঁখিপল্লব থেকে

ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল—একরাশি মুক্তা
অশ্রুবিন্দুর মালা।
অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমি !
কাঁদছে ?
হাঁ, কাঁদছেই তো !
জিজ্ঞাসা করলাম—'কাঁদছ তুমি ?'
নির্বাক হয়ে বসে রইল সে।
আমি দেখতে লাগলাম—
তার অশ্রুর বিন্দুগুলি অপূর্ব ধারায়
ঝর্ণা হয়ে বয়ে চলেছে।
ঝর্ণা ক্রমশ হল নদী
নদী—মহানদী—
শেষে দেখি বিশাল সমুদ্র
অতল—অগাধ—অপার,
অশ্রু-সাগর।
সেই অশ্রু-সাগরের বেলাভূমিতে একা বসে আছি,
আর কেউ নেই !
সেই মায়াবিনী কোথা ?
কোথা গেল সে ?
দেখতে দেখতে সেই অশ্রু-সাগরে একটি দ্বীপ জাগল
অদ্ভুত সে আবির্ভাব।
সর্বাঙ্গে তার মরকত-দ্যুতি
অপূর্ব শ্যামলশ্রী
চতুর্দিকে চন্দনের বন
পুষ্পভারনম্র লতাকুঞ্জ
স্বর্ণ-কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত।
হঠাৎ চন্দনের বন থেকে বেরিয়ে এল সে।
লীলায়িত তার দেহলতাখানি
নৃত্যমুখর হয়ে উঠেছে তার চরণের নূপুরগুলি
পীবর বক্ষের কাঁচুলিতে লাগছে যৌবনের তরঙ্গ-ভঙ্গ,

আবেশমুগ্ধ নয়নভঙ্গিমা,
নীল ওড়নাখানি দখিন হাওয়ায় দুলছে।
নৃত্যচটুল শিঞ্জিনীতে অপূর্ব ছন্দে বাজতে লাগল
চন্দন গন্ধ ঘন
কল্পনা কোথা হতে বহিয়া আনিল রে
চঞ্চল পরান মন।
কোন্ স্বপ্ন-কুঞ্জ-তরু-শাখে
আজি উন্মন বিহঙ্গ ডাকে
ও কে অসীম শূন্য ভরি আঁকে
কার ক্রন্দন-ছন্দ, শোন।
তপ্ত তপন খরতাপে
পুষ্পিতা বল্লরী কাঁপে
চঞ্চল পরান মন।
আজি মধু ফাল্গুন মাহে
অন্ধ কামনা কারে চাহে
চঞ্চল পরান মন।
কোন্ সার্থক সুন্দর মায়া
আজি অন্তরে লভিছে রে কায়া
ওই অম্বর ভরি আলো-ছায়া
কেন মন্থরে সঞ্চরিছে—
চঞ্চল পরান মন।
মোর বিশ্ব নিঃস্ব করি কারে
আজি নন্দিব ছন্দের হারে,
একি অপরূপ আনন্দ ধারে
মম অন্তর সন্তরিছে
চঞ্চল পরান মন।
আমি আর পারলাম না,
পারলাম না থাকতে;
শিরায় শিরায় সুরার স্রোত বইতে লাগল
তপোভঙ্গ হল আমার।

বলে উঠলাম—

ভেঙেছে ভুল—ভেঙেছে ভুল—কাছেতে এসো সুন্দরি
মুগ্ধ তব সঙ্গীতের ছন্দে যে
চটুল দুটি চরণ ঘেরি পরান ফেরে গুঞ্জরি
উতলা অলি পাগল মধু গন্ধে যে !

একসঙ্গে যেন হাজার ঝাড়-লণ্ঠন ভেঙে পড়ল
পাথরের মেঝেতে—
অপূর্ব সে কলহাস্য !
চেয়ে দেখি—কেউ নেই,
সাগর নেই—দ্বীপ নেই—সে নেই।
একা আমি বসে আছি
সামনে কাঠের টেবিল
হাতে ফাউন্‌টেন্ পেন
বেকুবের মতো।

অবহেলে

গোখরো, কেউটে, বোড়া, করেৎ
জমিয়ে রেখেছে আসর।
হেলে বেচারা কলকে পায় না কিছুতেই।
শেষে
মনের দুঃখে সে
এমন দেশে গেল যেখানে সাপ নেই।
অর্থাৎ
'নিরস্ত-পাদপ দেশে' হাজির হল
হেলে-এরণ্ড !
গিয়েই এক তরুণীর দর্শনলাভ !
লিকলিকে রঙচঙে হেলেকে দেখে
মুগ্ধা তরুণী তার সঙ্গিনীর গা টিপে বললে,
—দেখ ভাই দেখ ! কী মিষ্টি দেখতে !
বাস্—কেল্লা ফতে !

পপুলার হয়ে উঠল ছেলে মেয়ে-মহলে।
গোখরো, কেউটে, বোড়া, করেৎ যদি দেখত ছেলের কাণ্ড
মরে যেত লজ্জায়।
পপুলার ছেলে সকলের গলায় গলায় ফিরতে লাগল ;
কারণ সে পপুলার হল সাপ-রূপে নয়,
হার-রূপে।

আকাশ-বাণী

[রাত্রিকালে নিজের নির্জন কক্ষটিতে কবি বসিয়া আছেন এবং তন্ময় হইয়া উন্মুক্ত দ্বারের পানে চাহিয়া গদ্গদকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছেন—]

বুনো হাঁসের পাখার শব্দ,
এঞ্জিনের ধোঁয়া,
মিলের নল,
নরম চুল,
মোহন মেকুর,
কচি টিয়া,
ঝুনো ক্যাপিটালিস্ট,
ডিগ্রী,
বিজ্ঞাপন,
পিটুনিয়ার শুকনো পাপড়ি,
জিরাফের বাচ্চা,
রাস্পবেরি রঙের ব্লাউজ,
অল-ইণ্ডিয়া রেডিও,
উপদংশের উপাখ্যান,
"চলে যায়, চলে যায়, চলে আয়
সরে আসছে, সরে আসছে, সরে আসছে—"
এই ধরনের নেকু-নেকু কথা ;
মেঘের গুঁড়ো,

কপনির টুকরো,
পাউডারের কৌটোর ঢাকনি,
স্যাণ্ডাল,
নানা রকম জিনিস সাজিয়ে বসে আছি ;
রীতিমত নিদিধ্যাসন চলেছে
স্বাস্থ্য
নৈতস্থিক
আধরিক,
উৎপাটনও করে রেখেছি নানা রঙের ঘাস
তোমার আশায়।
তুমি আসবে বলে
সেজেছি
হাবাগোবা,
খামখেয়ালী অন্যমনস্ক কবি !
চলতি ট্রামের কোণে বসে বসে
রহস্যময় ভঙ্গিতে চুলকে চলেছি
জ্ঞান-হয়রান-কারী দক্রটিকে ।
পিপীলিকা দেখছে গণ্ডারের স্বপ্ন,
বাছুর বাঘের।
সিংহনাদ ছাড়ছে
প্লীহাস্থিত এল. ডি বড়িজ।
বাপের পয়সা
শ্বশুরের প্রভাব
স্ত্রীর কোমর-দোলানি,
হোমরা-চোমরাদের পিঠ-চাপড়ানি,
চকচকে কাগজ,
ভালো ছাপা—
এতগুলি জিনিসের সম্মিলিত চাপে
সরস্বতী পিতৃনাম স্মরণ করে
চ্যাপটা হয়ে

স্থান দিয়েছেন সাহিত্যিক সমাজে।
এইবার তুমি শুধু এসো
সাইকেলে, মোটরে অথবা এরোপ্লেনে,
হেঁটে অথবা হামাগুড়ি দিয়ে,
যেমন ভাবে খুশি তোমার এসো।
একটি শুধু অনুরোধ
ঘোড়ার গাড়িতে এসো না তুমি।
দুটো মদ্দা ঘোড়ায় টেনে আনছে তোমাকে
এ চিন্তাও অসহ্য।

[কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—]

আয় আয়, ওরে আয় তুই,
দেখে যা কত কী রেখেছি তোর জন্যে।
আয় লক্ষ্মীটি,
আয়, আয়, আয়,
আঃ, আঃ, আঃ,
চ্‌চ্‌, চ্‌চ্‌, চ্‌চ্‌ !

[ঝড়ের মতো বেগে একটি মোটা মেয়ে প্রবেশ করিল। ভীষণ মোটা, গিনিপিগের মতো মুখ, জালার মতো দেহ—একটা বিরাট বাঁধাকপি যেন মানবী-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। গলার খাঁজে খাঁজে পাউডার জমিয়া আছে। ছোট হাতার ব্লাউজ পরিয়া আছে বলিয়া বগলের খাঁজও দেখা যাইতেছে, সেখানেও পাউডার। জমকালো লাল রঙের একখানা শাড়ি পরিয়াছে। আসিয়াই অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য শুরু করিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে গান।—]

আমি অরূপাগ্নির অচিন হলকা
কল্পনা শালে ললিত কলকা
অলক দুলায়ে চপল পলকা
নাচিব রাত্রি দিন।
আমি নাচিব নাচিব নাচিব—
হিল্লোল তুলি সকল অঙ্গে
নট-রাজ-কৃপা যাচিব।

আমি তুলিব তুফান, ভুলিব বিধান,
খুলিব বন্ধ, লভিব বিতান,
ওগো কবি, তুমি তোলো গীতিতান,
বাজাও ম্যাণ্ডলিন।
আমি অলক দুলায়ে চপল পলকা
নাচিব রাত্রি দিন।

[হতভম্ব কবি নির্বাক হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। মেয়েটি কিন্তু থামে না, সর্প-নৃত্য, ঝম্প-নৃত্য, নকুল-নৃত্য, বকুল-নৃত্য, হস্তী-নৃত্য, উষ্ট্র-নৃত্য, ওরিয়েণ্টাল-নৃত্য, অক্সিডেণ্টাল-নৃত্য, জাভা-নৃত্য, বালী-নৃত্য, পোয়ে-নৃত্য, কথাকলি-নৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য—একে একে নানা রকম নাচ সে নাচিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে কবির ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হইতেই তিনি একটি বিড়ি ধরাইলেন এবং উঠিয়া জানালার নিকট গিয়া ধূম-উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন। মোটা মেয়েটি ইহা দেখিয়া নাচ থামাইল, তাহার পর কপালের ঘাম মুছিয়া কবির দিকে নিষ্পলক নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। কয়েক সেকেণ্ড কাটিয়া গেল। তাহার পর সে অকস্মাৎ কোমর বাঁকাইয়া, দুই হাত কবির দিকে প্রসারিত করিয়া নানারূপ মুদ্রা প্রদর্শন করিতে করিতে নাকি সুরে পুনরায় গান গাহিয়া উঠিল—]

বিদায় বিদায় বিদায় গো—
চলিনু আপন পথে
জানি মোরে লয়ে লিখিবে কবিতা,
কী লিখিবে জানি, জানি গো সবি তা
পথ ভুলে আমি, এসেছিনু মিতা,
ভুলো না তা কোনোমতে।
বিদায় বিদায় বিদায় গো—
চলিনু আপন পথে।

[চলিয়া গেল। কবি বিড়িটিতে শেষ টান দিয়া সেটি ফেলিয়া দিলেন এবং আসিয়া স্বস্থানে বসিলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া পুনরায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—]

হে সুন্দরি,
এ তো তোমার রূপ নয়,
এই বিভীষিকার জন্যেই কি আমার তপস্যা !
কোথায় সেই তুমি,
যে তোমাকে দেখেছি প্যারিসের সালোনে,
ইটালির গণ্ডোলায,
ভূস্বর্গের ভাসমান নিকুঞ্জে,
খাদ্য-পানীয-পুষ্প-পরিবেষ্টিত
বর্ণ-বিচ্ছুরিত
হোটেলের আবেষ্টনীতে,
উপন্যাসে,
কাব্যে,
স্বপ্নে।
রবীন্দ্রনাথ যার কাছে হার মেনেছেন,
কীট্স যার ভযে মরে বেঁচেছেন,
যার প্রত্যাশায
আদর্শবাদী শেলী
জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভিজতেন,
ব্রাউনিং দাড়িতে আঙুল চালাতেন,
হামসুন মাটি কোপাতেন,
টলস্টয় সাইবেরিয়া দৌড়তেন,
কোথায় সেই তুমি !
নিখুঁত কালি-পোরা দামী ফাউণ্টেন পেন উদ্যত করে
কল্পনা করছি তোমার যে অনবদ্য মাধুরী,
কালিমা-কলঙ্কিত করতে চাইছি যে অকলঙ্কিতাকে,
উপমা-সীমাবদ্ধ করতে চাইছি যে অসীমা শ্রীকে,
বাণী-শৃঙ্খলিতা করতে চাইছি অবর্ণনীয়াকে—
[সহসা আকাশ-বাণী হইল—]
সাবধান সাবধান,
পথভ্রষ্ট হয়েছ।

সত্যিকার কবিতা হয়ে যাচ্ছে—
সাবধান !
অরিজিনালিটি দেখাও,
নতুবা কল্‌কে পাবে না।

[সচকিত কবি আকাশের পানে চাহিলেন। তাহার পর ক্ষুব্ধকণ্ঠে পুনরায় শুরু করিলেন—]

হয়তো তাই।
পুরানো সাবেক চালে তোমায় ডাকছি বলে
আসছ না তুমি হয়তো।
পিপুলগাছে বসে বসে
কাঠবেড়ালির মতো ল্যাজ তুলে
ধ্যানী পেচকের দৃষ্টি নিয়ে
আল্‌হাম্‌ব্রার কচুপাতায় শিহরণ তুলে
কুলেগুার আবছায়ায় বসে
যূথচারী গর্দভের গিটকিরিদার আবেগে
শুকিয়ে-পড়া করমচা-পাতার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
রক্তগোধিকাপুচ্ছতাড়িত মধুকুপীর লাঞ্ছনা দেখতে দেখতে
টিকিনের বালিশে মাথা রেখে
সামুদ্রিক সর্পের স্বপ্ন দেখতে দেখতে
যদি ডাকতাম তোমায়
হয়তো তুমি আসতে।
বেশ,
তেমনই করেই ডাকছি তোমায়—
ওগো, এসো তুমি,
বিদ্যুৎ-টেলিস্কোপের দোহাই,
ডাইনামিক শামুকের দোহাই,
থরথরর দোহাই,
মাংসপিণ্ডের দোহাই,
চূর্ণ চাঁদের দোহাই,
গর্ভবতী ছুছুন্দরীর দোহাই,

নীল শাড়ি, লাল সায়া, বেগনি ব্লাউজ,
পাণ্ডুটে পাজামা,
সকলের দোহাই—
দয়া করো,
একবার এসো তুমি
ডিমের খোলা মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

[হঠাৎ আর-একটি মেয়ে প্রবেশ করিল। এটি লিকলিকে রোগা। হাত-পা কাঠিকাঠি, গালের হাড় উঁচু, গলার সাঁকি দেখা যাইতেছে। ক্ষুধার্ত কোটরগত চক্ষু। চক্ষুতে কাজল, ঠোঁটে রুজ, গালে ক্রীম। দৃশ্যমান সর্ব অঙ্গে পাউডার। পরিধানে হাওয়াই শাড়ি এবং সেইজন্যই বোঝা যাইতেছে যে, একটি নীল জরিদার কাঁচুলি সহযোগে দুইটি ছোট ছোট বালিশ বুকে বাঁধা আছে। বক্ষোদেশ অস্বাভাবিক রকম উন্নত দেখাইতেছে। এ মেয়েটিও আসিয়া নাচগান শুরু করিল।—]

আমারি লাগিয়া আহা নিশি কাটালে,
চেটে চেটে ফাটা ঠোঁট আরও ফাটালে!
হে মোর প্রিয়,
মোরে ডাকিয়া নিও
বাদুড়ে চড়িয়া যবে যাবে নাটালে।
চটকে ঘটক করি
মিলন-রাত্তি,
কাটাব তোমারি সাথে
দরদী সাথী।
হে মোর প্রিয়,
মোরে কিনিয়া দিও
কমলা কানাড়ী শাড়ি পোপোকাটালে।
পনসে দুলিব দোঁহে
ফানুসী ছাঁদে,
মাকালে নাকাল করি

হে মোর প্রিয়,
চুপি চুপি চলিও
জানাজানি হয়ে যাবে বেশি ঘাঁটালে !
আমারি লাগিয়া আহা নিশি কাটালে !

[এই গানটি গাহিতে গাহিতে কাঁকড়ার মতো হাত-পা নাড়িতে নাড়িতে মেয়েটি ক্রমাগত নাচিতে লাগিল। হঠাৎ কবি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বলিলেন—]

চাই না, চাই না, চাই না তোমাকে
তুমি বিষাক্ত,
তুমি লোভী,
তুমি কুৎসিত,
তুমি সাংঘাতিক,
তুমি যাচ্ছেতাই,
তুমি বাজে।

[মেয়েটি ভয়ে প্রস্থান করিল। কবি কিন্তু বলিয়া চলিলেন—]

আমি চাই ঊর্বশী, মিনার্ভা, জুনো,
ক্লিওপেট্রা বিয়াত্রিচে।
কোথায় গেল
কুচবরণ কন্যা
মেঘবরণ চুল,
হেনা বকুল চম্পা মালতীর দল,
ফুটফুটে চেহারা
টুকটুকে রঙ
টানা-টানা চোখ
চোখের দৃষ্টি
কারো মদির, কারো মধুর, কারো স্বপ্নালু,
মুখের মিষ্টি হাসি
কারো নরম, কারো বক্র, কারো তীক্ষ্ণ,
তন্বী সুঠাম দেহ—

[পুনরায় আকাশ-বাণী হইল—]
তাদের সব ভদ্রঘরে বিয়ে হয়ে গেছে ।
যাদের এখনও হয় নি
শিগগিরই হবে ।
যে দুটি নমুনা পাঠানো হল,
তোমার মতো হাবাতের উপযুক্ত
এ ছাড়া বাজারে আর মাল নেই ।

সাংখ্য*

প্রথমেই জানিয়ে দিতে চাই জোর গলায় স্পষ্ট করে,
কপিল-প্রণীত সাংখ্য এটা নয় ।
তাতে লজ্জিত হবারও কারণ নেই,
যেহেতু আমি কপিল নই, নকুলেশ ।
কপিল মুনি এ সম্বন্ধে কী বলে গেছেন,
তাও আমার অজ্ঞাত,
ও সব আলোচনা করবার অবসরই পাই নি জীবনে ।
আমার জ্ঞান কৃষিতত্ত্ববিষয়ক,
সে তত্ত্ব আহরণ করতে অবশ্য হলধর হতে হয় নি,
[করতালি]
যেতে হয় নি মাঠে ।
যেতে হয়েছিল আমেরিকায়—
ডলার এবং পেট্রলের দেশে ।
ডলারি ধাঁচে, পেট্রলি কেতায়, বৈদ্যুতিক আবহাওয়ায়
যে কৃষিতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি,
তা এদেশে কাজে লাগল না ।
আপনারা কেউ ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না সে বিষয়ে,
কৃষিচর্চামূলক চাকরিও জুটল না একটা ।

সুতরাং
অক্ষযক-সুলভ রীতিতে
সচিত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয় আমাকে
মাঠে, মঞ্চে, কাগজে।
বস্তুত, বর্তমানে এই আমার পেশা।
'মারাঠা জাতির অভ্যুদয়',
'বাংলা সাহিত্যে আদিরস',
'ফুসফুসের বিকার',
'হিলিয়মের প্রক্রিয়া',
নানা বিষয়ে নানা বক্তৃতা করেছি আমি জনতার ফরমাশে।
ঈশ্বর বক্তৃ দিয়েছেন একটা—
বলতে পারি অনর্গল।
আজ ফরমাশ এসেছে,
সাংখ্য বিষয়ে বলতে হবে কিছু।
বলব।
কিন্তু প্রথমেই বলে রাখছি,
এ বক্তব্য আমারই বক্তব্য,
কপিলের সঙ্গে যদি কিছু মিল হয়,
ধন্য হবে কপিল।
মিল যদি না হয়,
ধন্য হব আমি।
চিত্রিতও করলাম বক্তব্যকে।
কারণ
অচিত্র কোনো কিছু বর্তমান যুগে অচল,
দেশলাই-বাক্স থেকে মহাভারত পর্যন্ত
সব সচিত্র হওয়া চাই।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

সংখ্যা থেকেই সাংখ্য।
এবং সে সংখ্যা স্থির নয়।

অনিবার্য গতিতে সে চলেছে অসংখ্যের পানে।
পাচ্ছে এবং হারাচ্ছে আপনাকে,
দৃষ্ট হচ্ছে অদৃষ্ট,
অদৃষ্ট দৃষ্টির সীমানায় আসছে।
সূক্ষ্ম স্থূল এবং স্থূল সূক্ষ্মে পরিবর্তিত হয়ে ভাবছে,
পরিণত হলাম।
অবাঙ্‌মানসগোচর বাক্যের সাহায্যে বিজ্ঞাপিত করছেন নিজেকে
আলোর মতো স্বচ্ছ যিনি,
মিষ্টিসিজ্‌মের ভান করে তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট।
বাক্যবাগীশ হচ্ছেন গম্ভীর,
লিরিক এপিক,
এক বহু।
একের চেহারা দেখেছেন কখনও ?

তার নাক মুখ চোখ সব আছে।
সে চেয়ে আছে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পানে,
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি তার আশাবাদীর দৃষ্টি।
মুখে হাসি—
অট্ট নয়, স্মিত,
আশঙ্কার চেয়ে আশারই আমেজ বেশি তাতে।
একমেবাদ্বিতীয়ম্ ?
হয়তো।
আমার কিন্তু মনে হয়, অদ্বিতীয় হবার শখ নেই ওর।
ওর চোখের দৃষ্টির সে ভাষা নয়।
আপনি দেখেন নি সে দৃষ্টি ?
শোনেন নি সে ভাষা ?
খুবই স্বাভাবিক।
শুনতে চান ? দেখতে চান ?
ফিট করুন তা হলে মাইক্রোফোন কল্পনার ককলিয়ায়,

লাগান দুরবীন মনশ্চক্ষের রেটিনায়,

[করতালি]

দেখবেন সব সংখ্যাই মূর্তিমান।

দুইকে চেনেন ?
দুই মনে হলেই যুগল কিছু একটা ভাবা অভ্যেস হয়ে গেছে।
দুই কিন্তু একক।
নাক,
ভীষণদর্শন নাক একটা।
সেই নাকের পেছনে
ঈষদ্দৃষ্ট ডট-ডট-ডটায়িত যে আভাস,
সেই মালিক,
সেই নাচাচ্ছে দুইকে,
অর্থাৎ নাককে।
নাক অবশ্য নানা রকম—
কুঞ্চিত, সন্নত, উদ্যত, অপ্রস্তুত,
কিন্তু সর্বদাই সে নৃত্যপ্রবণ,
এবং নাচাচ্ছে তাকে ওই অদৃশ্য ডট ডট ডট।
লিবিডো বলতে চান তাকে ?
আপত্তি করব না,
কারণ আপত্তি করবার মতো মালমশলা নেই হাতের কাছে।
বুঝতে পারছেন না ?

[সভায় কলরব]

ওই আপনাদের লোচন, নয়ন, অক্ষি, চক্ষু—
(বাজে জিনিসটার কি নামাবলীই বানিয়েছেন আপনারা !)
উপড়ে ফেলুন ওটাকে।
তা দিন
মনের ওপর
অন্ধকারে

নীরবে
সঙ্গোপনে
কুস্তি করুন
নিজের বাক্সে সংস্কারগুলোর সঙ্গে।
দেখতে পাবেন অদৃশ্য জগৎ।
হয়তো তা অবর্ণনীয়,
হয়তো অকথ্য,
কিন্তু অনন্যসাধারণ নিশ্চয়ই।

[ঘন ঘন করতালি]

দেখতে পাবেন,
সভ্যতার বেধড়ক চাপে
তিন বেচারা প্রায় বে-খড।
মুণ্ড-সম্বল হয়ে বেঁচে আছে খালি।
দেহটি লিকলিকে সরু, বাঁকা,
মুণ্ডটিকে ভিড়ের মধ্যে উঁচিয়ে রেখেছে বলেই ওর খাতির।
তা না হলে অনায়াসে ওটাকে ফেলে দেওয়া চলত
ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটে কিংবা পিঁজরাপোলে।
কিন্তু মুণ্ডধর বলে
শুধু যে ও সার্থক তা নয়,
ও অলংকৃত, অহংকৃত, আলিঙ্গিত।

[হিয়ার হিয়ার]

হয়তো অনাগত ভবিষ্যযুগে
দেহহীন মুণ্ড
বিজ্ঞানের জাদুমন্ত্রে
জনতার সমুদ্রে
আপনিই ভেসে থাকতে পারবে।
কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে,
ততদিন উপেক্ষণীয় নয়
ওই লিকলিকে দেহটা।

মুণ্ডের খাতিরেও তেমনই সম্মান করতে হবে
মুণ্ডবাহক দেহকে।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

তিনের তিন দিক নয়,
নানা দিক আছে।
ত্রিনয়ন না হয়েও তা দেখতে পাচ্ছি।
আমি শুধু একটা দিক নিয়ে সামান্য কিছু বললাম।
বাকি সংখ্যাগুলোরও নানা দিক আছে ;
প্রত্যেকেরই কিন্তু
একটা দিক নিয়ে আলোচনা করব।
কারণ সময়াভাব।

আড্ডিকেলে বুড়ো—চার।—
গুটিসুটি, জবুথবু, তালগোল-পাকানো, কিম্ভূতকিমাকার।
কিন্তু ভীষণ প্রভাব—
চতুর্মুখে, চতুর্বেদে, চতুর্বর্গে, চতুর্বর্ণে, চতুর্যুগে।

[করতালি]

চতুরঙ্গে চরমে উঠে
চার-অধ্যায়ে এলিয়ে পড়েছে,
চার-ইয়ারী কথায় ফোড়ন দিয়ে
ঢুঁ মারছে চতুর্থ পক্ষে।
রঙ্গ করছে চৌরঙ্গীতে,
চাপা পড়ছে চৌমাথায়,
মরছে না তবুও।
তালগোল পাকিয়ে টিকে যাচ্ছে ক্রমাগত।
চার্চে, চার্বাকে, (এমন কি চার্জেও)
চারের চার।
তাই সম্ভবত বড় বড় রুই-কাতলা গিলেছে টোপ
এবং রূপান্তরিত হয়েছে অবলীলাক্রমে

কোপ্তা কাবাব কাটলেটে।

[ঘড়ি দেখিলেন]

পাঁচের ঐশ্বর্যও অতুল
পঞ্চবাণ, পঞ্চমুখ, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চনদ,
পঞ্চকন্যা, পঞ্চভূত, পঞ্চপাণ্ডব।
কিন্তু মুখ ওর প্রসন্ন নয়।
ও যেন ক্রমাগত ভাবছে,
কেন ও এক নয়, দুই নয়, তিন নয, চার নয়,
কেন ও ছয় নয, সাত নয়, আট নয়, নয নয়,
কেন ও পাঁচ ছাড়া আর কিছু নয়!
মুখ বেঁকিয়ে ভাবছে তাই।
তাই কি ?
হয়তো ও কিছুই ভাবছে না,
ওই ওর রূপ।
কোনো অন্যমনা গাণিতিকের
বিরক্ত মুহূর্তের সৃষ্টি ও ;
কিংবা হয়তো তাও নয়,
হয়তো ও সুদর্শন,
আমাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিম।
কিংবা হয়তো ওটা ওর দুরারোগ্য মৌখিক পক্ষাঘাত।
কিংবা হয়তো—
আর নয়, থামতে হল।
কিংবা দুর্যোধনের পরামর্শে
পাঁচ পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ করতে পারবে না।
কোনো দার্শনিক দুঃশাসন।
বিচিত্র সম্ভাবনা শ্রীকৃষ্ণ তার সহায়,
ক্রমাগত বেরিয়ে পড়বে নব নব আচ্ছাদন।
পলাণ্ডুকে নগ্ন করতে পেরেছে কেউ কি ?

[সভায় পিন-ড্রপ নীরবতা]

সুতরাং পাঁচ-প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টেনে

ছয়-প্রসঙ্গে আসতে অনুমতি দিন আমাকে !

[কপালের ঘাম মুছিলেন ও হাতঘড়ি দেখিলেন]

ছয় সংখ্যাটি
আমার ব্যক্তিগত বিক্ষোভে বিক্ষত।
ও আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করে নি,
আমিও করব না।
ওর সম্বন্ধে মধুর কিছু বলতে পারব না।
ষড়ানন অথবা ষড়্‌দর্শনের অবতারণা করে
বাড়াতে পারতাম আমি ছয়ের মাহাত্ম্য,
কিন্তু পারলাম না।
লেখনী রাজী নয়।
ছয় সংখ্যার ওপর কোনো রকম রঙ চড়াতে ইচ্ছুক নয় সে।
তেরো নয়, ছয় রোল-নম্বর ছিল,
তবু ফেল করেছি ম্যাট্রিক,
ষষ্ঠরাশি অর্থাৎ কন্যারাশিতে জন্ম আমার,
জীবন দুর্দশায় কাটছে,
বিয়ে করেছি ছয়ই জ্যৈষ্ঠ,
উৎপাদন করেছি ছয়টি কন্যা,
আমি চাকরি পাই নি,
ছকড়ি পেয়েছে।
সুতরাং যতই না বাহ্যচক্ষু নিমীলন করে
যত আবেগেই না মনের ওপর তা দিই,
ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌ঋতু, ষড়ানন, যতই না আবৃত্তি করি,
লেখনী পাদমেকম্‌ ন গচ্ছতি,
রসনা নীরস হয়ে উঠছে,
কল্পনার মুখে ভ্রূভঙ্গি।
সুতরাং ছয়ের প্রতি সুবিচার করতে পারব না আমি।
আমি ছাড়া পৃথিবীতে আরও সমঝদার লোক আছে—

ওইটুকুই ছয়ের ভরসা,
আমারও।

ছয়ের পরেই সাত,
সুতরাং সাতকেও দেখি ছাতার বাঁটে,
সাপের ফণায়।
লম্বগ্রীব বৃহন্মুণ্ড ব্যাপার বলে মনে হয়।
ছয়ের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী,
কিন্তু পাঁচের সঙ্গে মিলে দল পাকায়।—
সপ্তরথীতে।ছিল।
সপ্ত সমুদ্র ?
বাজে কথা।
সমুদ্র সংখ্যাতীত, অভৌগোলিক বিস্তৃতি।
সংখ্যা দিয়ে সমুদ্রকে বাঁধতে চায় যে ভৌগোলিক,
সে রাম-ভৌগোলিক।
কিছুদিন পরে হয়তো বলবে
কিংবা বলেছে,
আকাশ একুশটা।
তার মস্তিষ্কে
সাত-সাততে ঊনপঞ্চাশের হাওয়া বইছে।
সাত ভাই চম্পা ?
চম্পাকে চিনি,
খুবই মাখামাখি আছে তার সঙ্গে,
[সকলে উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন]
কেচ্ছাটা তাই চেপে গেলাম,
তা না হলে রসকথা শোনাতে পারতাম কিছু।
সপ্তর্ষির কীর্তিও জানি—
বাঙালীর বাচ্চা আমি,
কিছু অবিদিত নেই আমার।

ব্রহ্মার মানসপুত্র বলেই জ্বলজ্বল করছেন,
কেরানির ঘরে জন্মালে ফ্যা ফ্যা করতেন।
দুটি উদরান্নের জন্য
অমন ঢের পুলহ-পুলস্ত্য-বশিষ্ঠ-অঙ্গিরার দল
কাছা সামলাতে সামলাতে কেড্‌স পায়ে দিয়ে
ঘর্মাক্ত কলেবরে
খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি নিয়ে
গুঁতোগুঁতি করছে
রাধাবাজারে, খেংরাপটিতে, ক্লাইভ স্ট্রীটে
সাতের প্রসঙ্গে সাত কাহন শুনতে পাবেন,
যান যদি কোনো কৃত-সপ্তপদী ব্যক্তির কাছে,
অর্থাৎ যার উদ্বাহ সম্পন্ন হয়েছে,
কিন্তু উদ্বন্ধন বাকি।
তবু কিন্তু সাতকে যৎসামান্য শ্রদ্ধা করি এ-সব সত্ত্বেও
কারণ ও ছয় নয়।
আটের কথা বলতে বাধছে।
ওকে স্বপ্নে দেখেছি সেদিন।
অদ্ভুত রকম বীভৎস স্বপ্ন।
কোনো বিজ্ঞ জ্যোতিষী হয়তো
সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এর।
কিন্তু আমি ভাবছি, কী দেখলাম সেদিন ?
অষ্টরম্ভা নয়,
আটটা আর্ত বেরাল-ছানা
পথ হারিয়ে কাঁদছে।
কিন্তু সহসা থেমেও গেল তাদের ক্রন্দন,
দেখতে দেখতে নিঃশেস হয়ে গেল তারা।
রৌদ্রদগ্ধ আকাশ থেকে
নেমে এল তীক্ষ্ণনখচঞ্চু আটটা শ্যেন,
নিমেষে নিয়ে গেল তাদের ছো মেরে তুলে
হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মনে হল, ফিক-ফিক করে কে যেন হাসছে !
ফিরে চেয়ে দেখি, আমার চিরশত্রু ছয়।
ভোল বদলে সিক্স হয়েছে,
হাসছে ফিক-ফিক করে।
রাগ হল ভয়ানক,
একটা বাখারি পড়ে ছিল কাছে,
দিলাম সেটা ছুঁড়ে,
বিঁধল সেটা গিয়ে সিক্সের বুকে,
চট করে হয়ে গেল বাংলা আট।
দেখতে দেখতে সিক্সের ভুঁড়িতে গজাল চোখ,
মানুষের নয়, বেরালের।
গজাল গোঁফ,
ফুটে উঠল তীব্র দৃষ্টি,
সিক্তস্কন্ধী মার্জারের শিকার-লোলুপতা।
ভেঙে গেল ঘুম আতঙ্কে।
চোখ বুজেই শুয়ে শুয়ে আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,
ভগবান,
বিংশোত্তরীতে যার রাহুর দশা,
অষ্টোত্তরীতে তার কী ?
ছয়কন্যা-প্রসবিনী সাধ্বী পত্নী ধমক দিয়ে উঠলেন,
মশারিটা ভালো করে গুঁজে দাও ওদিকে।
চোখ খুলে দেখলাম, ছারপোকা মারছেন তিনি
বিছানায় বসে বসে।
গুঁজে দিলাম।
সুতরাং
আর্টের সম্বন্ধে আমার ধারণাও
ঘোরালো রকম ঘোলাটে।
অষ্টধাতুর আংটি পরে
অষ্টবসুর ধ্যান করলে পরিষ্কার হবে হয়তো।
হয় যদি,

জানাব আপনাদের।
রসনা আমার অক্লান্ত,
ছাপাখানা অবাধ,
কাগজ কালি কলম জুটবেই।
সুযোগ পেলেই
কথার মিকি-মাউস
বেঁটে হয়ে, চৌকস হয়ে
লীলায়িত হবে ক্রমাগত,
বস্তুত, না হওয়াটাই আশ্চর্য এ যুগে।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

এইবার, নয়।
একটা কথা বিস্মৃত হলে চলবে না—
নয় 'নয়' নয়।
ও রীতিমত আছে।
অস্বীকার্য-রকম স্থূল ওর স্থিতি।
তিনই যেন তিরিক্ষে হয়ে দুমড়েছে নিজের দেহটা।
কিন্তু ধারাপাতের বচন ওটা,
আসলে ওর তিরিক্ষে ভাব নয়।
কেমন যেন একটা আড়ি-পাতা ভাব।
ও আড়ি পেতেছে সেই বাসরঘরের বন্ধ দ্বারে,
যেখানে ওর প্রবেশ নিষেধ,
যেখানে ও একটুর জন্যে ঢুকতে পায় নি,
যেখানে চিরন্তন এক মিলেছে শাশ্বত শূন্যে।
লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে যুগল-মিলন।
ও যুগল-মিলনটাই দেখছে,
যুগল-বিরহটা দেখতে পাচ্ছে না।
দেখতে পাচ্ছে না যে, চক্ষুষ্মান এক হয়েছে দৃষ্টিহারা
এবং নিশ্চক্ষু শূন্যকে খুঁজছে উলটো দিকে মুখ করে।

[নাটকীয় ভঙ্গিতে Exit। শ্রোতারা কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া করতালি দিলেন।]

আধুনিকার পত্র

ইণ্টার-ক্লাসের কামরায় আমি এবং আর-একজন রোগাগোছের যুবক পাশাপাশি দুইটি বেঞ্চে শুইয়া ছিলাম। কামরায় আর তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। সহযাত্রী ভদ্রলোক মুখচোরা প্রকৃতির মানুষ বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ জমাইতে পারি নাই। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি এলিয়ট-প্রণীত একখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহার পকেট হইতে 'লিলিপুট' নামক মাসিক পত্রিকাটি উঁকি দিতেছে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক নামিয়া গিয়াছেন। গাড়ির মেঝেতে খামে-মোড়া এই চিঠিখানি পড়িয়া আছে। ঠিকানা এবং চিঠিতে যে নামে সম্বোধন করা ছিল, অপ্রয়োজন-বোধে তাহা প্রকাশ করিলাম না। চিঠিখানিতে একটা সার্বজনীনতা আছে বলিয়া তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মহিলার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

হে কবি,
তোমারই অনুকরণে
আজ তোমাকে সম্বোধন করছি
অমিল কবিতার গদ্যছন্দে।
আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি
এর মিলহীন সাবলীলতা দেখে,
কিছু বাধে না সত্যি,
কোথাও আটকায় না।
তুমি অতি-আধুনিক কবি,
চমকপ্রদ অতি-আধুনিকতার মুকুট পরে,
একদিন সম্মোহিত করেছিলে আমাকে।
প্রথম প্রথম সত্যিই সম্মোহিত হয়েছিলাম,
কিন্তু এখন আর স্বীকার করতে বাধা নেই যে,
বরাবর আমাকে ভোলাতে পার নি তুমি!
শেষাশেষি মুগ্ধ হবার ভান করতাম।
কারণ,
আমার লক্ষ্য ছিল
তোমাকে গেঁথে তোলা।

এই ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল
নিতান্ত জৈবিক কারণে,
এবং অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়েছিল
নিতান্ত ছন্নছাড়া সমাজে বাস করি বলে।

গেঁথে যখন তুললাম,
তখন দেখা গেল,
তুমি হাঙরও নও, কুমিরও নও,
অক্টোপাসও নও, হাইড্রাও নও,
এমন কি রুই-কাতলাও নও,
তুমি সনাতন পুঁটি।
সস্তা সাধারণ বঁড়শির-মুখে-গাঁথা কেঁচোটার
লোভ সামলাতে পার নি,
গপ করে গিলে ফেলেছ।
শফরী যতক্ষণ জলের তলায় ফরফর করছিল,
মস্ত একটা কিছু ভেবেছিলাম তাকে।
বাগাড়ম্বর করছিলে যতদিন দূর থেকে,
স্পন্দিত হৃদয়ে
ততদিন মুগ্ধ হচ্ছিলাম।
জীবনের ক্ষেত্রে মুখোমুখি যেদিন প্রত্যক্ষ করলাম
সেইদিনই বুঝলাম,
তুমি কবিও নও,
আধুনিকও নও,
এমন কি পুরোপুরি মানুষই নও।
পুরোপুরি মানুষ হলে ভাবনা ছিল না,
পুরোপুরি মানুষেরাই
যুগে যুগে বহন করেছে
আধুনিকতার বিজয়-বৈজয়ন্তী।
সে শক্তিমান,

নিজের জোরে চলে,
নিজের জোরে বলে।
গগনস্পর্শী তার ললাট,
বিধানের পর্বত উলটে দেবার মতো তার শক্তি।
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণবন্ত অমর সে,
নিজেকে জানে।
কাউকে ভয় করে না,
মৃত্যুকেও না।

তেল-চিটচিটে
ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে
ছারপোকার কামড় এবং সস্তা সিগারেট খেতে খেতে
তোমার মতো
ধার-করা আধুনিকতার বুলি যারা কপচায় না,
তাদের প্রতি
ভারী অনুকম্পা তোমার,
তোমাকে কেউ পোঁছে না বলে
পপুলারিটির প্রতি অসীম তোমার তাচ্ছিল্য।
'চীপ পপুলারিটি' তুমি চাও না—
আঙুরলুব্ধ শেয়ালটার কথা মনে পড়ে।
আগে অনেকবার বলব ভেবেছি,
কিন্তু চক্ষুলজ্জার জন্যে পারি নি ;
এখন বলছি শোনো—
পপুলার জিনিসমাত্রেই খেলো নয়।
আগুন, জল, সূর্য, চন্দ্র—
এরা সবাই পপুলার।
এরা সনাতন এবং চির-আধুনিক।
প্রতিভাবান লেখকরাও তাই।
তোমার প্রতিভা নেই বলেই কদর নেই—
এ কথাটা ভুলো না।

আচ্ছা,
তুমি যে 'আধুনিক' 'আধুনিক' বলে
যেখানে সেখানে নিজেকে জাহির করে বেড়াও,
বুঝিয়ে দিতে পার আমায়,
কিসে তুমি আধুনিক ?
কবিতা লেখবার ছুতোয়
কতকগুলো অদ্ভুত কথার সাহায্যে
অর্থহীন হেঁয়ালি-বানানোর নাম আধুনিকতা ?
ন্যাকামি করাটা আধুনিকতা ?
পরের লেখা চুরি করাটা আধুনিকতা ?
তোমাকে অনেকবার বলতে শুনেছি—
চাঁদ, কোকিল, ফুল, মলয়, সন্ধ্যা, ঊষা,
সাবেক কালের এ-সব জিনিস
আধুনিক কবিতায় অচল।
এই যন্ত্রপ্রধান বিজ্ঞানের যুগে
মোটর, এঞ্জিন,
মিল, রেডিও,
ফোন, সিনেমা,
ইলেকট্রিসিটি, অ্যামুনিশন,
পিচের গন্ধ,
পেট্রোলের গন্ধ,
ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ইউবোট, মাইন,
অবচেতন মনের নিগূঢ় নোংরামি,
নানারকম ইজ্‌মের প্যাঁচ—
আধুনিক কবিতার মালমসলা এরাই।
সাহিত্য যখন জীবনের দর্পণ,
তখন এই সব আধুনিক জিনিস
আধুনিক সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হওয়া চাই।
কিন্তু
একটা কথা মনে পড়ে ভারী হাসি পাচ্ছে আমার !

আমাকে প্রথম যেদিন প্রণয় নিবেদন করেছিলে,
কোনো রকম উদ্ভট আধুনিকতা তো লক্ষ্য করি নি।
সাবেক ভাবে,
সাবেক ভাষায়,
সমীরস্নিগ্ধ বাসন্তী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়
নিতান্ত সেকেলে ধরনেই তো
ব্যক্ত করেছিলে নিজেকে।
তোমার আধুনিকতার প্রতীক
বাদুড়, শকুনি,
ফায়ারব্রিগেড,
কাক, ক্যাক্‌টাস
কিছুই তো আমদানি কর নি সেদিন।
সেদিন তোমার মুখচ্ছবি দেখে
যে উপমাটা মনে হয়েছিল,
তা 'ক্রিস্‌প বিস্‌কিট্‌' নয়,
আশকে পিঠে।

মানলাম না হয়,
আধুনিক কাব্যে আধুনিক জীবনের ছাপ থাকা চাই;
কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে,
সে ছাপ দেবার সামর্থ্য তোমার আছে কি?
তোমার জীবন-দর্পণে
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি
একান্ত সত্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি?
আধুনিক বিজ্ঞান তোমার জীবনে
এমন ওতপ্রোতভাবে মিশেছে কি,
যার জোরে
তোমার লেখায় তার প্রভাব
স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে?
আধুনিক বিজ্ঞানকে হজম করতে পেরেছ তুমি?

মিছে কথা।
তোমার
ডাল ভাত কামিজ কাপড় জোটাবার সামর্থ্য নেই,
চাকরির জন্যে
হন্যে কুকুরের মতো
আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াও তুমি,
তোমার বাপ মা ভাই বোন
মাসী পিসী খুড়ো জ্যাঠা—
যে সমাজের অন্তস্তলে তোমার মূল,
সেই সমাজ
হাজারো রকম কুসংস্কারের তাড়নায়
হাজারো দরগায় মাথা কুটে বেড়াচ্ছে অহরহ,
তুমি নিজেও
নির্লজ্জের মতো
যখন যে দলে সুবিধে সেই দলে ভিড়ে যাচ্ছ,
তুমি নিজেকে বল আধুনিক ?
তুমি পাড় বিজ্ঞানের দোহাই ?
বিজ্ঞানের সঙ্গে কতটুকু পরিচয় আছে ?
কটা মোটর, ফোন, রেডিও আছে তোমার ?
কট যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখ ?
তুমি
আবিষ্কারকও নও,
মালিকও নও !
তুমি বড় জোর কোনো কারখানার কেরানি হতে পার।
রেডিও, টেলিফোন, ইলেক্‌ট্রিসিটি
ব্যবহার কর হয়তো,
কিন্তু ও-সব তোমার জীবনের বহিরঙ্গ।
না থাকলেও তোমার জীবন অচল হয় না,
যেমন হয় ওদের দেশে।
ওদের দেশে

জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান একান্তভাবে অঙ্গীভূত,
ওদের আধুনিক কবিতায় তাই এ-সবের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী।
ওরা যুদ্ধ করেছে,
যুদ্ধে মরেছে।
যন্ত্র-দানবের সঙ্গে ওদের সত্যিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।
তাই ওদেশের আধুনিক কবিতায়
যন্ত্রসভ্যতার ছাপ সাজে।
তাই বলে তোমার কবিতাতেও সাজবে ?
ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ইউবোট. জেপেলিন
কটা দেখেছ তুমি ?
পটকার আওয়াজ শুনলে হৃৎকম্প হয় তোমার।
ফাসিজ্‌ম্‌, নাৎসিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌,
সমস্তই তো তোমার ধার-করা বুলি—
তোতা-ইজ্‌ম্‌ !
তোমার জীবনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী ?
তোমার বাপ-পিতামহরা যেমন আওড়াতেন
মনু, পরাশর, রঘুনন্দন,
তুমিও তেমনি আওড়াচ্ছ
লেনিন, হিটলার, এলিয়ট, এজ্‌রা পাউণ্ড।
যাদের জীবনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক,
তারা এ-সব নিয়ে কবিতা লিখুক ,
তাদের লেখনীতে এ-সব মানাবে।
কিন্তু তুমি—
চচ্চড়ি-খেকো মাদুলি-বাঁধা জাত-কেরানী তুমি,
তুমি এ-সব লিখতে গিয়ে
হাস্যাস্পদ হও কেন ?
সচেতন মনের সবখানি খবর রাখতে পার না,
অবচেতন মনের ডেঁপোমি করতে যাও কোন্ সাহসে ?

অবৈধ প্রণয় নিয়ে মাতামাতি করাটাও

একটা আধুনিক ফ্যাশান।
আধুনিকরা চাঁদ ফুল মলয়ের মতো
এটাকেও ত্যাগ করে না কেন, বুঝি না।
প্রণয়-ব্যাপারে পরকীয় তত্ত্বটা তো সেকেলে জিনিস,
সব দেশেই চিরকাল আছে।
এদেশে আরও বেশি করে আছে,
তার কারণ
এখানে এখনও
কুল গোত্র কুষ্ঠি মিলিয়ে,
রূপের পরীক্ষা নিয়ে,
পণের টাকা বাজিয়ে বিয়ে হওয়াটাই সনাতন নিয়ম।
এদেশে অবৈধ প্রণয় তো অনিবার্য প্রতিক্রিয়া,
অতিশয় স্বাভাবিক।
এ প্রতিক্রিয়ার ফলে কিন্তু হচ্ছে কী?
আর যাই হোক,
সমাজ সংস্কৃত হচ্ছে না।
লেক ভরে উঠল।
আর ভরে উঠল খবরের কাগজের পাতা—
আফিঙ, কেরোসিন, গুণ্ডা, গলায় দড়ি।
এ-সব কাহিনীর অন্তর্নিহিত মর্মন্তুদ সত্যটা না এঁকে
যে ধরনের শৌখিন ফানুস-মার্কা
অবৈধ প্রণয়ের ছবি এঁকেছ তুমি,
তা পড়লে হাসি পায়।
ইসাডোরা ডান্‌কান এখনও জন্মায় নি এ দেশে;
খেঁদি-বুঁচি-বগি-বিন্দিরই মেলা এখানে এখনও।
রেসারেকৃশন লেখবার যোগ্যতাই বা আছে কজনার?
জীবন দিয়ে এ-সব যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।
কটা অবৈধ প্রণয় করবার তাকত রাখ তুমি?
আমার মতো
অতি সাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে

আলতো আলতো ভাবে প্রণয় করতে গিয়েই তো
কাত হয়ে পড়েছ।
এদিক ওদিক চাইতে চাইতে
লুকিয়ে-চুরিয়ে
প্রেমের ছুতোয় মেয়েদের অপমান করে
যে ভীরু নপুংসকের দল,
হঠাৎ সেদিন আবিষ্কার করলাম,
তুমিও তাদের একজন।
একটা কথা শুনে রাখো,
মেয়েদের যারা সম্মান করতে জানে না,
তারা কখনও মেয়েদের প্রেমাস্পদ হতে পারে না,
তারা মানুষ নয়—পশু।
পশুর লালসা গর্বের জিনিস নয়।

আমার সর্বাঙ্গ ঘিনঘিন করছে।
ছি ছি ছি ছি—
তুমি কবি,
তুমি আধুনিক,
যে দেশের আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে
অলিতে-গলিতে
তোমার মতো আধুনিক গিজগিজ করছে,
সে দেশের মেয়েরা
সত্যিই হতভাগিনী!
মৃত্যুই তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা।

ভয় নেই,
আত্মহত্যা করব না।
ও-সব নাটুকেপনা করবার মতো
আত্মবিস্মৃতি নেই আমার
সামান্য পুঁটিমাছ ঘেঁটে

হাতে যে আঁশটে গন্ধ হয়েছে,
সাবান দিলেই তা উঠে যাবে।
তোমাকে এ চিঠি লিখছি,
হে অতি-আধুনিক কবি,
তোমাকে জানিয়ে দেবার জন্তে স্পষ্ট করে যে,
তোমার স্বরূপ চিনেছি আমি।
মিনতি করছি,
আধুনিক কথাটাকে কলঙ্কিত কোরো না আর।
সব আধুনিক কবিদের চিনি না আমি,
সুতরাং
সকলকে ধিক্কার দেওয়ার অধিকার নেই আমার।
যদি তাঁদের মধ্যে কোনো খাঁটি আধুনিক থাকেন,
জ্যোতির্ময় সবিতার মতো একদিন না একদিন
তাঁর প্রদীপ্ত আবির্ভাব ঘটবেই।
তিনি ভুল করতে পারেন,
ভণ্ডামি করবেন না।
কথার ফুলঝুরি কেটে নয়,
জীবন জ্বালিয়ে আধুনিকতার আলোকোৎসব করবেন তিনি,
যেমন করেছিলেন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
কিন্তু তোমাকে চিনেছি আমি,
তোমার মেকি আধুনিকতার ভেলকি দেখিয়ে
আর ভোলাতে পারবে না আমাকে।
শুধু আমাকে কেন,
কাউকেই পারবে না।
এটা নিঃসন্দেহে বুঝেছি
তুমি কবিতা লেখ
কবি বলে নয়,
বেকার বলে।
আধুনিকতার ছদ্মবেশে

সস্তা কৃতিত্ব অর্জন করতে চাও,
বিদেশী লেখকদের ব্যর্থ অনুকরণকারী
নকলনবিশ তুমি।
কাছাকে দ্বিধাবিভক্ত করে
কাবুলী স্যাণ্ডাল পায়ে দিলেই
যদি শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ কাবুলী হওয়া যেত,
তা হলে আর ভাবনা ছিল কী!
তোমার ওই বাক্যের খিচুড়ির মধ্যে
যে যে ক্ষোভ মূর্ত হয়ে ওঠে,
তা আদর্শবাদীর আকুলতা নয়,
তা পরশ্রীকাতরতার কুৎসিত কাতরানি।
ভালো একটা চাকরি জুটলেই সব থেমে যাবে।
তেল ও তুলি নিয়ে
সেই চেষ্টাই করো।
আমার কাছে আর এস না,
মুখদর্শন করতে চাই না তোমার।

পরশুরামের শেষ উক্তি—

(একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর)

অনেক কিছু বলছিস তো,—দেখছি এবং যাচ্ছি সবই শুনে—
হাত পা নেড়ে নানান চালে অঙ্গভঙ্গি করিস নানান রকম,
কিন্তু তবু বলব নাকো, বাণগুলি সব রাখছি পুরে তূণে,
আর যা করি আঘাত হেনে করব নাকো আর পোকাদের জখম,
কুঠার দিয়ে মাছি কিংবা গদাঘাতে মারি না মৎকুণে,
যত ইচ্ছে ঘুরে ফিরে যতই খুশি করে যা বকবকম।

যুদ্ধ করে করব খাতির রণাঙ্গণে কই সে মহারথী ?
অস্ত্র হবে সম্মানিত—অস্ত্রী হবে ধন্য যারে হেনে,
লম্ফঝম্প যতই না কর,—জানি আমি জীর্ণ তোরা অতি,
হাড়গুলো সব গোনা যাবে পাঞ্জাবিটা ফেললে খুলে টেনে,
একটি চড়ে মৃত্যু হবে,—তোদের তাতে হবে তো সদগতি—
আমি কিন্তু কী আক্কেলে আঘাত করি সকল কথা জেনে !

আগে আগে চটে যেতাম, অনেক ঠেকে শিখেছি ভাই আমি,
তোদের পিঠের চেয়ে আমার জুতো জোড়া অনেক বেশী দামী ।

চতুর্দশী

(কৃষ্ণা ও শুক্লা)

ক্লান্তা

১

হয়তো আমিও সখি, গিয়াছি ফুরায়ে ধীরে ধীরে,
হয়তো তোমারো আঁখি দেখে না আমার স্বপ্ন আর,
নিতান্ত অভ্যাসবশে তরীখানি বাঁধা আছে তীরে,
নিয়ম-নিগড়পাশে বহিতেছে নোঙরের ভার।

পালেতে লাগে না হাওয়া, চলে না সে ঠেলিয়া উজান,
দিগন্তে সোনার সন্ধ্যা বারম্বার মরে প্রতিদিন,
গভীর পূর্ণিমা-রাতে বন্ধহারা জ্যোৎস্নার তুফান
আপনি থামিয়া যায়, ক্লান্ত তরী অতি গতিহীন।

গতিহীন! তবু তাহা প্রাণ ধ'রে পারি না বলিতে,
গতিহীনতার ব্যাখ্যা প্রাণপণে চলেছি করিয়া,
ভ্রমর গুঞ্জন করে ঝাঁকে ঝাঁকে কুসুমকলিতে,
লাখে লাখে তারা ওঠে অন্ধকার গগন ভরিয়া।

মোরা ভাবি মিথ্যা মোহ: কিছুতেই হই না আকুল,
ভুলিয়া থাকিতে চাই—স্বপ্নহীন মোরা ঝরাফুল।

২

ঝরাফুলে অলি নাই, শ্রোতা নাই জীর্ণ গায়কের,
প্রতিভা-শিখর-চ্যুত লেখকের নাহি যে পাঠক,
নায়িকা যৌবনহীনা বৃথা পথ চাহে নায়কের,
অসমর্থ ক্লান্ত নট জমাইতে পারে না নাটক।

মদিরা ফুরায়ে যায়, প'ড়ে থাকে শূন্য পাত্র তার;
পাত্ররে মদিরা ভাবি কিছুকাল করিবে যে ভান
সুরালোভী মত্তপের নাহি সে শোভন শিষ্টাচার,
নব-পাত্রে নব-সুরা নিত্যই করিছে সন্ধান।

ভগ্ন উচ্ছিষ্টের দলে প'ড়ে থাকে শূন্য পাত্র—ভীত,
লেহন হয়তো তারে কভু করে পথের কুক্কুর,
কভু কারো পদভরে হয়তো সে হয় বিচূর্ণিত,
লাঞ্ছিত জীবন বহে হয়তো সে আরো কিছুদূর।

হয়তো সে আশা করে পুনরায় আসিবে উৎসব,
পুরাতন পাত্র ভরি উচ্ছলিবে নূতন আসব।

৩

হয়তো হয়তো সখি,—কি সুন্দর 'হয়তো' কথাটি
তিনটি আখরে গাঁথা অফুরন্ত যেন নীহারিকা
হয়তো বাঁচিবে পুন ছিন্নমূল আশা লতিকাটি,
পরাজিত লাঞ্ছিত যে, হয়তো পরিবে জয়টীকা।

হয়তো আঁধার মাঝে হবে নব আলো-পরকাশ,
হয়তো অপ্রত্যাশিত বাজিবে মধুর কোন সুর,
নয়নে বসন বাঁধি অন্ধকারে চল করি বাস,
আলোক যে নিদারুণ অতিশয় নির্মম নিষ্ঠুর।

একে একে বন্ধ করি এস সব বাতায়ন-দ্বার
আঁধারের স্বপ্ন দেখি, বাহিরেতে থাকুক দিবস ;
ভালবাসি ভালবাসি—বল বল বল বারম্বার,
যতক্ষণ নাহি হয় শুষ্কতালু রসনা বিবশ।

কিন্তু সখি, অন্ধকারে! অন্ধকার আনে স্বপ্ন-সুধা,
সত্যের সামর্থ্য নাই মিটাইতে এ মনের ক্ষুধা।

৪

আমার মনের ক্ষুধা নানামূর্তি ধরিছে কত কি!
বীরত্বে উন্মাদ কভু রুদ্ররসে উঠিতেছে জ্বলি,
নৃত্যরসে আত্মহারা কখনো সে চটুলা নর্তকী,
লোলুপ ভিখারী কভু ভিক্ষা মাগে পাতিয়া অঞ্জলি।

কখনো উদাত্ত কণ্ঠে জাগে তার সন্ন্যাসীর সুর,
রাজসিক মহিমায় কভু ভালে শোভে রাজটীকা,
প্রেয়সীর বাহুবন্ধে কখনও সে বন্ধন-আতুর,
ফিরিছে তস্কর বেশে কভু হস্তে শাণিত ছুরিকা।

সম্মানিত করে কভু, কভু করে লজ্জিত আমারে,
দগ্ধ করে, শান্ত করে, করে মোরে পীড়ন লালন,
আমার মনের ক্ষুধা—ভালবাসি ঘৃণা করি তারে,
সঙ্গোপনে রাখি কভু, কভু তারে করি আস্ফালন।

প্রবল সে অনিবার্য, বহুরূপী ভীষণ মধুর
মোর মাঝে শুনেছ কি তুমি সখি, সে বিচিত্র সুর?

৫

শোন নাই? তবে তুমি কতটুকু দেখেছ আমার?
কহ কহ কহ ওগো, কি দেখিয়া হারালে সম্বিৎ?
অর্থ প্রতিপত্তি যশ? উচ্চনাদ তুচ্ছ দামামার?
মৃতপশুচর্মটার আর্তনাদে ভেবেছ সঙ্গীত?

বলিষ্ঠ যৌবন মম তারেই কি বাসিয়াছ ভাল?
সে যে বিধাতার দান, না বাসিয়া নাহি যে উপায়—
ক্ষুদ্র পল্বলের বুকে পড়িলেও অালো তবু আলো,
আলো দেখে আসিয়াছ, দেখেছ কি পল্বলেরে হায়?

আমারে বাস নি ভাল, তুমি মম ঐশ্বর্য-গরবী,
কিন্তু সখি, ঐশ্বর্যের আমি মাত্র ক্ষুদ্র ভারবাহী,
রঞ্জন করবী বৃক্ষ নহে সখী, রঞ্জন করবী;
পুষ্পবিলাসিনী অয়ি, দেখেছ কি বৃক্ষপানে চাহি?

অতীব আগ্রহভরে আহরণ করিতেছ মণি,
ফিরিয়াও দেখ নাই কত গাঢ় অন্ধকার খনি।

৬

সে মোরে বাসে নি ভাল যে আমি একান্ত অসহায়,
কামনার তাড়নায় অন্ধ পঙ্গু যে আমি ভিক্ষুক,
সবার দাক্ষিণ্য-দ্বারে অর্থহীন মূঢ় প্রত্যাশায়
শূন্য ভিক্ষাভাণ্ড করে চলিয়াছি লোলুপ উৎসুক।

যে দ্যুতিরে স্তুতি কর সে আমার নহে পরিচয়,
আলোকের আবরণ অন্তরাল করেছে তিমিরে,
রঙ্গমঞ্চে দম্ভভরে করিয়া চলেছি অভিনয়,
যবনিকা-অন্তরালে দেখেছ কি অভিনেতাটিরে ?

দেখেছ কি সেথা তারে যেথা তার নাহি বেশ-বাস,
নাহি কোন প্রসাধন, নাহি কোন বাহিরের স্বর,
অতিশয় স্থূলরূপে যেখানে সে স্বয়ম্প্রকাশ—
লুব্ধ ক্ষুব্ধ আশাহত অনাবৃত লজ্জিত আতুর ?

আলোকিত রঙ্গমঞ্চে উচ্ছ্বসিতা দাও তুমি দেখা,
অন্ধকারে কোথা থাক ? সেখানে আমি যে বড় একা।

৭

বড় একা সে নির্জনে, কেহ নাই সে গাঢ় তিমিরে,
সে নিভৃতে কোন দিন আস নাই হে অভিসারিকা,
সে মহাতমিস্রালোকে আঁধারে আঁধার আছে ঘিরে,
অন্ধকার মহাশূন্যে জ্বলে যাহা নাহি তার শিখা!

কোন দিকে নাহি পথ, কোন দিকে নাহি কোন দিশা,
জমাট কঠিন কালো আছে শুধু শূন্যতারে ভরি,
বিচূর্ণিত সাধ আশা, অপূর্ণ কামনা ক্ষুধা তৃষা
প্রেতরূপে ফিরিতেছে সে আঁধার গাঢ়তর করি।

সে অন্ধ-লোকের ব্যথা বুঝিতে পার না তুমি, সতী,
স্তব্ধীভূত হাহাকার মরে যেথা নিঃশব্দে গুমরি,

তুমি আলোকের প্রাণী, কাননের সুখী প্রজাপতি,
রঙিন পাখার ভরে ফুলে ফুলে ফিরিছ সঞ্চরি।

ফুলের কাঙাল তুমি—মূলের তো কর না সন্ধান,
সে মূল আঁধার-লোকে করিছে পঙ্কিল রসপান।

৮

হয়তো তোমারো সখি, আছে কোনো অন্ধকার লোক—
একাকিনী দিশাহারা ভ্রমিতেছ সে আঁধার দেশে,
পশিতে পারে না যেথা জীবনের উৎসব-আলোক,
পশিতে পারি নি আমি যেথা মোর অভিনেতা-বেশে।

লয়ে চল সখি মোরে, সেই তব অন্ধকার মাঝে,
মিছা স্তোকবাক্য দিয়া করিও না বৃথা অস্বীকার,
যেখানে দুর্বল তুমি, লজ্জিত মুমূর্ষু ভয়ে লাজে,
সেই গোপনতা মাঝে দেহ মোরে প্রবেশাধিকার।

ছলনার ছদ্মবেশ, অধরের অর্থহীন হাসি,
অগভীর অশ্রুধারা, অতি তুচ্ছ বাদ-প্রতিবাদ,
পুরাতন সেই কথা 'ভালবাসি, ওগো ভালবাসি'
অসহ্য হয়েছে সখি, বড় তিক্ত অতীব বিস্বাদ।

সম্পূর্ণ সমগ্র তুমি সম্পূর্ণ সমগ্র মোরে লও
যতই বীভৎস হোক পূর্ণরূপে প্রকটিত হও।

৯

এ কি এ প্রলাপ-বাণী কহিতেছি ছন্দ-গুঞ্জরণে!
সম্পূর্ণ তোমার মূর্তি পার না যে দেখাইতে কভু,
নিজেই দেখ নি যাহা আমারে তা দেখাবে কেমনে!
যতই প্রকট হও কিছু বাকি থেকে যাবে তবু

আমিও কি পারি সখি, সম্পূর্ণ দেখাতে আপনারে ?
এ যে শুধু কল্পনার উচ্ছ্বসিত ছন্দ-আড়ম্বর,
সম্পূর্ণ সমগ্র রূপে কবে বল, কে দেখেছে কারে ?
দৃষ্টির ওপারে আছে চিরকাল অনন্ত অম্বর।

সীমা নাই অসীমের, অনন্তের মিলিবে না শেষ,
তবু সখি, একবার স্বপনের দাও অবকাশ,
প্রত্যক্ষের পরপারে আছ তুমি, হও নি নিঃশেষ,
কল্পনা করিতে দাও, দাও তার ক্ষণিক আভাস।

অতিশয় স্পষ্টরূপে এত শীঘ্র যেও না ফুরায়ে
নিজেরে দেখাও সখি, নানারূপে ঘুরায়ে ঘুরাযে।

১০

তোমারি মাঝারে সখি, বারে বারে নূতন করিয়া
নেহারিতে চাহি যে গো নিত্য নব অপরিচিতারে,
তারি লাগি অন্ধকারে বিঘ্ন বাধা বিপদ বরিয়া
স্পন্দিত শঙ্কিত চিত্তে যেতে চাই নিত্য অভিসারে।

যে নিগূঢ় অন্ধকারে নীহারিকা রচে মায়াপুরী,
আভাসে প্রকাশ করে রূপকথা অজ্ঞাত-লোকের
নাই কি তোমার মাঝে সে অনন্ত আঁধার-মাধুরী,
অতল রহস্য নাই কালো কালো ও দুটি চোখের ?

ফুরাইয়া গেছ তুমি ? অবলুপ্ত সকল মহিমা ?
কোনো দূর দিব্যলোকে নাই তুমি বাঁচিয়া কি প্রিয়া ?
যতটুকু দেখিতেছি ততটুকু তব শেষ সীমা ?
মোর অগোচর লোকে নাই তুমি আরো প্রসারিয়া ?

অদৃষ্ট কল্পনালোকে, সীমাহীন স্বপন-পাথারে
নবরূপে আবিষ্কৃত হবে নাকি তুমি বারে বারে ?

১১

কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি,—আঁধার হতেছে সখি ঘন,
কাঁপিছে তারার আলো অন্ধকার আকাশ-বিতানে,
গুমরি মরিছে বায়ু বিজন প্রান্তরে ওই শোন,
এস, আরো কাছে এস, মাথা রাখ বাহুর শিথানে।

পুরাতন আবরণ খ'সে যাক জীর্ণবাস সম,
নবপুষ্পে অলঙ্কৃত কর সখি, পুরাতন শাখা,
নবরূপে লুব্ধ কর, মুগ্ধ কর কবিচিত্ত মম,
পুরাতন তুমি থাক স্মৃতির মঞ্জুষা মাঝে ঢাকা।

অতীতে মমতা আছে, কিন্তু তাহে ভরে না যে বুক,
নিত্য নূতনের খোঁজে পিপাসার্ত ফিরি চুপে চুপে,
বহুমুখী মন সখি, বহু-লোভে সতত উন্মুখ,
পিপাসা মিটাও তার, এক তুমি সাজ বহুরূপে।

অয়ি পুরাতন সখি, রজনী যে হয়েছে অধীরা,
পুরাতন পাত্রে কি গো ঢালিবে না নূতন মদিরা ?

১২

নূতন মদিরা চাই চাই নিত্য নব উন্মাদনা,
নব স্রোতে নব মোহে ভাসাইতে চাহি যে তরণী,
নিত্য নূতনের পূজা করাই যে আমার সাধনা,
যে পথে পথিক আমি সে পথ যে স্বপন-সরণি।

স্বপন-সরণি 'পরে নামিয়াছে অন্ধকার রাতি,
সহসা থামিয়া গেলে, বল কেন বিশুষ্ক অধরে,
এ দুরূহ পথে সখি, কেন বল হয়েছিলে সাথী,
অকস্মাৎ মধ্যপথে থেমে যাবে যদি ক্লান্তিভরে ?

আঁধারে আঘাত কর—কটাক্ষ-বিদ্যুতে তারে হান,
রক্তিম অধর 'পরে তীব্র হাসি তোল বিচ্ছুরিয়া,

কঙ্কণে ঝঙ্কার তুলি হিম-বক্ষে শিহরণ আন,
নব রূপে মূর্ত হও, থামিয়া যেও না তুমি প্রিয়া।

কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি ক্রমশ হতেছে ঘনতর,
নূতন মহিমাভরে সার্থক তাহারে তুমি কর।

১৩

কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি—জ্যোৎস্নার হয়েছে অবসান,
আকাশ-ধরণী-ব্যাপী পুঞ্জ পুঞ্জ নিবিড় তমসা,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে অবিশ্রান্ত ওঠে ঝিল্লিতান,
রজনীর মধ্যযামে তন্দ্রাতুর ধরণী অবশা।

রজনীগন্ধার গন্ধ অন্ধকারে ফেরে অন্ধবৎ,
গাঢ় স্তব্ধতার মাঝে সন্তর্পণে ফিরিছে কাহারা,
নিরুদ্দেশে চ'লে গেছে মহাশূন্যে দীর্ঘ ছায়াপথ,
একাকার হয়ে গেছে গিরি নদী সমুদ্র সাহারা।

নিস্তব্ধ আঁধার মাঝে চলে কোনো আয়োজন যেন,
সমস্ত রজনী ভরি ফুটিয়াছে কিসের আভাস,
মানব-মনের প্রশ্ন চিরন্তন 'কহ' 'কোথা' 'কেন'
অস্পষ্ট মূরতি ধরি সঞ্চরিছে অনন্ত আকাশ।

অজাত আলোর স্বপ্নে উতলা যে আঁধার নিশীথ,
জ্বল জ্বল সখী তুমি, বল কেন হ'লে নির্বাপিত ?

১৪

জ্বল জ্বল পুনরায় উজ্জ্বল হও গো আর বার,
একান্ত আগ্রহভরে এখনও যে ক'রে আছি আশা,
জ্বলন্ত শিখার মাঝে পুড়িতে যে চাহি বারম্বার,
আলো-লুব্ধ পতঙ্গের এখনও যে মেটে নি পিপাসা।

এসেছিনু ছুটে হায়, হেরিয়া যে জ্যোতি অপরূপ
কে নিবাল শিখা তার? জ্বাল তারে, পুনরায় জ্বাল,
হে বর্তিকা, কোন্ মন্ত্রে সম্বরিলে আপন স্বরূপ,
আলো কই, আলো কই, আলো চাই আলো, আলো, আলো।

আলোকের লাগি আমি আসিয়াছি আলোক-পিপাসী,
জ্বলন্ত শিখার মাঝে করিয়াছি আপনারে দান,
পাখা দুটি পুড়াইয়া নিবে গেলে অয়ি সর্বনাশী,
দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের কামনার নাহি যে নির্বাণ।

পুড়িয়াছে পাখা দুটি, পদপ্রান্তে প'ড়ে আছি হায়,
নির্বাপিত হে প্রদীপ, প্রজ্জ্বলিত হও পুনরায়।

শুক্লা

১

বহ্নিলুব্ধ পতঙ্গের অসম্বৃত ক্ষুধিত নিশ্বাস
বারম্বার নিবায়েছে প্রদীপের ঊর্ধ্বমুখী শিখা,
ঘন গাঢ় অন্ধকারে নিঃসম্বল করিয়াছি বাস,
আপনার অন্ধ মোহে রচিয়াছি মিথ্যা বিভীষিকা।

পুড়িবার শিখা নাই উড়িবার পাখা নাই আর,
ভাবিয়াছিলাম বুঝি অন্ধলোকে হব অবসান।
স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর ক্রমে ক্রমে হতেছে আঁধার
নাস্তিক্যের অন্ধকারে আসিল কি আলো-ভগবান?

মুঞ্জরিছে শুষ্ক তরু, গুঞ্জরিছে মৃত মধুকর,
লুপ্তস্রোত তটিনীর অন্তরেতে জাগে গতিবেগ,
মৌনকুঞ্জ মৃদুবায়ে পুনরায় তুলেছে মর্মর,
দিগন্তে উঠিছে শশী নীলাকাশ হয়েছে নির্মেঘ।

আকাশ হইতে আলো নামিতেছে মাটির ধরায়,
নির্বাপিত প্রদীপেরে কে দিল জ্বালিয়া পুনরায়?

২

শিখাহীন প্রদীপের অন্তর্লীন প্রদীপ্ত কাহিনী
ধরেছে ভাস্বর মূর্তি জ্যোৎস্নালোকে পবিত্র পরম
স্নিগ্ধভাতি অপরূপ নহে শিখা পতঙ্গ-দাহিনী
জ্বালা নাই জ্যোতি আছে, লোভ নয় জাগায় সম্ভ্রম

স্থূলতার অন্তরালে সূক্ষ্ম শোভা ছিল সুগোপন,
বুঝি নি দেখি নি তারে, লুব্ধ আঁখি ছিল দৃষ্টিহীন;
উপলবন্ধুর পথে অন্ধকারে লালায়িত মন
বারম্বার নিজেরেই করিয়াছে শুধু প্রদক্ষিণ।

এতদিন যা চেয়েছি প্রসারিয়া ব্যগ্র দুটি বাহু
সে শুধু আমারি তৃপ্তি, ক্ষুধিতের নিষ্ঠুর আহার,
গ্রাস করি সুধাকরে তবু হায় পিপাসিত রাহু,
বুভুক্ষিত চিররিক্ত, সুধাবিন্দু মেলে নি তাহার।

আপনার হাহাকারে বধির হইয়াছিল কান,
শুনি নি তোমার কথা, বুঝি নি তোমার অভিমান।

৩

চাহি নি তোমার পানে, ছিল না তাহার অবসর,
অসংযত মত্ততায় লুব্ধ হস্তে করেছি লুণ্ঠন,
পিপাসা মেটে নি তবু, শুষ্কতর হয়েছে অধর,
দেখিতে পাই নি রূপ ছিন্নভিন্ন করিয়া গুণ্ঠন।

বাহুবলে বস্তু মেলে—তুচ্ছ বস্তু অতীব ভঙ্গুর,
নিমেষে গুঁড়ায়ে যায় বজ্রমুঠি লুব্ধ লালসার
বাদ্যযন্ত্র চূর্ণ করে সুর-লোভে অশিল্পী অসুর,
সুর সাধনার ধন ভুলে যায় তাহা বারম্বার।

বস্তুর জগতে, সখী, বারে বারে বাধা দেয় সীমা,
আজি এই জ্যো'স্নালোক অসীমের পেয়েছি সন্ধান,
দেহ নয় দেহাতীত, বস্তু নহে অবস্তু-মহিমা,
দীপ নয়, শিখা নয়, হেরিতেছি আলো অনির্বাণ।

পেলব আলোক-স্পর্শে অন্ধকার যায় বিগলিয়া
অদৃষ্টরে দেখিলাম অন্তরের অনুভূতি দিয়া।

৪

চিনিবার শুভ-লগ্ন জীবনে আসে না বহুবার,
যে আলোকে চেনা যায়, নহে তাহা বাহিরের আলো,
শুক্লা-চতুর্দশী—সে তো সাধারণ তিথি পঞ্জিকার
আসে যায় কত বার, আজ কেন লাগে এত ভালো?

ডাকে দূরে দহিয়াল, চতুর্দিক নিবিড় নির্জন,
জ্যোছনা ঘুমায় ওই বালুতটে, গিরি-সানুদেশে,
আজ কেন মনে হয় সব দ্বন্দ্ব হ'ল নিরসন,
নবীন অঞ্জন পরি নব-দৃষ্টি লভিনু নিমেষে ?

কোন্ মন্ত্রে, কহ, আজি প্রকাশিলে আপনারে প্রিয়া,
নীরবে আনত চোখে স্বমহিমা করিলে প্রচার,
তপস্যা করিতে হবে ধৈর্যভরে তোমার লাগিয়া,
কি করিয়া বুঝিলাম প্রয়োজন আছে প্রতীক্ষার ?

প্রবল পরুষকণ্ঠে কত দাবি করিয়াছিলাম,
আজ কিছু চাহি নাকো, আপনারে সঁপিয়া দিলাম।

৫

আজ বুঝিয়াছি সখি, যে শক্তিতে মোরা বলীয়ান,
অশক্তের শক্তি তাহা, অনিবার্য আনে পরাজয়,
সে শক্তি হনন করে, নিত্য রচে বাধা ব্যবধান,
পরিখা খনন করে, সৃষ্টি করে অবিশ্বাস ভয়।

দম্ভের কঠিন দুর্গ আজীবন দৃঢ় করি শুধু,
পাষাণে পাষাণ গাঁথি উচ্চ করি প্রাচীর প্রবল,
শ্যামল থাকে না কিছু' চারিদিকে মরু করে ধূ ধূ,
শক্তির প্রখর তাপে শুকাইয়া যায় সব জল।

নিজদুর্গে নিজে বন্দী ,—জলবিন্দু নাহি পিপাসার,
বাহিরের পথ নাই, প্রাচীর প্রাচীর চারিদিকে,
পাষাণে কুটিয়া মাথা আপনারে হানি বার বার,
সহসা চাহিয়া দেখি, চেয়ে আছ তুমি অনিমিখে।

মন্ত্রবলে কর ত্রাণ,—মোর শক্তি হয় অবান্তর,
অনাবিল চন্দ্রালোকে স্বপ্ন দেখে উষর প্রান্তর।

৬

নিখিল-ভুবনভরা আলো আছে চির-জ্যোতিষ্মান,
দৃষ্টিহীন প্রাণহীন সৃষ্টি করে নিজে অন্ধকার,
যতক্ষণ প্রাণ আছে আলোকের নাহি অবসান,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে করিবে সে আলো আবিষ্কার।

অজানার তমোলোকে কল্পনার দ্যুতিমান রথে
আলোর সন্ধান করে আলোসন্ধী মানবের মন,
নিত্য নব রশ্মিপাতে আলোকিত করে যাত্রাপথে
মৃত্যু-যবনিকা ভেদি জন্মান্তর করে দরশন।

অন্ধকারে মৃত্যু তার,—মানে না সে আপন বিনাশ,
অন্তরের অন্তস্তলে জ্বলে মৃত্যু-বিজয়িনী শিখা,
আলোকের প্রত্যাশায় ক্ষণিকের আঁধার-বিলাস
ক্ষণিকে বিলুপ্ত হয়,—আলো জ্বালে মানস-দীপিকা।

সে আলোক জ্বলিয়াছে , বিদূরিত অন্ধকার অমা,
সে আলোকে নব-রূপে চিনেছি তোমারে প্রিয়তমা।

৭

এতকাল বুঝি নাই, করিয়াছি বুঝিবার ভান,
অপরের শোনা কথা আবৃত্তি করেছি বারবার,
তোমারে তোমার মূল্যে কোন দিন করি নি সম্মান,
অপরের মানদণ্ডে করিয়াছি তোমার বিচার।

বিধাতার সৃষ্টি তুমি, রহস্যের শেষ নাহি তব,
তোমার বিশিষ্ট রূপ দেহেতেই নহে যার সীমা,
তোমার নিগূঢ় বার্তা, তোমার প্রকাশ অভিনব,
অন্তহীন অফুরন্ত বিচিত্রিত তোমার মহিমা।

বিধাতার সৃষ্টি মাঝে কোন্ স্তরে কোথা তব স্থান ?
কতটুকু জানিয়াছি ? কতটুকু করেছি স্বীকার ?
কতটুকু শক্তি আছে করিতে রহস্য-সমাধান ?
অন্ধ অহঙ্কারবশে করিয়াছি শুধু অধিকার !

অতি-পরিচয়-মোহে হেরি নাই তোমার বিস্ময়,
অপরিচিতার সাথে হ'ল আজ নব পরিচয়।

৮

গ্রন্থ ছিল অপঠিত, মত্ত ছিনু লয়ে আবরণ
প্রতিমা সাজায়েছিনু সন্ধান করি নি দেবতার,
পূজারীর ছদ্মবেশে করিয়াছি মিথ্যা আচরণ,
ছিল না পূজার নিষ্ঠা ছিল বাহ্য মন্ত্র উপচার।

মিথ্যা সে বিলুপ্ত হয়, সত্য শুধু বেঁচে থাকে একা,
চিরন্তন বার্তা বহি আলো আসি তমসাকে হানে,
চরম দুঃখের রাতে পরম মুহূর্ত দেয় দেখা,
থেমে যায় কলরব, নীরবতা অর্থ বহি আনে।

আবরণ ভেদ করি গ্রন্থ দেয় আত্ম-পরিচয়,
দেবতা দর্শন দেন অতিক্রমি মাটির প্রতিমা,
হেরি যবে আবির্ভাব স্তব্ধ হয় সব অভিনয়,
আজি সখি, আঁখি ভরি হেরিলাম তোমার মহিমা।

বুঝিলাম, তুমি শুধু নহ প্রিয়া মোহিনী সজনী,
নিখিলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা তুমি যে জননী।

৯

পঙ্ক মাঝে পঙ্কজের সম্ভাবনা কর আবিষ্কার,
অন্ধকারে আলো জ্বাল আপনারে দহিয়া-দহিয়া,
স্বপ্ন আন, মুক্তি আন, মর্তে আন বার্তা অমরার,
ক্ষমা কর, ভালবাস, জয় কর সহিয়া সহিয়া।

অথচ লুকায়ে থাক, আপনারে রাখ সম্বরিয়া,
অবগুণ্ঠনের তলে সশঙ্কিত স্নেহভীরু মন
সুগোপনে কুণ্ঠাভরে অন্তরালে সরমে মরিয়া
অতিশয় সসঙ্কোচে করিছ অমৃত-বিতরণ।

মুখে কোন নাহি কথা, তনুখানি আনম্রিত লাজে,
নিজেরে লুকায়ে তবু রাখিতে তো পার নাই প্রিয়া,
আজি এই চন্দ্রালোকে রজনীর স্বপ্নপুরী মাঝে
মহিমা-মুকুটখানি বারে বারে ওঠে ঝলসিয়া।

আজি রাতে ফল্গুধারা খুলিয়া ফেলেছে আবরণে,
যূথিকার মৃদুগন্ধ স্পষ্টতর হয় ক্ষণে ক্ষণে।

১০

শুক্লা-চতুর্দশী নিশি,—আকাশে আলোর পারাবার,
যে আনন্দ উথলিছে নাহি কথা নাহি তার স্বর,
যে কথা বলিতে চাহি নীরবতা জানি ভাষা তার,
রসনা মানে না মানা,—আজি নিশি বড় যে মধুর।

নিবিড় হয়েছে রাতি, শুভ্র জ্যোৎস্না হয় শুভ্রতর
স্বপ্নাবিষ্ট আঁখি তুলি চেয়ে আছ কেন মুখপানে?
আসিয়াছি অসহায়, আমারে গ্রহণ তুমি কর,
কত দূরে আছ বল, কহ সখি, আছ কোন্‌খানে।

একদা ভাবিয়াছিনু নিঃশেষ হইয়া গেছ প্রিয়া,
কোথায় আরম্ভ তব আজি আমি খুঁজিতেছি তাই;
কাছে এস, আরো কাছে, কহ সখি, কহ বিবরিয়া,
কতদূরে আছ তুমি—সত্যই কি ব্যবধান নাই?

তোমারে পাব না জানি যদি নিজে নাহি দাও ধরা,
অয়ি চির-পলাতকা, অয়ি নারি চির-স্বয়ম্বরা!

১১

সমস্ত আকাশে আজি কত কান্তি কত কোমলতা,
মন্থর মুহূর্তগুলি স্বপ্নাতুর ধীরে ধীরে ভাসে
নীরব রয়েছ কেন, বলিছ কেন কোন কথা
জ্যোছনার সমারোহ আজি সখি, মোদের আকাশে

সমস্ত আকাশ ভরি আজি এ কি অপূর্ব উৎসব
আলোকিত মর্মবাণী আনন্দিত আকাশ জুড়িয়া,
অতীতের গ্লানি ব্যথা বিলুপ্ত হইয়া গেছে সব,
ভগ্ন-মনোরথখানি স্বপ্নলোকে গিয়াছে উড়িয়া।

দিগন্ত-রেখায় ওই মহাকাশ আসিয়াছে নামি,
ধরণীর বার্তা লাগি অপেক্ষিছে আকাশের তারা,
মৃত্তিকার মোহ ভুলি মন সখি আজি ঊর্ধ্বগামী,
না জানি কাহার লাগি দহিয়াল ডেকে ডেকে সারা।

সত্য আজি স্বপ্নময়—ভাষা আজি লভিয়াছে সুর,
অতীত-জীবন-কথা রূপকথা-সম সুমধুর।

১২

রূপসী ছিলে কি তুমি? একদিন ছিলে কি কামিনী?
রক্তিম অধর ভরি রেখেছিলে মদিরা মধুর?
পূর্ণ যৌবনের ভরে মদালসা-মরালগামিনী,
চরণের নূপুরেতে বাজাতে কি মরমের সুর?

ললিত মৃণালভুজে রেখেছিলে লুকায়ে শৃঙ্খল?
কটাক্ষকুশল আঁখি করিত কি বহ্নি-বরষণ?
সোহাগের মৃদু হাসি, অভিমানী নয়নের জল,
নিত্য নব নব রূপে করিত কি চিত্ত-পরশন?

হয়তো করিত সখি, বিজয়িনী ছিলে তুমি মানি,
হয়তো এখনো আছ—কিন্তু আজ বুঝিয়াছি প্রিয়া,
দেহের গৌরব তব পরিচয় নহে সবখানি,
মহিয়সী নহ তুমি দেহের মাধুরী বিতরিয়া।

অক্ষমে আশ্রয় দাও—পশুরে দেবত্ব কর দান,
অয়ি মহিয়সী নারি, সেই তব শ্রেষ্ঠ জয়গান।

১৩

পাশাপাশি ব'সে আছি, স্বপ্নময়ী ধরণী মধুরা
শুভ্র স্বচ্ছ লঘু মেঘ আকাশে ভাসিছে ধীরে ধীরে,
ফুটেছে যূথিকা কোথা সুগোপনে সরম-আতুরা,
তারি গন্ধ মন্দবায়ে আকুল করিছে রজনীরে।

পাশাপাশি ব'সে আছি ; শুনিতেছি আকাশের বাণী
যে আকাশ ঊর্ধ্বে নিয়ে চতুর্দিকে আছে প্রসারিয়া,
যে আকাশে সূর্য আসে, মেঘ ভাসে, বজ্র যায় হানি,
যে আকাশে তুমি আছ, যে আকাশে আমি আছি প্রিয়া।

সে আকাশ জ্যোৎস্নাকুল—জ্যোৎস্না নহে আলো সবিতার,
স্বপ্নাতুর সত্য সে যে, আলো নয় আলোর আশ্বাস,
ভাষা নয় ভাব শুধু,—অবর্ণিত মূর্তি কবিতার,
বস্তুহীন প্রশ্নহীন জ্যোতির্ময় অনন্ত আভাস।

অনন্ত আভাস মাঝে অনন্ত সত্যেরে দেখিলাম,
এতদিন, কহ সখি, অন্ধকারে কোথায় ছিলাম।

১৪

অনাহত বীণাতন্ত্রে সম্ভাবনা অনন্ত সুরের,
যে তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেছে সেও নহে সম্ভাবনাহীন,
আজি এই জোৎস্নালোকে স্বপ্ন নামে যেই সুদূরের,
সে সুদূরে সুরহীন নাহি কোন ছিন্নতন্ত্রী বীণ।

মূক পাইয়াছে ভাষা, পঙ্গু সেথা লভিয়াছে গতি,
নিরর্থক অর্থময়, ব্যর্থ সেথা নহেক শূন্যতা,
সে মহা-আলোক-লোকে স্বয়ম্প্রভ অপরূপ জ্যোতি,
চরিতার্থ করি সবে অসম্পূর্ণে দিয়েছে পূর্ণতা।

সে আলোক আজি সখি, উদ্ভাসিত তব মুখ 'পরে,
তার দিব্য দীপ্ত বাণী কাঁপিতেছে আঁখিতে অলকে,
জ্যোতির্ময়ী বার্তা তার লেখা তব কপোলে অধরে,
মর্ত মানবীরে ঘেরি অমর্তের মহিমা ঝলকে।

মহান আলোক-তীর্থে চমৎকৃত দাঁড়াইয়া আছি,
বিমোহিত আত্মহারা তোমার আত্মার কাছাকাছি।

আহবনীয়

শ্রীমান অসীম মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু—

ভাগলপুর

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫০

নিপীড়িত মানবের সনাতন বিশ্বাসের গান
পুরাতন ছন্দে গাহিলাম,
স্বকীয়তা নাহি কিছু :—নাহি মোর হেন অভিমান—
কর-জোড়ে শুধু চাহিলাম
প্রাণদ অভয়-মন্ত্র মৃত্যুঞ্জয় দেবতা-সমীপে
অন্ধকারে আলো দেন যে দেবতা জীবন-প্রদীপে ।

১

অয়ি শুভ্রা, সুনির্মলা, অয়ি দেবী কুন্দেন্দু-বরণী,
শঙ্খশুভ্র হংস তব চিরকাল মেলে আছে পাখা
অন্তরের অন্তরীক্ষে : দেবী তুমি তিমির-হরণী
জ্যোতির্ময়ী চিরকাল মানবের মর্ম-পটে আঁকা।

যুগে যুগে নব-মূর্তি : সোম-রস এনেছ সন্ধানি
মোহিয়া গন্ধর্ব-কুল, লভিয়াছ অন্তরের স্তুতি
হেরা ও মিনার্ভা রূপে, পুস্তকশ্রী তুমি বীণাপাণি,
ক্রুশকাষ্ঠে আপনারে হাসিমুখে দিয়েছ আহুতি।

এসেছে নূতন যুগ, নব-মূর্তি লহ সরস্বতী,
নিবেছে আনন্দ-দীপ অন্ধকারে চলে হানাহানি—
পাপের প্রবল-হস্তে ভুঞ্জিতেছি নির্বাক দুর্গতি,
রক্ত-শতদল 'পরে মূর্ত হও মর্মন্তুদ বাণী।

ভাষাহীন লাঞ্ছিতেরে ভাষা দাও, কর দুঃখ দূর,
বীণাতন্ত্রে রুদ্র ছন্দে ঝঙ্কারিয়া তোল নব সুর।

২

ক্ষমা কর, মুগ্ধ ছিনু, শুনিতে পাই নি নব-সুর
এই তো নবীন যুগে করিয়াছ নব-মূর্তি দান
বিদলিত পদ্মবন—কাব্য-কুঞ্জে এসেছে কর্বুর—
যে হস্তে বাজায় বীণা সেই হস্তে তুলেছ কৃপাণ।

পূর্ণিমা হয়েছে অমা, ইন্দ্রাণী হয়েছে ভিখারিণী
অন্ধকার নহে স্নিগ্ধ আবরিয়া রেখেছে তস্কর,
কৃষ-মেঘে বিসর্পিছে বজ্র-গর্ভা বিদ্যুৎ-নাগিনী
দৈত্য-রথ-চক্র-তলে নিষ্পিষ্টের ওঠে আর্ত-স্বর।

রক্ত-মাংস-কর্দমাক্ত শবাকীর্ণ গৃহস্থ-অঙ্গন
শিবা-সারমেয়-দল সঙ্ঘবদ্ধ পিশাচ প্রমথ
লোলুপ প্রলুব্ধ-কণ্ঠে তুলেছে কি প্রমত্ত গর্জন
বিষ-দিগ্ধ লক্ষ শরে নব-রূপে এসেছে মন্মথ।

নারী নগ্না ভয়ঙ্করী—বিধর্ষিতা কলঙ্কিতা সতী
প্রলয়ের কালরাত্রে শ্মশানেতে নাচে ধূমাবতী।

৩

প্রলয়ের কালরাত্রে একি তব মূর্তি বিভীষণা,
মেরুদণ্ড-শীর্ষে শোভে সুপিঙ্গল দীর্ঘ জটাভার,
কণ্ঠে শোভে মুণ্ডমালা, শিরে শোভে গরুড়ের পাখা,
হস্তে মহিষের শৃঙ্গ—দৈত্য-রক্তে করে টলমল।

কট কট কট শব্দে নর-অস্থি করিয়া চর্বণ
প্রলয়-তাণ্ডবে মাতি প্রেতদলে ছাড়িছ হুঙ্কার,
কহ-কহ-কহ-কহ—উগ্রহাস্যে কাঁপিছে আকাশ,
ধ্বনিতেছে মহাশূন্যে ডমরুর ডিমি ডিমি ডিমি।

ঝম ঝম ঝম ঝম—মহোল্লাসে করিছ নর্তন,
টণ্ট টণ্ট টণ্ট টণ্ট—উঠিতেছে উগ্র ঘণ্টানাদ,
স্ফেং স্ফেং স্ফেং রবে দন্তে দন্ত করিয়া ঘর্ষণ
টক টক টক শব্দে অট্টহাস্য হাসিতেছ ভীমা।

ঘূর্ণিতলোচনা ক্ষিপ্তা তুলি তীব্র লহ-লহ-নাদ
উন্মাদিনী দিগ্বসনা ছুটিয়াছ তৃষার্তা লোলুপা,
শিহরিছে ত্রিভুবন মট মট মট মট রবে—
রক্তাক্ত রসনা মেলি মুণ্ডমালা করিছ চর্বণ

কর্ণে দোলে সূর্য চন্দ্র, বক্ষে দোলে নক্ষত্রনিকর,
নভশ্চুম্বী তুঙ্গজটা বজ্রবহ ক্রুদ্ধ-মেঘসম

স্কন্ধোপরি গর্জিতেছে ধ্বজ-রূপী সর্প ভয়ঙ্কর,
হস্তে শূল, তাম্র-নেত্র, মগ্ন ও রুধির মত্ত তুমি।

তৈলসিক্ত একবেণী, ধূমাবতী অয়ি ভয়ঙ্করী
লৌহের বেষ্টনী দিয়া সাজায়েছ চরণ-কমলে,
দীর্ঘ-অঙ্গ, ধ্বজ-বাহু, দিগম্বরী ধূম্রবর্ণ-আভা
কৌতুকেতে গ্রাসিতেছ মুহূর্তেকে নিখিল সংসার।

সংসারের অন্তকালে নরবসারক্তে প্রীত তুমি,
তুমি রিক্তা, তুমি ঋদ্ধি, তুমি শিবা, তুমিই কুমারী,
যোগমুদ্রা হে যোগিনী, মৃত্যুভয়-বিনাশিনী তুমি,
তোমারে প্রণাম করি ত্রিভুবন-জননী চণ্ডিকা। *

৪

তোমারে প্রণাম করি হে মৃত্যু-রূপিণী মহাকালী
তোমারে প্রণাম করি জীবনের নবীন আশ্বাসে,
এ দুর্যোগ অবসানে, আশা আছে, জ্যোতির্বহ্নি জ্বালি'
যেই সূর্য দেখা দেবে অন্ধকার-লাঞ্ছিত আকাশে
তারই তুমি বার্তাবহ : আসিয়াছ ভীমা মূর্তি ধরি'
গ্রাস কর নাশ কর ধ্বংস কর চূর্ণ কর সব,
ক্লেদাক্ত রক্তাক্ত কর, ছিন্ন ভিন্ন কর ভয়ঙ্করী
খল খল অট্টহাস্যে ঝঞ্ঝামত্ত তোমার তাণ্ডব
সানন্দে সমাপ্ত কর। পরিচ্ছন্ন পবিত্র অঙ্গনে
যে নব জীবন-মন্ত্র উদ্ঘোষিত হবে একদিন
নবীন উদ্গাতা-কণ্ঠে, আজিকার তর্জনে-গর্জনে
শুনিতেছি তারই বাণী,—শান্ত দীপ্ত বাণী সে নবীন।

তুমি মৃত্যু—তুমি মুক্তি—জীবনের তুমি অগ্রদূত
বলিষ্ঠ উদার শুভ্র যে জীবন নির্মল নিখুঁত।

---

* তন্ত্র হইতে গৃহীত

৫

কে তুমি কুঞ্চিত-নাসা, চাহ শুধু নিখুঁত শুভ্রতা,
বাঁচাইয়া মলিনতা সন্তর্পণে কর সঞ্চরণ,
নির্মল থাকিতে চাহ ? একি স্পর্দ্ধা, একি এ মূর্খতা !
মৃত্তিকার ধরণীতে অমলিন রবে কতক্ষণ ?

এ যে বন্ধু মর্তলোক, তুমি বুঝি পাওনি সংবাদ
শিকারী শিকার করে, বাণ ছোঁড়ে, পাতে হেথা জাল
একই কবি একই মুখে করে গান করে আর্তনাদ
জীবন্তের পদতলে লক্ষ কোটি মৃতের কঙ্কাল।

এ পারে উঠিলে রবি ও পারেতে নামে যে আঁধার
এক তীরে শ্যামা জাগে অন্য তীরে জাগে যে পেচক
যে বৃক্ষ আকাশমুখী অন্য প্রান্ত মৃত্তিকায় তার
একই সে লবণ হয় কভু খাদ্য কখন রেচক।

দানব-মানব-দেব মৃত্তিকারই নানা বিবর্তন
মৃত্রিকারে বাঁচাইয়া কেমনে করিবে সঞ্চরণ ?

৬

মৃত্তিকায় স্থান জানি তবু আমি আকাশ-বিলাসী,
শ্মশানে বসিয়া থাকি অমারাত্রে শবাসন 'পরে
অমৃত আকাঙ্ক্ষা করি', ইন্দ্রত্বের আমি অভিলাষী
রিক্ত দীন দরিদ্র তাপস, অবিচল নিষ্ঠা-ভরে
অসম্ভব স্বপ্ন দেখি। নহি আমি সামান্য শিকারী,
ভূমারে করেছে বন্দী জাল মোর, মোর তীক্ষ্ণ বাণে
পশু নয়—পশুপতি আহত যে ; কৃপার ভিখারী
দেবতা আপনি আসি তুষ্ট মোরে করে বর-দানে।

আমার আদর্শ-লোকে মুঞ্জরিত হয় কল্পতরু,
বশিষ্ঠ তপস্যা করে, বিশ্বামিত্র মানে পরাজয়,

জানি আমি যাব যেথা উল্লঙ্ঘিয়া সিন্ধু, গিরি, মরু ;
অনিবার্য গতি মোর মানিবে না কোন বিঘ্ন-ভয় ।

জরায় জর্জর দেহ যৌবনের টিকা ভালে শোভে,
পঙ্কস্নান করি আমি শতদল পঙ্কজের লোভে ।

৭

আনন্দে বিশ্বাস করি ,—যে আনন্দ জীবন-স্পন্দন
যে জীবন ছিন্ন করে সমস্ত বন্ধন
চূর্ণ করে বাধা-বিঘ্ন সব,
যে জীবন প্রদীপ্ত উৎসব
মৃত্যুর আঁধারে :
শাশ্বত মানব আমি চলিয়াছি ঝঞ্ঝা-অন্ধকারে
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ভেদি'
লক্ষ্য করি সেই তীর্থ-বেদী
যেই বেদী-পাদ-মূলে অকম্পিত শিখা জ্যোতির্ময়
উদ্ভাসিত বাণী কহে—নাহি ভয়—নাহি কোন ভয় ।

৮

যৌবনের জয়-গাথা চিত্ত মোর চাহে গাহিবারে ।
অন্ধকার অমারাত্রে সূর্য-স্বপ্ন দেখিছে মানস,
কল্পনায় নভশ্চুম্বী অনির্বাণ জ্বলদগ্নি-শিখা
উন্মাদ আনন্দভরে তমিস্রায় করিছে লেহন ।

মহত্তর প্রেরণায় বৃহতের লাগি সে উন্মুখ,
নির্ভীক অকুতোভয়ে ঊর্ধ্বলোক করিছে সন্ধান,
দুর্দম বিজয়ী দৃপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবন প্রখর—
তারই স্বপ্নমূর্তি আঁকি কল্পনায় বিনিদ্র নয়ন ।

দিগন্তপ্রসারী মরু উত্তরিছে সে যেন বিক্রমে,
ধাবমান অশ্বক্ষুরে তপ্ত-বালু উঠে আবর্তিয়া,

বল্‌গার ঘর্ষণে রক্ত ফেনাইয়া উঠে অশ্বমুখে,
দীপ্ত-চক্ষু অশ্বারোহী কশাঘাত করে বারম্বার।

উত্তুঙ্গ হিমাদ্রিশিরে মৃত্যু-হিম উচ্চতা করাল,
শীত-তীক্ষ্ণ হিংস্র বায়ু তীব্রকণ্ঠে করে প্রতিবাদ,
বিগলিত শিলা-স্রোত সগর্জনে পথরোধ করে,
দন্তে দন্ত চাপি তবু সে যেন করিছে অতিক্রম।

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ-কৃষ্ণ ঘন-মেঘে আবৃত আকাশ,
গর্জমান বজ্রাঘাতে শিহরিছে ভয়ার্ত পৃথিবী,
ঝঞ্ঝার তাণ্ডব সাথে সমুদ্রের ফেনিল নর্তন,
দুঃসাহসী সে নাবিক শান্তমুখে বাহিছে তরণী।

পাতালের অন্ধকার, অন্তহীন ব্যাপ্তি আকাশের,
সমুদ্রের অতলতা, অরণ্যের রহস্য জটিল,
প্রবুদ্ধ করিছে তার প্রাণবান মনীষা জিগীষা
অসম্ভবে সম্ভবিয়া ফিরিছে সে অদম্য দুর্বার।

বিজ্ঞানের তপস্যায় সত্যকাম মগ্ন সে সাগ্নিক—
অচঞ্চল, অবিক্ষুব্ধ, তন্দ্রাহীন একাগ্র সাধন,
মায়াবিনী অপ্সরীর রূপসজ্জা মরে ব্যর্থতায়,
অংশুবিদ্ধ অন্ধকার ধীরে ধীরে হয় জ্যোতিষ্মান।

মস্তকে মুকুট কভু, নির্যাতিত কভু কারাগৃহে,
রক্তাপ্লুত রণাঙ্গনে মৃত্যুশয্যা পাতে সে কখনও,
জলন্ত খধূপ-সম মহাশূন্যে সে দীপ্ত যৌবন
নীহারিকা-স্বপ্নলোকে সৃষ্টি করে আকাশ-কুসুম।

অনাগত যৌবনের স্বপ্ন দেখি ভরিয়া নয়ন,
মনে হয় আসিবে সে, এ দুর্দিন রহিবে না আর,
মেঘজাল-কুজ্ঝটিকা মন্ত্রবলে মিলাবে সহসা,
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদল আলোকিবে আঁধার গগন।

কোথায় যৌবন তুমি, ভারতের হে নব-যৌবন,
কোন ক্ষুদ্র তুচ্ছতায় আপনারে রয়েছ পাশরি' ?
পৌরুষের পরিচয়ে আপনারে করিবে প্রকাশ—
সত্যই কি স্বপ্ন তাহা ? একান্তই আকাশ-কুসুম ?

নপুংসক বিলাসের গ্লানিকর মিথ্যা মহোৎসবে
হে যৌবন, বল বল কত কাল মত্ত রবে আর
অগ্রণী-সমাজে আর কতকাল রহি অপাংক্তেয়
কর্দমে চন্দন ভাবি ললাটেরে করিবে লাঞ্ছিত ?

কল্পনায় স্বপ্ন দেখি—স্বপ্নে করি সার্থক নয়ন
জেগেছে যৌবন তুমি শাশ্বত আপন মহিমায়
দ্যুতিমান প্রাণ-বহ্নি মূর্তি তব করেছে ভাস্বর
আকাশে ফুটেছে ফুল থরে থরে স্তবকে স্তবকে।

৯

যৌবন কোথা, যৌবন কই, জীবন্ত যৌবন ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর
আদর্শবাদী, প্রবল, তীক্ষ্ণ, কই সে পূর্ণ মন ?
শিব সুন্দর সত্য শুভঙ্কর !
অপরের দ্বারে মর্যাদা-হীন ভিক্ষা যাহারা যাচে
ভিক্ষার লাগি' ভিখারীর ভীড়ে উদ্বাহু যারা নাচে
তুচ্ছ স্বার্থে মাতিয়া যাহারা চীৎকার তুলিয়াছে
উচ্চ কণ্ঠে কাঁপাইয়া অম্বর
মোদের দেশের যৌবন কি গো আজিকে তাদের কাছে ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

অগ্নি ঝঞ্ঝা বন্যার মতো দুর্দম যৌবন
আছে কি মোদের যৌবন দুর্বার ?
যদি থাকে তবে ঘরে ও বাহিরে কেন এত ক্রন্দন ?
সকলের মুখে হতাশার হাহাকার !

সারা দেশ জুড়ে শঙ্কার ছায়া ঘনাইছে দিবারাতি
ঝরিয়া পড়িছে আশার কুসুম, নিবিয়া যেতেছে বাতি
অথচ আমরা গৌরব করি—'আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি
ছোট নহি মোরা—নহি মোরা বর্বর।'
যৌবন হায় সে কি করে শুধু রসনাগ মাতামাতি ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।
ভারতবর্ষে যৌবন আছে প্রমাণ কে দিবে তার ?
প্রাণ-প্রদীপ্ত কই সে যুবন্ বীর
সূর্যের মতো উদিত হইয়া নাশিবে অন্ধকার
বজ্রকণ্ঠে কহিবে সুগম্ভীর—
হও আগুয়ান জীবন-যুদ্ধে এস এস চল ত্বরা
বীর্যবন্ত যোগ্য বীরের ভোগ্য বসুন্ধরা
অপেক্ষা করে তাহারই লাগিয়া কমলা স্বয়ম্বরা
হস্তে বহিয়া বিজয়-মাল্য, বর।
মোদের দেশের কোথা সেই বীর প্রদীপ্ত প্রাণ ভরা ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

বাক্যেই নহে কার্যে প্রমাণ করিবে শক্তি তার
কই সে সতেজ সুস্থ সে যৌবন ?
মন্ত্র-সাধনে সিদ্ধ হইবে যাহার পুরুষকার
তাহারই লাগিয়া করিবে জীবন পণ,
বাধার পাহাড় যার পদতলে গুঁড়াইয়া হবে ধূলি
আগাইয়া যাবে বজ্র-মুঠিতে বিজয়-পতাকা তুলি
স্কন্ধে বহিবে দায়িত্ব-ভার—নহে ভিক্ষার ঝুলি—
কই সে যুবক—কই সে জাতিস্মর ?
তারই আশা-পথ চাহিয়া রয়েছি সকল দুঃখ ভুলি
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

মোদের জননী যুগে যুগে নাকি যৌবন-প্রসবিনী
শুনিয়া এসেছি আকুল কর্ণ ভরি'

সারা জগতের সভ্যতা নাকি ভারতের কাছে ঋণী
ইতিহাসে লেখে, বিশ্বাসও তাহা করি।
সেই সভ্যতা কোথা আজ বল,—কোথা সেই যৌবন ?
জাগো যৌবন থাকো যদি তুমি খোল তিমিরাবরণ
মিথ্যা ভস্মে আবরি' রাখিবে বল আর কতখন
সত্য বহ্নি তব অবিনশ্বর !

তুচ্ছ করিয়া জীবন-মৃত্যু উচ্চে তুলিয়া শির
ঊর্দ্ধে রাখিয়া দেশের জাতির মান
ধন্য করিয়া ভারতবর্ষে জাগো আজি তুমি বীর
প্রণাম করিয়া গাহিব তোমারি গান।
স্বদেশের নামে স্বার্থের বোঝা করিয়া বেড়ায় ফেরি
প্রাণ চাহে না তো গান গাহিবারে সে ফেরিওলারে ঘেরি,
থামাইয়া দাও এ আডম্বর চীৎকার তুরী-ভেরী
ধ্বংস কর এ মিথ্যা ভয়ঙ্কর
ভারতবর্ষ, যৌবন তব জাগিবার কত দেরী ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

১০

ভারতের ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিয়াছে যে উদাত্ত স্বর
পুনরায় কর অবধান
ক্ষণ-স্থায়ী এই দেহ অস্থি তুচ্ছ—অতীব ভঙ্গুর
বেঁচে থাকে প্রাণ।
প্রাণবন্ত হে যুবক, নাহি ভয়—নাহি কোন ভয়
অমৃতের পুত্র তুমি জ্যোতিষ্মান তুমি মৃত্যুঞ্জয়
জীর্ণবাস সম দেহ ছিন্ন হোক—হোক লয় ক্ষয়
কোরো না আত্মার অপমান
সমিধ্‌ পুড়িয়া যায় অগ্নি রহে চির জ্যোতির্ময়
অগ্নি অনির্বাণ।

সূর্যের সগোত্র তুমি, মনে রেখ তাহা চিরকাল
উদয়াচলের যাত্রী সমুন্নত শুভ্র তব ভাল
জীবনেতে জমে যদি আবর্জনা মালিন্য জঞ্জাল
নির্বিচারে কোরো অগ্নি-স্নান
অগ্নির পাবক শিখা দগ্ধ করে নশ্বর কঙ্কাল
বেঁচে থাকে প্রাণ।

মহাশূন্যে জলে যাহা লক্ষ কোটি নক্ষত্রের স্বরে
মৃত্তিকার মর্ম ভেদি' উন্মুখিয়া ওঠে তৃণাঙ্কুরে
অশান্ত দীপক রাগে ত্র্যম্বকের বিরাট তম্বুরে
যে অগ্নির ওঠে জয়-গান
সে অগ্নি তোমারও আছে, হে যুবক, ভস্ম ফেল দূরে
করহ সন্ধান।

১১

আগুন জলিছে, আগুন জলিছে—আগুন চিরন্তন
জলিছে বাহিরে জলিছে মর্মতলে—
জলে তুষানল, জলে দাবানল, জলিছে বাড়বানল,
চিতার অনল হোমের অনল জলে।

অগ্নি-পরশে উপল উল্কা হয়,
অগ্নি-প্রপাতে শূন্য দীপ্তিময়,
অগ্নির ঝড়ে ধ্বংস অন্ধকার,
অগ্নি দ্যোতার বজ্র-কণ্ঠে বাজে—
পিণাকের টঙ্কার।

সমরাঙ্গণে শোণিত আগুন জলে,
মহা-উৎসবে শবের মিছিল চলে,
ছিন্নমুণ্ড গাহে আগুনের গান,
প্রতি-কবন্ধে অগ্নি-মশাল জলে—
অগ্নি অনির্বাণ।

অগ্নি-পতঙ্গ ঠিকরে অগ্নি-কণা,
অগ্নি-সর্প তুলেছে অগ্নি-ফণা,
অগ্নি-বক্ষে কালী নাচে নির্ভীকা,
ভীষণ-রসনা রক্ত-দশনা দেবী—
ললাটে অগ্নি-টিকা।

মর্মের বাণী জলে বিদ্যুৎ-চিড়ে,
জ্বালামুখী জলে পর্বত শিরে শিরে
জিহ্বা-লেলিহ ক্ষুধিতা জলন্তিকা.
রুদ্র-নয়নে শুদ্ধ নিরঞ্জন
জলে ধক্‌ধক্‌ শিখা।
জলে তুষানল, জলে দাবানল, জ্বলিছে বাড়বানল,
জলে চিরকাল বহ্নি অনন্তিকা।

১২

তোমারই অন্তরবহ্নি এ দুর্দিনে রবে নির্বাপিত
চিরন্তন অগ্নিহোত্রী? হে তরুণ, তুমি যে সাগ্নিক!
শঙ্কাহীন বীর্যবান বীর তুমি অপ্রমত্ত-চিত
সমস্ত জীবন জ্বালি' পথ-ভ্রান্তে দেখায়েছ দিক
যুগে যুগে চিরকাল, কীর্তিকথা তব সমুজ্জ্বল
ইতিহাসে আছে লেখা জলন্ত অক্ষরে, আছে লেখা
স্মৃতিপটে, আশার কল্পনা-নভে করে ঝলমল
লক্ষবর্ণ মহিমায়। কোথা তুমি আজ? দাও দেখা,
উদ্ভাসিত কর অন্ধকার, হে অগ্রণী চিরন্তন,
আদর্শ-প্রদীপ্ত তব মনীষায়। আছ তুমি জানি,
তবে কেন কষ্ট, ক্ষোভ, অসম্মান, সহস্র বন্ধন
পুঞ্জীভূত হতাশায় প্রতি পদে পরাজয়-গ্লানি?
হে যৌবন-ভগবান, হে ভাস্বর, স্বীয় মূর্তি ধর
অন্ধকার যজ্ঞভূমে প্রাণ-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।

১৩

তোমারেই ডাকি শুধু, হে যৌবন, প্রাণ-বহ্নিময়
মূর্ত কর কবি-কল্পনারে
হে অভীষ্টবর্ষী দেব, অন্ধকারে কর জ্যোতির্ময়
কৃপা করি' স্পর্শ কর তারে।

সুবিশাল বনস্পতি আজ শুধু শুষ্ক কাষ্ঠ-ভার
তীক্ষ্ণীকৃত পরশু-আঘাতে
হে উজ্জ্বল বৈশ্বানর, তুমি তার করহ সংকার
প্রজ্বলিত শিখা-সন্নিপাতে।
দগ্ধ কর শব-স্তূপ, হে ধ্বান্তারি, হও দীপ্তিমান
হে সুকর্মা, হও শুভতম,
ঘর্ষিত অরণি-বক্ষে নব-জন্ম লভি' বলবান
হে নির্জর, হও যুবতম,

প্রকৃষ্ট প্রসিদ্ধ হও—প্রজ্বলিত হও হুতবহ,
হে অগ্নি, হে চিরন্তন, হিরণ্যগর্ভের বার্তা কহ।

১৪

পলে পলে দুঃখ সহি, পদে পদে সহি অত্যাচার,
অপমান-কশাঘাতে জর্জরিত দেহ-প্রাণ-মন,
তবু বাঁচি আশায় আশ্বাসে ; অন্তরের হাহাকার
নিরুদ্ধ করিয়া রাখি, মনে মনে জপি সারাক্ষণ—
কোথা তুমি ভগবান, দৈত্য-দাপে কাঁপে বসুন্ধরা ,
জানি তুমি আসিবে নিশ্চয়—কহ, কত দেরি আর ?
এখনও কি হয় নি সময় ? ভরে নি পাপের ভরা ?
বিশ্বাস করিয়া আছি—অবতীর্ণ হও অবতার।

বিশ্বাস করিয়া আছি রাম আসি হানিবে রাবণে,
দুঃশাসন-বক্ষোরক্ত পান করি ভীম-বৃকোদর

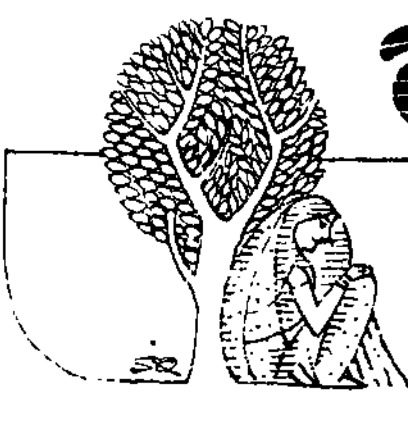
পাঞ্চালীর বেণীবন্ধ করিবে রচনা রণাঙ্গনে,
ছিন্নজটা ধূর্জটির তীক্ষ্ণ রুদ্র রোষ ভয়ঙ্কর
মূর্ত হবে বীরভদ্রে,—দক্ষযজ্ঞ হবে ধ্বংস-স্তূপ,
বিদীর্ণ করিয়া স্তম্ভ দেখা দিবে নরসিংহ-রূপ।

১৫

বিশ্বাস করিয়া আছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্রোণ স্বীয় ভুজবলে
গর্বোদ্ধত দ্রুপদের উচ্চ-শির টানিয়া নামাবে ধূলি-তলে
বিশ্বাস করিয়া আছি একদিন বীর্যবলে বিনতা-নন্দন
স্বর্গ হ'তে সুধা আনি' উন্মোচিবে জননীর দাসত্ব-বন্ধন।
ভগ্ন-উরু দুর্যোধন প্রায়শ্চিত্ত করিবে আবার: জয়দ্রথ
মিথ্যা সূর্য-অস্ত হেরি' হর্ষে বাহিরিয়া জানি হবে পুন হত।
বিশ্বাস করিয়া আছি লবে প্রতিশোধ ভার্গব কুঠার-পাণি
জননীর অপমানে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ধরণী: জানি জানি
ক্ষত্রিয়-শোণিত-পূর্ণ সমন্ত-পঞ্চকে তর্পণ করিয়া তবে
আত্মা তৃপ্ত হবে তার। বিশ্বাস করিয়া আছি—হবে সব হবে।
জলন্ত বিশ্বাস মোর, অচঞ্চল অসন্দিগ্ধ নিগূঢ় বিশ্বাস
নিপীড়িত-বিদলিত-লক্ষ-বক্ষ-বিনির্গত উত্তপ্ত নিশ্বাস
যে অগ্নি জ্বালায়ে তোলে—সে অগ্নি আহবনীয়, প্রদীপ্ত প্রকাশে
দেবতা আসেন সেথা,—অসম্ভবে সম্ভবিয়া দেন অনায়াসে।



নাটক



বিদ্যাসাগর

উৎসর্গ

শ্রীমতী করবী মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু—

করবী,

এখন তোমার বয়স একবছরও হয়নি তবু তোমার নামেই এই বইটি উৎসর্গ করলাম, তার কারণ, তোমার যেদিন জন্ম হয় ঠিক সেই দিনই আমি এই নাটকটি লিখতে আরম্ভ করি। এই বই বোঝবার মতো যখন তোমার বয়স এবং বুদ্ধি হবে তখন তোমার অভিমত শোনা যাবে। ইতি—

১৮ই পৌষ, ১৩৪৮ তোমার—বাবা

ভাগলপুর

ভূমিকা

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য একটি নাটকে অঙ্কিত করা শক্ত। আমি তাঁহার জীবনের একটি কার্যকে মূলসূত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

নাটকীয় প্রয়োজনে আমি জ্ঞাতসারেই নিম্নলিখিত কার্যগুলি করিয়াছি— ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পারম্পর্য রক্ষা করি নাই, একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি এবং বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস-সম্মত করিতে পারি নাই। এই শেষোক্ত কার্যটির জন্য আমি তাঁহাদের বংশধরদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি। ইঁহাদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য যতটুকু ইতিহাস আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা যতটা সম্ভব ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক কোন ইতিহাস না পাওয়াতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা যেন ক্ষুণ্ণ না হন, আমি যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারেই তাঁহাদের চিত্র অঙ্কিত করিলাম।

আর একটি কথা বাহুল্য হইলেও বলিব। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যে সকল উক্তি আছে, সেগুলিকে কেহ যেন আমার ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া মনে না করেন, যে চরিত্রের মুখে যে কথা মানাইবে, তাহাই আমি তাহাদের মুখে বসাইয়া দিয়াছি মাত্র! কোন ব্যক্তি বা ধর্মকে মহৎ অথবা ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য আমার নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় বহুবিধ উপদেশ দিয়া নাটকটির উন্নতি-বিধান করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

"বনফুল"

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগণ

পুরুষ

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগরের পিতা

দীনবন্ধু } বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা
শম্ভুচন্দ্র

নারায়ণ—বিদ্যাসাগরের পুত্র

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মদনমোহন তর্কালঙ্কার } বিদ্যাসাগরের বন্ধুগণ
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

তারানাথ তর্কবাচস্পতি
শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি } বিদ্যাসাগরের অধ্যাপকগণ
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রামগোপাল ঘোষ
রসিককৃষ্ণ মল্লিক } ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রধানগণ সকলেই বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ
রাধানাথ শিকদার
রামতনু লাহিড়ী
কালীপ্রসন্ন সিংহ

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় } স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ
রাধাকান্ত দেব

মিস্টার মার্শাল—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ

মতিলাল—বিদ্যাসাগরের গ্রামবাসী

মদনলাল } কালনাবাসী ভদ্রলোকগণ
জানকীজীবন

হরিহর তর্করত্ন বিদ্যাবাগীশ ন্যায়রত্ন চূড়ামণি	রাধাকান্ত দেবের অনুগৃহীত পণ্ডিতগণ
নরু, মতি, ক্যাবলা, ক্যাপলা গুরুচরণ, কালী	তৎকালসুলভ ফকোড ছোকরাগণ

শ্রীরাম—বিদ্যাসাগরের ভৃত্য

ভৃত্য, একজন লোক, দুইজন ভদ্রলোক, সংকীর্তনের দল, সাঁওতালের দল, বিপিন, হরেন, প্রভৃতি।

স্ত্রী

ভগবতী দেবী—বিদ্যাসাগরের জননী
দীনময়ী দেবী—বিদ্যাসাগরের পত্নী
সুরো—বিদ্যাসাগরের বাল্যসঙ্গিনী
তারানাথ তর্কবাচস্পতির পত্নী
শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বালিকা বধূ
দুইজন বিধবা
একজন বারবনিতা

প্রথম অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[বীরসিংহের বিদ্যাসাগরের শয়নকক্ষ। রাত্রিকাল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের নিকট বসিয়া বিদ্যাসাগর-পত্নী দীনময়ী দেবী পান সাজিতেছেন। পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ি, অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। পিছনকার দেওয়ালের জানালার নীচে শুভ্র শয্যা পাতা। জানালাটি বন্ধ রহিয়াছে। শয্যার মাথার কাছে একটি ছোট টেবিল, টেবিলের সামনে চেয়ার। টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য টেবিল-বাতি রহিয়াছে, কিন্তু জ্বলিতেছে না। ঘরের কোণে একটা শেল্‌ফে বই দেখা যাইতেছে। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে কিছু সাদা কাগজ এবং একটি দোয়াত। দোয়াতে কলম ডোবানো রহিয়াছে, কাগজ এবং দোয়াত-কলম টেবিলের উপর রাখিলেন। দীনময়ী এক বার চোখ তুলিয়া চাহিলেন। তাহার পর ডিবায় করিয়া পান দিলেন।]

বিদ্যাসাগর। [এক খিলি পান মুখে পুরিয়া] নিবারণের কতদিন থেকে অসুখ হয়েছে ?

দীনময়ী। তা অনেক দিন হ'ল, মাসখানেকের ওপর হবে।

বিদ্যাসাগর। আহা বেচারা সেদিন মাত্র বিয়ে করেছে, ছেলেমানুষ বউ !

দীনময়ী। তুমি গেলে না যে ? আমি তো ভাবছিলাম, খেয়েই ছুটবে সেখানে।

বিদ্যাসাগর। মা যেতে দিলেন কই। বললেন, তুই এতটা পথ এসেছিস, আজ আর তোর গিয়ে কাজ নেই। মা নিজেই গেলেন।

[কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।]

দীনময়ী। কতদিন পরে আজ তুমি এলে !

বিদ্যাসাগর। এবার অনেক দিন আসি নি, না ?

[দীনময়ী কিছু না বলিয়া পানই সাজিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর আর এক খিলি পান মুখে পুরিয়া দীনময়ীর দিকে চাহিলেন।]

একেবারে সময় পাই না আজকাল।

[দীনময়ী অবনত মুখে পানই সাজিতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর। নতুন যে আলোটা আনলাম, সেটা কোথায় রাখলে ?

দীনময়ী। ওই যে টেবিলের উপর রয়েছে।

বিদ্যাসাগর। জ্বাল নি যে ?

দীনময়ী। কি করে জ্বালতে হয় আমি জানি না। তেল ভরে' রেখেছি।

বিদ্যাসাগর। ওতে আর জানবার কি আছে, দেশলাই কাঠি জেলে ধরিয়ে দিলেই জ্ব'লে উঠবে। দেশলাই কোথায়, দাও, আমিই জ্বালছি।

[দীনময়ী উঠিয়া দিয়াশলাই আনিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর আলো জ্বালিলেন। দীনময়ী বিছানায় উপবেশন করিলেন।]

দীনময়ী। এখন আবার লেখাপড়া করবে নাকি ?

বিদ্যাসাগর। একটু লিখব ভাবছি। শম্ভুর কাছ থেকে তাই কাগজ কলম নিয়ে এলাম। রাস্তায় আসতে আসতে মনে হ'ল সীতার বনবাস নিয়ে একখানা বই লিখলে বেশ হয়। পাঁচ কাজে হয়তো ভুলে যাব, খানিকটা ফেঁদে রাখি। 'উত্তররামচরিত'খানা এখানে আছে, না, কলকাতায় আছে কে জানে! দেখি। [শেল্‌ফের নিকট গিয়া খুঁজিতে লাগিলেন] বই কি থাকবার জো আছে ? এই যে আছে দেখছি। ইস, ধুলো জমেছে কত! [ঝাড়িলেন] ধুলোগুলো ঝেড়ে রাখতে পার না ?

দীনময়ী। তোমার বই-পত্তরে হাত দিতে ভয় করে আমার।

বিদ্যাসাগর। হাতে ঝাঁটা থাকতে ভয় কি তোমাদের ?

[বিদ্যাসাগর চেয়ারে উপবেশন করিলেন, আলোটা একটু উসকাইয়া কমাইয়া ঠিক করিয়া লইলেন, তাহার পর 'উত্তররামচরিত' উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে এক জায়গায় আটকাইয়া গেলেন এবং তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দীনময়ী খাটের উপর বসিয়াই রহিলেন। খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।]

দীনময়ী। আজকাল মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে, নয় ?

বিদ্যাসাগর। [বই হইতে মুখ তুলিয়া] কি বলছ ?

দীনময়ী। না, কিছুই নয়। বলছিলাম, আজকাল মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে।

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, শিখছে বই কি। গ্রামে গ্রামে এইবার মেয়ে ইস্কুল করব, দেখ না।

দীনময়ী। আহা, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন যদি কোন বিদ্যাসাগর আমাদের জন্যে ইস্কুল ক'রে দিত, হয়তো আমিও একটু লেখাপড়া শিখতে পারতাম।

বিদ্যাসাগর। এখনই শেখ না।

দীনময়ী। এখন আর হয় না।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে তখনও হ'ত না। ['উত্তররামচরিত' মুড়িয়া কাগজ টানিয়া লইয়া খানিকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর লিখিতে সুরু করিলেন। খানিকক্ষণ লেখার পর—]

দীনময়ী। কি বই লিখছ বললে?

বিদ্যাসাগর। সীতার বনবাস।

দীনময়ী। সীতার দুঃখ বোঝ তুমি?

[বিদ্যাসাগর লেখা হইতে মুখ তুলিলেন।]

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] তার মানে?

দীনময়ী। [হাসিয়া] কিছু না। লেখ।

[বিদ্যাসাগরের মুখে একটি স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া তিনি লিখিতে লাগিলেন।]

দীনময়ী। চঞ্চলাকে আমার হিংসে হয়।

বিদ্যাসাগর। [লিখিতে লিখিতে] চঞ্চলা আবার কে?

দীনময়ী। তিনু ভটচাজের বউ।

বিদ্যাসাগর। সুন্দরী নাকি?

দীনময়ী। সুন্দরী না হ'লেও তার ভাগ্য ভাল, তার স্বামী বিখ্যাত বিদ্যাসাগর নয়।

বিদ্যাসাগর। [মুখ না তুলিয়া] কেন, বিদ্যাসাগরের অপরাধ?

[দীনময়ী মুচকি হাসিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা হয়েছে, তোমার সব বাণগুলিই লক্ষ্য ভেদ করেছে। কিন্তু দোহাই তোমার, এটুকু লিখে নিতে দাও।

[লিখিতে লাগিলেন।]

দীনময়ী। [আবদারের সুরে] শোবে চল, অনেক রাত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। আর একটু বাকি।

[লিখিতে সুরু করিলেন, দীনময়ীর হাই উঠিল।]

দীনময়ী। চল, ওঠ এবার।

বিদ্যাসাগর। এই যে হয়ে গেল। [লেখা শেষ করিয়া কলম রাখিলেন।]

দীনময়ী। কই, এখনও উঠছ না যে?

বিদ্যাসাগর। একটু প'ড়ে দেখি, দাঁড়াও। [পড়িতে লাগিলেন।]

নাঃ, এ সুবিধে হয় নি। কানের কাছে এত বকর বকর করলে কি লেখা যায়?

[কাগজটা সরাইয়া রাখিলেন। তাহার পর ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্মিতমুখে দীনময়ীর মুখের পানে চাহিলেন।]

দীনময়ী নামটা তোমার লেখাপ্পা হয়েছে।

দীনময়ী। কেন?

বিদ্যাসাগর। তোমার যত প্রতাপ তো রাত্রেই।

দীনময়ী। আমার তো সবই খারাপ। বাসরঘরে যে টুকটুকে মেয়েটিকে পছন্দ করেছিলে, তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল।

বিদ্যাসাগর। কেন, তুমিও তো বেশ।

দীনময়ী। ছাই।

বিদ্যাসাগর। ছাই যদি হও, দামী ছাই—মুক্তোভস্ম।

দীনময়ী। আহা; ওঠ এবার অনেক রাত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। জানালাটা খোল, বড় গরম।

[দীনময়ী উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িল। বিদ্যাসাগর আলো নিবাইয়া শুইতে যাইবেন, এমন সময় বাতায়নপথে দূর হইতে ক্রন্দনরোল ভাসিয়া আসিল।]

ও কি, নিবারণ মারা গেল নাকি?

দীনময়ী। তাইতো মনে হচ্ছে। আহা কচি বউটা বিধবা হ'ল।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে আমি যাই, বুঝলে?

[দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। জ্যোৎস্নালোকিত বাতায়নের সম্মুখে দীনময়ী প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় বাহিরে বসিবার ঘর। ঘরে দুইটি দরজা, একটি ভিতরের দিকে, অপরটি বাহিরের দিকে। ঘরে আসবাবপত্র যাহা আছে তাহাতে ঐশ্বর্যের চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা সেগুলিকে মর্যাদা দান করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর খাতা রাখিয়া লিখিতেছেন, সম্মুখে একটি পুস্তক খোলা রহিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে মতিলালকে দেখা গেল, ইনি বীরসিংহ নিবাসী পূর্বদৃশ্যে উল্লিখিত স্বর্গীয় নিবারণের প্রতিবেশী।]

বিদ্যাসাগর। এস মতি। তারপর, হঠাৎ কি মনে ক'রে?

মতিলাল। নিজের একটু দরকারে কলকাতায় এসেছি. তুমি কি নিবারণের মাকে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে দেবে ব'লে এসেছ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

মতিলাল। তা হ'লে দাও, নিয়ে যাই।

বিদ্যাসাগর। ওদের খবর কি?

মতিলাল। তুমি যদি সাহায্য না কর, সংসার চলবে না, নিবারণই তো যা কিছু রোজগার করত। [উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় ওই কচি বিধবাটার জন্যে। মাত্র ন-দশ বছর বয়স।

মতিলাল। তার নিজের কিন্তু খুব বেশি কষ্ট হয় নি।

বিদ্যাসাগর। মানে?

মতিলাল। সবাই জোর ক'রে তার সিঁদুর মুছে দিয়ে থান পরিয়ে দিয়েছে ব'লেই তাকে বিধবা ব'লে মনে হয়, আর কোন লক্ষণ নেই? একাদশীর দিন খালি একটু কাঁদে।

বিদ্যাসাগর। কাঁদে না কি?

মতিলাল। হাঁ। খাবার জন্যে।

বিদ্যাসাগর। ও, বটে!

মতিলাল। [অন্তরূপ অর্থ বুঝিয়া] তবে আর বলছি কি? নির্জলা একাদশী তো তাকে দিয়ে করানোই গেল না এ পর্যন্ত। ঠিক লুকিয়ে কিছু খাবেই, আর কিছু না থাক আঁজলা আঁজলা করে জল খাবে পুকুরে গিয়ে। আজকালকার মেয়েদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকম, হোয়েছে।

[বিদ্যাসাগরের সমস্ত মুখমণ্ডল বেদনাতুর হইয়া উঠিল, তিনি কোন কথা বলিলেন না। মতিলাল বলিয়া চলিলেন।]

গেল একাদশীতে খুড়ীমা তাকে ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর। [সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে] তোমরা মানুষ, না পিশাচ?

মতিলাল। [সবিস্ময়ে] তার মানে?

বিদ্যাসাগর। ওইটুকু মেয়েকে জোর ক'রে একাদশী করাবার দরকার কি?

মতিলাল। [আরও বিস্মিত] দরকার কি! সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এ কথা বলছ তুমি?

বিদ্যাসাগর। সংস্কৃতের সম্বন্ধে তোমার ধারণা তো খুব নিখুঁত দেখছি।

[টেবিলের ড্রয়ার টানিলেন।]

মতিলাল। বাঃ, আমাদের শাস্ত্রে—

বিদ্যাসাগর। তোমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করবার সময় সেই এখন আমার. এই নাও। [তাঁহাকে পাচ টাকা দিলেন।] আর নিবারণের মাকে ব'লো, যেন একাদশীর দিন তাকে খেতে দেয়, ওই কচি মেয়েটাকে খেতে দিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হবে না।

মতিলাল। [উঠিয়া] আচ্ছা, তাই ব'লে দেব, তোমার মতামত যে এ রকম তা আমার জানা ছিল না। আমরা মুখ্যু মানুষ, দেশাচার মেনেই চলি। আচ্ছা, চললুম—তাই ব'লে দেব। [চলিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। দেশাচার!

[পুনরায় লিখিতে সুরু করিলেন। একটু পরে দ্বারপ্রান্তে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতিকে দেখা গেল। ইনি স্থবির এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বতন শিক্ষক। লাঠির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিলেন।]

বাচস্পতি। তোর কাছে একবার এলুম বাবা।

বিদ্যাসাগর। আসুন, বসুন।

[চেয়ার আগাইয়া দিলেন, বাচস্পতি উপবেশন করিলেন, বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

বাচস্পতি। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ব'স।

[বিদ্যাসাগর চেয়ারে গিয়া বসিলেন, বাচস্পতি টেবিল হইতে খাতাখানা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে সরাইয়া ভ্রূকুঞ্চন সহকারে পড়িবার চেষ্টা করিলেন।]

বাচস্পতি। কোন গ্রন্থ রচনা করচ নাকি?

বিদ্যাসাগর। আজ্ঞে না, ইংরেজী লেখা অভ্যাস করছি।

[যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন, এমনই ভাবে বাচস্পতি খাতাখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।]

বাচস্পতি। সংস্কৃত ভাষায় এত বড় পণ্ডিত তুমি, তোমার ও ম্লেচ্ছভাষা শেখবার প্রয়োজনটা কি? [সাড়ম্বরে] বিদ্যার সাগর তুমি—

[বাচস্পতির নিকট অন্য কোন যুক্তির অবতারণা বৃথা মনে করিয়া বিদ্যাসাগর একেবারে সার যুক্তিটি বিবৃত করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। শিখছি চাকরির জন্যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ান সাহেবদের পড়াতে হয়, ইংরাজী না জানলে চলে না।

[বাচস্পতি যেন আশ্বস্ত হইলেন।]

বাচস্পতি। ও, চাকরির জন্যে, তবু ভাল। [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] হ্যাঁ, চাকরির জন্যে আজকাল লোকে না করছে কি? টুপি পরছে, পাৎলুন পরছে, বার্ডসাই খাচ্ছে, এমন কি খিরিস্টান পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। বেশ, শেখ।

[কিছুক্ষণ চুপচাপ।]

বিদ্যাসাগর। আপনি কি কিছু বলবেন আমাকে?

বাচস্পতি। বলব—মানে—

[বাচস্পতি একটু যেন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর একটু সামলাইয়া লইলেন।]

দেখ, ঈশ্বর, তোর রাগটিকে আমি বড় ভয় করি বাপু। অথচ সব কথা তোকে না ব'লেও থাকতে পারি না। তুই শুধু আমার ছাত্র ন'স—পুত্রস্থানীয়। রাগ করবি না বল্।

বিদ্যাসাগর। কি বলুন।'

বাচস্পতি। মানে, এ পাড়ায় আমার একজন আত্মীয়ের বাড়িতেই এসেছিলাম আমি। ভাবলাম, তোর সঙ্গেও একবার দেখাটা ক'রে যাই। তুইও তো দেখিস নি, তোকে জানাতে পর্যন্ত সাহস হয় নি আমার।

বিদ্যাসাগর। কি জানাতে সাহস হয় নি ?

[বাচস্পতি যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন।]

বাচস্পতি। আমি আবার দারপরিগ্রহ করেছি। তোর কথা রক্ষে করতে পারলাম না বাবা। তুই তো গোঁয়ারের মত মানা ক'রে দিয়ে চ'লে এলি, আমার দুঃখ-কষ্ট তো বুঝলি না। এই বুড়ো বয়সে পরিবার না থাকলে কে আমার দেখা শোনা করে বল ?

[উভয়েই কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি তো বলেছিলাম, আপনি আমার কাছে এসে থাকুন, আমি আপনার দেখাশোনা করব।

বাচস্পতি। সেটা কি একটা কাজের কথা বাবা ? গৃহধর্ম করতে হ'লে গৃহিণী চাই, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, গার্হস্থ্য আশ্রম নিয়ে যখন আছি—

[বিদ্যাসাগর গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বাচস্পতি থামিয়া গেলেন এবং একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর। বেশ, যা ভাল বুঝেছেন, করেছেন। এখন আমাকে বলবার কি দরকার ?

বাচস্পতি। দরকার তেমন কিছু—[একটু ইতস্তত করিয়া] তোর মাকে প্রণাম করবি না ?

বিদ্যাসাগর। না, আমি আপনার ভিটে মাড়াব না।

[বাচস্পতি অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু অপ্রতিভ ভাবটাকে চাপা দিবার জন্য ক্রোধের ভান করিলেন।]

বাচস্পতি। জানি জানি, সে আগে থাকতেই জানি আমি। ওই ম্লেচ্ছ ব্যাটাদের সংস্পর্শে এসে তোমার মেজাজ যে দিন দিন ক্রমশঃ সাহেবী হয়ে উঠেছে, তা আগে থাকতেই অনুমান করেছিলাম আমি। যদিও গুরুপত্নীকে প্রণাম করতে শিষ্যেরই গুরুর বাড়িতে যাওয়া উচিত, কিন্তু তোমার গোঁ তো জানা আছে আমার, তাই সঙ্গে ক'রেই এনেছি—

[বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া উঠিলেন।]

বাচস্পতি। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] বাইরে পালকিতে আছে ডেকে নিয়ে আসিব, না দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিবি বাড়ীর দরজা থেকে ?

[বিদ্যাসাগর নির্বাক হইয়া রহিলেন। বাচস্পতি তাঁহার প্রতি একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণপরেই একটি অর্দ্ধাবগুন্ঠিতা বালিকাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন।]

এই দেখ, এর নামই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—আমার ছাত্র, কীর্তিমান ছাত্র।

[মেয়েটির বয়স দশ এগারো বৎসরের বেশি নয়। ফুটফুটে সুন্দরী। বিদ্যাসাগর বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ঘাটের মড়া আপনি, একে বিয়ে করেছেন ! ওর মুখ দেখে দয়া হ'ল না আপনার, এতটুকু দয়া হ'ল না ?

বাচস্পতি। দয়া করেছি বই-কি। ওর বাপ একটি পয়সা কৌলিন্যমর্যাদা দেয় নি আমাকে। হরিতকী মাত্র নিয়ে—

[বিদ্যাসাগরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।]

বিদ্যাসাগর। [প্রায় চীৎকার করিয়া] আপনার চিতার আগুনের হলকায় এমন সুন্দর ফুলটিকে ঝলসে ফেলবার কি অধিকার আছে আপনার, বলতে পারেন ? [মেয়েটি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।]

বাচস্পতি। অত কথায় কাজ কি. তোর ওই চটি জুতো খুলে ঘা কতক বসিয়ে দে আমার পিঠে। চল গো, আমরা যাই। তুই এমন ব্যাভার কর্‌লি শেষটা ! [গমনোদ্যত]

বিদ্যাসাগর। দাঁড়ান।

[বাচস্পতি-দম্পতি দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিদ্যাসাগর টেবিলের ড্রয়ার হইতে গোটা দুই টাকা বাহির করিয়া আগাইয়া গেলেন এবং টাকা দুইটি বধূর পায়ের নিকট রাখিয়া প্রণাম করিলেন।]

বাচস্পতি। নাও, টাকা দুটো তুলে নাও, চল।

[বধূ হেঁট হইয়া টাকা দুইটি তুলিয়া লইল।]

বিদ্যাসাগর। [অবরুদ্ধ কণ্ঠে] উঃ, আপনি যদি আমার গুরু না হতেন, তা হ'লে আজ—

বাচস্পতি। তা হ'লে কি করতিস ?

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে—(সহসা) দেখুন—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনং।

আপনি—আপনার মুখদর্শন করব না আর।

বাচস্পতি। (সক্রোধে) কি, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর? অর্বাচীন, বেল্লিক—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

[গালি দিতে দিতে পত্নীসহ বাচস্পতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর চেয়ারে গিয়া বসিলেন।]

বিদ্যাসাগর। (সক্ষোভে) হতভাগা দেশ!

[দ্বারপ্রান্তে একটি দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অল্প অল্প গোঁফ-দাড়ি উঠিয়াছে, মুখে চোখে সংযত শান্ত শ্রী।]

ভূদেব যে, এস এস, তারপর কি মনে ক'রে?

[ভূদেব প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিলেন।]

ভূদেব। (স্মিত মুখে) দেশের ওপর যে ভারী চটেছেন দেখছি।

বিদ্যাসাগর। যে দেশে কুমারীরা কচি বুড়ো যে-কোন বয়সের যে-কোন লক্ষীছাড়ার গলায় মালা দিয়ে কুল মান চোদ্দপুরুষ রক্ষে করে, সে দেশ নিয়ে গদগদ হয়ে ওঠবার কোন কারণ দেখতে পাই না।

ভূদেব। সব দেশেই অমন দু-চারটে কু-প্রথা আছে। বিলেতে—

বিদ্যাসাগর। দেখ, ওটা কোন সান্ত্বনা নয়। [ভূদেব অপ্রতিভ হইলেন।]

ভূদেব। না, আমি তা বলছি না।

বিদ্যাসাগর। হঠাৎ কি মনে ক'রে এখন?

ভূদেব। আমি এসেছি মধুর জন্যে।

বিদ্যাসাগর। মধু কে?

ভূদেব। মধু ব'লে আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ে, আপনি চেনেন তো তাকে, খুব ভাল কবিতা লিখতে পারে।

বিদ্যাসাগর। মনে পড়েছে। যে ছোকরা কলেজে এসে তিনবার হ্যাট বদলায়, সেই কি?

ভূদেব। (হাসিয়া) হাঁ, সেই।

বিদ্যাসাগর। কি হয়েছে তার?

ভূদেব। সে ক্রিশ্চান হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর। তা তো হবেই। এ হতভাগা সমাজে ভাল লোক টিকতে পারে কখনও?

ভূদেব। কেন আমাদের সমাজে ভাল কিছু নেই?

বিদ্যাসাগর। ভাল থাকলে সমাজ ছেড়ে লোকে পালাবে কেন? কোন্ জিনিসটা ভাল আছে, শুনি?

ভূদেব। [একটু ইতস্তত করিয়া] আর কিছু না থাক, আমাদের ইতিহাসে বিরাট অতীত আছে, আমাদের কাব্যে মহৎ আদর্শ আছে, আমাদের শাস্ত্রে বহুদর্শিতার নিদর্শন আছে।

বিদ্যাসাগর। আছে আছে বলছ কেন, ছিল ছিল বল। এখন দলাদলি আছে, খেউড় আছে, হাফ-আখড়াই আছে, বেশ্যার নাচ আছে, রসরাজ আছে।

ভূদেব। আপনি খারাপ দিকটাই দেখছেন খালি। রসরাজের নাম করলেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীও তো আছে, বেঙ্গল স্পেক্‌টেটার আছে।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু ওদের গালাগালি দিতে দিতে যে এদেশের লোকের মুখে ফেকো উড়ে গেল! যে রামমোহন রায়কে পুজো করা উচিত, তাকে তোমরা দেশছাড়া করেছিলে, বিলেতে গিয়ে মৃত্যু হ'ল তাঁর।

ভূদেব। [বিনীত প্রতিবাদের হাসি হাসিয়া] না না, তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন বাদশার পেন্‌শনের ব্যাপার নিয়ে—

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, ইতিহাসে ওই কথাই লেখা থাকবে। আসলে কিন্তু তিনি পালিয়েছিলেন তোমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে।

[ভূদেব চুপ করিয়া রহিলেন।]

দেখ, এ দেশকে যদি বাঁচাতে চাও, তা হ'লে এর গুণকীর্তন না ক'রে ময়লা পরিষ্কার কর আগে। এ দেশের সৌভাগ্য যে ইংরেজ এদেশে এসেছে।

ভূদেব। সবই জানি, তবু কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। আমরা সবাই অসভ্য বর্বর, ইংরেজদের দয়াতে সভ্য হচ্ছি—এ কথা স্বীকার করতে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার। আমি হয়তো এখন যুক্তি দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে, কিন্তু—

[গলার স্বর ভারি হইয়া আসিল, অভিভূত হইয়া তিনি থামিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] ও বাবা, তুমি যে আমার চেয়েও বেশি ছিঁচকাঁদুনে দেখছি। ব'স ব'স, ওসব জ্যাঠামি থাক।

[ভূদেব দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিদ্যাসাগর একরূপ জোর করিয়া তাঁহাকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া তক্তাপোশের তলা হইতে কি যেন বাহির করিতে লাগিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখা গেল একটা চকচকে কাঁসার রেকাবিতে গোটা কয়েক সন্দেশ বাহির করিয়াছেন।]

নাও, একটু মিষ্টিমুখ কর।

ভূদেব। না থাক, আমি খাব না।

বিদ্যাসাগর। মেজাজ চটেছ দেখছি! বেশ বেশ, আমাদের সমাজ খুব ভাল, প্রত্যেকটি লোক দেব-চরিত্র—নাও, খাও।

ভূদেব। (হাসিয়া) না, সেজন্যে নয়, আমি এখনও সন্ধ্যাহ্নিক করি নি।

বিদ্যাসাগর। বল কি, তুমি আবার সন্ধ্যাহ্নিক কর নাকি? ডিরোজিও কোম্পানির ছোঁয়াচ তোমাকে লাগেনি তাহ'লে বল। অ্যাঁ, অবাক করলে যে!

[ভূদেব হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। বিদ্যাসাগর সন্দেশ যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।]

মধু ক্রিশ্চান হচ্ছে, তা আমি কি করব বল?

ভূদেব। আমি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কাছে গেছলাম, শুনলাম তিনি আপনার কাছেই আসবেন।

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, তার আসবার কথা আছে এখনই। 'সর্বার্থ সংগ্রহে'র জন্যে আসবে।

ভূদেব। আপনি যদি একটু বলেন তাঁকে, তা হ'লে হয়তো—

বিদ্যাসাগর। তুমি নিজে ব'লো বাপু। ও এক অদ্ভুত মানুষ, কথায় কথায় ভক্তি আওড়ায়, অথচ পাদরিগিরি ক'রে বেড়ায়, বুঝি না ওকে।

ভূদেব। আচ্ছা, তা হ'লে ঘুরে আসি আমি।

বিদ্যাসাগর। এস।

[ভূদেব চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণ ও রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন, দুর্গাচরণের হাতে একটি পুঁটুলি।]

বিদ্যাসাগর। তোমরা আমাকে আজ আর লিখতে দেবে না দেখছি। দুর্গাচরণ, তোমার হাতে ওটা কি?

[রাজকৃষ্ণ একটি চেয়ারে বসিলেন।]

দুর্গাচরণ। এ বেলা তোমারই রাঁধবার পালা তো ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ। কিছু বেগুন আর কুচো চিংড়ি নিয়ে এলুম, বেশ ঝাল ঝাল ক'রে রাঁধ দেখি, খাওয়া যাক। বেড়ে শুতরায় তরকারিটা তোমার হাতে।

বিদ্যাসাগর। আজ রাত হবে কিন্তু। রেডারেও কেষ্ট বাঁড়ুজ্জে আসছে কতক্ষণ থাকবে জানি না।

দুর্গাচরণ। ও বাবা! আমি এগুলো শ্রীরামের জিম্মায় দিয়ে স'রে পড়ি তা হ'লে এখন। পরে আসব।

[মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। রাজকৃষ্ণ পকেট হইতে একটি চকচকে পানের ডিবা বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে এক খিলি পান বাহির করিলেন। পানের খিলিটি দিয়া পুষ্ট গোঁফ জোড়াটি বাগাইলেন, তাহার পর সেটি মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহাকে বেশ একটু অন্যমনস্ক মনে হইল।]

বিদ্যাসাগর। একাই খেলে যে!

রাজকৃষ্ণ। ও, হ্যাঁ। [বিদ্যাসাগরকে পান দিলেন।]

বিদ্যাসাগর। তোমাকে অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে আজ।

রাজকৃষ্ণ। ঠিক ধরেছ। [আর এক খিলি পান খাইলেন।]

বিদ্যাসাগর। কি, ব্যাপার কি ?

রাজকৃষ্ণ। ব্যাপার গুরুতর।

বিদ্যাসাগর। কি ?

রাজকৃষ্ণ। কথাটা হচ্ছে—[ভৃত্য শ্রীরাম প্রবেশ করিল।]

শ্রীরাম। দুর্গাবাবু মাছ দিয়ে গেলেন, আঁচ দেব ?

বিদ্যাসাগর। একটু পরে, কাল ছুটি আছে তো।

শ্রীরাম। ছেলেগুলো সব ঘুমিয়ে পড়ল যে, কত রাত করবে আর ?

[হাই তুলিল।]

বিদ্যাসাগর। তুইও একটু ঘুমিয়ে নে না।

শ্রীরাম। আমার এক ঘুম হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর। তবে চুপ ক'রে ব'সে থাকগে যা যাচ্ছি।

শ্রীরাম। বলবার কি জো আছে, বা মশা!

বিদ্যাসাগর। এইখানে এসে ব'স, আমি বাতাস করি।

[শ্রীরাম নির্বিকার।]

শ্রীরাম। বেশি রাত ক'র না, এস, মাছটা পচে যাবে। [চলিয়া গেল।]

বিদ্যাসাগর। এইবার বল।

রাজকৃষ্ণ। ভারী মুশকিলে পড়েছি ভাই, এক বিধবা এসে জুটেছে আমাদের গাঁ থেকে।

বিদ্যাসাগর। কি রকম?

রাজকৃষ্ণ। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হয়, এসেছে কালীঘাটে তীর্থ করতে।

বিদ্যাসাগর। তাতে আর মুশকিলটা কি?

রাজকৃষ্ণ। না, ভেতরে কথা আছে।

[ডিবা বাহির করিয়া আর এক খিলি মুখে নিক্ষেপ করিলেন।]

নেবে?

বিদ্যাসাগর। না।

শ্রীরাম। মেয়েটি বাল-বিধবা। যখন ও দশ বছরের, সেই সময় বিধবা হয়। এখন বয়স হবে উনিশ কুড়ি এবং—

বিদ্যাসাগর। এবং?

রাজকৃষ্ণ। এখন সে অন্তঃসত্ত্বা।

বিদ্যাসাগর। ও—

রাজকৃষ্ণ। কি করা যায় বল দিকি?

[বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না, নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।]

রাজকৃষ্ণ। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, বুঝলে, কালীঘাটে আসার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—

[বিদ্যাসাগর এমন গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রাজকৃষ্ণ থামিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। [সহসা] শ্রীরাম, শ্রীরাম [শ্রীরাম প্রবেশ করিল।]

শ্রীরাম। কি বলছ?

বিদ্যাসাগর। তুই তো পরশু বীরসিংহ থেকে ফিরেছিস, হরো কেমন আছে?

শ্রীরাম। কোন্ সুরো ?

বিদ্যাসাগর। আমাদের পাড়ার সুরো।

শ্রীরাম। সে তো ভালই আছে।

বিদ্যাসাগর। দেখে এসেছিস ?

শ্রীরাম। হ্যাঁ, শচী-বামনী থেকে জল নিয়ে আসছে দেখলাম।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, যা।

[শ্রীরাম চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।]

রাজকৃষ্ণ। সুরো কে ?

বিদ্যাসাগর। সুরো আমার বাল্যসঙ্গিনী। (একটু পরে) সেও বালবিধবা।

রাজকৃষ্ণ। সেবার নরেশদের গাঁয়ে একটি বিধবা মরেই গেল ভ্রূণহত্যা করতে গিয়া।

[বগলে ফাইল পাদরি-বেশী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে দ্বার প্রান্তে দেখা গেল।]

কৃষ্ণমোহন। May I come in ?

বিদ্যাসাগর। এস, এস।

কৃষ্ণমোহন। Good evening—তারপর খবর সব ভাল ? অনেক দিন আসতে পাই নি।

[টুপি ও ফাইল টেবিলে রাখিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার রাজকৃষ্ণের ও একবার বিদ্যাসাগরের মুখের পানে চাহিলেন।]

I hope I haven't stumbled into your privacy Pundit.

বিদ্যাসাগর। বাংলা ক'রেই বল, ইংরিজীটা এখনও রপ্তো হয় নি তেমন আমার।

কৃষ্ণমোহন। I am sorry, I mean, আমি এসে তোমাদের গোপন কোন পরামর্শে বাধা দিলাম না তো ?

[আবার উভয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কিছুমাত্র না। তা ছাড়া এসব জিনিস কত আর গোপন থাকবে বল ? প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই হচ্ছে।

[কৃষ্ণমোহনের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল।]

বিদ্যাসাগর। রাজু, এঁকে বলব সব কথা ? আমার মনে হয়, বলাই ভাল। ইনি কথাটা শুনেছেন, সবটা না শুনলে। হয়তো অন্য রকম ভাববেন।

রাজকৃষ্ণ। (অনিচ্ছাসত্ত্বেও) বল।

বিদ্যাসাগর। এঁর বাসায় এঁর দূরসম্পর্কীয়া এক আত্মীয়া কালীঘাটে তীর্থ করবার জন্যে এসেছেন। মেয়েটি বাল-বিধবা, আন্দাজ উনিশ-কুড়ি, এবং ইনি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা।

[কৃষ্ণমোহন ভ্রূযুগল উত্তোলন করিলেন।]

কৃষ্ণমোহন। অর্থাৎ কালীঘাটে শুধু পারলৌকিক উদ্দেশ্যেই আসেন নি, ইহলৌকিক মতলবও আছে কিছু। Well—

[Shrug করিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেন।]

আগে কাজটা সেরে নিই, তারপর বিধবা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে। 'সর্বার্থ সংগ্রহে'র জন্যে কিছু যোগাড় করেছ নাকি মালমশলা ?

বিদ্যাসাগর। কিছু কিছু করেছি।

কৃষ্ণমোহন। কই, দেখি।

[বিদ্যাসাগর শেল্‌ফে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা পাইলেন না।]

বিদ্যাসাগর। দীনু, অ দীনু। [অগ্রজ দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন।]

দীনবন্ধু। কি বলছেন ?

বিদ্যাসাগর। এখানে যে একখানা খাতা ছিল, কি হ'ল ?

দীনবন্ধু। দুপুরে তর্কালঙ্কার মশাই এসেছিলেন, তিনিই নিয়ে গেছেন।

বিদ্যাসাগর। কে মদন ?

দীনবন্ধু। আজ্ঞে হাঁ।

বিদ্যাসাগর। যা নিয়ে আয় গিয়ে, কি করছিস তুই এখন ?

দীনবন্ধু। পড়ছি।

কৃষ্ণমোহন। থাক, ওকে আর যেতে হবে না পড়ার ক্ষতি ক'রে আমিই যাবার সময় নিয়ে যাব এখন। যাও তুমি। ওটা কি তত্ত্ববোধিনী নাকি ?

[দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণমোহন তত্ত্ববোধিনী উলটাইতে লাগিলেন।]

রাজকৃষ্ণ। একটা কথা বলতে ভুলেছি তোমাকে, শ্রীশ এসেছে, এখুনি আসবে তোমার কাছে।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

রাজকৃষ্ণ। কি জানি, তারও এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভাগ্নীকে নিয়ে কি এক হাঙ্গামা হয়েছে, তাই নিয়ে ও দরখাস্ত করবে। ঠিক মনে নেই সব আমার, আসবে সে।

[ভৃত্যজাতীয় এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল।]

ভৃত্য। আমাদের বাবু এয়েছে এখেনে? [রাজকৃষ্ণকে দেখিয়া] এই যে।

রাজকৃষ্ণ। কি ?

ভৃত্য। যে মাঠানটি তিথথি করতে এয়েছে, তিনি তো কান্নাকাটি ক'রে অনথ করছে বাবু। আমাদের মাঠান তেনাকে কি যেন বলেছে, তিনি তো কানতে কানতে আস্তায় বেইরে যাচ্ছিল, আমি আর গুপি আটকে করেছি, এস একবারটি। [সকলেই স্তম্ভিত।]

বিদ্যাসাগর। যাও, তুমি যাও। [ভৃত্যসহ রাজকৃষ্ণের প্রস্থান।]

কৃষ্ণমোহন। [Shrug করিয়া] There you are.

বিদ্যাসাগর। [বিচলিতভাবে] কি উপায় করা যায় ?

কৃষ্ণমোহন। তোমাদের সমাজে এর তিনটি উপায় আছে—abortion, prostitution or both—চতুর্থ কোন উপায় নেই আচ্ছা, আমি উঠি এবার। মদনকে বাড়ীতেই পাব তো ?

বিদ্যাসাগর। খুব সম্ভব। [ভূদেব আসিয়া প্রবেশ করিল।]

কৃষ্ণমোহন। Hallo' ভূদেব যে— [ভূদেব নমস্কার করিলেন।]

Good evening, What brings you here ?

ভূদেব। আপনার কাছে একটু দরকার আছে।

কৃষ্ণমোহন। কি করতে হবে বল ?

[শ্রীরাম আসিয়া দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিল।]

বিদ্যাসাগর। তোমরা কথা কও, আমি রান্নার ব্যবস্থা ক'রে আসছি এখুনি।

কৃষ্ণমোহন। Well, what can I do for you ?

ভূদেব। মধুকে আপনারা নাকি ক্রিশ্চান করছেন ?

কৃষ্ণমোহন। আমরা! What do you mean ? I have nothing to do with it personally.

ভূদেব। [একটু ইতস্তত করিয়া] শুনেছি, মধু আপনার মেয়েকে নাকি বিয়ে করতে চায়।

কৃষ্ণমোহন। So have I.

ভূদেব। [যেন নিশ্চিন্ত হইলেন] ও, তা হ'লে গুজবটার কোন ভিত্তি নেই।

কৃষ্ণমোহন। ভিত্তি? Well . তোমার বন্ধু তার কাছে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শেক্‌সপীয়ার মিলটন হোমার ভার্জিল আউড়ে চলেছে।

[Shrug করিয়া এবং হাত উলটাইয়া।]

Well, that's where it exactly stands

ভূদেব। কিন্তু এমনভাবে মেশামেশি করতে দেওয়ার মানেই তো—

কৃষ্ণমোহন। [সবিস্ময়ে] How can I help it? বাড়ীতে মেয়ে থাকলেই suitor আসবে। There are other suitors too. [সহসা] হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে তোমার এমন শুচিবাই কেন বল তো?

ভূদেব। [সহাস্যে] হিন্দু কলেজের ছাত্রের হিন্দুই তো হওয়া উচিৎ।

কৃষ্ণমোহন। I see. [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] হিন্দুর ডেফিনিশন কি? শাক্ত, বৈষ্ণব, বামাচারী, ব্রহ্মচারী, নেড়ামাথা, জটাওলা, পৌত্তলিক, বৈদান্তিক সবাই হিন্দু, এমন কি নাস্তিক পর্যন্ত।

ভূদেব। হিন্দুধর্ম উদার এবং প্রশস্ত, তাই সকলেরই স্থান আছে ওতে।

কৃষ্ণমোহন। ও, তাই বুঝি মুসলমানকে ছুঁলে গঙ্গা নাইতে হয় আর গির্জায় গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়!

ভূদেব। [সসম্ভ্রমে] আপনার সঙ্গে তর্ক করবার স্পর্ধা আমার নেই। আপনি কি সত্যিই খ্রীষ্টধর্ম মহত্তর মনে ক'রেই খ্রীষ্টান হয়েছিলেন?

কৃষ্ণমোহন। Oh, no I was forced into it. গোমাংস আর মদ খেয়েছিলাম ব'লে হিন্দুসমাজ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভূদেব। কিন্তু মদ আর গোমাংস খাওয়াটা কি ভাল?

কৃষ্ণমোহন। Why not?

ভূদেব। মদ খেলে শুনেছি লিভার খারাপ হয়।

কৃষ্ণমোহন। লঙ্কা খেলেও হয়। [একটু থামিয়া] আলো চাল খেলেও হয়। আমার এক পিসীমা জীবনে হবিষ্যান্ন ছাড়া অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করেন নি, তিনি সিরোসিস অব লিভারে মারা গেছেন। আর আমাদের

মিশনে যদি আস, এক গোখাদক বুড়ী মেমসায়েবকে দেখিয়ে দেব, তার সঙ্গে আমি পর্যন্ত হেঁটে পাল্লা দিতে পারি না। তার লিভার ঠিক আছে।

ভূদেব। [হাসিয়া] সাহেবদের ধাতে যেটা সয়, আমাদের ধাতে সেটা না-ও সইতে পারে তো ?

কৃষ্ণমোহন। হিন্দু মুনি-ঋষিদের ধাতে কিন্তু সইত। যজ্ঞাগ্নিতে beef roast ক'রে খেতেন তাঁরা। ঋকবেদে সোমরসের যে রকম বর্ণনা আছে, তাতে হুইস্কি-শ্যাম্পেনকে ছেলেমানুষ ব'লে মনে হয় তার কাছে। সমগ্র নবম মণ্ডলটিতে সোমরস ছাড়া আর কোন রস নেই।

ভূদেব। [সাগ্রহে] বেদ আপনি পড়েছেন ? এখানে কোন্ লাইব্রেরিতে আছে বলুন তো ?

কৃষ্ণমোহন। আমি পড়েছি জার্মান অনুবাদ। আমার কাছেই আছে। There you are again,—হিন্দুদের বেদ হিন্দুদের কাছ থেকে পাবার জো নেই, পেতে হচ্ছে খ্রীষ্টান জার্মানদের মারফৎ এবং তাদের জবানিতে।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আলতো আলতো ভাবে ভূদেবের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন।]

Don't hate the Christians, my boy. They are well-meaning people, they have done a lot of good to our country.

ভূদেব। [সসঙ্কোচে] সবই স্বীকার করছি, কিন্তু আমার কেমন যেন—

কৃষ্ণমোহন। [বলিয়া চলিলেন] কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, শের্বর্ণ ড্রমণ্ড—এরা এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার না করলে আমাদের অবস্থা যে কি হ'ত, তা ভাবলেও ভয় হয় (শিহরিয়া উঠিলেন)। Look at Mr. Bethune, look at our Governor, come don't be a prig.

ভূদেব। কিন্তু টাইট্‌লার সাহেব তো শুনেছি প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষা দেবার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলতেন, সংস্কৃত—

কৃষ্ণমোহন। (অধীরভাবে) Oh, don't talk of tytler. সে নিউটন ছাড়া আর কিছু বুঝত না, আর আমাদের রাধানাথ ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার বনত না। He was a queer fish, ছাগলের গাড়ি চ'ড়ে গড়ের মাঠে বেড়িয়ে বেড়াত !

ভূদেব। [নাছোড়] কিন্তু তিনি সায়েব হয়েও তো সংস্কৃত ভালবাসতেন :

কৃষ্ণমোহন। আমিও কি সংস্কৃত কম ভালবাসি? কিন্তু দই ভালবাসি ব'লে পুডিং খেতে পাব না—এ কি রকম আবদার তোমাদের?

ভূদেব। [হাসিয়া] কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, আপনি যদি হিন্দুই থাকতেন, তা হ'লে—

কৃষ্ণমোহন। তা হ'লে কি?

ভূদেব। তা হ'লে আরও যেন বেশি তৃপ্তি হ'ত আমার।

[কৃষ্ণমোহন অকৃত্রিম আনন্দের ভান করিয়া অতিশয় কৃত্রিম একটা হাসি হো হো করিয়া হাসিলেন।]

কৃষ্ণমোহন। তোমাদের সমাজ আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমি কি করব বল?

ভূদেব। মধু যাতে ক্রিশ্চান না হয়, তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে কিন্তু।

কৃষ্ণমোহন। [গম্ভীরভাবে] that is impossible, my boy.

ভূদেব। ইচ্ছে করলে আপনি নিশ্চয়ই পারেন।

কৃষ্ণমোহন। ও রকম ইচ্ছে করাই আমার সাধ্যাতীত। আমি যদিও ইচ্ছে ক'রে ক্রিশ্চান হই নি, কিন্তু ক্রিশ্চান হয়ে ক্রিশ্চ্যানিটির মর্ম বুঝেছি।

ভূদেব। আপনি তা হ'লে মধুর জন্যে কিছু করবেন না?

কৃষ্ণমোহন। Please excuse me. [ভূদেব ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।]

ভূদেব। আচ্ছা, তা'হ'লে যাই আমি, নমস্কার।

কৃষ্ণমোহন। Good night. [বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন।]

ভূদেব। আমি চললাম।

কৃষ্ণমোহন। আমিও? Good night, Pundit.

[উভয়ে চলিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। এস, তারপর কি মনে করে?

শ্রীশ। আমি একটা বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি, ভাই, একটু সাহায্য করতে হবে।

বিদ্যাসাগর। কি করতে হবে বল।

শ্রীশ। আমার এক দূরসম্পর্কের ভাগনী বিধবা হয়েছে, দশ বছর মাত্র তার বয়স। কিন্তু তার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা এমন চণ্ডাল, যে, কিছুতেই তাকে বাপের বাড়ী আসতে দেবে না।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

শ্রীশ। কেন বুঝতে পারছ না, পেট-ভাতায় একটা ঝি পেলে কেউ ছাড়ে কখনও ? [ক্ষণকাল নীরবতা]

বিদ্যাসাগর। তা আমাকে কি করতে হবে ?

শ্রীশ। ওখানকার যিনি ম্যাজিস্ট্রেট তিনি তোমার ছাত্র, আমি একটা দরখাস্ত লিখে এনেছি, তুমি যদি একটু সুপারিশ ক'রে দাও, বড় ভাল হয়।

বিদ্যাসাগর। আত্মীয়ের নামে নালিশ করবে ?

শ্রীশ। তা ছাড়া উপায় কি, অনেক অনুরোধ উপরোধ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মেয়েটার তাতে কি লাভ হবে ?

শ্রীশ। লাভ আর কি, ঘরের মেয়ে ঘরে আসবে, ওদের ওখানে দাসীবৃত্তি করছে বই তো নয়।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু বাপের বাড়ীতেও তো সেই দাসীবৃত্তি। চরিত্রও খারাপ হতে পারে। তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন ?

শ্রীশ। কি, মন্তর নেওয়া—

বিদ্যাসাগর। না [মাথা নাড়িলেন] না [পুনরায় মাথা নাড়িলেন। তারপর সহসা] ধরে'করে' আবার বিয়ে দেওয়া যায় না ?

শ্রীশ। [সবিস্ময়ে] বিয়ে !

বিদ্যাসাগর। হাঁ গো, বিয়ে, নয় কেন ?

শ্রীশ। বল কি !

বিদ্যাসাগর। চমকাচ্ছ কেন, প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত নয় ?

শ্রীশ। [আরও চমকিত] বিধবা-বিবাহ যুক্তিযুক্ত !

বিদ্যাসাগর। ক্ষুধিতকে যদি খেতে না দাও, সে চুরি ক'রে খাবে, অখাদ্য কুখাদ্য খাবে—এ তো সহজ যুক্তি।

শ্রীশ। শাস্ত্রে কিন্তু ক্ষুধা দলন করবার উপদেশ দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর। উপদেশ দেওয়া অতি সোজা, পালন করাটাই শক্ত।

শ্রীশ। হিন্দু বিধবার পবিত্র উচ্চ আদর্শ তুমি মান না ?

বিদ্যাসাগর। মানি, কিন্তু এই পবিত্র উচ্চ আদর্শটি এত বেশি উচ্চ যে সকলে তার নাগাল পায় না। যারা পায় না, তাদের আবার বিয়ে করবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

শ্রীশ। কিন্তু তুমি উচিত বললেই তো লোকে মানবে না। শাস্ত্রে তার সমর্থন থাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রে যা যা আছে সব মান তুমি? শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান আছে, গান্ধর্ব বিবাহের সমর্থন আছে, অহল্যা আছে, দ্রৌপদী আছে, কুন্তী আছে, হিড়িম্বা আছে, শকুন্তলা আছে, রাধাকৃষ্ণ আছে—এদের যে-কোন একটার আদর্শ বরদাস্ত করতে পার তুমি?

শ্রীশ। তুমি আমাদের শাস্ত্রের কতটুকু বোঝ?

বিদ্যাসাগর। কিছুই বুঝি না, যা আছে তাই শুধু বললাম।

শ্রীশ। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, রাধা এসবের যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ—

বিদ্যাসাগর। দেখ, তোমাদের একটা ভারী মজার ব্যাপার দেখি। সংস্কৃতে কিছু লেখা থাকলেই তোমরা তার মধ্যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে পাও, কিন্তু বাংলাতে সেই কথা বললেই আঁতকে ওঠ!

শ্রীশ। না, তা আমি অন্তত স্বীকার করতে রাজি নই। আমাদের শাস্ত্রে এমন কিছু নেই, যার বাংলা শুনে আমি আঁতকে উঠব।

বিদ্যাসাগর। দেখ, শাস্ত্র তোমরা কেউ পড়নি। পদি পিসী, কথক ঠাকুর, আর পাঁজি—এই তিনটি তোমাদের সম্বল।

শ্রীশ। এ কথা বললে আর তোমার সঙ্গে তর্ক করা চলে না। কারণ—

বিদ্যাসাগর। [সহসা] হিন্দু শাস্ত্র মান তুমি?

শ্রীশ। নিশ্চয় মানি।

বিদ্যাসাগর। হিন্দুশাস্ত্রে যদি বিধবা-বিবাহের বিধান থাকে, ভাগনীর বিয়ে দিতে রাজী আছ?

শ্রীশ। হিন্দুশাস্ত্রে ওরকম বিধান থাকতেই পারে না।

[বিদ্যাসাগর উঠিয়া শেলফের নিকটে গেলেন ও বই নাড়াচাড়া করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।]

বিদ্যাসাগর। বইটা এখানে নেই, থাকলে তোমায় দেখিয়ে দিতাম সংস্কৃত ভাষাতেই বিধবা-বিবাহের বিধান দেওয়া আছে।

শ্রীশ। নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করি না।

বিদ্যাসাগর। আর একদিন এস, নিজের চোখেই দেখতে পাবে, বইখানা এনে রাখব।

শ্রীশ। দরখাস্তটায় কিছু লিখে দাও এখন।

বিদ্যাসাগর। এখন লিখে দিলে কাল আর তুমি আসবে কি! কাল এস, বইটা এনে রাখব।

[চিঠি লইয়া একজন পিওন প্রবেশ করিল এবং চিঠিখানা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়া চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর পত্রখানি পড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কালনা যেতে হবে দেখছি।

শ্রীশ। কালনা! কেন?

বিদ্যাসাগর। একটা জরুরী দরকার আছে।

শ্রীশ। কবে যাচ্ছ?

বিদ্যাসাগর। আজই, তুমি একটু ব'স, আমি রান্নাটা দেখে আসছি—

[চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

দুর্গাচরণ। শ্রীশ যে, কবে এলে?

শ্রীশ। আজই।

দুর্গাচরণ। ঈশ্বর কোথা?

শ্রীশ। ভেতরে গেছে, কি একটা চিঠি পেয়ে ও তো কালনা চলল।

[বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। দুর্গা এসেছিস, ভালই হয়েছে, তুই রাত্রে এখানেই থাক, আমি কালনা যাব।

দুর্গাচরণ। হঠাৎ কালনা?

বিদ্যাসাগর। তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে একটু দরকার আছে।

দুর্গাচরণ। কি দরকার?

বিদ্যাসাগর। সব কথা নাই বা জানলি। বেগুনের তরকারিটা চড়িয়ে দিয়েছি, দেখগে যা, পুড়ে না যায়। [দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন।] শ্রীশ, আমি কালনা থেকে ফিরে আসি, তারপর তুমি এস, বুঝলে?

শ্রীশ। আচ্ছা, এখন চলি তবে, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তর্কটা কিন্তু মুলতুবী রইল।

বিদ্যাসাগর। বেশ।

[চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগরও ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় রেস্তরেঁও কৃষ্ণমোহন আসিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন।]

কৃষ্ণমোহন। Sorry to disturb you again.

বিদ্যাসাগর। মদনের কাছ থেকে খাতাখানা পেয়েছ তো, নিয়ে গেল কেন?

কৃষ্ণমোহন। ভুলে। ওর নিজের খাতা বুঝি একটা ছিল এখানে সেইটে নিতে এসে এইটে নিয়ে গেছে—

বিদ্যাসাগর। এত অন্যমনস্ক! কাব্য-রোগেই খেলে ওকে—তার ওপর নোনা ধরেছে! [কৃষ্ণমোহন হাসিলেন।]

কৃষ্ণমোহন। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, এই যে খবরগুলো দিয়েছ [খাতা খুলিয়া দেখাইলেন], এগুলো সব নির্ভরযোগ্য তো?

বিদ্যাসাগর। আমি যে যে বই থেকে টুকে দিয়েছি, সেগুলো নির্ভরযোগ্য ব'লেই তো বিশ্বাস করি। তুমি আর একবার মিলিয়ে নিও অন্য পাঁচটা বইয়ের সঙ্গে।

কৃষ্ণমোহন। বেশ, তাই করা যাবে, many thanks.

[অবগুণ্ঠনবতী বিধবা সমভিব্যাহারে রাজকৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

রাজকৃষ্ণ। আমার স্ত্রী এঁকে কি বলেছেন জানি না ভাই, ইনি তো কিছুতেই আমাদের বাড়ীতে থাকতে চাইছেন না। নিরুপায় হয়ে শেষে এইখানে নিয়ে এলাম। [সকলেই স্তম্ভিত।]

বিদ্যাসাগর। এখানে! এখানে উনি কি থাকতে পারবেন? যদি পারেন, আমার অবশ্য কোন আপত্তি নেই। আমি কিন্তু থাকব না, আমাকে কালনা যেতে হবে আজকে। দুর্গা থাকবে বাসায়।

রাজকৃষ্ণ। কিন্তু পুরুষমানুষের বাসায় থাকাটা কি ঠিক হবে? মানে—

[ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেলেন। বিধবা আধোবদনে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।]*

কৃষ্ণমোহন। [সহসা] If you permit me, I may solve the problem. [বিধবাটিকে] আপনার বিপদের কথা শুনেছি আমি, আপনার কোন ভয় নেই, আপনি যদি রাজী থাকেন, আপনাকে ভদ্রভাবেই উদ্ধার করতে পারি আমি।

রাজকৃষ্ণ। আপনি! আপনি কি করবেন?

কৃষ্ণমোহন। আপনারা না করতে পারবেন না। আপনারা ওকে অপমান করতে পারেন, কিন্তু বাঁচাতে পারবেন না। আমি তা পারব।

রাজকৃষ্ণ। ক্রিশ্চান করবেন নাকি ?

কৃষ্ণমোহন। সে যাই করি, ওঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে যা যা দরকার সব করব। যাবেন আপনি আমার সঙ্গে।

বিদ্যাসাগর। কোথা নিয়ে যাবে ?

কৃষ্ণমোহন। To my fold. ওঁর যদি সে জায়গা ভাল না লাগে, কাল আবার রেখে যাব এখানে।

রাজকৃষ্ণ। ক্রিশ্চান করবেন কি না সেইটে জানতে চাই।

কৃষ্ণমোহন। উনি যদি রাজী থাকেন নিশ্চই করব, ভদ্রভাবে বিয়ে পর্যন্ত দেব ওঁর। যদি না রাজী থাকেন, তা হ'লে অবশ্য—[Shrug করিলেন।]

রাজকৃষ্ণ। না, তা আমি হতে দিতে পারি না।

কৃষ্ণমোহন। আপনার হতে দেওয়া না দেওয়ার ওপর তো কিছুই নির্ভর করছে না। ইনি যদি রাজী থাকেন, নিয়ে যাব, এবং প্রাণপণে চেষ্টা করব ওঁর ভাল করতে। রাজী আছেন আমার সঙ্গে যেতে ?

[বিধবা মাথা নীচু করিয়া রহিল।]

আসুন তা হ'লে। আচ্ছা চলি, good night.

[বিধবাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[কালনায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়ির বহির্ভাগ। দেখিলেই মনে হয়, গরিবের বাড়ি—খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল। বাচস্পতি মহাশয় বারান্দায় বসিয়া একটি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। একজন গ্রামবাসী আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে কয়েকটি বেগুন। বাচস্পতি মহাশয় পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিতেই গ্রামবাসী তাঁহাকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমস্কার করিল।]

বাচস্পতি। জয়োস্তু। হরিহর কি মনে ক'রে ?

হরিহর। আজ্ঞে, হাট থেকে কিছু বেগুন কিনলাম। ভাবলাম, আপনাকে একবার শুধিয়ে যাই, আজ বেগুন খেতে আছে কি না।

বাচস্পতি। দোষ কি, খাও না।

হরিহর। আজ্ঞে না, তবু পাঁজিটা একবার দেখুন আপনি। আজ আবার আমার নটবরের জন্মবার কি না।

বাচস্পতি। পাঁজি আমার দেখাই আছে, পাঁজিতেও বারণ নেই। কাল বার্তাকু ভক্ষণ নিষেধ, আজ খেতে পার।

হরিহর। [হৃষ্ট] এ দুটো আপনার জন্যে রইল ঠাকুর মশাই।

[হাসিয়া দুইটি বেগুন বাছিয়া দাওয়ার একধারে রাখিয়া নমস্কারান্তে চলিয়া গেলে বাচস্পতি পুনরায় পাঠে মন দিলেন। একটু পরেই দ্বিতীয় গ্রামবাসী মদনলাল মল্লিক প্রবেশ করিলেন। মদনলাল একটু মাতব্বরগোছের লোক, কাঁচাপাকা গোঁফ।]

মদনলাল। বাচস্পতি বাহিরে আছ দেখছি ভালই হল।

[উঠিয়া বসিলেন।]

বাচস্পতি। এস, কি মনে ক'রে ?

মদনলাল। এই যে পাঁজিও রয়েছে দেখছি। বাঃ! বিয়ের একটা দিন দেখে দাও তো ভাই, এই মাসেই ঝুলিয়ে দিই ব্যাটাকে।

বাচস্পতি। ছেলের বিয়ে কি কামারখালিতেই ঠিক হ'ল ?

মদনলাল। না, বৈঁচিতে। যদিও মেয়েটি তেমন গৌরবর্ণা নয়, কিন্তু দেবে থোবে। কামারখালির লোকটা একের নম্বর কঞ্জুস হে, রূপোর থালা বাটি দিতে হবে শুনে চোখ কপালে তুলে ফেললে। দিন দেখ তো একটা।

[বাচস্পতি পাঁজি খুলিয়া দিন দেখিতে লাগিলেন।]

বাচস্পতি। বাইশে একটা দিন আছে।

মদনলাল। আরে, সে তো আমিও জানি, বাইশে আছে, পঁচিশে আছে, ছাব্বিশে আছে। লগ্ন কটায় দেখ, রাত জাগা আমার পোষাবে না।

বাচস্পতি। বাইশে লগ্ন হচ্ছে বারোটার পর। তা'লে ছাব্বিশেই কর, গোধূলিলগ্ন রয়েছে।

মদনলাল। সেই ভাল। আচ্ছা, উঠি তা'হলে এখন। ছাব্বিশেই ঠিক, চৌধুরীও তাই বলছিল। আচ্ছা, তুমি আজকাল চৌধুরীবাড়িতে যাও না ?

বাচস্পতি। যাই বই-কি। তবে—

মদনলাল। [হাসিয়া] বলতে হবে না, বুঝেছি। কি পড়ছ ? বাবা! এ যে দেখি দেবনাগরী অক্ষর। আচ্ছা চলি এখন, যজ্ঞেশ্বরকে দইয়ের ফরমাশ দিতে হবে। [চলিয়া গেলেন। দ্বারপ্রান্তে বাচস্পতি-গৃহিণী দেখা দিলেন।]

বাচস্পতি-গৃহিণী। ওগো, শুনছ ?

বাচস্পতি। কি ?

বাচস্পতি-গৃহিণী। ঘরে চাল যে বাড়ন্ত।

বাচস্পতি। ডাল ?

বাচস্পতি-গৃহিণী। ডাল আছে।

বাচস্পতি। [সহাস্তে] তবে তাই সিদ্ধ কর খানিক, আর বেগুন দুটো পোড়াও।

বাচস্পতি-গৃহিণী। কিন্তু এমনভাবে কদিন চলবে বল তো ?

বাচস্পতি। যদিন চলে, চলুক।

বাচস্পতি-গৃহিণী। চৌধুরী-বাড়িতে যাচ্ছিলে, তবু মাসে দশটা ক'রে টাকা তো আসছিল।

বাচস্পতি। ওই কথাটি ব'লনা। ওই হস্তীমূর্খ ছেলেকে সংস্কৃত পড়াতে পারব না, আর তার বাপের মোসায়েবী করতে সকাল বিকেল দাবাও খেলতে পারব না। যা পারব না, তা করতে ব'ল না আমাকে।

বাচস্পতি-গৃহিণী। কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।

বাচস্পতি। ভগবান দেবেনই কিছু একটা জুটিয়ে। ঈশ্বরকে লিখেছি, আরও অনেককে লিখেছি।

[জানকীজীবন প্রবেশ করিল। শৌখিন যুবক। বাচস্পতি-গৃহিণী ভিতরে চলিয়া গেলেন।]

জানকীজীবন। আপনার মত একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত গ্রামে থাকতে যদি এমন সব অনাচার ঘটতে থাকে, তা হ'লে তো—

বাচস্পতি। কেন, কি হয়েছে ?

জানকীজীবন। আপনি শোনেন নি ?

বাচস্পতি। না।

জানকীজীবন। ঘোষাল-বাড়ির ব্যাপার ?

বাচস্পতি। আমি কিছুই জানি না। কি হয়েছে ?

জানকীজীবন। কমলির বয়স কত হয়েছে জানেন ?

বাচস্পতি। না।

জানকীজীবন। গতমাসে তেরো পেরিয়ে গেছে, অথচ বিয়ে দেবার

বাচস্পতি। মনোমত পাত্র পাচ্ছে না বোধ হয়।

জানকীজীবন। পাত্র পাচ্ছে না! হুঁ, নষ্টামি—সব নষ্টামি! আপনি একটা বিহিত করুন এর।

বাচস্পতি। কি করব, বল?

জানকী। একঘ'রে করুন। ধোপা, নাপিত, পুরুত বন্ধ হ'লে বাপ বাপ ক'রে বিয়ে দিতে পথ পাবে না। বাঘা যোগাম্বর ছুদিনে সিধে হয়ে গেল, এ তো জিতু ঘোষাল।

বাচস্পতি। একটা পাত্র খুঁজে দাও না বাপু তোমরা।

জানকী। কি পাত্র পাত্র করছেন! জানেন? আমি—খোদ আমি—নিয়ে করতে চেয়েছি ওই মেয়েকে, এখনও চাইছি, কিন্তু ওরা কিছুতে দেবে না। আমরা নাকি নীচু ঘর। কঁইকালার চক্রবর্তী আমরা হলুম নীচু ঘর! বুঝুন!

বাচস্পতি। আচ্ছা, বলব আমি জিতুকে তোমার কথা।

জানকী। আপনার আশকারা পেয়েই ওরা আরও বেড়েছে। কিন্তু এই ব'লে দিয়ে গেলাম, এর বিহিত যদি না করেন, তা হ'লে চাটুজ্জেবাড়ির মেজকর্তাকে গিয়ে ধরব আমি। হিন্দু গ্রামে ওসব অনাচার চলবে না, এখনও চন্দ্র সূর্য উঠছে।

[সক্রোধে বাহির হইয়া গেল। বাচস্পতি তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন, ঘর্মাক্ত কলেবর—ধূলিধূসরিত চটি।]

বাচস্পতি। একি, ঈশ্বর নাকি! তুমি এ সময়ে হঠাৎ যে?

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] চ'লে এলুম। [উঠিয়া প্রণাম করিলেন।]

বাচস্পতি। এস এস, ব'স। তারপর, কলিকাতা থেকেই আসছ তো?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

বাচস্পতি। কি ক'রে এলে এখন হঠাৎ?

বিদ্যাসাগর। হেঁটেই এলাম।

বাচস্পতি। ত্রিশ ক্রোশ হেঁটে এলে! বল কি তুমি। বেরিয়েছ কবে?

বিদ্যাসাগর। পরশু।

বাচস্পতি। এমন উর্ধশ্বাসে আসবার হেতুটা?

বিদ্যাসাগর। এমনই, আপনার কাছে একটু শাস্ত্র জানতে এলুম।

বিদ্যাসাগর। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ দেবার বিধান আছে কি না, থাকলে কোথায় আছে।

বাচস্পতি। বিধবা-বিবাহের বিধান। তার মানে?

বিদ্যাসাগর। আমি বিধবা-বিবাহ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব ভেবেচি। [তর্কবাচস্পতি হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলেন।] আমার যতদূর মনে হয়, আপনি ছাড়া এ বিষয়ে—

বাচস্পতি। থাম, একটু প্রকৃতিস্থ হতে দাও আমাকে।

বিদ্যাসাগর। আপনার শরীর অসুস্থ নাকি?

বাচস্পতি। না; এতক্ষণ আমি কোন্ বারে বেগুন খেতে হয়, কোন লগ্নে বিয়ে দিলে মদন মল্লিকের নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না, কাকে একঘ'রে করা উচিত—এই সব বিধান দিচ্ছিলাম। তুমি হঠাৎ এসে এমন একটা ফরমাশ করলে যে আমি দিশাহারা হয়ে পড়েছি। [ক্ষণকাল পরে] বিধবা-বিবাহ নিয়ে প্রবন্ধ লিখবে ব'লে ত্রিশ ক্রোশ পথ হেঁটে শাস্ত্রীয় বিধান খুঁজতে বেরিয়েছ!

[বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। অর্ধাবগুণ্ঠিতা বাচস্পতি-গৃহিণী এক ঘটি জল ও একটি গামছা রাখিয়া গেলেন।]

নাও, হাত পা মুখ ধোও আগে।

বিদ্যাসাগর। পুকুরটা কত দূরে?

বাচস্পতি। পুকুর বাড়ির পেছনেই। ওই জলেই ধোও না।

বিদ্যাসাগর। উনি জল এনে দিলেন, ও জলে—ওটা খাব আমি এসে, তেষ্টাও পেয়েছে খুব! পা-টা ধুয়ে আসি।

[চলিয়া গেলেন। বাচস্পতি-গৃহিণী প্রবেশ করিলেন।]

বাচস্পতি-গৃহিণী। ধারেই কিছু চাল আনাই তা হ'লে।

বাচস্পতি। তাই আনাও, ও বাড়ির নবদ্বীপকে বল সে এনে দেবে। [বাচস্পতি-গৃহিণী চলিয়া যাইতেছিলেন।] আর দেখ, হারু ময়রার দোকান থেকে কিছু মিষ্টান্নও আনতে বল, আমার নাম করলেই দেবে সে। মিষ্টিটা আগে দিয়ে যাক!

[বাচস্পতি-গৃহিণী চলিয়া গেলেন। জানকীজীবনের পুনঃ প্রবেশ।]

জানকীজীবন। বাচস্পতি মহাশয়, আপনার এখান থেকে ফেরবার পথে

বাচস্পতি। তাই নাকি ?

জানকীজীবন। হ্যাঁ। ওঁর চোখ এড়াবার জো আছে! আমাকে সোজা জিজ্ঞেস করলেন, কমলির বিয়ের সম্বন্ধ করছে কোথাও জিতু ঘোষাল? আমি বললাম করছে, প্রায় হব-হব হয়েছে এক জাগায়। দেখুন, আপনার কথার ওপর নির্ভর ক'রে কিন্তু ব'লে দিলুম কথাটা—

বাচস্পতি। কমলির বিয়ের সম্বন্ধে তোমার আগ্রহের হেতুটা কতক হৃদয়ঙ্গম করেছি, কিন্তু মেজকর্তার এত মাথাব্যথা কেন ?

জানকী। বাঃ, হবে না? উনি হলেন একটা চৌকস লোক, গ্রামের হর্তাকর্তা বিধাতা, ওঁর হবে না তো কার হবে ? তা ছাড়া ঘোষাল-বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গেছে কিনা কিছুদিন আগে। মনে নেই, কমলির বিধবা বোনটা পালাল নবনে দুলের সঙ্গে ?

বাচস্পতি। সে তো মারা গেছে শুনেছি।

জানকীজীবন। হ্যাঁ, তাইতেই রক্ষে, তা নইলে ও বাড়ীতে বিয়ে করতে সাহস করতুম নাকি ? প্রবৃত্তিই হ'ত না যে। এখনও যে খুব প্রবৃত্তি হয় তা নয়, কিন্তু কি করি, পাশাপাশি বাড়ি, কমলিটাকে দেখছি রোজ দুবেলা, মুখ শুকিয়ে বেড়ায়—

বাচস্পতি। আচ্ছা, আমি পাড়ব জিতুর কাছে তোমার কথাটা আজ।

জানকীজীবন। আপনি একটু চেপে ধরলেই হয়ে যাবে।

বাচস্পতি। আচ্ছা, দেখব চেষ্টা ক'রে, আজই বলব।

জানকীজীবন। বলবেন, তা না হলে মেজকর্তার কাছে মিথ্যুক হতে হবে আমাকে। আমি এখন যাই, জ্যোতিষ কলকাতা থেকে এসেছে, দেখা ক'রে আসি তার সঙ্গে।

> [চলিয়া গেল। বাচস্পতি স্মিতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়াই ঘটিটা তুলিয়া আলগোছে জলপান করিতে গেলেন।]

বাচস্পতি। একটু অপেক্ষা কর, মিষ্টি আনতে পাঠিয়েছি।

[বিদ্যাসাগর ঘটি নামাইয়া রাখিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আর একটি প্রার্থনা আছে আপনার কাছে।

বাচস্পতি। আবার কি ?

বিদ্যাসাগর। আপনাকে আজই আমার সঙ্গে কলকাতা রওনা হতে হবে।

বাচস্পতি। কেন ?

বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ খালি হয়েছে, আপনি সে পদটি নেবেন চলুন। বেতন মাসিক নব্বুই টাকা, আপনার উপযুক্ত নয়, তবু—

বাচস্পতি। আমি তো নিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাকে তারা নেবে কেন ? কোন্ অধ্যাপকের পদ।

বিদ্যাসাগর। ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ।

বাচস্পতি। ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ভরত শিরোমণি লিখেছেন যে, ও পদে মার্শাল সাহেব নাকি তোমাকেই মনোনীত করেছেন, অথচ তুমি বলছ—

বিদ্যাসাগর। আমাকেই করেছিলেন, কিন্তু আপনার কথা তখন তিনি জানতেন না। আমার কাছে আপনার কথা শুনে আপনাকেই ও পদ দিতে চান এখন, যদি সোমবার গিয়ে আপনি যোগদান করতে পারেন।

বাচস্পতি। সে কি ক'রে হয় ? তোমাকে দিতে চেয়েছিলেন, তুমিই নাও।

বিদ্যাসাগর। আপনি থাকতে ও পদ কি আমি নিতে পারি ? আপনি অমত করবেন না, চলুন, আমি মার্শাল সাহেবকে কথা দিয়ে এসেছি যে, আপনাকে ঠিক নিয়ে যাব।

[বাচস্পতি একদৃষ্টে বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

বাচস্পতি। তোমার বিধবা-বিবাহের বিধান নিতে আসাটা তা হ'লে ওজুহাত মাত্র, আসলে তুমি এসেছ আমাকে নিয়ে যেতে! আমার ধারণা ছিল তুমি সত্যবাদী, এখন দেখছি—

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহের বিধান নিতে আসাটাও একটা উদ্দেশ্য বই-কি, ও সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতেই হবে আমাকে।

বাচস্পতি। হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন তোমার ?

বিদ্যাসাগর। বিধবাদের দুর্দশা আর চোখে দেখা যায় না, অবিলম্বে প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

বাচস্পতি। প্রতিকারের চেষ্টা! তার মানে, সত্যি তুমি ওদের বিয়ে দেবে নাকি ?

বিদ্যাসাগর। চেষ্টা করব অন্তত! [বাচস্পতি চুপ করিয়া রহিলেন।]

বাচস্পতি। বিধান থাকবে না কেন, পরাশর-সংহিতা খুললেই পাবে।

বিদ্যাসাগর। সেটা দেখেছি।

বাচস্পতি। আরও আছে, শাস্ত্রে বিধানের অভাব নেই। কিন্তু আমি ভাবছি—

বিদ্যাসাগর। কি?

বাচস্পতি। আমাদের মধ্যে একটা জিনিস আছে, যা কোন বিধানেরই বশীভূত নয়, তার নাম সংস্কার। সেটা ত্যাগ করা শক্ত হবে।

বিদ্যাসাগর। শক্ত হ'লেও কুসংস্কার ত্যাগ-করা উচিত।

বাচস্পতি। [হাসিয়া] সব উচিত কাজ কি আমরা করতে পারি?

বিদ্যাসাগর। তার মানে, বিধবা-বিবাহে আপনার মত নেই?

বাচস্পতি। আমার মত? যুক্তির দিক দিয়ে আমি মত দিতে বাধ্য কিন্তু আমার রুচিতে বাধে। এই যেমন ধর, অপরের বাসনে আমি খেতে পারি না, অপরের ব্যবহৃত কাপড বা গামছা আমি ব্যবহার করতে পারি না, সে হাজার পরিষ্কৃত হ'লেও অর্থাৎ কিনা—

বিদ্যাসাগর। উপমাগুলো ঠিকই দিয়েছেন। এ দেশে মেয়েরা বাসন কাপড় গামছারই সামিল।

বাচস্পতি। না, তা যদি বল, তা হ'লে—

বিদ্যাসাগর। জানি, অন্য দিকও আছে, তাদের দেবীও বানিয়েছি আমরা। কথায় কথায় মা মা গৃহলক্ষ্মী ব'লে উচ্ছ্বসিতও হয়ে উঠি, তারা যে রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ এই কথাটি কেবল স্বীকার করি না। স্বীকার করলে চলে না। [বাচস্পতি মহাশয় উঠিলেন।]

বাচস্পতি। তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ দেখছি। বিধবা-বিবাহের বিধানগুলো তাহলে অনুসন্ধান করি—

বিদ্যাসাগর। বিধান পরে বার করলেও চলবে। আপনি আপনার মত বদলান আগে। আমি আপনার সহানুভূতি চাই।

[বাচস্পতি উপবেশন করিলেন।]

বাচস্পতি। সহানুভূতির অভাব হবে না। কিন্তু মত বদলানো কি এতই সহজ? ইচ্ছে করলে কি আমি আমার গায়ের রং বদলাতে পারি?

বিদ্যাসাগর। কিন্তু এ তো গায়ের স্বাভাবিক রং নয়, এ যে একটা

বাচস্পতি। [হাসিয়া] শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্। সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে।

বিদ্যাসাগর। উচিতও নয় বলতে চান কি ? চেষ্টা করতে হবে না সুস্থ থাকবার ?

বাচস্পতি। বেশ তো, কর। বিধান বার করে দিচ্ছি। ভাল কথা, তোমার বাবা জানেন এসব কথা ?

বিদ্যাসাগর। তাঁকে এখনও জানাই নি।

বাচস্পতি। আমার সঙ্গে লাঠালাঠি করবার আগে তাঁর মতটা নাও। তিনি এত গোঁড়া যে ইংরেজী লেখাপড়া পর্যন্ত শেখাতে চান নি তোমাকে। মনে আছে ?

বিদ্যাসাগর। সেইজন্যেই তো আরও আপনার কাছে আসা। শাস্ত্রীয় বিধান দু-চারটে দেখাতে পারলে অনেক সুবিধে হবে। অধিকাংশ লোকই যুক্তি মানে না, শাস্ত্র মানে।

বাচস্পতি। তুমি এই নিয়ে সকলের সঙ্গে তর্ক ক'রে বেড়াচ্ছ বুঝি ?

বিদ্যাসাগর। অনেকের সঙ্গে করেছি।

বাচস্পতি। কি বলেন তাঁরা সব ?

বিদ্যাসাগর। যুক্তিযুক্ত কিছু বলেন না, কেবল ধর্মের দোহাই পাড়েন। বুঝতে চান না যে, এইভাবে চললে, তাঁদের ধর্মরক্ষা করবার জন্যেও কেউ আর থাকবে না। ভবিষ্যতে বিধর্মীরা এসে টুঁটি চেপে ধরবে। তখন এই ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে কেবল অর্কফলার আন্দোলনই বাঁচাতে পারবে না।

বাচস্পতি। দেখ, কোনক্রমে বেঁচে থাকাটাই সব সময়ে বড় কথা নয়। মানুষের সঙ্গে পশুর ওইখানেই তফাত। পশু কেবল জীবন যাপন করতে চায়, মানুষ আদর্শ জীবন যাপন করতে চায় এবং অনেক সময় তা করতে গিয়ে মারা পড়ে।

বিদ্যাসাগর। আমরা তাহলে আদর্শ জীবন যাপন করছি ?

[সবেগে জানকীজীবনের প্রবেশ।]

জানকীজীবন। বাচস্পতি মশায়, জিতু ঘোষালকে আপনি আর কিছু বলবেন না। ও বাবা, ও বাড়ির মেয়ে আমি বিয়ে করতে চাই না।

জানকীজীবন। জ্যোতিষ কলকাতা গেছ্‌ল, এক্ষুণি তার সঙ্গে দেখা হ'ল, সে স্বচক্ষে দেখে এসেচে—উঃ, বাপরে বাপরে বাপরে—আঁ্যা!

বাচস্পতি। কি, ব্যাপারটা কি?

জানকীজীবন। কমলির দিদি নবনে তুলের সঙ্গে পালিয়েছিল, ওরা রটিয়ে দিয়েছিল যে মেয়েটা মারা গেছে, কিন্তু সে মরে নি, চিৎপুরে ব্যবসা খুলেছে—স্বচক্ষে দেখে এসেছে জ্যোতিষ, মুখে রঙ মেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—হি হি হি হি।

[একটা অদ্ভুত হাসি হাসিতে লাগিল। বাচস্পতি স্তম্ভিত ও বিদ্যাসাগর বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[মার্শাল সাহেবের অফিস। সাহেব টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পায়ে চটি, গায়ে সাদা চাদর। সাহেব সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। সাহেব বাংলা শিখিয়াছেন, শুদ্ধ কেতাবী বাংলা বলেন, ক্রিয়াপদও প্রায় কেতাবী, কখনও চলিত। দ স্থানে ড এবং ত স্থানে ট প্রভৃতি উচ্চারণের দোষও আছে।]

মার্শাল। নমস্কার, নমস্কার, আসুন পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশায় কাজে যোগদান করেছেন। আপনার অনুগ্রহ না হ'লে এটা হ'ত না।

মার্শাল। আমি কিন্তু আশ্চর্যান্বিত, আপনার মত এরূপ মহত্ত্ব দুর্লভ। আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি স্বীকৃত ?

বিদ্যাসাগর। আমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, আমার অনেক অধ্যাপক সেখানে এখনও শিক্ষকতা করছেন, সেখানে কি আমার—

মার্শাল। না না, এবার আমি কোন কথা শুনতে চাই না পণ্ডিত। আপনার মত লোককে পুরস্কৃত করিবার সৌভাগ্য হইতে এবার আমাকে বঞ্চিত করিবেন না, এবার আমি নিজের মতে চলিব।

বিদ্যাসাগর। আপনি যদি সত্যই আমাকে পুরস্কৃত করতে চান, তা হ'লে—

মার্শাল। [সাগ্রহে] উত্তম, বলুন, আপনার অভিপ্রায় কি ?

বিদ্যাসাগর। আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কোন কাজে যদি আমাকে লাগিয়ে দেন, তা হ'লে আমি বড় সুখী হই।

মার্শাল। আনন্দের সহিত। আপনি এখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হউন, ক্রমশ নূতন স্কীমে যে ইন্‌স্পেক্টারের পদ সৃষ্ট হইবে, তাহাতেও আপনাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। মিস্টার বীটন আপনার উপর

খুবই সন্তুষ্ট আছেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সহজেই করিতে পারিবেন। নূতন স্কীমে ইন্‌স্পেক্টারের নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার থাকিবে।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে তো ভালই হয়।

মার্শাল। [সহাস্যে] আপনার নিকট আমি আজ কিন্তু একটি অনুরোধ করিতে ইচ্ছুক।

বিদ্যাসাগর। কি বলুন।

মার্শাল। অনুরোধটি শুনিবার পূর্বে আপনি একটি কথা ভাবিয়া দেখুন, যে সব সিভিলিয়ান ছাত্র আপনার নিকট বাংলা অধ্যয়ন করে, তারা আপন আপন আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া কত দূর দেশ হইতে আসে, ভাবিয়া দেখুন।

বিদ্যাসাগর। তা তো জানি।

মার্শাল। আরও ভাবিয়া দেখুন, তাহারা চাকুরী করিবার জন্যই কত কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই গরম দেশে আসে। আপনি যদি তাহাদের প্রতি একটু সদয় না হন, বেচারীরা মারা যায়—এই আমার অনুরোধ।

[বিদ্যাসাগর অনুরোধের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাদের সাহায্য করতে। আমার অধ্যাপনায় কি আপনারা সন্তুষ্ট নন?

মার্শাল। না না, আপনার অধ্যাপনা খুবই সুন্দর, সব রকমে উৎকৃষ্ট তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানি। উহারা আপনার মতন শিক্ষক সৌভাগ্যবলে লাভ করিয়াছে। আমি সে কথা বলিতেছি না, আমি আপনাকে কেবল একটু নরম হইতে অনুরোধ করিতেছি।

[বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। তার মানে?

মার্শাল। আমি নিশ্চয় বলিব, পরীক্ষক হিসাবে আপনি বড় শক্ত। পরীক্ষায় ফেল করিলে কিন্তু বেচারীদের চাকরিতে—

বিদ্যাসাগর। যে পাশ করবার উপযুক্ত নয়, তাকে আমি কি ক'রে পাশ করিয়ে দেব?

মার্শাল। উহাদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটু যদি—

[বাম চক্ষুটি আবার কুঞ্চিত করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ওটি আমার দ্বারা হবে না। আপনারা অন্য লোক দেখুন তা হ'লে।

মার্শাল [শশব্যস্তে] না, না, না—আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না। ইহা শুধু অনুরোধ মাত্র! আপনি যদি রক্ষা করিতে না পারেন, আমি মোটেই দুঃখিত হইব না।

বিদ্যাসাগর। যার যোগ্যতা নেই, তাকে পাশ করানো মানে—বিশ্বাস-ঘাতকতা করা। তা আমি পারব না।

মার্শাল। বেশ, আপনার অভিরুচি অনুসারেই চলুন। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাই না। [উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমিও আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল। কি বলুন?

বিদ্যাসাগর। ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ী যেতে লিখেছেন।

মার্শাল। ছুটি? কত দিনের?

বিদ্যাসাগর। অন্তত তিন-চার দিনের।

মার্শাল। তাহা তো এখন অসম্ভব, কলেজের কাজকর্ম চলিবে কিরূপে?

[বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল। খুব জরুরি?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, খুব জরুরি। তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল। [বিস্মিত] আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁদের অনুমতি অনুসারে করেন?

বিদ্যাসাগর। সকল কার্য করি না। কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাঁদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল। এমন কি কাজ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ। মা বাবা যদি আপত্তি না করেন, তা হ'লে এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি এখনও কোন উত্তর দেন নি।

মার্শাল। আপনার এ চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ডাকযোগেই তো আপনি তাঁদের উত্তর পেতে পারবেন।

বিদ্যাসাগর। আমি এর জন্তেই ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে, সেই জন্তেই ছুটি চাই।

মার্শাল। আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে। [বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। বিদ্যাসাগর উঠিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল, উঠি তা হ'লে।

মার্শাল। আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত পণ্ডিত।

[বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন। মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল। ছুটি না দিলেও যাবেন ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব।

মার্শাল। কি মুশকিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয়। [হাসিয়া] কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল।

বিদ্যাসাগর। নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়।

[চলিয়া গেলেন।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[দামোদর-তীরে একটি খেয়াঘাট। ঘাটের নিকট একটি কুটীর রহিয়াছে। চতুর্দিক অন্ধকার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, প্রবল বায়ু বহিতেছে। বায়ুবেগে উত্তালতরঙ্গ-সমাকুল দামোদরের গর্জন শোনা যাইতেছে। জনপ্রাণী কেহ নাই। দ্রুতপদে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার পর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কেউ কোথাও নেই দেখছি !

[কুটীর দেখিতে পাইয়া সেইদিকে গেলেন।]

মাঝি, মাঝি, এরা সব গেল কোথা ? ও মাঝি—

[ঝাঁপ খুলিয়া একটি লোক বাহির হইল।]

লোক। মাঝি ফিরতে পারে নাই, মেঘ দেখছেন ?

বিদ্যাসাগর। তা তো দেখছি, কিন্তু আমাকে এখুনি পেরুতে হবে যে।

লোক। নৌকা নৈলে যাবেন কিসে চেপে? উপার থে নৌকোই তো আসে নাই। আর এমন ঝড়ে নৌকোই বা আসে কি ক'রে? মেঘ দেখছেন, দামুদরের ডাক শুনছেন?

বিদ্যাসাগর। সব শুনছি। কিন্তু আমাকে পেরুতেই হবে।

লোক। মাঝি নৌকো নিয়ে ফিরলে তবে না পারাবেন, সে আজ আর ফিরছে নাই।

[বিদ্যাসাগর চাদরটি কোমরে বাঁধিলেন এবং ঘাটে নামিয়া গেলেন। লোকটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।]

ওই, পাগল বটে নাকি! [ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হইল।]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[বীরসিংহয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর অভ্যন্তর। রাত্রি গভীর, চারিদিক নিঃষুপ্ত, কপাট জানালা সব বন্ধ। একটি ঘরের বাতায়ন দিয়া ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে।]

নেপথ্যে বিদ্যাসাগর। মা, মা!

[যে ঘরের জানালা দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল, সেই ঘরের কপাট সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল। প্রদীপ-হস্তে বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি যেন জাগিয়াই ছিলেন।]

ভগবতী। ঈশ্বর, এলি বাবা? [আগাইয়া গিয়া বাহিরের কপাট খুলিতে খুলিতে] আমি জেগেই ছিলাম, আয় বাবা, আয়, বড রাত করলি যে, ওরা সব তোর অপেক্ষায় থেকে থেকে চ'লে গেল।

[কপাট খুলিয়া দিতেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কাপড় ভিজা, স্থানে স্থানে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। ভগবতী দেবী বিস্মিত হইয়া গেলেন।]

এ কি! [বিদ্যাসাগর প্রণাম করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] দামোদরের ঘাটে মাঝি ছিল না, সাঁতরেই চ'লে এলাম।

ভগবতী। পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ দিকি! আয়, কাপড় ছাড়, মাথা মোছ আগে।

[তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া একটা গামছা আনিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মাথা মুছিতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর। বরযাত্রী কে কে গেল?

ভগবতী। সবাই গেল, তোর জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করলে ওরা।

[ঘরের ভিতরে খড়মের আওয়াজ পাওয়া গেল।]

বিদ্যসাগর। বাবা যাননি নাকি?

ভগবতী।। ওঁর শরীরটা ভাল ছিল না, তাই যান নি।

[খড়ম চটপট করিয়া ঠাকুরদাস বাহির হইয়া আসিলেন।]

ঠাকুরদাস। যান নি বলছ কেন, বল যেতে দিই নি।

[বিদ্যাসাগর পিতাকে প্রণাম করিলেন।]

এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এমন করে' আসবার দরকারটা কি ছিল?

[ভগবতী দেবীর মুখে একটি প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া তিনি ঘরের ভিতরে গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। আপনার কি শরীরটা খারাপ?

ঠাকুরদাস। তেমন কিছুই নয়, ঠাণ্ডা লেগেছে একটু।

[ভগবতী দেবী একটি কাপড় লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।]

ভগবতী। নে, কাপড়টা ছেড়ে ফেল্।

[বিদ্যাসাগর কাপড়খানা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।]

ঠাকুরদাস। ঈশ্বর তো এসে গেছে, এবার ও-ই মীমাংসা করুক।

ভগবতী। [হাসিয়া] ও মীমাংসা করলে ঠিক আমার মতে মত দেবে, দেখো।

ঠাকুরদাস। পাগল, না ক্ষ্যাপা! ওদের পেট কি পোরাতে পারবে তুমি? সোজা খরচ নাকি? গোটা কয়েক টাকা হ'লেই বাজনা হয়ে যাবে।

ভগবতী। ও ক'টা টাকাই বা বাজে খরচ করা কেন?

ঠাকুরদাস। বাজে খরচ! বিয়ে-বাড়িতে বাজনাটা বাজে খরচ হ'ল? বাজনা বিবাহের একটা অঙ্গ। [কাপড় ছাড়িয়া বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন।]

ভগবতী। আচ্ছা, ঈশ্বরই মীমাংসা করুক।

বিদ্যাসাগর। কি?

ভগবতী। আমি বলছি, বউভাতের দিন গ্রামের যত কাঙাল গরিবদের নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াই। উনি বলছেন, তার দরকার নেই, তার বদলে বাজনা হোক।

ঠাকুরদাস। কাঙাল গরিব কি এক আধটা, কত লোককে খাওয়াবে তুমি? দেশশুদ্ধই তো কাঙাল গরিব।

ভগবতী। তা খুব পারা যাবে, মোটা ভাত ডাল তরকারি—

ঠাকুরদাস। তা দিয়েও কুল পাবে না। তার চেয়ে বাজনা গোটা কয়েক টাকা খরচ করলেই হবে।

বিদ্যাসাগর। বেশ তো, দুই-ই হোক।

ঠাকুরদাস। দুই-ই হোক। অত টাকা কোথায় পাব?

বিদ্যাসাগর। তার যোগাড় করব আমি।

ঠাকুরদাস। [ভগবতীকে] নাও, মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ল তো!

[ভগবতী দেবীর মুখখানি আবার স্নিগ্ধহাস্যে ভরিয়া উঠিল।]

ভগবতী। যাই ঈশ্বরকে খেতে দিই।

ঠাকুরদাস। এত রাত্রে আবার রান্না করবে নাকি?

ভগবতী। [হাসিয়া] আমি জানতাম ও ঠিক আসবে, খাবার ঠিক করাই আছে। [চলিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

ঠাকুরদাস। পেয়েছি, তোমার প্রস্তাবও পড়েছি, বড় অদ্ভুত প্রস্তাব! কি করতে চাও তুমি?

বিদ্যাসাগর। আপনার যদি মত থাকে, বিধবা-বিবাহের জন্যে আন্দোলন করতে চাই।

ঠাকুরদাস। মত যদি না থাকে?

বিদ্যাসাগর। [ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া] তা হ'লে আপনার জীবদ্দশায় কিছু করব না। তারপর যা হয় করব।

ঠাকুরদাস। [ব্যঙ্গভরে] মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না বুঝি তুমি? [বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুরদাস ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন।]

তুমি তোমার প্রস্তাবে যা যা লিখেছ, তা সব শাস্ত্রে আছে?

বিদ্যাসাগর। আছে।

ঠাকুরদাস। তোমার বিবেক কি বলে ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হ'লে দেশের মঙ্গল হবে।

[ঠাকুরদাস ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।]

ঠাকুরদাস। বেশ, তা হ'লে কর, আমার আর আপত্তি কি ? [একটু থামিয়া] আমার নিজের সংস্কারের বেড়ি তোমার পায়ে জোর করে পরাতে চাই না। [ঘরের ভিতর চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা ফিরিয়া বলিলেন।]

কিন্তু তোমার এ প্রস্তাব ছাপা হবামাত্র দেশসুদ্ধ লোক মার মার শব্দে তেড়ে আসবে। তাদের ঠেকাবার মত সাহস আর শক্তি যদি থাকে, তবেই ও কাজে হাত দিও। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে শেষটা লোক হাসিও না যেন। [উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ভগবতী দেবী প্রবেশ করিলেন।]

ভগবতী। বউমা ভাত বেড়েছে, খাবি আয়।

বিদ্যাসাগর। মা, একটা কথা শোন।

ভগবতী। কি ?

বিদ্যাসাগর। আমি একটা কাজে হাত দেব ভাবছি।

ভগবতী। কি ?

বিদ্যাসাগর। বিধবাদের যাতে বিয়ে হয় তার চেষ্টা করব, হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধান আছে।

ভগবতী। ওমা, তাই নাকি ! তা হ'লে বেচারীদের এত দুঃখ দেওয়া কেন ?

বিদ্যাসাগর। মা, সুরো কেমন আছে ?

ভগবতী। মেয়ে মানুষের কপাল পুড়লে কি আর ভাল থাকে বাবা, ওই বেঁচে আছে কোন রকমে আর কি ! এর চেয়ে আগেকার মতো পুড়িয়ে ফেলা ভাল ছিল বাপু—

বিদ্যাসাগর। তোমার মত আছে তাহ'লে ?

ভগবতী। আমি আপত্তি করব কেন বাবা ?

বিদ্যাসাগর। ওসব শুনতে চাই না, মন খুলে বল, তোমার মত আছে কি-না।

ভগবতী। খুব মত আছে। যদি পারিস, তা হ'লে তো খুব ভাল হয়। কিন্তু এ পোড়া দেশে তা কি আর হবে ?

[বিদ্যাসাগর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সবিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা তাঁহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন।]

বিদ্যাসাগর। সত্যি মত আছে ? না, আমার মন রেখে বলছ ?

ভগবতী। [হাসিয়া] অত কথার জবাব দিতে পারি না আমি, ভাত বাড়া হয়েছে, আয় তুই। ওমা, সুরোর কথা বলতে বলতেই সুরো এল যে—

[থান কাপড় পরা সুরো প্রবেশ করিল। কৃশাঙ্গী যুবতী।]

সুরো। এত রাত্রে আপনাদের কথাবার্তা শুনে ভাবলাম, কি হ'ল দেখে আসি। এসে শুনলাম, দাদা এসেছেন।

[গলায় কাপড় দিয়া বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করিল। পদপ্রান্তে অবনমিতা বিধবার পানে চাহিয়া বিদ্যাসাগর নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

তৃতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[রাধাকান্ত দেবের বৈঠকখানা। দেখিলেই মনে হয়, বড়লোকের বৈঠক। কয়েকখানি মহার্ঘ চেয়ার ছাড়া একটি প্রকাণ্ড চৌকির উপর প্রশস্ত ফরাশ বিছানো রহিয়াছে, ফরাশের উপর দামী গালিচা এবং কয়েকটি মখমলের তাকিয়া দেখা যাইতেছে। রাধাকান্ত দেব একটি তাকিয়া হেলান দিয়া রূপার গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতেছেন; ফরাশের উপর একটু দূরে তর্করত্ন, বিদ্যাবাগীশ, তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন, চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বসিয়া আছেন।]

রাধাকান্ত। সামনাসামনি এর বিচার হওয়াই ভাল। আপনাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, ওকেই বলুন, এখনই আসবে ও।

তর্করত্ন। নিশ্চই বলব, ভয় করি নাকি কাউকে?

রাধাকান্ত। যাই বলুন আপনারা, ওর বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব প'ড়ে বিস্মিত হয়েছি আমি। ছোকরার 'বিদ্যাসাগর' উপাধি সার্থক!

[ধোঁয়া ছাড়িলেন।]

বুদ্ধিমান যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

বিদ্যাবাগীশ। আপনার যে সন্দেহ থাকবে না, তাতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে! কি বল হে ন্যায়রত্ন, সজ্জন সকলকেই সজ্জন মনে করে, বুদ্ধিমান সকলকেই বুদ্ধিমান ভাবে, কি বল হে চূড়ামণি?

চূড়ামণি। কি আর বলব বল!

ন্যায়রত্ন। কত অকালকুষ্মাণ্ড যে রসালত্ব প্রাপ্ত হ'ল এঁর হাতে তা আর কহতব্য নয়। সেদিন কথা নাই, বার্তা নাই, এক ছোঁড়া এসে ফড়ফড় ক'রে খানিক ইংরাজী আউড়ে শুরু ক'রে খানিক কেঁদে দিলে; বাস, অমনই তার কলেজে পড়বার বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

রাধাকান্ত। কি যে বল! সে বেচারা সত্যিই ভাল ছেলে, সত্যই গরিব।

[তর্কালঙ্কার গলা-খাঁকারি দিলেন।]

বাপু পাঁচটা পক্ষী এসে। তোমাদের তাতে এত গাত্রদাহ কেন? দাহই যদি হয়, শীতল ছায়াতে আর একটু স'রে ব'স না, ছায়ার তো অভাব নেই।

বিদ্যাবাগীশ। তর্কালঙ্কার কি বুঝতে কি বুঝলে দেখ! গাত্রদাহের কথা নয়, অপাত্রে দান করাটা শাস্ত্রেই যে মানা করেছে, কি বল হে ন্যায়রত্ন? এই পরশু-দিনের ঘটনাটাই ধর না, লিকলিকে ওই বামুন ছোঁড়া যে একটা সংস্কৃত শ্লোক ব'লে দশ দশটা টাকা নিয়ে গেল, শ্লোকটা কি ওর নিজের তৈরি? কি বল হে চূড়ামণি?

রাধাকান্ত। শ্লোকটি কিন্তু বড় কবিত্বপূর্ণ। মনে আছে কারও?

[ন্যায়রত্ন প্রথমে চক্ষু মিটিমিটি করিয়া পরে চক্ষু বুজিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিলেন।]

ন্যায়রত্ন। না, বাক্যগুলি স্মরণ করতে পারছি না। তবে অর্থটা হচ্ছে যে, আমার অন্তরস্থিতা বাণী এই সভায় আবির্ভূ'তা হতে কুন্ঠিতা হচ্ছেন, কারণ তিনি নগ্না, আমার দারিদ্র্যের অনলে তাঁর বসন দগ্ধ হয়েছে। ভাবটি উত্তম, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

তর্করত্ন। [হাই তুলিলেন] তারা তারা তারা।

তর্কালঙ্কার। তোমার বিদ্যাসাগর কতক্ষণে আসবে হে?

[রাধাকান্ত পিরানের পকেট হইতে একটি সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন।]

রাধাকান্ত। সাতটার সময় তাকে আসতে বলেছি। এখনই আসবে সে, আর মিনিট পাঁচেক দেরি আছে সাতটা বাজতে।

বিদ্যাবাগীশ। আপনি কি ওকে জানিয়েছেন যে, আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে হবে?

রাধাকান্ত। না, আমাকে এসে সেদিন বলছিল যে, আপনি বিধবা-বিবাহ যাতে প্রচলিত হয়, তার একটা ব্যবস্থা করুন, তাই আমি ডেকেছি আজকে তাকে।

চূড়ামণি। একটা অর্বাচীনের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করাটাই আত্মসম্মান-হানিকর।

রাধাকান্ত। নিতান্ত অর্বাচীন নয় হে, ওর প্রস্তাবটা প'ড়ে দেখেছ ভাল

চূড়ামণি। [সবিস্ময়ে] আপনি কি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন নাকি তা হ'লে ?

রাধাকান্ত। বিবাহ সমর্থন না করলেও যুক্তিটা সমর্থন করি। আপনারা পারেন তো খণ্ডন করুন না যুক্তি।

বিদ্যাবাগীশ। আসল কথা কি জান ? যুক্তি নিজেই উনি খণ্ডন করতে পারেন—

তর্কালঙ্কার। স্বচ্ছন্দে।

বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু পারছেন না চক্ষুলজ্জাবশত, কি বল হে তর্করত্ন ? অপ্রিয় কার্যটা আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে চান। বুঝছ না ?

[বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

রাধাকান্ত। [উঠিয়া বসিয়া] এস, এস। ব'স।

[বিদ্যাসাগর একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল।]

বিদ্যাসাগর। আমাকে ডেকেছেন কেন ?

রাধাকান্ত। তোমার প্রস্তাবটির সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করতে চাই। এঁরাও রয়েছেন, সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার মত বিদ্যে আমার নেই। তা ছাড়া, শাস্ত্রে যদি বিধবা-বিবাহের কোন বিধান নাও থাকত, তা হ'লেও আমি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করতে চেষ্টা করতাম।

রাধাকান্ত। [সবিস্ময়ে] এটা কেমন ধারা কথা হল তোমার ?

বিদ্যাবাগীশ। এই যদি তোমার মনের কথা, তা হ'লে শাস্ত্রীয় বচনের ভুল ব্যাখ্যা ক'রে ধার্মিক লোকদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি না করাই উচিত ছিল তোমার, কি বল হে চূড়ামণি ?

বিদ্যাসাগর। ভুল ব্যাখ্যা ! কোন্‌টা ভুল ব্যাখ্যা ?

চূড়ামণি। আগাগোড়াই ভুল। পরাশরসংহিতার বিবাহবিধায়ক উক্ত বচনটির অভিপ্রায় এই যে, যদি কোন বাগ্‌দত্তা কন্যার বর অহুদ্দেশাদি হয়, তা হ'লেই তার পুনরায় অন্য বরে বিবাহ হতে পারে। বিবাহিতা বিধবাদির বিবাহ হতে পারে—ও বচনের এরূপ অভিপ্রায় কদাচ নয়।

বিদ্যাসাগর। শ্লোকের মধ্যে তো বাগ্‌দত্তা কথার কোনই উল্লেখ নেই, কষ্টকল্পনা ক'রে বাগ্‌দত্তা আনবার প্রয়োজন কি ? তা ছাড়া ভাষ্যকার

মাধবাচার্য তে এ বিষয়ে পরিষ্কার ক'রে লিখে দিয়েছেন, তিনি নিজে বিধবা-বিবাহ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনিও অঙ্গীকার করেছেন যে, পরাশরের ওই বচনটি বিধবা-বিবাহ-বিধায়ক। নারদসংহিতা আরও সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন—

[চূড়ামণির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।]

চূড়ামণি। কি, আমার কথার ওপর কথা! আমি বলছি, ও শ্লোক বাগ্‌দত্তা-বিষয়ক, তুমি তা অপ্রমাণ কর।

তর্কালঙ্কার। থাম থাম, আমি একটি প্রশ্ন করি। ওই পরাশরসংহিতাতেই বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, তা দেখেছো?

বিদ্যাসাগর। দেখেছি।

বিদ্যাবাগীশ। তবে? বিধবারা কি বিবাহিতা স্ত্রী নয়?

বিদ্যাসাগর। কি মুশকিল; বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ তো নিষিদ্ধই, কেবল নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ—এ পাঁচটি স্থলে পরাশর বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধান দিচ্ছেন। বাগ্‌দত্তার কথা বলছিলেন? কাশ্যপবচনে বাগ্‌দত্তারও পুনর্বার বিবাহ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের কি কিছু ঠিক আছে?

তর্করত্ন। কিন্তু আদিত্যপুরাণে? আদিত্যপুরাণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

ঊঢ়ায়াং পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং, গোবধং তথা
কলৌ পঞ্চ ন কুর্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্।

রাধাকান্ত। কমণ্ডলু ধারণ মানা নাকি কলিতে?

[তর্করত্ন ঘাড় নাড়িলেন।]

বিদ্যাসাগর। শুধু আদিত্যপুরাণ কেন, ক্রতু, বৃহন্নারদীয় এসব গ্রন্থেও বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। পরাশরও তা মানেন, কিন্তু তিনি পাঁচটি স্থল ধ'রে বিধান দিচ্ছেন যে, এই এই ক্ষেত্রে বিবাহিতা স্ত্রীরও পুনর্বিবাহ হতে পারে। আদিত্যপুরাণ, ক্রতু, বৃহন্নারদীয় এদের বিধি সামান্য বিধি অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম। কিন্তু পরাশরের বিধি বিশেষ বিধি, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সামান্য বিধি লঙ্ঘন করা যেতে পারে, তারই বিধি।

বিদ্যাবাগীশ। দেখ, তোমার ওসব মনগড়া যুক্তি তোমার মনেই নিবদ্ধ রাখ, ওসব আমরা শুনতে চাই না।

চূড়ামণি। ওসব শোনাও গিয়ে তোমার তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে, যে তোমার অনুগ্রহে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েছে। সে তোমার সব কথায় হাঁ হাঁ করে যায় সেই ব'লে আমরাও দেব না।

বিদ্যাসাগর। কটূক্তি কিংবা উপহাস যুক্তি নয়। আচ্ছা, আমি উঠি এবার। [উঠিবার উপক্রম করিলেন।]

রাধাকান্ত। সেকি, ব'স ব'স, কোন আলোচনাই তো হ'ল না!

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি যা জানি বললাম, তা মানা না মানা এখন আপনাদের ইচ্ছে। তা ছাড়া আমি তো আগেই বলেছি, শাস্ত্রে আছে—এই আমার প্রধান যুক্তি নয়। আমার আবেদন আপনাদের হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে।

রাধাকান্ত। ঠিক।

তর্কালঙ্কার। প্রত্যেক লোক যদি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা বুদ্ধির কৌশল অনুসারে চলে, তা হ'লে তো সমাজ দুদিনে উৎসন্ন যাবে। এই সব দমন করবার জন্যেই তো শাস্ত্র যা শাসন করে—

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রও যুগেযুগে বদলেছে, কারণ শাস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়।

বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু যে মানুষ শাস্ত্র বদলাতে সক্ষম, সে মানুষ এ দেশে জন্মায় নি এখনও, কি বল হে ন্যায়রত্ন?

চূড়ামণি। অন্তত বীরসিংহয় জন্মায় নি।

[বিদ্যাসাগর কোন জবাব দিলেন না।]

রাধাকান্ত। আপনারা চুপ করুন। [বিদ্যাসাগরকে] খোলসা ক'রে বল দিকি, কি চাও তুমি?

বিদ্যাসাগর। বলেছি তো, সমাজ-সংস্কার। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা তার একটা দিক মাত্র।

রাধাকান্ত। সমাজ-সংস্কারের অন্য দিকও তো আছে, তার জন্যে কি করছ?

বিদ্যাসাগর। আমি একা কতটুকু করতে পারি, আপনারা সবাই মিলে না করলে? আমাদের সমাজে বিধবাদের অসীম দুর্গতি, সমাজ থেকে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে, সবই তো জানেন আপনারা।

তর্কালঙ্কার। আহা, এসব আর নতুন কথা কি? সব সমাজে ব্যভিচারিণী চিরকাল আছে, সহসা তাদের দুঃখে এতটা বিচলিত হওয়ার অর্থ কি?

বিদ্যাবাগীশ। অর্থ আছে বই কি, আমরা বুড়ো হয়েছি আমরা তার কি বুঝব, কি বল হে চূড়ামণি। দাও নস্যটা দাও।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, আমি এবার উঠি।

রাধাকান্ত। ব'স ব'স। দেখ, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা উচিত হ'লেও সহজ নয়।

বিদ্যাসাগর। সহজ নয় ব'লেই তো আপনার মত শক্তিশালীর উপযুক্ত কাজ—

ন্যায়রত্ন। এ কথাটা ঠিকই বলেছ। উনি যদি এতে নামেন, এখনই সব ঠিক হয়ে যায়। এ কি আর তোমার আমার মত ভিখিরি বামুনের কম্ম হে?

বিদ্যাসাগর। সেই জন্যেই তো ওঁর দ্বারস্থ হয়েছি।

রাধাকান্ত। বেশ, কি করতে হবে বল?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ দিন, আপনি সে বিবাহে প্রকাশ্যে যোগদান করুন, সমাজে সেটা স্বীকৃত হোক।

রাধাকান্ত। পাত্র-পাত্রী কোথায় পাব?

বিদ্যাসাগর। আমি যোগাড় ক'রে দেব।

রাধাকান্ত। তা না হয় দিলে, বিয়েও না হয় হ'ল, কিন্তু তাদের ছেলেপিলে যদি আইনের চক্ষে জারজ ব'লে গণ্য হয়, তখন?

[ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাবাগীশের চাক্ষুষ একটা আলাপ হইয়া গেল। ভাবটা—এইবার নূতন একটা প্যাঁচ কষিয়াছেন রাধাকান্ত।]

বিদ্যাসাগর। যদি দরকার হয়, আইন বদলাবারও চেষ্টা করতে হবে। গভর্ণমেণ্টের কাছে আপনার যথেষ্ট মান-সম্ভ্রম, আপনি চেষ্টা করলে তাও অসম্ভব না হতে পারে।

রাধাকান্ত। [হাসিয়া] অত সোজা নয়। দেখ, তোমার যুক্তিগুলি খুবই ভাল, ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সমর্থন করি, কিন্তু প্রকাশ্যে আমি তার সহায়তা করতে পারি না, যতক্ষণ এঁরা না মত দিচ্ছেন।

[পণ্ডিতদের দেখাইলেন।]

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কি?

রাধাকান্ত। কারণ এঁরাই সমাজ, এঁদের সম্মতি না থাকলে, এঁদের ভাল করবারও কারও অধিকার নেই। সমাজ একটা এজমালি জিনিস—

[বিদ্যাসাগর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। উঠি আমি তা হ'লে। [উঠিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কি বলুন ?

ন্যায়রত্ন। শুনেছি, বীরসিংহয় তোমাদের পাড়ায় একটি বাল-বিধবার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে। সেই কি তোমার সমাজ সংস্কারের প্রেরণা নাকি ? [বিদ্যাসাগর রাধাকান্তের দিকে একবার চাহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। শুধু সে নয়, আরও অনেকে।

ন্যায়রত্ন। ভাল ভাল। দেখ, চেষ্টা ক'রে দেখ, যদি তাদের দুঃখ মোচন করতে পার, এ চেষ্টা সাধু।

তর্করত্ন। তোমরা রাজি না হ'লে কি ক'রে হয় বল ? [রাধাকান্তকে দেখাইয়া] উনি যে সমস্ত দায়িত্বটা তোমাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। লোক বটে !

তর্কালঙ্কার। কিন্তু বিশ্বাস কর তুমি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়ে সত্যই যদি আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারতে, তা হ'লে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে চেষ্টিত হতাম আমরা, বিশ্বাস কর।

বিদ্যাসাগর। আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যদি পাই, আপনাদের জানাব। এটা কিন্তু জেনে রাখুন, বিধবা-বিবাহ হবে। [বাহির হইয়া গেলেন।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[চিৎপুর অঞ্চল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলষষ্ঠীর রাত্রি, সুতরাং এ অঞ্চল বেশ একটু সরগরম বোধ হইতেছে। সারি সারি বেল-লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে। 'বেলফুল' 'বরফ' 'মালাই' 'তপসে মাছ'—ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র ডাক আশ-পাশের গলির ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে গাজনের ঢাকের শব্দ—দূরত্ব-নিবন্ধন গুরুগম্ভীর ও সুমিষ্ট। সম্মুখেই একটি ঘরে খ্যামটা-নাচ চলিতেছে। ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। কালো কপাটের উপর খড়ি দেওয়া নম্বর লেখা আছে ৬১। নর্তকীকে দেখা যাইতেছে না, কিন্তু নূপুরনিক্কণ ও স-তবলা-সারঙ্গ সঙ্গীত আলোকিত বাতায়নপথে ভাসিয়া

শুনিতেছেও। জনতার অধিকাংশ লোকই তৎকালপ্রচলিত বেশে সজ্জিত। সকলেরই পায়ে ইংরেজী জুতা, কাহারও কাহারও পায়ে বুটজুতাও, মোজাও নানা রঙের। অনেকের গায়ে শান্তিপুরে ডুরে উড়্নি; পরনে চওড়াপাড় সিমলের ধুতি, কাছা পাকানো। পাকানো চাদরও কাহারও কাহারও গলায় রহিয়াছে। প্রায় সকলেরই মাথায় বাহারে টেরি। সৌন্দর্য-বৃদ্ধি-মানসে কেহ কেহ দাঁতে মিশি দিয়াছে, কেহ চবরচবর করিয়া পান চিবাইতেছে, কেহ বার্ডসাই ফুঁকিতেছে। কোটপ্যাণ্টপরা ও মাথায় শামলা গায়ে পিরান এ রকম লোকও আছে। অল্প একটু দূরে গৃহসংলগ্ন ফালি বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া একটি বারবনিতা এই জনতাকে লক্ষ্য করিতেছে। জনতা কিন্তু তাহার সম্বন্ধে তেমন সচেতন বলিয়া মনে হইতেছে না। মেয়েটি অতিশয় কুৎসিত। সাজসজ্জার সে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে তাহার কদর্যতা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

খানিকক্ষণ চলিয়া নাচগান থামিয়া গেল। ভিতর হইতে 'কেয়াবাৎ' প্রভৃতি হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। গান থামিতে অনেক লোক চলিয়া গেল। ক্যাবলা, হ্যাপলা, মতি, নরু ও গুরুচরণ গেল না। নরু উৎকর্ণ হইয়া ঢাকের বাজনা শুনিতেছিল। গুরুচরণ ঘাড়টা যথাসম্ভব বাড়াইয়া আলোকিত বাতায়নপথে ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গুরুচরণের ফিরিঙ্গী বেশ। গলার কলারটা বেশ শক্ত ও উঁচুগোছের, ঘাড়টা স্বচ্ছন্দে নাড়িতে পারিতেছে না। সে যে মাসখানেক কোন ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছিল এবং এখনও অভিধান মুখস্থ করে, তাহার প্রমাণ সে সর্বদাই দিতে ব্যগ্র।]

নরু। [চিন্তিত] মিত্তিরদের বাড়ীতে শিবের মাথায় ফুল ঠিক এখনও পড়ে নি। ঢাকের বাজনাটা শোন।

মতি। তা তো শুনছি।

নরু। জগোটা তো ভারী আটকে পড়ল হে! এঃ, দমাজে দেখছি।

হ্যাপলা। [ক্যাবলাকে] তোমার খুড়োই বা কখন আসবে, তা তো বুঝতে পারছি না।

ক্যাবলা। খুড়ো এল ব'লে।

মতি। খুড়োকে কি কি আনতে দিয়েছিস ?

ক্যাবলা। আতুয়ী, জবাবী, দু'রকমই—ভাল ক'রেই জমাতে হবে আজ।

[ব্যর্থমনোরথ গুরুচরণ আসিয়া কথোপকথনে যোগ দিল।]

গুরু। ইন্‌সাইড একদম—[বাকিটা অঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া প্রকাশ করিল]। নেক বাথা ক'রে ফেললাম বাবা, কিন্তু তিলমাত্র ফিলজফি পাবার জোটি নেই।

মতি। সে আবার কি, ফিলজফি কি !

গুরু। ফিলজফি মানে দর্শন। ইংরিজীটা শেখ একটু আধটু।

নরু। না, জগোর গতিক খারাপ দেখছি।

হ্যাপলা। জগো কি মিত্তির-বাড়িতে নাকি ?

নরু। হ্যাঁ, জগো ওদের শিবের বামুন যে, ফুল না পড়লে আসে কি ক'রে বল ?

ক্যাবলা। শিবের মাথার ফুল পড়বে কি ক'রে বাবা, যা সব হিরণ্যকশিপু জন্মাচ্ছে দেশে।

মতি। যা বলেছ, রামমোহন রায় যেতে না যেতেই বিদ্যাসাগর এসে জুটেছে, সে নাকি বিধবাদের বে দেবে, দু'খানা কেতাব ছেড়েছে বাজারে।

[গুরুচরণ পুনরায় জানালার ধারে উঁকি দিতেছিল।]

হ্যাপলা। যা বলেছিস মাইরি। কালে কালে দেখবি, শিবের মাথায় ধোপায় কাপড় আছড়াবে।

গুরু। এখানকার গুড়ে তো শ্যাণ্ড দেখছি, আজ নাইটে ও কপাটের নো ওপনিং বেশ শাঁসালো ডাভ এণ্টার করেছে মনে হচ্ছে।

হ্যাপলা। খুড়োর তো টিকি দেখা যাচ্ছে না হে ?

মতি। খুড়োকে পাঠিয়ে ভুল করেছ তুমি। খুড়ো আজকাল আর আমাদের তোয়াক্কা করে না। নবীন শীলের বাড়ি খুড়োর এখন দহরম-মহরম।

গুরু। ও ইয়েস, আংকল আর নবীন শীল আজকাল সোল টু সোল।

ক্যাবলা। খুড়োকে না পাঠিয়ে উপায় কি, খুড়ো না হ'লে এত রাত্তিরে কে আর মদ আনবে বল ? আর কারু সাধ্যি নেই।

হ্যাপলা। বাজে কথা। আজ মদের দোকান থেকে একটি খদ্দের ফিরছে না।

নরু। [সবিশেষ চিন্তিত] শিবের মাথার ফুলটা পড়ল না হে এখনও, মহা মুশকিল হ'ল দেখছি, মূল সন্ন্যাসী বোধ হয় কিছু খেয়েছে, ওদের দোষেই এই সব হয় কিনা।

ক্যাবলা। খুড়োরই বা হলো কি ? [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] নবীন শীল ! হুঃ, আমার তো অবিদিত কিছু নেই, নবনে ছিল শিব-সরকার, আজ না হয় হয়েছে মুচ্ছুদ্দি। [সক্ষোভে] দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল হে, অথচ আমরা যে কে সেই র'য়ে গেলাম।

গুরু। সব ফর্‌হেড। [কপালে হাতে দিলেন।]

ক্যাবলা। আমাদের যতেও শুনছি শেরুডের বাড়ী ঢুকে এখন বেশ দু' পয়সা পিটছে ! ঢুকেছিল মেট-মিস্তিরি হয়ে, এখন মেয়েমানুষ রেখেছে একটি, রূপোর বকলস দেওয়া জুতো পায়ে দেয়—[হঠাৎ গাজনের ঢাকের তাল বদলাইয়া গেল। নরু উল্লসিত হইয়া উঠিল।]

নরু। ফুল পড়েছে, ফুল পড়েছে। আমি যাই, চট ক'রে ডেকে নিয়ে আসি তাকে, আবার না কোন ঝামেলায় আটকে পড়ে। [চলিয়া গেল।]

মতি। ও বাঁচল। [দূরে একটা কোলাহল ও সঙ্গীত শোনা গেল।]

ন্যাপলা। স'রে দাঁড়াও, স'রে দাঁড়াও—সং আসছে।

[হাসির হর্‌রা ও হুল্লোড় করিতে করিতে খোল করতাল প্রভৃতি বাজাইয়া সংকীর্তনের দলের মত একটা দল প্রবেশ করিল। বিধবাবেশী কয়েকজন পুরুষ উদ্বাহু হইয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে।]

গান

বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই,
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে।

[গান গাহিতে গাহিতে দলটি চলিয়া গেল।]

ক্যাবলা। সত্যি ? সদরে রিপোর্ট করেছে নাকি হে বিদ্যাসাগর ?

মতি। করে নি এখনও, কিন্তু তার উদ্যোগ চলছে। বাজারে বই ছেড়েছে দু'খানা। রিপোর্টও করবে ঠিক, ভয়ঙ্কর লোক, সব করতে পারে।

হ্যাপলা। তুই চিনিস নাকি ?

মতি। চিনি না! সেবার পেনেটির পিক্‌নিকের খরচটা তো ওর কাছ থেকেই বাগিয়েছিলাম। লোকটার পণ্ডিত ব'লে এত নামডাক, আসলে কিন্তু একটি হাঁদারাম। মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে একবার ধরলেই হ'ল গিয়ে।

ক্যাবলা। কি বলেছিলি তুই ?

মতি। [অভিনয় করিয়া] "আমার বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, আমার বোনটি শুষছে, আমাদের ঘরদোর সব দামোদরের বানে ডুবে গেছে, তিন দিন খেতে পাই নি—" তারপর দু' ফোঁটা চোখের জল, বাস্, তারপর পাঁচটি টাকা। [সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

হ্যাপলা। কি রকম দেখতে রে লোকটা ?

মতি। কাঠগোঁয়ারের মত চেহারা, উড়ে মালি একটা। তার ওপর ভয়ঙ্কর জেদী, ঠিক ও বিধবার বিয়ে দেবে। এক রাধাকান্ত দেব যদি ওকে আটকাতে পারে, আর কেউ পারবে না।

ক্যাবলা। না রে, দেশে এখনও মহাপুরুষ আছে।

মতি। ছাই আছে।

ক্যাবলা। আলবৎ আছে। আমার ছোট পিসীর দেওর সেদিন রিষড়ে গেসল, স্বচক্ষে দেখে এসেছে। হিমালয়ের এক সন্ন্যাসী পারাভস্ম খাইয়ে তিন দিনের বাসী মড়াকে বাঁচিয়ে দিলে। ভস্ম মুখে ঠেকাবামাত্র মড়া তড়াক ক'রে উঠে বসল। লোহাকে সোনা করতে পারে।

মতি। দ্বিতীয় হোসেন খাঁ, বল ?

হ্যাপলা। সে আবার কে ?

মতি। তুই এখুনি ভূমিষ্ঠ হ'লি নাকি ? হোসেন খাঁর নাম শুনিস্ নি ? মন্তরের জোরে উইল্‌সনের হোটেল থেকে পাঁউরুটি পার করত সে।

হ্যাপলা। কবে বল্ তো ?

মতি। এই তো কিছুদিন আগে।

হ্যাপলা। ও, আমি তা হ'লে তখন ছিলুম না বোধ হয়, পিসীর সঙ্গে বৃন্দাবন গেসলাম।

[কথা কহিতে কহিতে নরু ও কালীর প্রবেশ।]

কালী। হঁ্যা হঁ্যা, আমি মিত্তির-বাড়ি থেকেই আসছি। শিবের মাথায় ফুল কিছুতেই পড়ছিল না তা ঠিক, শেষটা বাবুকে বাঁধতে হ'ল। বাবু প্যাসনাপেলের চপকান পরে এই দিকেই আসছিলেন, কিন্তু রুকতে হ'ল তাঁকে, উপায় কি ?

নরু। কিন্তু জগো কোথায় ? তাকেই তো খুঁজছি আমি, সে যে ওদের বাড়ি শিবের বামুন হয়েছিল।

কালী। [সবিস্ময়ে] কে বলল ? গঙ্গাজল ছিটুচ্ছিল তো নফর শিরোমণি, জগো ও তল্লাটে ছিল না !

নরু। কি আশ্চর্য। জগো তা হ'লে গেল কোথা ? আমার কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে এল, ব'লে এল, পুজোটি সেরেই আমি আসছি। ৬১ নম্বর বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে বললে, তার ভরসায় এদের আটকে রেখেছি—

[৬১ নম্বর ঘরের ভিতর আবার তবলা ও সারঙ্গ বাঁধার আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল।]

গুরু। [সক্ষোভে] এদের আবার কমেন্সমেন্ট হল। আর আমরা স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ফ্রাই করছি কেবল। [ক্যাবলার দিকে চাহিয়া] তোমার খুড়োই আমাদের ড্রাউন করালে আজ।

হ্যাপলা। খুড়ো টাকা ক'টি মেরে সরেছে।

ক্যাবলা। [জিব কাটিয়া] না না, খুড়োর সম্বন্ধে ও কথা বলা যায় না।

[কথা শেষ হইতে না হইতে খুড়ো ও জগো প্রবেশ করিল। উভয়েরই বগলে বোতল, উভয়েরই পা টলিতেছে।]

এটা কি রকম হ'ল খুড়ো ?

খুড়ো। কুস পরোয়া নেই বাওয়া, সব লাল হো যায়গা, লা—লে লাল।

জগো। [নরুর মুখের সামনে হাত নাড়িয়া, সুরে] কিনে দেব মাথাঘষা, বারুইপুরে ঘুনসি খাসা, উভয়ের পুরাবি আশা, ও যাদুমণি—

[ইহাতে নরু অত্যন্ত চটিয়া গেল।]

নরু। আশা পোরাচ্ছি, থাম তো শালা—

[জগোর গলার চাদর মুঠি করিয়া ধরিল।]

দে, টাকা দে আমার।

গুরু। আহা নরু, রেজ কনট্রোল কর ব্রাদর, ফাইট ক'র না, পুলিশের

হুজ্জুতে পড়লে নিউ ডিফিকাল্‌টি হবে আবার একটা। আর ডিলে না ক'রে রিসার্চ করিগে চল, ডোর টু ডোর ঘুরলে এখনও—কি বল মতি?

মতি। হ্যাঁ, তাই চল।

[সকলে চলিয়া গেলে ৬১ নম্বরের দরজা খুলিয়া দুইজন ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। চাদর সামলাইতে গিয়া একজনের পকেট হইতে একটি পুস্তিকা মাটিতে পড়িয়া গেল।]

প্রথম ভদ্রলোক। ওখানা কি হে?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওখানা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম ভদ্রলোক। ও বই এখানে কেন বাবা! লোকটার কি পাগলামি দেখ তো!

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। পাগলামি কোথায় দেখলে তুমি? তোমার গাড়ী কই?

প্রথম ভদ্রলোক। আসছে এখনই।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। বিদ্যাসাগর প্রস্তাব লিখেই ক্ষান্ত হন নি শুধু, ব্যবস্থাপক সভায় যাতে আইন পাশ হয় তার জন্যে চেষ্টা করছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। কি রকম?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। একটা দরখাস্ত লিখে তাতে বহু লোকের সই সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছেন। বিকেলে আজ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, সেই সময়ে এই বইখানা দিলেন আমাকে। আমাদের বাড়ী থেকে হেঁটেই বেলুড় চ'লে গেলেন।

প্রথম ভদ্রলোক। ক্ষেপে উঠেছে বল।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওঁকে আরও ক্ষেপিয়েছেন রাধাকান্ত দেব। উনি যদি এর বিরুদ্ধে না যেতেন, তা হ'লে হয়তো বিদ্যাসাগর মশায় এতটা উঠে পড়ে লাগতেন না।

প্রথম ভদ্রলোক। রাধাকান্ত দেবই বা কি করবেন বল, নানা পণ্ডিত যে নানা কথা কইছেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। কেউ কথা কইছেন না, সবাই ছাতারে পাখীর মত কচর-কচর করছেন। এমন একজন পণ্ডিত নেই, যার কথার জবাব বিদ্যাসাগর মশায় দেন নি। দ্বিতীয় প্রস্তাবটা প'ড়ে দেখো—তুলো ধোনা ক'রে ছেড়েছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। সকলকার আপত্তি খণ্ডন করেছেন ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। চুল চিরে।

প্রথম ভদ্রলোক। কিন্তু শুনেছি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন—

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। নাম ক'র না ওঁদের, ওঁরা সব ভণ্ড। ওঁরাই কিছুদিন আগে নাম সই ক'রে শ্যামাচরণ দাসের বিধবা মেয়ের বিয়ের ফতোয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু যেই ম্যাও ধরবার সময় এল, অমনই সব পিছিয়ে গেলেন। বল কেন ওঁদের কথা। একটা কথা জেনে রেখো—ওই সব বিদ্যারত্ন, তর্কসিদ্ধান্ত, বিদ্যাবাগীশ, চূড়ামণিরা বিদ্যের জাহাজ হতে পারেন, কিন্তু সাগরকে অতিক্রম করতে পারেন নি কেউ। কই, তোমার গাড়ি কত দূর হে ? হেঁটেই চল না হয়। [ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন] একি, নাম করতে করতেই যে—কি বিপদ, চল, ঘরের ভেতরে ঢোকা যাক।

প্রথম ভদ্রলোক। কেন ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। দেখছো না, বিদ্যাসাগর মশাই আসছেন যে। এদিকে হঠাৎ কেন বাবা। বেলুড় থেকে ফিরছেন বোধ হয়।

[উভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। বারান্দায় বারাঙ্গনাটি তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হনহন করিয়া বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বারবনিতাকে ছাড়াইয়া হনহন করিয়া কিছুদূর চলিয়া গেলেন। তাহার পর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বারবনিতার সম্মুখীন হইলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি বেলুড় যাবার সময় তোমায় দেখে গেছি। এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ !

বারবনিতা। এই তো আমাদের ব্যবসা গো।

বিদ্যাসাগর। [ইতস্তত করিয়া] তুমি—

বারবনিতা। অত ঢঙে কাজ কি বাপু, আসবে তো এস না।

[বিদ্যাসাগর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। নাও আমি টাকা দিচ্ছি ঘরে গিয়ে শোও গে যাও।

[টাকা দিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।]

বারবনিতা। (বিস্মিত) এ আবার কি !

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[রামগোপাল ঘোষের বৈঠকখানা। নানাবিধ মহার্ঘ আসবাবপত্রে কক্ষটি সুসজ্জিত। যদিও মুসলমান সভ্যতার কিছু কিছু চিহ্ন বর্তমান —যেমন শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত ঝাড়-লণ্ঠন, একটি ছোট টেবিলে রক্ষিত আতরদান গোলাপ-পাশ, একটি তেপায়ার উপর কুণ্ডলীকৃত জমকালো নল-সমন্বিত দামী গড়গড়া—কিন্তু সদ্য-আগত পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপও বেশ সুস্পষ্ট। মেহগনির টেবিল, চেয়ার, তেপায়া, কৌচ, আলমারি, সুদৃশ্য ডোম দেওয়া টেব্‌ল-ল্যাম্প, চমৎকার 'চমৎকার ফুলদানি, দেওয়ালে দেওয়ালে ব্র্যাকেট, ব্র্যাকেটের উপর ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত ভেনাস, অ্যাপোলো জাতীয় গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি, একটি বড় দামী ঘড়ি প্রভৃতি সাহেব-বাড়ী হইতে আনীত ছোট-বড় শৌখিন দ্রব্যনিচয় ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এক কোণে টেবিলের উপর কয়েকটি মদের বোতল, ডিক্যাণ্টার, সোডাওয়াটারের বোতল এবং তাহার পাশের খোলা দরজাটা দিয়া প্রশস্ত বারাণ্ডায় হ্যাটর্যাক দেখা যাইতেছে। ঘরটি বেশ প্রশস্ত, অনেকগুলি দরজা জানালা আছে। একটি দরজা দিয়া রামগোপাল ঘোষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিরতিশয় গম্ভীরপ্রকৃতির রাশভারি লোক। তিনি এইমাত্র বাহির হইতে ফিরিলেন, সাজ-পোষাক এখনও খোলা হয় নাই। পরিধানে চোগা, চাপকান, শামলা—দামী কিন্তু চাকচিক্যশালী নয়। আসিয়াই তিনি শামলাটা খুলিয়া একটা কৌচের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর কি মনে করিয়া আবার সেটি তুলিয়া লইলেন।]

রামগোপাল। (দ্বারের পানে চাহিয়া) বয় !

নেপথ্যে বয়। হুজুর।

[কেতাদুরস্ত লিভেরি-পরা খানসামা আসিয়া প্রবেশ করিল। রামগোপাল তাহাকে কিছু না বলিয়াই পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন বাচনিক কোন আদেশ না দিলেও ভৃত্য তাহার কর্তব্য বুঝিতে পারিল। কোণে গিয়া মদ্যপানের সরঞ্জাম সব ঠিক করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে চোগা-চাপকান-শামলা ছাড়িয়া রামগোপাল ফিরিয়া আসিলেন। সোফার উপর গিয়া বসিতেই খানসামা নিকটে একটি তেপায়া স্থাপন করিল, একটি ট্রেতে সমস্ত সরঞ্জাম সাজাইয়া আনিয়া ট্রে-টি তাহার উপর রাখিল।]

রামগোপাল। ঢাল। [খানসামা গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিল] বাস্। না, সোডা চাই না। খবরের কাগজখানা দে।

[খানসামা আদেশ পালন করিয়া চলিয়া গেল। রামগোপাল মদ 'সিপ' করিতে করিতে কাগজে মন দিলেন। কয়েক মিনিট পরে খানসামা পুনরায় প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একখানি পত্র।]

খানসামা। হুজুর, সংস্কৃত কলেজের তর্কবাগীশ মশায় এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিকেলে। [রামগোপাল পত্রটি পড়িয়া দেখিলেন।]

রামগোপাল। বাইজী আনতে লোক চ'লে গেছে ?

খানসামা। হ্যাঁ হুজুর।

রামগোপাল। আর একজন লোক পাঠিয়ে মানা ক'রে দে। আসতে হবে না আজ।

[খানসামা চলিয়া গেল। রামগোপাল কাগজে মন দিলেন এবং একটু পরে স্বগতোক্তি করিলেন।]

This Napoleon III seems to be a rogue !

[বাহিরে পদশব্দ পাওয়া গেল, চটি জুতার আওয়াজ। রামগোপাল কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন না, পড়িতেই লাগিলেন। খানসামা প্রবেশ করিল।]

খানসামা। হুজুর, তর্কবাগীশ মশায় এসেছেন।

রামগোপাল। ও, আচ্ছা। ডেকে নিয়ে আয়।

[মদের গ্লাসটা তেপায়ার উপর রাখিয়া দিলেন, বৃদ্ধ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রবেশ করিলেন। রামগোপাল যেন কর্তব্যবোধেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও নমস্কার করিলেন।]

আসুন, বসুন।

তর্কবাগীশ। (সহাস্যে) এক পা ধুলো নিয়ে তোমার এই কার্পেট মার্পেটগুলো দিলাম বোধ হয় নষ্ট ক'রে।

[ইহার উত্তরে সাধারণত লোক 'কিছু না' 'কিছু না' জাতীয় যে সব

বিনয়-বচন কহিয়া থাকে, রামগোপাল সে সব কিছুই বলিলেন না। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানসামা আসিয়া একটি চেয়ার একটু টানিয়া সোফার দিকে ফিরাইয়া দিয়া গেল। তর্কবাগীশ উপবেশন করিলে রামগোপাল উপবেশন করিলেন।]

রামগোপাল। আমি এইমাত্র আপনার চিঠিটা পেলাম।

তর্কবাগীশ। আমি গত কয়দিন থেকে তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছি। বারংবার বিফল-মনোরথ হয়ে অবশেষে চিন্তা ক'রে দেখলাম পূর্বাহ্নে পত্র না দিলে তোমার দর্শন পাওয়া দুর্লভ হবে। তোমার আপিস আছে, কাগজ আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে, বক্তৃতা আছে—

[খবরের কাগজটার দিকে লক্ষ্য পড়িল।]

পাঠে বিঘ্ন করলাম নাকি, কি পড়ছিলে ?

রামগোপাল। ক্রিমিয়ান ওয়ারের খবর।

তর্কবাগীশ। হ্যাঁ শুনেছি বটে, ভারী একটা সংঘর্ষ হচ্ছে ইয়োরোপ খণ্ডে। কার সঙ্গে কার বল তো, আমি ঠিক—

রামগোপাল। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের।

তর্কবাগীশ। তা তো বটেই, কিন্তু ব্যাপারটার ঠিক তাৎপর্য আমি—

রামগোপাল। আপনি কি দরকারে এসেছেন ?

তর্কবাগীশ। তা বলছি।

[রামগোপাল মদের গ্লাসটার পানে চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন।]

তর্কবাগীশ। খাও না, খাও, ওতে আর দোষ কি আছে, ব্যাপ-ব্যাটায় ব'সে খাচ্ছে আজকাল।

[রামগোপাল আর নিরর্থক সঙ্কোচ না করিয়া গ্লাসটি তুলিয়া এক চুমুক দিলেন।]

রামগোপাল। আপনার প্রয়োজনটা কি বলুন ?

তর্কবাগীশ। কথাটা হচ্ছে, ঈশ্বর বিধবা-বিবাহ নিয়ে খুব উন্মত্ত হয়েছে। শুনছি নাকি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন যাতে পাশ হয়, তার জন্যে খুব চেষ্টা করছে ও। ওকে বুঝিয়ে বললে ও শোনে না, গোটাকতক সংস্কৃত শ্লোক শাস্ত্র থেকে উদ্ধার ক'রে হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছে। তুমি ওর বন্ধুলোক এবং বুদ্ধিমান লোক, তাই তোমার কাছে এসেছি, তোমরা নিবৃত্ত কর ওকে।

রামগোপাল। আমার মত আছে।

তর্কবাগীশ। [ভুল বুঝিয়া] তোমার মত হ'লেই ঈশ্বরেরও মত হবে, তাই তো তোমার কাছে আসা।

রামগোপাল। বিধবা-বিবাহে আমার মত আছে। ঈশ্বর এ নিয়ে আন্দোলন করবার পূর্বেই আমি বেঙ্গল স্পেকটেটারে এর বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

তর্কবাগীশ। আলোচনা চলুক না। কিন্তু এ নিয়ে একেবারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারস্থ হওয়াটা—

রামগোপাল। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে দরখাস্ত দেওয়া হবে, সেটা নিয়ে ঈশ্বরের আসবার কথা আছে এখনই। আমি এ বিষয়ে তাকে উৎসাহিত করেছি, আপনার অনুরোধ আমি পালন করতে পারব না, মাপ করবেন।

[খানসামার প্রবেশ।]

খানসামা। হুজুর, বিদ্যাসাগর মহাশয় এসেছেন।

[রামগোপাল তর্কবাগীশের দিকে চাহিলেন।]

রামগোপাল। [খানসামাকে] ডেকে নিয়ে আয়।

[খানাসামা চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি দরখাস্ত, আসিয়াই তিনি তর্কবাগীশ মাহাশয়কে প্রণাম করিলেন।]

তর্কবাগীশ। ভক্তিটি এদিকে টনটনে আছে, কিন্তু জুতোটি মারবার বেলায় হাতটি কম্পিত হয় না বৎসের।

বিদ্যাসাগর। ছি, ছি, একি কথা বলছেন আপনি! কি করেছি আমি।

[তর্কবাগীশ নস্য লইলেন।]

তর্কবাগীশ। কি করনি? চরম দুর্গতি করেছ; শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের। আগে আমরা যদৃচ্ছা আসতাম, টেবিলের উপর পা-টি উত্তোলন ক'রে দিবানিদ্রাটি উপভোগ করতাম, তুমি এসে সেটি ঘুচিয়েছ। ঠিক সময়ে কলেজে আসতে হচ্ছে সোজা ব'সে পড়াতে হচ্ছে। [রামগোপালের দিকে চাহিয়া] এত বড় ধূর্ত ও, আমি ওর শিক্ষক, আমাকে তো মুখের উপর হুকুম করতে পারে না, তাই কলেজে ঢোকবার মুখটিতে কাঁচুমাচু হযে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি দেরিতে এলেই বলে—আপনি এই বুঝি এলেন! দেখ দিকি নষ্টামি! [হাসিলেন] কয়েক বার এ রকম হবার পর ঠিক সময়েই আমাকে

আসতে হচ্ছে। এসবে আমার কোন ক্ষোভ নেই, সময়ানুবর্তিতা ভালই, তুমি যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে লেগেছ তাও নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারটা—

বিদ্যাসাগর। আমি কোন কথা শুনছি না, সই করুন।

তর্কবাগীশ। কিসে?

বিদ্যাসাগর। ব্যবস্থাপক সভায় আমরা সবাই মিলে দরখাস্ত করছি, যাতে বিধবা-বিবাহ আইনত বৈধ ব'লে গণ্য হয়। লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সই সংগ্রহ ক রে বেড়াচ্ছি। অনেকে সই করছেন। আপনাকেও করতে হবে।

[তর্কবাগীশ একবার রামগোপাল ঘোষের দিকে চাহিলেন, রামগোপালের চোখে একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিয়া তর্কবাগীশ বলিলেন।]

তর্কবাগীশ। আমাকেও করতে হবে?

বিদ্যাসাগর। আপনারা না করলে চল্‌বে কেন?

[খানসামা প্রবেশ করিল।]

খানসামা। হুজুর, স্নানের জল তৈরী হয়েছে।

রামগোপাল। [উঠিয়া] আমি স্নানটা সেরে আসি। ঈশ্বর, তুমি যেও না, রাধানাথ, রসিক, রামতনু, কৃষ্ণমোহন আসবে এখনি। [চলিয়া গেলেন।]

তর্কবাগীশ। দেখ ঈশ্বর, ম্লেচ্ছের সাহায্য নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হয়ে সমাজের ভিত্তিতে আঘাত করতে যাওয়া কি মূর্খতার নামান্তর নয়?

বিদ্যাসাগর। সমাজের ভাল হোক—এটা কি আপনি চান না?

তর্কবাগীশ। চাই। কিন্তু সে ভাল করবে ব্রাহ্মণরা।

বিদ্যাসাগর। হুঁ। ব্রাহ্মণরা থাকলে করত, কিন্তু এদেশে ব্রাহ্মণ নেই, আছে বামুন, রাঁধুনি বামুন আর পুরুত বামুন।

তর্কবাগীশ। আমাদের তুমি রাঁধুনি বামুনের দলে ফেলতে চাও, স্পর্দ্ধা তো তোমার কম নয়। একমাত্র তুমিই বুঝি ব্রাহ্মণ আছ।

বিদ্যাসাগর। আমরা সবাই শূদ্র—দাসত্ব করি।

তর্কবাগীশ। ম্লেচ্ছদের সাহায্য নিয়ে সমাজ-সংস্কার করলেই আমরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করব না কি!

বিদ্যাসাগর। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করব কি না বলতে পারি না, তবে ওদের সাহায্যে অনেকটা ভদ্রস্থ হব আশা করি।

তর্কবাগীশ। তাই সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত পাঠ্যবস্তুর পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করছ?

বিদ্যাসাগর। যুগ বদলাচ্ছে, আমাদেরও বদলাতে হবে, পাশ্চাত্য শিক্ষাও উৎকৃষ্ট শিক্ষা।

তর্কবাগীশ। মাঘ, ভারবী, কালিদাস, ভাস্করাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র, রঘুনাথ এরা ইংরেজী জানতেন না ব'লে কি নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন বলতে চাও? ষড়দর্শন কি বাজে জিনিস?

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] পণ্ডিত মহাশয় আপনার সঙ্গে তর্ক করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি মনে প্রাণে যা ভাল ক'রে বুঝেছি, তাই করছি।

তর্কবাগীশ। বেশ, কর। আমি উঠি। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

বিদ্যাসাগর। দরখাস্তে সই ক'রে দিয়ে যান।

তর্কবাগীশ। এত বচসার পরও আমার সই আশা কর তুমি?

বিদ্যাসাগর। [সহাস্যে] আমার আশার অন্ত নেই। আমার যুক্তি না মানেন, আবদারটা অন্তত মানুন।

তর্কবাগীশ। [বিব্রত] আমাকে একটু বিবেচনা করবার অবসর দাও বাপু, তাড়াহুড়ো ক'র না।

বিদ্যাসাগর। এতে আর বিবেচনা করবার কি আছে? দেশের যাঁরা রত্ন, তাঁরা সবাই সই করেছেন, এই দেখুন—দেবেন ঠাকুর, জয়কেষ্ট মুকুজ্জে, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, ভূকৈলাসের সত্যশরণ ঘোষাল—

[দরখাস্ত খুলিয়া দেখাইলেন।]

তর্কবাগীশ। কই, রাধাকান্ত তো করেন নি! তা ছাড়া নিজের রত্নত্ব জাহির করবার জন্যই সই করতে হবে নাকি? সই করব না।

[সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন, তাহার পর একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। চাদরের তলা হইতে একটি খাতা ও পেন্সিল বাহির করিয়া কি লিখিতে লাগিলেন। একটু পরে খানসামা আসিয়া প্রবেশ করিল।]

খানসামা। হুজুর, শ্রীশ বিদ্যারত্ন মশায় আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছেন।

বিদ্যাসাগর। শ্রীশ? এখানে এসেছে।

খানসামা। হাঁ, হুজুর। ডেকে আনব?

বিদ্যাসাগর। আনবে বই কি।

[খানসামা চলিয়া গেল। শ্রীশ বিদ্যারত্ন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

শ্রীশ। [উচ্ছ্বসিত] আমি ভাই তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি!

বিদ্যাসাগর। [বিস্মিত] হঠাৎ!

শ্রীশ। তোমার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব দুটো প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি, অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়েছ তুমি। যেমন শাস্ত্র-জ্ঞান, তেমনই লিপিচাতুর্য যেমনি সংযত ভাষা। চমৎকার! এসব কিছুই জানতাম না হে।

বিদ্যাসাগর। এখানে কি ক'রে এলে?

শ্রীশ। আমি প্রথমে তোমার বাড়িতেই গেছলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, তোমার অপেক্ষায় ভূদেব ব'সে আছে। কেউ তোমার সন্ধান দিতে পারলে না, ফেরবার মুখে রাস্তায় দুর্গাচরণের সঙ্গে দেখা হ'ল, সে-ই বললে তুমি এখানে আছ।

বিদ্যাসাগর। ভূদেব আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে? কেন?

শ্রীশ। নৌকোয় না কোথায় এক সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তাই তোমার পরামর্শ নিতে চায় শুনলাম।

বিদ্যাসাগর। সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করেছে?

শ্রীশ। ওই জাতীয় কিছু একটা. ঠিক জানি না আমি।

বিদ্যাসাগর। তুমি এক কাজ কর, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও গিয়ে। তোমার অভিনন্দন আমি মাথা পেতে নিলুম। [হাসিয়া] অনেকের অভিশাপও মাথা পেতে নিতে হচ্ছে, কিন্তু কেবল অভিনন্দন ক'রে ক্ষান্ত দিলেই চলবে না, হাতে কলমে প্রমাণ কর সেটা।

শ্রীশ। কি করতে হবে?

বিদ্যাসাগর। আপাতত এই দরখাস্তটায় সই ক'রে দাও, ওই টেবিলে দোয়াত কলম রয়েছে।

শ্রীশ। কিসের দরখাস্ত?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ যাতে আইনত বৈধ ব'লে গ্রাহ্য হয় তার জন্যে চেষ্টা করছি আমরা। দরখাস্ত করা হচ্ছে ব্যবস্থাপক সভায়।

শ্রীশ। এ তো খুব ভাল কথা।

বিদ্যাসাগর। সই কর।

শ্রীশ। বেশ তো [সহসা] সই করলে কোন বিপদ-টিপদ হবে না তো? মানে—

বিদ্যাসাগর। বিপদ কিসের?

শ্রীশ। বেশ, তা হ'লে দিচ্ছি—কিন্তু—আচ্ছা, তুমি যখন বলছ—

[সই করিয়া দিলেন।]

বিদ্যাসাগর। এবার ভাগনীর বিয়ে দিতে রাজি আছ?

শ্রীশ। ওরা আমার কথা শুনবে কেন, বল?

বিদ্যাসাগর। বেশ, আইনটা পাস হোক, তোমাকেই করতে হবে বিধবা-বিবাহ। আমাদের দলে তুমিই আইবুড়ো আছ এখনও।

শ্রীশ। আমাকে? পরিবার পোষবার সঙ্গতি নেই আমার—

বিদ্যাসাগর। সে তখন দেখা যাবে।

শ্রীশ। রামগোপালবাবু ফেরেন নি বুঝি এখনও?

বিদ্যাসাগর। সে স্নান করতে গেছে, ওর বন্ধু-বান্ধবরাও জুটবে এখনই, আমি ওদের সকলের সই নিয়ে তারপর ফিরব। তুমি ভূদেবকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে, আমার ফিরতে দেরি হবে।

[বিদ্যাসাগব যে খাতাটিতে লিখিতেছিলেন, শ্রীশ সেটি তুলিয়া লইলেন।]

শ্রীশ। এটা কি?

বিদ্যাসাগর। ওটা উপক্রমণিকা। রাজকেষ্টর সংস্কৃত শেখবার শখ হয়েছে, তারই জন্যে সংক্ষেপে একটা সংস্কৃত ব্যাকরণ তৈরি করবার চেষ্টায় আছি। এটা তারই খসড়া। তুমি যাও, আর দেরি ক'র না, ভূদেব হয়তো বিপদে পড়েছে কোন।

শ্রীশ। আচ্ছা।

[শ্রীশ চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর উপক্রমণিকার খসড়ায় মন দিলেন। একটু পরে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার এবং রামতনু লাহিড়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রসিককৃষ্ণ চোগা-চাপকান পরিয়া আছেন, গলায় মাফলার জড়ানো। রাধানাথের পুরা সাহেবী পোষাক, মুখে পাইপ। নিরীহ শান্তমূর্তি রামতনুর পরিধানে গলাবন্ধ কোট ও সাদা প্যাণ্টালুন।]

রাধানাথ। Hallo, we didn't expect you here Pandit. Good evening, how do you do?

[আগাইয়া গিয়া করমর্দন করিলেন। রসিককৃষ্ণ নমস্কার ও রামতনু স্নিগ্ধ হাস্য দ্বারাই সম্ভাষণ শেষ করিয়া উপবেশন করিলেন।]

রাধানাথ। It is awfully cold to-day.

[হাতের তালু দুইটি একত্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিতে করিতে উপবেশন করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। তোমরা সব এমন সময় আজ একজোটে এসে পড়লে যে ?

রসিককৃষ্ণ। এখানে আমাদের ডিনার আজ। রামগোপাল আমাকে বাদ দিলেই পারত !

[মুখের সামনে রুমাল ধরিয়া একটু কাসিলেন। রসিককৃষ্ণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চালচলন কথাবার্তায় একটু হাকিমী ভাব আছে।]

রাধানাথ। ঘোষ গেল কোথা ?

[শিকদার মহাশয়ের বাংলা উচ্চারণ একটু সাহেবী ধরণের।]

বিদ্যাসাগর। সে নাইতে গেছে। [রসিককৃষ্ণকে] তোমার শরীরটা খারাপ নাকি ?

রসিককৃষ্ণ। হঁ্যা।

বিদ্যাসাগর। আশ্চর্য, বর্ধমানে থেকেও তোমার শরীর ভাল থাকছে না ? আমরা তো ওখানে হাওয়া বদলাতে যাই হে।

রাধানাথ। বর্ধমান ঠিক আছে, অতিরিক্ত সাধুতা ক'রেই ভদ্রলোকটি মারা যবার যোগাড় হয়েছেন। ব্যাধিটা মানসিক। [পাইপ ধরাইযা] ঘুষ না নিলে ডেপুটিগিরি করা চলে কখনও ?

[রামতনুর মুখ স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল। রসিককৃষ্ণের গম্ভীর মুখেও মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি কিছু না বলিয়া রাধানাথের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কেবল মাথা নাড়িতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ভালই হয়েছে— তোমরা সবাই এসে পড়েছ, এখন সই কর দিকি সবাই।

রসিককৃষ্ণ। কিসে ?

বিদ্যাসাগর। এই দরখাস্তে। বিধবা-বিবাহের আইন পাশ করাবার জন্তে লাট-দরবারে এক দরখাস্ত দিচ্ছি আমরা।

রাধানাথ। My God ! Are you still running after widows ?

[রামতনুর মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া গেল।]

রামতনু। এত সব করবার সময় পাচ্ছ কি ক'রে ?

রসিক। Really। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ আছে, বিটন কলেজ আছে, চার-চারটে জেলার ইনস্পেক্টারগিরি করা আছে, বাংলা বই লেখা আছে—

রামতনু। কলেজের সামনে মাটি কুপিয়ে একটা কুস্তির আখড়াও বানিয়েছ শুনছি। বিধবা-বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর পাও কখন ?

রাধানাথ। He is a camel—মানুষ নয়, উট।

বিদ্যাসাগর। অত বড় একটা মহৎ প্রাণীর অপমান করছ কেন আমার সঙ্গে তুলনা ক'রে ?

রাধানাথ। তোমার ওই চেহারা আর ওই চরিত্র দেখে অন্য কোন উপমা মনে আসা শক্ত। (সহসা) বাই দি বাই, তুমি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের নাকের সামনে চটিসুদ্ধু পা তুলে ধরেছিলে নাকি ?

বিদ্যাসাগর। সেজন্য লজ্জিত আছি মনে মনে, রাগের মাথায় ক'রে ফেলেছিলাম কাজটা। সবাই জেনে ফেলেছে নাকি ?

রসিককৃষ্ণ। ব্যাপারটা কি ?

রাধানাথ। উনি একদা কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছলেন তাঁর আপিসে। গিয়ে দেখেন, প্রভু টেবিলে পা তুলে দিয়ে চুরুট ফুঁকছেন, [পাইপ ধরাইলেন] একে বসতে পর্যন্ত বললে না লোকটা।

রসিককৃষ্ণ। Fancy !

রাধানাথ। তারপর একদিন কার সাহেবেরও পালা এল। তাঁকেও একদিন আসতে হ'ল এর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এর আপিসে, and he paid him back in his own coins,—চটিসুদ্ধ পা টেবিলে তুলে আলাপ করতে লাগল ; and not only that, ওপরওয়ালা যখন explanation চাইলে ইনি বললেন যে সাহেবের কাছেই এই সহবৎ শিখেছি আমি। আমাদের ভারতীয় ধরণ-ধারণ অন্যরকম, সাহেব আমাকে ওই ভাবে অভ্যর্থনা করলেন দেখে আমার ধারণা হ'ল, এই বুঝি ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করবার বিলাতী কায়দা ! Splendid !

বিদ্যাসাগর। কাজটা ঠিক হয় নি আমার। কার সাহেব অসভ্য ব'লে যে আমাকেও অসভ্য হতে হবে, তার কোন মানে নেই। রাগের মাথায় ক'রে ফেলেছিলাম কাজটা।

রাধানাথ। My dear fellow, take it from me that is one of the noblest deeds of your life এর কাছে বিধবা-বিবাহ-টিবাহ কিছু নয়।

রামতনু। আজকাল নতুন আর কি লিখছ ?

রাধানাথ। Please excuse me, তোমার বাংলা কিন্তু অচল। পুরুষ-পরীক্ষা পাষণ্ডপীড়নের চেয়ে একটু ভাল যদিও কিন্তু তবু অচল।

বিদ্যাসাগর। কি রকম ?

রাধানাথ। যে ভাষা আমাদের স্ত্রীলোকেরা বুঝতে পারে না, সে ভাষায় বই লেখা পণ্ডশ্রম। তোমার ওই জলধরপটল-নির্ঘোষের ভাষায় mass education হতে পারে না।

বিদ্যাসাগর। সৎসাহিত্য mass-এর জন্যে নয়। তোমার বন্ধু প্যারীচাঁদের মত মেছুনী গয়লানীর ভাষায় লিখলে তোমাদের মনঃপূত হয় জানি, কিন্তু তা আমি পারব না।

রাধানাথ। তা ছাড়া উপায় কি, দেশ সুদ্ধই যে মেছুনী গয়লানী !—It is not good casting pearls before swine.

[ঘড়িটিতে আটটা বাজিল, রামতনু উঠিয়া দাঁড়াইল।]

রামতনু। নবীন আটটার সময় যেতে বলেছে, ঘুরে আসি চট করে আমি।

বিদ্যাসাগর। সেখানে কেন ?

রামতনু। আমার বামুনটা পালিয়েছে ভাই, নবীন একটা যোগাড় ক'রে রাখবে বলেছে।

বিদ্যাসাগর। তোমার আবার বামুনের দরকার কি ? বাবুর্চি খানসামা যা হোক একটা কিছু হ'লেই তো চলা উচিত তোমার।

রামতনু। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই আপত্তি নেই, কিন্তু বাড়ির ভেতরে যে বামুন ছাড়া চলবে না ভাই।

বিদ্যাসাগর। বাপের কথায় পৈতেগাছটি রাখতে পারলে না, এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ !

রাধানাথ। Nothing to be ashamed of রেভারেণ্ড কেষ্টমোহনেরও গোঁড়া পরিবার আছে এবং খুব সম্ভবত তাকেও তার জন্যে গঙ্গাজল সরবরাহ করতে হয়।

রসিককৃষ্ণ। এই সব দুঃখেই তো বিয়ে করিনি।

রামতনু। আমি যাই ভাই। [চলিয়া গেলেন।]

রাধানাথ। পরিবারের ভয়ে বেচারা তটস্থ।

রসিক। এইটি যে বেচারার বরাতে অনেক কষ্টে টি঳কে গেছে।

রাধানাথ। ওর বরাতটাই খারাপ, সেবার কোথায় পিক্‌নিক করতে গিয়ে কাটলে খাসি, রটে গেল গরু কেটেছে!

রসিককৃষ্ণ। ছেলেটি মারা যাওয়াতে সত্যিই মুষড়ে পড়েছে বেচারা।

বিদ্যাসাগর। সে তো বছরখানেক হয়ে গেল, নয়?

রসিককৃষ্ণ। হ্যাঁ—in 1850।

[রেস্তারেও কৃষ্ণমোহন প্রবেশ করিলেন।]

কৃষ্ণমোহন। Wordsworth and Balzac died in 1850. Are we discussing them?

রাধানাথ। তোমার এত দেরি যে?

কৃষ্ণমোহন। গৌরদাস বসাকের পাল্লায় পড়েছিলাম। সে কার কাছ থেকে শুনেছে আমি মাদ্রাজ যাব, এমনই এসে ধরেছে।

রাধানাথ। কেন, পরিবারের জন্তে মাদ্রাজী শাড়ী আনতে দেবে?

কৃষ্ণমোহন। মধু মাদ্রাজে আছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিদ্যাসাগর। বাজে কথায় বড্ড সময় নষ্ট হচ্ছে। দরখাস্তটিতে সই ক'রে দাও তোমরা, আমি যাই, অনেক কাজ আমার।

কৃষ্ণমোহন। What are you about?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহের আয়োজন করছি।

[কৃষ্ণমোহন shrug করিলেন। খানসামা একটি ট্রেতে করিয়া কয়েক গ্লাস মদ লইয়া প্রবেশ করাতে বিধবা-বিবাহ-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। রাধানাথ, রসিককৃষ্ণ, কৃষ্ণমোহন প্রত্যেকে একটি করিয়া গ্লাস লইলেন, বিদ্যাসাগর লইলেন না।]

রাধানাথ। Well, pandit, have a peg.

বিদ্যাসাগর। ওসব আমার সয় না ভাই।

রাধানাথ। ও বাবা! বিধবা-বিবাহ দেবার মত উদারতা আছে, এক ঢোক মদেই যত আপত্তি!

বিদ্যাসাগর। দুটো জিনিস কি এক হ'ল?

কৃষ্ণমোহন। I wonder.

রাধানাথ। দেখ, আজীবন আমি অঙ্কশাস্ত্র চর্চা ক'রে এসেছি and I am fond of accuracy, আমি বলছি, দুটো জিনিসেরই motive power এক। যে energy রেলগাড়ি চালাচ্ছে, সেই energyই জাহাজ চালাচ্ছে। তোমার ভাষাতেই বলছি—যে যুক্তি তোমাকে বিধবা-বিবাহে প্রণোদিত করিয়াছে সেই যুক্তিই আমাদিগকে মদ্যপানে প্ররোচিত করিতেছে। উভয় কার্য দ্বারাই আমরা এই অধঃপতিত বঙ্গসমাজের কুসংস্কার-মহীরুহ-মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। অতএব আইস ভাই,—

[সকলে হাসিয়া উঠিলেন।]

বিদ্যাসাগর। নেশা করবার তাগদ নেই আমার!

রাধানাথ। তাগদের তো অভাব দেখি না। চেষ্টা করেছ কখনও?

[স্নান সমাপন করিয়া রামগোপাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

রাধানাথ। Well Ghose, you promised us a nautch girl this evening, but we find her!

[বিদ্যাসাগরকে দেখাইলেন। রামগোপাল একটি গ্লাস তুলিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।]

রামগোপাল। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ এসে গেলেন যে।

বিদ্যাসাগর। আমি বিদেয় হচ্ছি, তোমরা চটপট সই ক'রে দাও না। [রামগোপালকে] তোমার শুধু সই করলেই চলবে না, একটু চেষ্টাও করতে হবে।

রামগোপাল। আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমি চেষ্টা করলে উল্টো ফল হবে, সরকার আমাকে সুনজরে দেখে না, জানই তো।

রাধানাথ। আহা, সরকারের ভারী দোষ যেন! লাট-সায়েব যেচে ওঁকে চাকরি দিতে চাইলেন, উনি বললেন—রাস্তার পাথর ভেঙে খাব, তবু তোমাদের গোলামি করব না। সেদিন হ্যালিডে সায়েবকে—

রসিককৃষ্ণ। Yes, it was very sharp!

[খানসামা আসিয়া প্রবেশ করিল।]

খানসামা। হুজুর, বাইজীকে মানা করতে যে গেসল, তার সঙ্গে বাইজীর দেখা হয় নি। ওরা সব এসে গেছে।

[রামগোপাল এক নিশ্বাসে মদটুকু শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রাধানাথের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।]

রামগোপাল। ওই ঘরটায় ঠিক করা যাক তা হ'লে। ওরে, পূব দিকের ঘরটায় নিয়ে যা ওদের। আচ্ছা, চল, আমিই যাচ্ছি।

[সোৎসাহে চলিয়া যাইতেছিলেন।]

বিদ্যাসাগর। সই ক'রে দিয়ে যাও।

রামগোপাল। ও, হ্যাঁ। [টেবিল হতে এক কলম কালি লইলেন।] কই দাও।

[বিদ্যাসাগর দরখাস্ত আগাইয়া দিলেন। রামগোপাল খসখস করিয়া সই করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। [রাধানাথকে] নাও, এবার সই কর।

রাধানাথ। আমি করব না।

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] কেন ?

রাধানাথ। On mathematical grounds.

কৃষ্ণমোহন। Well this is rather—

[shrug করিলেন ; রসিককৃষ্ণ হাসিলেন।]

বিদ্যাসাগর। Mathematical grounds মানে কি ?

রাধানাথ। Newton's third law states—To every action there is an equal and opposite reaction.

বিদ্যাসাগর। ধাঁধাটা ভেঙেই বল না বাপু।

রাধানাথ। বিধবারাই এখন আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়, আমাদের এখন প্রধান সমস্যা শিক্ষা, বিশেষ ক রে স্ত্রীশিক্ষা—

রসিককৃষ্ণ। You are carrying coal to Newcastle man.

বিদ্যাসাগর। গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করছি তো ভাই যথাসাধ্য।

রাধানাথ। কিন্তু তোমার ওই বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে একটি বালিকা আসবে না, যদি তুমি বিধবা-বিবাহের হাঙ্গামা তোল।

বিদ্যাসাগর। কি রকম ?

রাধানাথ। First of all, your energy will be divided, এবং দ্বিতীয়ত, লোকে ভড়কে যাবে।

কৃষ্ণমোহন। A reasonable point of view, no doubt.

[খানসামা প্রবেশ করিয়া গড়গড়াটা লইয়া গেল।]

বিদ্যাসাগর। তোমার যুক্তিটা অনেকটা সেই বীরপুরুষের যুক্তির মত হ'ল দেখছি।—এক বীরপুরুষ শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, হঠাৎ তার কানে একটা বিছের বাচ্চা ঢুকে পড়ল, ধড়মড় ক'রে উঠে বসল সে, কিন্তু মুখ বিকৃত ক'রে ব'সেই রইল চুপ ক'রে। একটু পরে তার এক বন্ধু এল, তাকে জিজ্ঞাসা করলে—'অমন ক'রে ব'সে আছ কেন, কি হয়েছে তোমার?' 'কানে একটা প্রকাণ্ড কি ঢুকেছে।' 'সর্বনাশ, চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন তা হ'লে? বার করবার চেষ্টা কর।' বীরপুরুষ উত্তর দিলেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশের কার্য ভিন্ন অন্য কোন কার্যে শক্তি ক্ষয় করব না' তোমার তাই হ'ল দেখছি!

[সকলে হাসিয়া উঠিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ওসব পাগলামি ছাড়, সই কর।

রাধানাথ। Please excuse me. I stick to my own calculations. তা'ছাড়া আমাদের সইয়ের মূল্য কি, we are out-casts in society.

[মদে চুমুক দিলেন। ভূদেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কি হে, তুমি এক সাহেবের সঙ্গে মারামারি করেছ?

ভূদেব। ঠিক মারামারি নয়।

বিদ্যাসাগর। তবে?

ভূদেব। কাল এক সাহেব জোর ক'রে আমার নৌকাতে উঠে ব'সে মাঝিকে বললে—টমসন ঘাটে চল। আমি বললাম, সাহেব, এটা আমার নৌকা, আমি আরমানী ঘাটে যাব। সায়েব কিছুতে শোনে না, জোর-জবরদস্তি করতে চায়, তখন তাকে বলতে বাধ্য হলাম যে, জলে ফেলে দেব তোমাকে।

বিদ্যাসাগর। বেশ বলেছ। তারপর?

ভূদেব। আমার ভাবগতিক দেখে সায়েব ঠাণ্ডা হ'ল। আমি আরমানী ঘাটে নেবে গেলাম, তারপর মাঝিকে বললাম সায়েবকে টমসন ঘাটে পৌঁছে দিতে। এখন শুনছি, লাটসায়েবের সঙ্গে তার আলাপ আছে। আমার নামে লাগিয়ে যদি কিছু করে, তাই আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিলাম কি করা উচিত। প্রাট সাহেবকে তো চেনেন—

বিদ্যাসাগর। ও সব কিচ্ছু করবে না। সায়েবরা আমাদের মত মার খেয়ে নাকে কেঁদে বেড়ায় না। যদি করে, তখন দেখা যাবে'। তুমি এখন এই দরখাস্তটায় সই কর দিকি। [দরখাস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।]

ভূদেব। কিসের দরখাস্ত ?

বিদ্যাসাগর। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করবার জন্যে দরখাস্ত।

ভূদেব। আমায় মাপ করুন, আমি সই করতে পারব না।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

ভূদেব। আমি বিধবা-বিবাহের বিরোধী।

বিদ্যাসাগর। আমার প্রস্তাব দুটো পড়েছ ?

ভূদেব। পড়েছি, কিন্তু আমার মত বদলায় নি। আমার মনে হয়, স্ত্রী পুরুষ কারও দ্বিতীয়বার বিবাহ করা উচিত নয়।

বিদ্যাসাগর। ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ ?

ভূদেব। দেখেছি।

বিদ্যাসাগর। বেশ, তা হ'লে আর কিছু বলবার নেই আমার।

ভূদেব। আমি যাই তা হ'লে।

বিদ্যাসাগর। এস। [নমস্কারান্তে ভূদেব চলিয়া গেলেন।]

কৃষ্ণমোহন। I admire his grit.

বিদ্যাসাগর। ওইতেই ডুবছে দেশটা। এই বামনাই খেয়েছে আমাদের [রসিককৃষ্ণকে] এস, তুমি সইটা ক'রে দাও, অনেক জায়গায় যেতে হবে আমাকে এখনও।

[রাধানাথ এতক্ষণ ধীরে ধীরে সুরাপান করিতে করিতে ইঁহাদের কথোপকথন উপভোগ করিতেছিলেন। সুরা শেষ করিয়া তিনি গ্লাসটি নামাইয়া রাখিলেন এবং পাইপে তামাক ভরিতে লাগিলেন।]

রাধানাথ। হ্যাঁ। ওর সইটা নাও, ও ডেপুটি মানুষ, আমার মতন সিভিলিয়ানদের সঙ্গে হাতাহাতি ক'রে জরিমানা দেয় নি, লাট-দরবারে ওর সইয়ের খাতির হতে পারে। [সহসা আপন মনে] By Jove, I am almost in love with Bhudeb. [পাইপ ধরাইলেন ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।] Excuse me আমি দেখে আসি, রামগোপাল কতদূর কি করছে!

[বাহির হইয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। নাও, এস। [রসিককৃষ্ণ মাথা নাড়িতে লাগিলেন।] সে কি, তুমিও করবে না ?

রসিককৃষ্ণ। ওসব আবেদন-নিবেদনের ওপর আমার আস্থা নেই।

বিদ্যাসাগর। আস্থা নেই! তোমার তো অন্তত জানা উচিত যে, আইন না হ'লে এদেশে কিছু হবে না।

রসিককৃষ্ণ। আইন নিয়ে ঘাটাঘাটি করি ব'লেই বলছি—কেবল আইন ক'রে সত্যকার কিছু হয় না। চুরির বিরুদ্ধে আইন আছে, কিন্তু চুরি বন্ধ হয় নি।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু ও আইন কোন কিছু বন্ধ করবার জন্যে হবে না, একটা ভাল প্রথা প্রচলিত করবার জন্যে হবে।

রসিককৃষ্ণ। আইন ক'রে কোন প্রথা প্রচলিত করা যায় না। সমাজ যদি সেটাকে গ্রহণ না করে, it will be a dead law তা ছাড়া ক্রমশই আমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, ইংরাজরা এদেশে যে-সব আইন করেছেন তা আমাদের হিতার্থে ততটা নয়, যতটা তাঁদের নিজেদের হিতার্থে। তোমার এ আইন যদি পাশ করেন ওঁরা, তা হ'লে করবেন নিজেদের popularity বাড়াবার জন্যে, আমাদের সমাজ-সংস্কারের জন্য নয়। অর্থাৎ যদি—

বিদ্যাসাগর। ওসব যদি-টদি ছাড়, সোজাসুজি বল, তুমি বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত মনে কর কি'না।

রসিককৃষ্ণ। বিধবা কুমারী সকলেরই বিবাহ হওয়া উচিত if possible

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে করতে আপত্তি কি? শাস্ত্রেও এর বিধান আছে যখন—

রসিককৃষ্ণ। শাস্ত্রে যখন আছে, দাও না বিধবার বিয়ে, গভর্ণমেন্টের দ্বারস্থ হচ্ছ কেন? কই, কুমারীর বিয়ের জন্যে কেউ তো গভর্ণমেন্টের দ্বারস্থ হচ্ছে না?

বিদ্যাসাগর। দ্বারস্থ হচ্ছি কি সাধে! এদেশের লোক যুক্তি বোঝে না। আইন আর শাস্ত্র বোঝে। অনেক রকম চেষ্টা ক'রে বাধ্য হ'য়ে আমি শেষে এ রাস্তা ধরেছি।

রসিককৃষ্ণ। আমায় ক্ষমা কর ভাই, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।

কৃষ্ণমোহন। Don't press him, don't forget the গঙ্গাজল-incident —he is a hard nut to crack. His বিশ্বাস,—[shrug করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। গঙ্গাজল-incident আবার কি?

কৃষ্ণমোহন। ওকে আদালতে একবার সাক্ষী দিতে হয়েছিল। কোর্ট

as usual বললে—তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কর, তুমি মিথ্যা বলবে না। রসিককৃষ্ণ ব'লে উঠল—তামা তুলসী গঙ্গাজলে আমার বিশ্বাস নেই, আমি ওসব ছুঁয়ে শপথ করতে পারব না ; and he didn't. There was a great noise, মনে নেই তোমার ?

বিদ্যাসাগর। না, আমার মনে নেই, শুনিও নি বোধ হয়। বেশ, ওর বিশ্বাস নিয়ে ও থাকুক। তুমি সই কর, তোমার আশা করি—

কৃষ্ণমোহন। [ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে] My dear Pandit, I am extremely sorry to hurt you. কিন্তু মাপ কর ভাই, আমিও পারব না।

বিদ্যাসাগর। তুমিও পারবে না। তোমার হেতুটা কি ?

কৃষ্ণমোহন। আমার হেতু—well, to put it crudely, my profession.

বিদ্যাসাগর। প্রফেশন ?

কৃষ্ণমোহন। হাঁ। [হাসিয়া] কালিদাস অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি যে ডালে বসে ছিলেন, সেই ডালটা কাটতে সাহস করেছিলেন, আমরা সাধারণ লোকেরা তা পারি না। বিধবাদের তোমাদের সমাজে বিয়ে হয় না ব'লেই আমরা তাদের ক্রিশ্চান করতে পারি, কিন্তু রাজার সাহায্য নিয়ে তুমি যদি তাদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর, আমাদের সে পথটি বন্ধ হবে। You believe in king, but I believe in both king and Christ.

বিদ্যাসাগর। অর্থাৎ তুমিও সই করছ না তা হ'লে। তোমাদের মুখেই যত আস্ফালন।

কৃষ্ণমোহন। ভুল বুঝো না আমায়, যুক্তির দিক দিয়ে আমি স্বীকার করি যে, বিধবামাত্রেরই বিয়ে হোক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি বিশ্বাস করি যে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পথ বন্ধ করা পাপ।

বিদ্যাসাগর। দেখ, চালাকির দ্বারা কখনও কোন মহৎ কর্ম সাধিত হয় না। তাসের ঘর টোকা লাগলেই প'ড়ে যায়।

কৃষ্ণমোহন। I am extremely sorry, Pandit I would have been really glad to help you, believe me, I have every sympathy.

বিদ্যাসাগর। ও সব মৌখিক sympathy-র তোয়াক্কা করি না আমি। রাধাকান্ত দেবেরও sympathy ছিল, কিন্তু তিনি প্রাণপণে এর বিরুদ্ধাচরণ করছেন।

কৃষ্ণমোহন। [যেন কথাটা মনে পড়িয়া গেল] Yes, that's another point ক্রিশ্চান মিশনারি হয়ে রাধাকান্ত দেবের মত প্রতাপশালী লোকের বিপক্ষে যাওয়া আমার সাজে না। Simply, I shouldn't

[সহসা দূরের একটা ঘর হইতে বাইজী-কণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল।]

বিদ্যাসাগর। বেশ, চললুম। [দরখাস্তটা দুই হাত দিয়া গোল করিয়া পাকাইতে পাকাইতে] তোমাদের আসর তৈরি হয়েছে, গান শোনগে যাও। কিন্তু ভুলেও ভেবো না যেন, তোমাদের সইয়ের অভাবে বিধবাবিবাহ আটক থাকবে। [সহসা ঝুকিয়া কৃষ্ণমোহনের মুখের সামনে হাত নাড়িয়া] কিছু আটকাবে না।

[নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। রসিককৃষ্ণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণমোহন shrug করিলেন।]

চতুর্থ অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার নূতন বাসা। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসা বদলাইযাছেন। বসিবার ঘরটি একটু বেশি প্রশস্ত। আসবাবপত্রও কিছু বেশি, নিখুঁত পরিচ্ছন্নতাই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ডাক্তার দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। একটু ব্যস্তবাগীশ ভাব।]

দুর্গাচরণ। ঈশ্বর! ঈশ্বর! [অনুজ দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন।]

দীনবন্ধু। দাদা, বাড়ি নেই।

দুর্গাচরণ। কোথা গেছে?

দীনবন্ধু। ডোমপাড়ায় একজনেব কলেরা হয়েছে, তিনি সেইখানেই গেছেন।

দুর্গাচরণ। কখন গেছে?

দীনবন্ধু। কাল রাত থেকে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

দুর্গাচরণ। তাই নাকি! তা হ'লে তো—আচ্ছা, আমি পরে আসব এখন। তাকে ব'ল, আমি এসেছিলাম।

দীনবন্ধু। আচ্ছা।

[দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণও চলিযা যাইতেছিলেন, কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থামিয়া গেলেন।]

দুর্গাচরণ। মদন নাকি?

মদনমোহন। নিঃসন্দেহে।

দুর্গাচরণ। কখন এলে?

মদনমোহন। এইমাত্র।

দুর্গাচরণ। হঠাৎ?

মদনমোহন। ঈশ্বরের চিঠি পেয়ে।

দুর্গাচরণ। বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়ে গেছে, জান তো ?

মদনমোহন। খুব জানি, বিধবা-বিবাহের পাত্রীর খবর নিয়েই এসেছি।

দুর্গাচরণ। তাই নাকি ! কিন্তু পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না যে।

মদনমোহন। পাত্র ঈশ্বর সৃজন করবেন। মহাপ্রভু কোথায় ?

দুর্গাচরণ। সে কলেরা-রোগীর সেবা করতে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই।

মদনমোহন। এস, তা হ'লে উপবেশন করা যাক।

দুর্গাচরণ। আমি আর উপবেশন করব না, আমার কল সারা হয় নি এখনও। তুমি উপবেশন কর, আর ঈশ্বর এলে এইটে দিও তাকে, ব'ল— কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পত্রিকাখানি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, একটু পরে সে নিজেও আসছে। [মদনমোহনকে একটি পত্রিকা দিলেন।]

মদনমোহন। সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা !

দুর্গাচরণ। সব রকম তত্ত্বই আছে ওতে। প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য—কিছু আর বাকি রাখেনি ছোকরা।

মদনমোহন। [সবিস্ময়ে] বটে !

দুর্গাচরণ। আমি চলি তা হ'লে।

মদনমোহন। আচ্ছা। [দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন।]

মদনমোহন। দীনু ! ও ছিরু ! [দীনবন্ধুর প্রবেশ]

দীনবন্ধু। আপনি কখন এলেন ? [প্রণাম করিলেন।]

মদনমোহন। এখনই।

দীনবন্ধু। দাদা বাড়ি নেই।

মদনমোহন। তা শুনেছি, তুমি এক কল্কে তামাকের ব্যবস্থা কর দিকি ভাই।

দীনবন্ধু। আপনি একেবারে ভেতরেই চলুন না, হাত পা ধুয়ে কিছু খান আগে, দাদা আপনার জন্যে মতিচুর আনিয়ে রেখেছেন কাল থেকে।

মদনমোহন। খাব না এখন, মুখটা ধুইগে চল।

[সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা টেবিলের উপর রাখিলেন ও টেবিল হইতে এক গোছা মনিঅর্ডার ফর্ম তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

মদনমোহন। এত মনি-অর্ডার কোথায় যাচ্ছে ?

দীনবন্ধু। দাদা প্রত্যেক মাসে মাসে পাঠান চারদিকে। সব টাকাকড়ি তো এই ক'রেই গেল, অথচ কিছু বলবার জো নেই।

[রামগোপাল ঘোষের খানসামা প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে বাক্স মাথায় একজন কুলি, বাক্সটি সুন্দর।]

খানসামা। [সেলাম করিয়া] হুজুর, ঘোষ সাহেব এই বাক্স আর চিঠি দিয়েছেন।

দীনবন্ধু। কোন্ ঘোষ সাহেব ?

খানসামা। রামগোপাল ঘোষ।

দীনবন্ধু। আচ্ছা, বাক্সটা কোণে নামিয়ে রাখ।

• [দীনবন্ধু পত্রখানি টেবিলে রাখিলেন। বাক্সটি যথাস্থানে রাখিয়া খানসামা ও কুলি চলিয়া গেল।]

মদনমোহন। বাক্স কিসের ?

দীনবন্ধু। জানি না।

মদনমোহন। চল।

[চলিয়া গেলেন। দীনবন্ধুও অনুসরণ করিতেছিলেন, এমন সময় সৌখিন পাঞ্জাবি পরিহিত একটি যুবক আসিযা প্রবেশ করিলেন।]

দীনবন্ধু। ও, আপনি আবার এসেছেন! দাদা এখনও ফেরেন নি কিন্তু!

যুবক। আমার কালই কলেজে মাইনে দেবার শেষ দিন, এখানেই তা হ'লে একটু অপেক্ষা করি।

দীনবন্ধু। করুন। দাদার ফেরবার কিন্তু ঠিক নেই।

[চলিয়া গেলেন, যুবক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। এই যে ঠিক এসেছ দেখছি।

যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল কলেজে মাইনে দেবার দিন।

বিদ্যাসাগর। আতরের দর আজকাল কত ক'রে ?

যুবক। [বিস্মিত] আতরের দর!

[বিদ্যাসাগর সহসা যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।]

বিদ্যাসাগর। বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে, তোমাদের মুখদর্শন করলেও পাপ হয়।

যুবক। আমি—

বিদ্যাসাগর। কাল তোমাদের কলেজে গিয়ে শুনলাম, ছ' মাস আগে তুমি কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে স'রে পড়েছ, অথচ আমার কাছে প্রতি মাসে এসে মাইনেটি নিয়ে যাচ্ছ। তোমরা কি! [যুবক অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।] দাঁড়িয়ে রইলে কেন, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। কোন দিন আর এস না।

যুবক। আমার বাবা মারা গেছেন ব'লে পড়া ছাড়তে হয়েছে, আপনি কলেজের মাইনের জন্যে যা দেন, তাইতেই সংসার চলছে কায়ক্লেশে, পাছে আপনি টাকা বন্ধ করেন, সেই জন্যে—[কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

বিদ্যাসাগর। [পাঞ্জাবি দেখাইয়া] এই কি কায়ক্লেশের নমুনা?

যুবক। [অশ্রু মুছিয়া] ওটা শ্বশুর-বাড়ির।

বিদ্যাসাগর। ও, বিয়েও করা হয়েছে!

[যুবক অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিদ্যাসাগর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।]

পাঁচটা টাকা নিয়ে তা হ'লে আর কি হবে? কাল বরং কলেজে দেখা ক'র, দেখি যদি চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি একটা। এতদিন সত্যি কথাটা বলতে কি হয়েছিল? [যুবক নিরুত্তর।] আচ্ছা, যাও এখন, কাল কলেজে এস।

[যুবক প্রণাম করিয়া গেলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। [সোচ্ছ্বাসে] তুই এসে গেছিস, আমি জানতাম ঠিক তুই আসবি, কখন এলি? [তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

মদনমোহন। ছাড় ছাড়, এ বুড়ো বয়সে আর চুম্বনটা ক'র না, আলিঙ্গন পর্যন্তই থাক।

বিদ্যাসাগর। ব'স, তারপর ওদিকের খবর কি?

মদনমোহন। স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্ক লক্ষ্মীং
কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু
বন্ধুক কান্তিমধরেষু মনোহরেষু
ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ।

মদনমোহন। কলকাতা ব'লে বুঝতে পারছ না তুমি, কিন্তু সত্যই শরৎকাল গতপ্রায়, হেমন্তের আভাস দেখা দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর। কি বিপদ, আমি জিগ্যেস করছি পাত্রীটির খবর, আর তুই ঋতুসংহার আওড়াচ্ছিস !

মদনমোহন। বিধবাদের প্রসঙ্গে ঋতুসংহারের প্রয়োগ এখন তো আর অপপ্রয়োগ নয় ভাই। তোমার কলেরা-রোগী কেমন আছে আগে বল।

বিদ্যাসাগর। অনেকটা ভাল, কিন্তু এখনও বিপদ কাটে নি, আবার যাব একটু পরে !

[দ্বারপ্রান্তে কালীপ্রসন্ন সিংহ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তরুণকান্তি প্রিয়দর্শন কিশোর, বয়স ষোল-সতেরো, পরিধানে মূল্যবান চোগা-চাপকান, মাথায় জরির কাজ-করা টুপী।]

বিদ্যাসাগর। এস এস কালীপ্রসন্ন, কি মনে ক'রে ?

[কালীপ্রসন্ন প্রবেশ করিয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন।]

কালীপ্রসন্ন। আমাদের বিদ্যোৎসাহিনীর আজ একটা মিটিং হবে, আপনি আসবেন কি ?

বিদ্যাসাগর। মদন এসেছে, আজ আর বোধ হয় পারব না।

কালীপ্রসন্ন। সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা দেখেছেন ?

মদনমোহন। তোমার কাগজ যখন এল ও তখন ছিল না। এই নাও, রামগোপাল ঘোষের ওখান থেকে একখানা চিঠি আর একটা বাক্সও এসেছে —এই সেই চিঠি আর ওই বাক্স।

বিদ্যাসাগর। চিঠি ? কই দেখি। [চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন] এদের ডেঁপোমিটা দেখ একবার।

মদনমোহন। কি, ব্যাপার কি ?

বিদ্যাসাগর। পড়ছি শোন,—হে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, অদূর-ভবিষ্যতে যে বিধবা-বিবাহটি সংঘটিত হইবেক তাহাতে তুমিই যে একাধারে বরকর্তা ও কন্যাকর্তার পদ অলঙ্কৃত করিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই, সেইজন্য এতৎসহ বিধবা-বিবাহের প্রথম দম্পতীকে যৎসামান্য উপহার তোমার সকাশেই প্রেরিত হইল। হে উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণ, এই সামান্য উপহার পরিগ্রহণ করতঃ তোমার অযোগ্য বন্ধুগণকে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে

আবদ্ধ করহ ইহাই তাহাদের একান্ত অনুরোধ। ইতি শ্রীরাধানাথ শিকদার, শ্রীরসিককৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামগোপাল ঘোষ।

মদনমোহন। ঠিক মনে হচ্ছে, যেন তুমি নিজে লিখেছ।

বিদ্যাসাগর। লিখেছে রাধানাথ শিকদার, আমার ভাষার নকল ক'রে।

মদনমোহন। কি কি জিনিস দিয়েছে দেখি—[বাক্সের ডালা তুলিয়া দেখিলেন, কৌতূহলী কালীপ্রসন্নও দেখিতে লাগিলেন।] খুব দামী দামী জিনিস দিয়েছে হে রূপোর বাসন, বেনারসী শাড়ি, ভাল ভাল রেশমের জামা-কাপড়। ও বাবা, আতর, গোলাপজল—এখানা কি—আচ্ছা, কি ফাজিল দেখ দিকি—জয়দেবের গীত-গোবিন্দ একখানা দিয়েছে!

বিদ্যাসাগর। ওসব রাখ তুই, আসল কথাটা বল আগে। এত সব কাণ্ডের পর একটা বিয়ে দিতে না পারলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার।

মদনমোহন। বিধবা পাত্রী ঠিক করেছি, নাম কালীমতি, কিন্তু তার মাকে হাজার টাকা দিতে হবে, তা না হ'লে তিনি রাজি হবেন না।

বিদ্যাসাগর। হাজার টাকা!

মদনমোহন। গরজ আমাদের, তাঁর নয়।

বিদ্যাসাগর। অত টাকা তো আমার হাতে নেই ভাই।

মদনমোদন। টেবিলের ওপর অনেকগুলি মনি-অর্ডার লেখা রয়েছে দেখলাম, ওগুলি কি—

বিদ্যাসাগর। আজই পাঠাতে হবে। তারপর আমার হাতে আর একটি পয়সা থাকবে না। [অপ্রত্যাশিতভাবে কালীপ্রসন্ন কথা কহিলেন।]

কালীপ্রসন্ন। টাকার জন্যে আটকাবে না।

বিদ্যাসাগর। তুমি দেবে?

[কালীপ্রসন্ন চুপ করিয়া রহিলেন। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল।]

কালীপ্রসন্ন। আমি যাই এবার, মিটিং-এর আর দেরী নেই বেশি। টাকাটা কালই আমি পাঠিয়ে দেব। [প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। এ যে তাক লাগিয়ে দিয়ে গেল রে!

মদনমোহন। শ্রীশ কি বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?

বিদ্যাসাগর। চাকরি-বাকরির লোভ দেখিয়ে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। এখনই আসবে সে। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি বাগড়া লাগাতে চেষ্টা

মদনমোহন। তা' তো করবেনই—

বিদ্যাসাগর। এ দেশে কোন একটি সৎকার্য করবার কি জো আছে! তোর মেয়ে ভুটোর নামের সঙ্গে বিটন সায়েবের নাম জড়িয়ে কি কুৎসাটা রটাচ্ছে শুনেছিস তো?

মদনমোহন। শুনেছি। [হাসিলেন।]

বিদ্যাসাগর। হাসছিস যে?

মদনমোহন। ভয় কি, অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

[শ্রীশ বিদ্যারত্ন প্রবেশ করিলেন।]

শ্রীশ। আমি ভেবে দেখলাম ভাই, আমি পারব না। আমার আত্মীয়-স্বজনরা—

বিদ্যাসাগর। এখন পেছনো অসম্ভব, মদন পাত্রী ঠিক ক'রে এসেছে।

শ্রীশ। আমার ভাই, কেমন যেন—মানে ভয় করছে।

বিদ্যাসাগর। আইনসঙ্গতভাবে একটি মেয়েমানুষকে বিয়ে করবে তাতে ভয়টা কি?

শ্রীশ। আমার আত্মীয়-স্বজনরা রাজি হবে কেন?

বিদ্যাসাগর। তাদের রাজি করবার ভার আমি নিচ্ছি, তুমি ঠিক থাক।

শ্রীশ। আরে ছ্যাৎ, পাগল নাকি, কি যে বল।

মদনমোহন। পাত্রীটি পরমাসুন্দরী।

বিদ্যাসাগর। এ বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

শ্রীশ। [বিব্রত] পাগল নাকি।

বিদ্যাসাগর। [সানুনয়ে] অমত করিস না ভাই, লক্ষ্মীটি তোর পায়ে ধরছি আমি। [পায়ে ধরিতে গেলেন।]

শ্রীশ। আঃ, কি কর তুমি।

বিদ্যাসাগর। [সহসা উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে] এ বিয়ে তোমাকে করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে—

[মদনমোহন স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সম্মুখ-ভাগের খানিকটা অংশ। এই অংশটুকুতে যদিও চার পাঁচ জনের বেশি লোক দেখা যাইতেছে না, কিন্তু একটা কলগুঞ্জন হইতে বেশ বোঝা যাইতেছে যে অদৃশ্য অংশ জনবহুল। ভিতরে সানাই বাজিতেছে। ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৮৫৬ সাল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।]

১ম ব্যক্তি। উঃ, রাস্তায় ভিড় হয়েছে দেখেছিস, বড় রাস্তাটাতে তো পা ফেলবার জায়গা নেই!

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি পুলিস ফোর্স এসেছে কেল্লা থেকে।

[এ কথার কেহ জবাব দিল না।]

১ম ব্যক্তি। বিধবার বিয়ে দিলে, তবে ছাড়লে! বাহাদুর লোক বটে বাবা এই বিদ্যাসাগর!

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি লাটসাহেব বরযাত্রী এসেছে।

৩য় ব্যক্তি। ওটা একদম বাজে কথা।

১ম ব্যক্তি। কিছুই অসম্ভব নয়। এ দেশে বিধবার যে বিয়ে হতে পারে, তাই বা কে ভেবেছিল বল আগে?

৪র্থ ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর অত কাঁচা ছেলে নয় যে, এ বিয়েতে সাহেবকে নিয়ে আসবে। সাহেব আসতে চাইলেও বাধা দিত বিদ্যাসাগর।

৩য় ব্যক্তি। কেন, তাতে ক্ষতিটা কি?

৪র্থ ব্যক্তি। ক্ষতি এই যে, দেশের লোকে তা হ'লে বলবে—ও সাহেবী বিয়ে হয়েছে, হিন্দু বিয়ে হয়নি। সেটি তোমাদের বলতে দেবে না বিদ্যাসাগর, হুঁ হুঁ।

১ম ব্যক্তি। তা বটে, যা বলেছ।

৪থ ব্যক্তি। সেদিকে ও ঠিক আছে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে পুরো হিঁদুয়ানি মতে বিয়েটি দেবে ও। খুঁতটি রাখবে না।

[ব্যস্তসমস্তভাবে পঞ্চম ব্যক্তির প্রবেশ।]

৫ম ব্যক্তি। বর এসে গেছে?

৩য় ব্যক্তি। কোন্ কালে।

১ম ব্যক্তি। শুধু এসে গেছে? বাজনা বাজিয়ে তুবড়ি ফুটিয়ে, আলোর বাহার দিয়ে, দস্তুরমত সমারোহ ক'রে এসে গেছে। দেখবার মত প্রসেশন হয়েছিল একটা মল্লিকদের বাড়ির প্রসেশনের পর এমন প্রসেশন আর দেখিনি আমি।

৫ম ব্যক্তি। আহা, আমার দেখা হ'ল না হে!

৩য় ব্যক্তি। তুমি এতক্ষণ ছিল কোন্ চুলোয?

৫ম ব্যক্তি। আমার বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেল। জানই তো আমার ছোট ছেলেটা যেমন ন্যাওটো, তেমনই বায়নাদার। তাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে এলাম। জেগে থাকলেই সঙ্গে আসতে চাইত।

১ম ব্যক্তি। সঙ্গে আনলেই পারতেন, প্রসেশনটা দেখা উচিত ছিল।

৫ম ব্যক্তি। এক বায়নাদার কাঁদুনে ছেলে ঘাড়ে ক'রে প্রসেশন দেখতে আসব। কি যে বলেন আপনারা!

২য় ব্যক্তি। আমি শুনছি, বরের আপনার লোক কেউ আসে নি।

৩য় ব্যক্তি। তুমি তো অনেক খবরই শুনেছ দেখছি। লাটসাহেব এসেছে শুনেছ, পুলিস ফোর্স এসেছে শুনেছ, বরের আপন লোক আসে নি শুনেছ, আর কি কি শুনেছ, বল দেখি? ঝেড়ে কাস না বাবা!

২য় ব্যক্তি। কানে আঙুল দিয়ে থাকব?

৪র্থ ব্যক্তি। না না, এ খবরটা আপনি ঠিকই শুনেছেন, বরের আত্মীয়-স্বজন কেউ এ বিয়েতে যোগ দেন নি।

১ম ব্যক্তি। বিয়ের দিনই পেছিয়ে গেল ওই হাঙ্গামায়। আগে দিন হয়েছিল, ১৫ই অগ্রাণ, একটি হপ্তা পেছিয়ে গেল।

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি শেষ মুহূর্তে বরও বেঁকে দাঁড়িয়েছিল।

৫ম ব্যক্তি। [বিস্মিত] তাই নাকি, তারপর?

৪র্থ ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর সোজা ক'রে দিল আবার।

৫ম ব্যক্তি। তা তো হবেই, বিধবাকে বিয়ে করা কি একটা সামান্য কর্ম, বুকের পাটা চাই!

১ম ব্যক্তি। কি রকম?

৫ম ব্যক্তি। চাই না! ও তো হাড়কাঠে মাথা গলানোর সামিল। বৈধব্য যোগ আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও তাকে বিয়ে করা—

[চোখ ও ভ্রূর এমন একটা ভঙ্গি করিলেন যদ্দারা এ কার্যের তুরূহতা ও এ প্রকার বিবাহকারীর অসম সাহসিকতা সূচিত হইল।]

১ম ব্যক্তি। যা বলেছেন, না জেনে শুনে অন্ধকারে সাপের পা দেওয়া যায়, কিন্তু চোখে প্রত্যক্ষ ক'রে তার কাছে ঘেঁষা শক্ত। ঠিক।

৫ম ব্যক্তি। নয় ?

৩য় ব্যক্তি। কিন্তু ওস্তাদ যারা, তারা সাপ নিয়ে খেলাও তো করে !

৫ম ব্যক্তি। কিন্তু মেয়ে মানুষ আর সাপ এক জিনিস নয়। [৪র্থ ব্যক্তিকে হাস্য গোপন করিতে দেখিয়া] আমি বলছি, এক জিনিস নয়। অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি। এই ধরুন না, আমি বিবাহই করেছি চারটি। বর্তমানে আমার চতুর্থ সংসার চলেছে।

৪র্থ ব্যক্তি। তা হ'লে আপনিও একটি হাড়কাঠ বলুন !

৫ম ব্যক্তি। তা যা বলেন ! [হাসিলেন]

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি বর এসে হোটেলে উঠেছিল।

৪র্থ ব্যক্তি। এটা ভুল শুনেছেন, বর এসে উঠেছিল রামগোপাল ঘোষের বাড়ীতে।

৩য় ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, রামগোপাল ঘোষই প্রসেশনের সব খরচ দিয়েছে, বরাভরণ, বরসজ্জা সবই তার খরচায়।

৫ম ব্যক্তি। বটে !

২য় ব্যক্তি। ভাটও শুনছি নাকি এসেছে অনেকগুলি।

৫ম ব্যক্তি। বিয়ে কি সত্যিই হিন্দুমতে হবে—পুরুত ডেকে মন্তর প'ড়ে ?

৪র্থ ব্যক্তি। হ্যাঁ, মায় 'হাত দিলাম মাকু, ভ্যা করত বাপু' পর্যন্ত সব হবে। কোন খুঁত রাখবে না বিদ্যাসাগর। টকটকে লাল কাগজে ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রের বাহারটা দেখেছিলেন ?

৫ম ব্যক্তি। না, দেখি নি।

৪র্থ ব্যক্তি। এই দেখুন না, আমার কাছে রয়েছে।

[বাহির করিয়া দিলেন এবং সকলে তাহা সাগ্রহে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন ভদ্রলোক একতাড়া ছাপানো কাগজ লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং সকলের হাতে একখানি করিয়া দিলেন।]

ভদ্রলোক। আপনারা এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি পড়ুন। যদি কারও এতে স্বাক্ষর করবার অভিরুচি হয়, স্বাক্ষর ক'রে বিদ্যাসাগর মশাইকে দিয়ে আসবেন, বা পাঠিয়ে দিবেন। [ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।]

১ম ব্যক্তি। কি প্রতিজ্ঞাপত্র আবার?

৫ম ব্যক্তি। ও সব সই-টইয়ের মধ্যে আমি নেই মশাই।

২য় ব্যক্তি। ও বাবা, এ যে ভয়ানক ব্যাপার দেখছি।

১ম ব্যক্তি। রমেন, তুমি পড় না হে শুনি, আমি আবার চশমাটা আনি নি। [৪র্থ ব্যক্তি পড়িতে লাগিলেন—।]

প্রতিজ্ঞাপত্র

১। কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব।

২। একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না।

৩। কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপাত্রে কন্যাদান করিব।

৪। কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে পুনরায় তাহার বিবাহ দিব।

৫। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।

৬। এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে আর বিবাহ করিব না।

৭। যাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে তাহাকে কন্যাদান করিব না।

৮। যেরূপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে তাহা করিব না।

৯। মাসে মাসে স্ব স্ব আয়ের পঞ্চাশত্তম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব।

১০। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণেই উপরি-নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।

৩য় ব্যক্তি। ওরে বাবা, এ যে টেন কমাণ্ড্মেণ্টস্' দেখছি।

৪র্থ ব্যক্তি। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরী সংস্করণ।

১ম ব্যক্তি। ওই টাকাকড়ির ব্যাপারটা কি তা ঠিক বুঝলাম না। নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষটাই বা কে?

৫ম ব্যক্তি। আজ ধনাধ্যক্ষ আছে, কাল দেখবেন জুড়ি হাঁকাচ্ছে! অনেক দেখলুম।

২য় ব্যক্তি। লগ্ন ক'টায়?

৪র্থ ব্যক্তি। সেটা ঠিক জানি না।

১ম ব্যক্তি। বেশী রাত্তিরে যদি হয়, তবে আমি আর থাকব না।

৫ম ব্যক্তি। আমিও না। ছেলেটা উঠে যদি আমায় না দেখতে পায়—

[ভিতর হইতে উলুধ্বনি ও শঙ্খরব শোনা গেল।]

২য় ব্যক্তি। বিয়ে শুরু হ'ল বোধ হয়।

৩য় ব্যক্তি। পাশের এই সরু গলিটার ভেতরে ঢুকে সোজা গিয়ে হরিশদের ছাতটায় চড়া যাক, চল। সেখান থেকে বাড়ীর ভেতরটা বেশ দেখা যাবে।

২য় ব্যক্তি। আচ্ছা, বর কোথায় বসেছিল, বল তো? বাইরের ঘরে তো দেখতে পেলাম না!

৪র্থ ব্যক্তি। বাইরের ঘরে বরকে বসাক আর তোমরা সব ঢিল ছোড়, অত কাঁচা ছেলে বিদ্যাসাগর নয়।

৩য় ব্যক্তি। যাবে তো এস।

৪র্থ ব্যক্তি। হ্যাঁ, চল, বিয়েটা দেখতে হবে।

[সকলে চলিয়া গেল। কপাট খুলিয়া বিদ্যাসাগর বাহির হইয়া আসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক হইতে ডাক্তার দুর্গাচরণও প্রবেশ করিলেন।]

দুর্গাচরণ। এই যে, আমি একটা কেসে এমন আটকে পড়লুম ভাই যে দেরী হয়ে গেল। বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে নাকি?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ। যাক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

দুর্গাচরণ। কান্না পাচ্ছে! আরে তোমারই তো জিত হ'ল, সমস্ত কলকাতা শহর জুড়ে তোমার জয়জয়কার। রাধাকান্ত দেবের ওপর টেক্কা দিয়েছ তুমি।

বিদ্যাসাগর। এর নাম কি জিত? বরপক্ষ কন্যাপক্ষ—দু'পক্ষকে ঘুষ দিয়ে আমি এ তো চাই নি, আমি সবাইকে বুঝাতে চেয়েছিলুম, কারও ওপর টেক্কা দেওয়া তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। দুর্গাচরণ, মনে হচ্ছে—

দুর্গাচরণ। কি আবোলতাবোল বকছ! চল, বিয়েটা দেখা যাক। এস।
[বিদ্যাসাগরকে টানিয়া লইয়া গেলেন।]

পট পরিবর্তন

[বাড়ীর ভিতরকার প্রাঙ্গণ। চারিদিকে বারান্দায় সারি সারি চেয়ার। রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ, রাধানাথ, রামতনু প্রমুখ দেশের শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহাদের সম্মুখে বহু লোক বসিয়া আছেন; পিছনে বহু লোক দাঁড়াইয়া আছেন। বিবাহ মণ্ডপ হিন্দু-সংস্কৃতি অনুযায়ী সুসজ্জিত ও সুশোভিত। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে হোমশিখার সমক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীশ বিদ্যারত্ন শ্রীমতি কালীমতি দেবীর পাণিগ্রহণ করিতেছেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বিবাহের সংস্কৃত মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। বিদ্যাসাগর ও দুর্গাচরণ এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।]

পঞ্চম অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসা। ডাক্তার দুর্গাচরণ ও বিপিন নামক একটি লোক কথাবার্তা কহিতেছে। ডাক্তার দুর্গাচরণের একটু বয়স বাড়িয়াছে তাহা বোঝা যাইতেছে।]

দুর্গাচরণ। আপনি বিধবা-বিবাহ করতে রাজি আছেন ?

বিপিন। আছি, কিন্তু ওই যে বললাম, আমার টাকা চাই।

দুর্গাচরণ। ঈশ্বরকে বলেছেন সে কথা ?

বিপিন। বলেছি।

দুর্গাচরণ। কি বললে সে ?

বিপিন। বললেন, বণ্ডে সই করতে হবে।

দুর্গাচরণ। তাতেও রাজি আছেন ?

বিপিন। আছি।

[বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও বয়স বাড়িয়াছে দেখা যাইতেছে। তাঁহার হাতে একখানি কাগজ।]

বিদ্যাসাগর। এই যে দুর্গাচরণ, এসে গেছ দেখছি।

দুর্গাচরণ। কেন ডেকেছ বল দিকি ?

বিদ্যাসাগর। বলছি (বিপিনকে) নাও, সই কর।

[বিপিন সই করিয়া দিল।]

দশ তারিখে বিয়ে হবে, সেই সময় টাকাও পাবে।

বিপিন। কিছু অগ্রিম পেলে সুবিধা হ'ত আমার।

বিদ্যাসাগর। অগ্রিম পাবে না।

বিপিন। আচ্ছা, তা হ'লে দশ তারিখেই নেব।

[প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।]

বিদ্যাসাগর। তোকে ডেকেছি টাকার জন্যে, কিছু টাকা দিতে পারিস ?

দুর্গাচরণ। কেন ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহের খরচ এত বেশী হচ্ছে যে, সামলাতে পারছি না।

দুর্গাচরণ। এ রকম ভাবে কতদিন তুমি বিধবা-বিবাহ চালাবে?

বিদ্যাসাগর। আমি একা চালাব, এ রকম কথা তো ছিল না। তোমরা সবাই আশ্বাস দিয়েছিলে, টাকার জন্য ভাবনা নেই, এখন তোমাদের কারও টিকি দেখা যাচ্ছে না।

দুর্গাচরণ। তবু চালাতে হবে? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, এরা টাকার লোভেই খালি—

বিদ্যাসাগর। দেখ, ওসব আলোচনা ক'রে কোন লাভ নেই, ওরা টাকার লোভে বিয়ে করছে এই অজুহাতে কর্তব্য কর্মের দায়িত্ব এড়ানো যায় না। ওসব কথা যাক, তুমি হাজার খানেক টাকা দিতে পারবে কি না বল।

দুর্গাচরণ। ধার দিতে পারি, দান করতে পারব না।

বিদ্যাসাগর। বেশ, ধারই দিও।

দুর্গাচরণ। তোমার ছেলেরও নাকি বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ?

বিদ্যাসাগর। সে নিজেই করতে চাইছে, আমি কিছু বলি নি।

[একটি ভৃত্য কতকগুলি কাগজপত্র আনিয়া টেবিলে রাখিয়া গেল।]

দুর্গাচরণ। প্রুফ বুঝি! [দুর্গাচরণ উঁকি দিয়া দেখিলেন।]

দুর্গাচরণ। বহুবিবাহ! বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও কিছু করছ নাকি? ভিমরুলের চাকে একটা ঢিল মেরেই তো নাস্তানাবুদ হবার যোগাড় হয়েছে, আবার কেন?

[বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না। প্রুফগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

দুর্গাচরণ। টাকাটা তোমার আজই চাই?

বিদ্যাসাগর। আজ পেলেই ভাল হয়।

দুর্গাচরণ। আচ্ছা, বিকেলে নিয়ে আসব তা হলে, এখন যাই।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা।

[দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর প্রুফগুলি সংশোধন করিতে লাগিলেন। একটু পরে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।]

বিদ্যাসাগর। এস শ্রীশ ব'স, তারপর খবর সব ভাল তো?

[শ্রীশ কোন উত্তর দিলেন না, একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন।]

কি, ব্যাপার কি, অমন বিমর্ষ কেন?

শ্রীশ। মনটা ভাল নেই।

বিদ্যাসাগর। কি হ'ল হঠাৎ? [শ্রীশ নীরব রহিলেন] দাঁড়াও তোমার মন ভাল ক'রে দিচ্ছি। হাজিপুরি ল্যাংড়া আম জোগাড় করেছি কিছু, আনি, থাম। [উঠিতে গেলেন।]

শ্রীশ। থাক, আমি এখন খাব না কিছু, দুর্গাচরণের খোঁজে বেরিয়েছি।

বিদ্যাসাগর। সে তো এই গেল। অসুখ নাকি কারও?

[শ্রীশ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন।]

শ্রীশ। আমি আর বাঁচব না ভাই।

বিদ্যাসাগর। কেন?

শ্রীশ। কাল রাত্রে পেটে এমন একটা ফিক-ব্যথা উঠল, মনে হ'ল গেলাম এবার। সত্যি, আমি বড় ভয়ে ভয়ে বাস করছি ভাই।

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] কেন, ভয়টা কিসের?

শ্রীশ। সত্যি বলছি ভাই, বিধবা বিয়ে ক'রে অবধি এতটুকু শান্তি নেই আমার। আত্মীয়স্বজনরা পরিত্যাগ করেছে, পাড়াপড়শীরাও ভাল ক'রে কথা কয় না, মনে হয়, এ কোথায় বাস করছি আমি, প্রাণটা সর্বদা হুহু করে, তা ছাড়া— [থামিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। [মৃদু হাসিয়া] তা ছাড়া আবার কি?

শ্রীশ। তা ছাড়া আমার মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হয়, কালীমতি তার আগের স্বামীর কথা চিন্তা করে লুকিয়ে। একদিন দেখলাম, কাঁদছে।

[বিদ্যাসাগর হাসিয়া ফেলিলেন।]

বিদ্যাসাগর। তুমি একটি নির্বোধ।

শ্রীশ। হয়তো। তবু আমার কথাটা শোন।

বিদ্যাসাগর। কিছু শুনতে চাই না, তুমি আগে খোঁজ ক'রে দেখ, যারা বিধবা-বিবাহ করে নি, তাদের ও রকম হয় কি না।

শ্রীশ। কি রকম?

আত্মীয়স্বজন তাদের পরিত্যাগ করেছে কি না, তাদেরও কারও কারও পেটে ফিক-ব্যথা ধরে কি না, তাদেরও স্ত্রী লুকিয়ে কাঁদে কি না।

শ্রীশ। কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। কিন্তুটা তোমার মনে বাইরে কোথাও নেই। বেশি দূর যাবার দরকার কি, আমাকেই দেখ না, আমি তো বিধবা-বিবাহ করি নি, কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনরা আমার ওপর কেউ বড় সন্তুষ্ট নন, কেবল টাকার দরকার হলেই আমাকে মনে পড়ে, এমন কি বাবাও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে থাকেন। আমার পেটের ব্যাপার তো জানই, চিরকাল ভুগছি। আর আমার স্ত্রীর—থাক, স্ত্রীর কথাটা আর নাই বললুম। [হাসিলেন।]

শ্রীশ। তোমার কথা আলাদা। তুমি বিনা ক্লোরোফর্মে কার্বাঙ্কল কাটাতে পার, দরকার হলে আরসোলা গিলে খেতে পার, আমি পারি না, আমি দুর্বল, আমার কেবল মনে হয়— [থামিয়া গেলেন ও চাহিয়া রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কি কাণ্ড!

শ্রীশ। আমি পারছি না ভাই, আমার—

বিদ্যাসাগর। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক হয়ে যদি এই সব তুচ্ছ কারণে ভেঙে পড, তা হ'লে সাধারণ লোকে কি করবে বল দেখি? তোমার আদর্শে কত লোক বিধবা-বিবাহ করেছে, তুমি অমন করলে চলে কি?

শ্রীশ। আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

বিদ্যাসাগর। কালীমতির যে ছেলেবেলায় একবার বিয়ে হয়েছিল, এই কথাটাকেই তুমি এত বড় ক'রে দেখছ কেন?

শ্রীশ। সেই কথাটাকেই যে বড় ক'রে দেখছি তা ঠিক নয়। [সহসা] কাল খবর পেলাম, শালকের যে লোকটি বিধবা-বিবাহ করেছিল, সে হঠাৎ মারা গেছে কলেরায়।

বিদ্যাসাগর। তোমার কি ধারণা বিধবা-বিবাহ করলেই মানুষ অমরত্ব লাভ করবে?

শ্রীশ। না, তা আমি বলছি না।

বিদ্যাসাগর। এর উল্টোটাও যে হচ্ছে, যোগেনও বিধবা বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার বউটাই ম'রে গেল, যোগেন বেঁচে আছে দিব্যি।

শ্রীশ। কিন্তু বিধবা-বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলেরা হওয়া একটু ও নয় কি?

বিদ্যাসাগর। এ বছর কলেরায় যত লোক মরেছে, সকলেই কি বিধবা-বিবাহ ক'রে মরেছে? [সহসা] মরবে না? যে দেশে বিজ্ঞানের চেয়ে শীতলা আর ওলাবিবি বড়, বিচারের চেয়ে আচার বড়, সে দেশে মানুষ মরবে না তো কোথায় মরবে?

শ্রীশ। আমি তোমার যুক্তি মানি, কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। আবার কিন্তু কেন, সত্যিই যদি বুঝতে পেরে থাক যে, রজ্জুটা সর্প নয়, তা হ'লে শুধু শুধু আঁতকে ওঠার মানে কি?

শ্রীশ। সংস্কার!

বিদ্যাসাগর। সংস্কার, সংস্কার, সংস্কার—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এই সংস্কারের পাঁকে সমস্ত দেশটা ডুবে যাচ্ছে, ঝুঁটি ধরে টেনে তোল তাকে।

শ্রীশ। আমি ভাই দুর্বল।

বিদ্যাসাগর। কে বললে, তুমি দুর্বল? তোমার মত এত বড় বীরত্ব কে দেখাতে পেরেছে এ যুগে? এই জরা-ব্যাধি-গ্রস্ত দেশে তুমিই একমাত্র সুস্থ সবল পুরুষ, সাহস ক'রে পথ দেখিয়েছ।

শ্রীশ। আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না।

বিদ্যাসাগর। বোঝবার কিছু নেই যে। আসল কথাটা ভেঙে বল দেখি, কালীমতির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

শ্রীশ। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে।

বিদ্যাসাগর। পরিবার জিনিসটাই একটু ভীতিকর।

শ্রীশ। দুর্গা কোথায় গেল বলতে পার?

বিদ্যাসাগর। সে বিকেলে এখানে আসবে আবার, তাকে নিয়ে যাব আমি সন্ধ্যেবেলা তোমার বাসায়। এখন তুমি যাও, এই প্রুফটা এখনই দেখে দিতে হবে আমায়। [শ্রীশ উঠিলেন।]

শ্রীশ। বিকেল বেলা আসছ তা হ'লে ঠিক?

বিদ্যাসাগর। আসব।

[শ্রীশ চলিয়া গেলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন আসিয়া প্রবেশ করিলেন! এবং বিনা ভূমিকায় কথা আরম্ভ করিলেন।]

কৃষ্ণমোহন। তুমি পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরিটা এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলে!

বিদ্যাসাগর। তুমি কি ক'রে জানলে, এখনও তো কাউকে বলি নি, কেউ জানে না।

কৃষ্ণমোহন। গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল এখনই, ওসব পাগলামি ছাড়।

বিদ্যাসাগর। যেখানে আত্মসম্মান থাকে না, সেখানে আমি থাকতে পারব না।

কৃষ্ণমোহন। well, you must be reasonable. একটা কথা তুমি বুঝছ না যে, গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে গভর্ণমেণ্ট যখন টাকা মঞ্জুর করে নি, তখন গর্ডন ইয়ং সে টাকা দেবে কি ক'রে তোমাকে?

বিদ্যাসাগর। লাটসাহেব স্বয়ং নিজের মুখে আমাকে বলেছিলেন, বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করতে।

কৃষ্ণমোহন। লাটসাহেবই বলুন আর যেই বলুন, গভর্ণমেণ্ট-sanction না থাকলে—

বিদ্যাসাগর। লাটসাহেবকেই গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ব'লে জানতাম। তাঁর কথা যে এতটা মূল্যহীন হবে, তা ভাবতে পারি নি।

কৃষ্ণমোহন। তুমি চাকরি ছাড়লে ওদের আর ক্ষতিটা কি? বরং তুমি লেগে থাকলে আস্তে আস্তে টাকাটা পেতে ক্রমশঃ, বালিকা-বিদ্যালয়গুলো টিঁকে থাকত। এখন উঠে যাবে সব।

বিদ্যাসাগর। উঠবে কেন, একটাও উঠতে দেব না।

কৃষ্ণমোহন। পঞ্চাশটা বালিকা-বিদ্যালয় তুমি একলা চালাবে?

বিদ্যাসাগর। একলাই চালাব।

[কৃষ্ণমোহন ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।]

কৃষ্ণমোহন। চাকরি না থাকলে এত টাকা পাবে কোথায়? তোমার সম্বল তো বইগুলি, কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত ডিপজিটারি প্রেসটাও আছে।

কৃষ্ণমোহন। সেটা নিয়ে তোমার ভাই দীনবন্ধুর সঙ্গে মকদ্দমা বেধেছে নাকি?

বিদ্যাসাগর। ভাই ছাড়া এমন সৎকার্য কে করবে বল?

কৃষ্ণমোহন। কার কোর্টে মকদ্দমা?

বিদ্যাসাগর। কোর্টে নয়, দ্বারকানাথ মিত্র আর দুর্গামোহন দাসকে আমরা দুজনেই সালিসি মেনেছি!

কৃষ্ণমোহন। May I give you a piece of advice? সকলের সঙ্গে চটাচটি করে পৃথিবীতে চলা যায় না, and it always pays in the long run to be in tune with the Government.

বিদ্যাসাগর। গভর্ণমেণ্টকে চটবার আমি কোন সঙ্গত কারণ দিই নি।

কৃষ্ণমোহন। বিধবা-বিবাহ বিলটা পাশ হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের কাছে একটু অপ্রিয় হয়েছে। তোমার ওপর চটবার আসল কারণ তাই।

বিদ্যাসাগর। তা আমি জানি।

কৃষ্ণমোহন। তুমি যদি বল, আমি মাঝে প'ড়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে পারি; গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে আলাপ আছে আমার।

বিদ্যাসাগর। থাক, দরকার নেই। [কৃষ্ণমোহন shrug করিলেন।]

[কিছুক্ষণ নীরবতা]

কৃষ্ণমোহন। বাই দি বাই, মধু শুনেছি ফ্রান্সে নাকি মহা অর্থকষ্টে প'ড়ে তোমাকে চিঠি লিখেছে—no wonder, such a reckless fellow.

বিদ্যাসাগর। ওর সমস্ত বিষয়টি গ্রাস ক'রে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা একটি পয়সা পাঠান নি। আমি ব'লে ব'লে হার মেনে গেছি।

কৃষ্ণমোহন। I see, শেষ পর্যন্ত কি হ'ল?

বিদ্যাসাগর। কি আর হবে! আমি কয়েকবার ওঁদের কাছে ছুটোছুটি ক'রে যখন বুঝলাম যে, ওঁরা টাকা দেবেন না, তখন নিজেই ধারধোর ক'রে পাঠিয়ে দিলাম কিছু। কি আর করব?

কৃষ্ণমোহন। That's coble of you. [কিছুক্ষণ নীরবতা] তুমি তা হ'লে কিছুতেই আর চাকরি করবে না?

বিদ্যাসাগর। না।

কৃষ্ণমোহন। Finally settled?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

কৃষ্ণমোহন। আমি বলি, আর একটু বিবেচনা ক'রে দেখ। There is no harm in reconsidering it.

বিদ্যাসাগর। না, আমি আর করব না।

কৃষ্ণমোহন। আচ্ছা, চলি তা হ'লে। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে। [চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর উঠিতে যাইবেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র সমভিব্যাহারে দীনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। এ কি, তোমরা হঠাৎ যে?

শম্ভুচন্দ্র। বউদিদি আসতে চাইলেন, তাই নিয়ে এলাম।

বিদ্যাসাগর। কারণটা কি?

শম্ভুচন্দ্র। ওঁর কাছেই শুনুন।

বিদ্যাসাগর। বীরসিংহের খবর সব ভাল তো?

শম্ভুচন্দ্র। বাবা কাশী চলে যেতে চাইছেন।

বিদ্যাসাগর। কেন?

শম্ভুচন্দ্র। দেশে বিধবা-বিবাহ নিয়ে এমন অশান্তি হয়েছে যে, তাঁর ভাল লাগছে না। [বিদ্যাসাগর নীরব হইয়া রহিলেন। শম্ভুচন্দ্র অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। দীনময়ী দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

দীনময়ী। [শুষ্ককণ্ঠে] নারাণও শুনছি বিধবা বিয়ে করবে?

বিদ্যাসাগর। [উৎফুল্ল] তুমি শুনেছ? আমিও শুনেছি, ভারী খুশি হয়েছি শুনে।

দীনময়ী। আমি বাধা দিতে এসেছি। বিধবাকে বিয়ে করা বড় অমঙ্গলের, ও আমি কিছুতেই হতে দেব না। তুমি মানা কর ওকে।

[বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।]

মানা কর, মানা কর, ও আমাদের একমাত্র ছেলে। তোমার পায়ে ধরছি, মানা কর ওকে। [পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ, বিছানায় শুইয়া আছেন। মাথার শিয়রে আলো জ্বলিতেছে, তিনি শুইয়া একটি বই পড়িতেছেন। ঘরে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি দুই-একটি সাধারণ আসবাব রহিয়াছে। দীনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

দীনময়ী। বার্লি খাবে এখন?

বিদ্যাসাগর। এখন থাক।

দীনময়ী। সকাল থেকে তো কিছুই খাও নি।

বিদ্যাসাগর। তুর্গা মানা ক'রে গেছে বেশি খেতে।

[দীনময়ী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।]

দীনময়ী। এখানে যখন শরীরটা ভাল থাকছে না, তখন বীরসিংহয় গিয়ে দিন কতক থাকবে চল।

বিদ্যাসাগর। বীরসিংহয় গিয়ে কোন্ সুখে থাকব? কর্মাটাঁড়ে যাব ঠিক করেছি।

দীনময়ী। সে সাঁওতালী জায়গায় আমি গিয়ে থাকতে পারব না বাপু।

বিদ্যাসাগর। তোমাদের কাউকে যেতে হবে না, আমি একাই যাব।

[দীনময়ীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি সামলাইয়া লইলেন, একটু হাসিলেনও।]

দীনময়ী। তুমি একা যেতে চাইলেই তোমাকে যেতে দিচ্ছি কি না।

[বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না।]

দীনময়ী। আমি না হয় না-ই গেলাম, নারাণের বউকে নিয়ে যাও।

বিদ্যাসাগর। [সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে] শুনলাম নারাণের বউকে তোমার নাকি খুব পছন্দ হয়েছে?

দীনময়ী। [হাসিয়া] সত্যি, খুবই পছন্দ হয়েছে। প্রথমে আমার ভয় হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি—ও কি, তুমি অমন ক'রে চেয়ে আছ যে?

[বিদ্যাসাগর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন।]

বিদ্যাসাগর। তুমি যখন নারাণের বিয়েতে বাধা দেবার জন্যে এসেছিলে, তখন তা আমার সহ্য হয়েছিল, কারণ তার ভেতর আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু যখন তুমি বিয়ে আটকাতে না পেরে নারাণের বউকে কোলে নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়লে, তখন আমাব তত ভাল লাগে নি।

দীনময়ী। কেন?

বিদ্যাসাগর। তার মধ্যে ভণ্ডামি ছিল, আর সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তোমার হাসিতে, কথায়-বার্তায়, চোখে মুখে।

দীনময়ী। মানুষ কি নিজের ভুল শুধরে নিতে পারে না?

বিদ্যাসাগর। পারে, কিন্তু তোমরা পার নি। আটকাতে না পেরে

তোমরা সবাই আমার মন রাখবার জন্তে দেঁতো হাসি হেসেছ। আমি সব বুঝতে পারি। [উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।]

দীনময়ী। বার্লি আনব?

বিদ্যাসাগর। বলছি তো একটু পরে।

দীনময়ী। ঠাকুরপো বীরসিংহ থেকে এসেছে, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়, ভয়ে আসতে পারছে না।

বিদ্যাসাগর। কে, দীনো? আসুক না, আমি আর কি করব তার?

দীনময়ী। বড় মনমরা হয়ে আছে, বেশি বোকো-ঝোকো না।

[দীনময়ী চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে দীনবন্ধু আসিয়া প্রণাম করিল।]

বিদ্যাসাগর। বড মনমরা হয়ে আছ শুনলাম, মকর্দমায় তোমার দাবি ডিস্‌মিস হয়ে গেছে, তাই দুঃখ হয়েছে?

দীনবন্ধু। আমার দোষ হয়েছে, ক্ষমা করুন।

বিদ্যাসাগর। থিয়েটারি ভঙ্গিতে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্তেই দেখা করতে এসেছ নাকি? তার দরকার নেই। [দীনবন্ধু চুপ করিয়া রহিলেন।] দেখ, প্রেসটা হয়তো তোমাকেই দিতুম, কিন্তু তুমি অন্তায় ভাবে দাবি ক'রে 'যুদ্ধং দেহি' বলে এগিয়ে এসেছিলে ব'লেই মকদ্দমা করেছি তোমার সঙ্গে। এতে তোমার যদি দুঃখ হয়ে থাকে, আমি নিরুপায়। অন্তায়কে আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না।

[দীনবন্ধু ইহার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। পিরানের পকেট হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া নিকটস্থ তেপায়ার উপর রাখিয়া প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।]

দীনবন্ধু। আপনি আসবার সময় আমার স্ত্রীকে গোপনে যে টাকা দিয়ে এসেছিলেন, তা আমি আর নিতে পারব না, মাপ করুন। আপনার টাকা নেবার আমার অধিকার নেই।

বিদ্যাসাগর। ভাল! যদি স্বাবলম্বী হতে পেরে থাক, সুখের কথা। [সহসা উচ্চকণ্ঠে] কিন্তু ঝুটো আত্মসম্মানের মুখোশ প'রে বউটাকে দুঃখ দিও না। আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, সে ছেঁড়া কাপড় প'রে ঘুরছে, তাই টাকা কটা দিয়ে এসেছিলাম, আর তাই লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার একটা চাকরির জন্তে লাটসাহেবের দ্বারস্থও হয়েছিলাম। তিনি তোমাকে একটা

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-গিরি দেবেন বলেছেন, আমার কোন রকম সাহায্য যদি না নিতে চাও, এ চাকরিও পরিত্যাগ করতে পার, করলে সুখীই হব।

[দীনবন্ধু এ কথার কোন জবাব দিলেন না। পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বিদ্যাসাগরকে দিলেন।]

দীনবন্ধু। শম্ভু এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়েছিল আপনাকে দেবার জন্য।

[বিদ্যাসাগর পত্রটি পড়িলেন।]

বিদ্যাসাগর। নারাণ বিধবা-বিবাহ করেছে ব'লে আমাদের আত্মীয়-কুটুম্বেরা আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে চান ?

দীনবন্ধু। তাঁরা সকলেই বিরূপ হয়েছেন।

বিদ্যাসাগর। মা কি বলেন ?

দীনবন্ধু। মা কিছু গ্রাহ্য করেন না।

[বিদ্যাসাগর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। তুমি বীরসিংহয় কবে ফিরবে ?

দীনবন্ধু। আজই, সেখানে থেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে আমাকে বরিশালে রওনা হতে হবে।

বিদ্যাসাগর। বরিশাল ? কেন ?

দীনবন্ধু। ওখানকারই ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট পদে আমি নিযুক্ত হয়েছি। অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে।

বিদ্যাসাগর। এতে আত্মসম্মানে আঘাতে লাগছে না বুঝি ? তোমাদের কি যে আসল রূপ, তা ধরতে পারলাম না এখনও।

[দীনবন্ধু চুপ করিয়া রহিলেন।]

যাবার আগে চিঠির উত্তরটা নিয়ে যেও। আচ্ছা, দাঁড়াও এখনই লিখে দিই!

[উঠিয়া বসিলেন এবং পত্র লিখিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ লিখিবার পর কলমটা রাখিয়া দিলেন।]

বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, থাক, পরে লিখে তাকে পাঠিয়ে দেব।

[দীনবন্ধু চলিয়া যাইতেছিলেন।]

শোন, এক কাজ কর আমি ব'লে যাই, তুমি লিখে নাও। উত্তরটা তাকে অবিলম্বে জানানোই ভাল।

[দীনবন্ধু চেয়ারে বসিলেন। বিদ্যাসাগর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তিনি লিখিতে লাগিলেন।]

[আমি যতটা লিখেছি, তারপর থেকে লেখ। 'আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি ; সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার বিহার পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা-বিবাহ হইতে বিরত করিতাম তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ ; অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে।']

[পত্র লেখা শেষ হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর তাহা পড়িয়া সহি করিয়া দিলেন। দীনবন্ধু চিঠি লইয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ প্রবেশ করিলেন।]

দুর্গাচরণ। কেমন আছ এ বেলা ?

বিদ্যাসাগর। অনেকটা ভাল আছি, এ বেলা চারটি ভাত খাই, কি বল ?

দুর্গাচরণ। আজ নয়, কাল।

বিদ্যাসাগর। বেশ, [ক্ষণকাল পরে] উপবাস করতে আমি খুব পারি কিন্তু এখন আমার শুয়ে থাকলে চলবে না, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

দুর্গাচরণ। দুদিন বিশ্রাম কর না, বহু-বিবাহ-বিল পাস হবার আশা নেই।

বিদ্যাসাগর। তা জানি, ও আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি। এখন আমার সর্বপ্রধান চিন্তা—কলেজটা, ওটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।

দুর্গাচরণ। বিধবা-বিবাহের ধাক্কাই তো এখনও সামলাতে পারনি, এতে আবার হাত দিচ্ছ কার ভরসায়?

বিদ্যাসাগর। ভরসা আর কারও ওপরে নেই। ধারের ওপর ধার জমছে।

দুর্গাচরণ। ধারের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছি ভাই, পাওনাদার বাড়িতে ধরণা দিয়ে ব'সে আছে। তোমাকে যে টাকাটা দিয়েছিলাম সেটা না পেলে আর আমার মান থাকবে না। দিতে পারবে টাকাটা?

বিদ্যাসাগর। আজই চাই?

দুর্গাচরণ। পরশু নিশ্চয়ই চাই।

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ ফাণ্ডে তুমি এককালীন কিছু টাকা এবং নিয়মিত চাঁদা দেবে ব'লে প্রতিশ্রুত ছিলে, তার কি কিছুই দেবে না?

দুর্গাচরণ। ভাই, আমি বড় বিপন্ন।

বিদ্যাসাগর। তুইও শেষে এই কথা বললি দুর্গা!

দুর্গাচরণ। সত্যি, আমি এখন বড় বিপদে পড়েছি, তা না হ'লে—

বিদ্যাসাগর। কবে চাই বললি টাকাটা?

দুর্গাচরণ। পরশু।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা যোগাড় ক'রে রাখব। মধুর কাছে গেছলি? কি বললে সে?

দুর্গাচরণ। যা চিরকাল বলছে, হাতে একটি পয়সা নেই—

বিদ্যাসাগর। আমার দুরবস্থার কথা বলেছিলি বুঝিয়ে?

দুর্গাচরণ। সব বলেছিলাম।

বিদ্যাসাগর। কি বললে?

দুর্গাচরণ। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে কবিত্বপূর্ণ একটি বক্তৃতা দিলে, বললে, তোমার অন্তঃকরণ Bengali mother এর মত—সে যখন ফ্রান্সে কপর্দকহীন তখন তোমার টাকা না গেলে অকূল পাথারে পড়ত সে। হাতে টাকা হ'লেই

সে তোমার টাকা অবিলম্বে শোধ করে দেবে, কিন্তু এখন হাতে কিছু নেই—এই সব আর কি!

বিদ্যাসাগর। অথচ স্পেন্‌সস্‌ হোটেলে নবাবের মত রয়েছে। [খানিকক্ষণ পরে] কি তোমরা!

দুর্গাচরণ। আমার ভাই, বড় জরুরী দরকার, তা না হ'লে তোমায় বিরক্ত করতাম না এখন! [বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।]

পরশু আসব তা হ'লে?

বিদ্যাসাগর। এস।

দুর্গাচরণ। এখন তা হ'লে উঠি।

[চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর নিস্পন্দভাবে বসিয়াই রহিলেন। দীনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

দীনময়ী। বার্লি আনব?

বিদ্যাসাগর। আন, আর ছিরুকে একটা গাড়ি ডাকতে বল।

দীনময়ী। অসুখ শরীরে আবার কোথায় বেরুবে?

বিদ্যাসাগর। টাকার চেষ্টায় বেরুতে হবে, টাকা চাই। অমন ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, যা বলছি, তাই কর।

[দীনময়ী চলিয়া গেলেন। দীনবন্ধু দ্রুতপদে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

দীনবন্ধু। এই মাত্র শম্ভু খবর পাঠিয়েছে যে বীরসিংহয় আমাদের ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছে!

বিদ্যাসাগর। অ্যাঁ! ও, হুঁ— [চুপ করিয়া গেলেন।]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলোর সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। একদল সাঁওতাল নর-নারী মনের আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে। মাদল, বাঁশী এবং সরল প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্থানটা ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। খানিকক্ষণ নৃত্যগীত চলিবার পর একটি বাবুগোছের ভদ্রলোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পিছনে একজন কুলি,

কুলির মাথায় একটি মোট। ভদ্রলোক ট্রেন হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, এই সাঁওতালের ভিড় তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার আগমনে সাঁওতালদের নাচগান বন্ধ হইয়া গেল। সকলে কৌতূহলী হইয়া আগন্তুককে দূর হইতে দেখিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ মাঝি আগাইয়া আসিল। তাহার কাঁধে মাদল ঝুলিতেছে।]

মাঝি। তুই কে বটিস ? কুথা থেকে আলি ?

বাবু। আমি কলকাতা থেকে আসছি। বিদ্যাসাগর মশাই কি এইখানেই থাকেন ?

মাঝি। হাঁ। উই যে তার ঘর।

[বাংলোটা দেখাইয়া দিল। বাবু কুলিকে লইয়া বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কুলি জিনিস রাখিয়া চলিয়া গেল। বাবু বাহিরে আসিলেন।]

বাবু। বিদ্যাসাগর মশায় কোথায় ?

মাঝি। হুথাকে নাই ?

বাবু। কই, না।

একটি মেয়ে। উ যে রূপনিকে দেখতে গেল গো।

বাবু। রূপনি কে ?

মেয়েটি। এতোয়ারি মাঝির বিটি, তার বড্ডা অসুখ।

বাবু। তোমরা এখানে নাচগান করছ যে ?

মাঝি। [হাসিয়া] আমরা হেথাকে রোজ আসি। বিদ্যাসাগর বাবুটি লোক বড়া ভাল যে গো ! হামরা ঝুড়ি, কুপ, মোড়া বুনে বুনে আনি, উ পয়সা দিয়ে কিনে লেন—

মেয়েটি। আমাদের খেতে দেয়, পয়সা দেয়, চুড়ি কিনে দেয—এই দেখ না কেনে !

[হাতের চুড়ি দেখাইল। ইহাতে তাহার সঙ্গিনীরা সাঁওতালী ভাষায় তাহাকে কি বলিল এবং সকলে কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

মাঝি। তুমি উয়ার কে বটে ?

[বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবেশ করিলেন। শরীর শীর্ণ, মুখে বার্ধক্যের

বিদ্যাসাগর। হরেন যে, কি খবর ?

হরেন। রাজকৃষ্ণবাবু এই চিঠিটি দিয়েছেন।

[একটি পত্র বাহির করিয়া দিলেন।]

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে চিঠি পাঠাবার মানে? পোস্টাপিস তো আছে ?

হরেন। আমারই দরকার, তাই ভাবলাম—

বিদ্যাসাগর। তা বুঝেছি। [সাঁওতালদের প্রতি] তোরা ওদিকে চ, তোদের জন্যে মকাই পুড়িয়ে রেখেছি।

মেয়েটি। রূপনিকে কেমন দেখে আসি তুই ?

বিদ্যাসাগর। বেশ ভাল আছে সে।

[সাঁওতালরা কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল এবং পত্র পাঠ শেষ করিয়া যখন তিনি চক্ষু তুলিলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার দৃষ্টি দিয়া আগুন ছুটিতেছে। কিন্তু তিনি কথা বলিলেন ধীরে ধীরেই—]

বিদ্যাসাগর। আমায় ক্ষমা কর তোমরা, আমি আর পারব না। আমার আর সামর্থ্য নেই।

হরেন। [ইতস্তত করিয়া] কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। [ঈষৎ উত্তেজিত] তুমি যা বলবে তা আমি জানি, না ব'লে যে ছাড়বে না, তাও জানি, আমার কথাটা আগে শেষ করতে দাও। ক্রমাগত বিধবা-বিবাহ দিয়ে দিয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি। মানসিক শক্তি যা ছিল তাও নিঃশেষ হয়েছে। আমাকে রেহাই দাও তোমরা।

[হরেন ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

হরেন। আমি বড় মুশকিলে পড়েছি। আপনি যে বিধবাটির সঙ্গে আমার ভায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, সে তাকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েছে। মেয়েটি এখন আমার ঘাড়েই এসে পড়েছে, শুধু তাই নয়, পাড়াগাঁয়ে বাস করি, সবাই একঘরে করেছে আমাকে, ধোপা, নাপিত বন্ধ—

বিদ্যাসাগর। আমাকে বলে কি হবে! তার নামে আদালতে নালিশ করগে যাও।

বিদ্যাসাগর। জোচ্চোর পাজি বদমাইসদের শাসন করবার অধিকার আদালতের, আমার নয়।

হরেন। আপনিই তো বিয়ে দিয়েছিলেন, এখন যদি—

বিদ্যাসাগর। তোমার ভাই কচি খোকা কি না, তাকে ভুলিয়ে আমি তার বিয়ে দিয়েছি! বণ্ডে সই করে নগদ টাকা নিয়ে তবে বিয়ে করেছে সে, অমনই করে নি!

[হরেন চুপ করিয়া রহিলেন। বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন।]

সে হারামজাদা গেল কোথায়?

হরেন। সে শান্তিপুরে গিয়ে লুকিয়ে আবার একটা বিয়ে করেছে।

বিদ্যাসাগর। আবার বিয়ে করেছে! [সহসা যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তুর সান্নিধ্যে সঙ্কুচিত হইলেন] স'রে যাও, স'রে যাও এখান থেকে, চণ্ডাল চণ্ডাল তোমরা, তোমাদের ছায়া মাড়ালে পাপ হয়!

[হন হন করিয়া বাংলোর দিকে আগাইয়া গেলেন।]

হরেন। [অর্ধস্বগত] ভগবানের বিধান উলটে দেবার বেলায় পাপ হয় না!

[বিদ্যাসাগর যে ইহা শুনিতে পাইবেন তাহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই, কিন্তু বিদ্যাসাগর শুনিতে পাইলেন এবং শুনিবাই ফিরিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ভগবানের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি তোমার? তাঁর বিধান নিয়ে আলোচনা করেন তোমার সঙ্গে তিনি?

[হরেন অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।]

হরেন। না, মানে আমি বলছিলাম যে, ভগবানের বিধান ওলটানো যায় না। এত বিধবার তো বিয়ে হ'ল কিন্তু ফের আবার অনেকে বিধবা হয়েছে। অদৃষ্টে যা থাকে, তা—

বিদ্যাসাগর। এত বড় অদৃষ্টবাদী যদি তুমি, তা হ'লে বিপদে প'ড়ে প্রতিকারের আশায় এতদূর ছুটে এসেছ কেন? ঘরে ব'সে থাকলেই হ'ত অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে?

হরেন। [আমতা আমতা করিয়া] না—তা—বিধবারা—

বিদ্যাসাগর। যাদের স্বামী দ্বিতীয়বার ম'রে গেল, আবার বিয়ে করুক না তারা, পথ তো বন্ধ নেই, পুরুষরা তো হরদম করছে!

হরেন। [বিস্মিত] আবার বিয়ে করবে!

বিদ্যাসাগর। করুক না, ক্ষতি কি! তুমি যে পাঁচবার ফেল ক'রে বি. এ. পাশ করেছ তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে! দুবার ফেল করবার পর বিধাতার বিধান ব'লে কপালে হাত দিয়ে ব'সে থাকলেই পারতে!

হরেন। [প্রতিবাদেচ্ছু কিন্তু ভীত] পরীক্ষায় পাস করা আর বিয়ে করা—

বিদ্যাসাগর। কিছু তফাৎ নেই, পরীক্ষা পাস করলে ছেলেদের হিল্লে হয়, আর বিয়ে করলে মেয়েদের হিল্লে হয়—

হরেন। [সবিনয়ে] আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আসি নি, সে ক্ষমতাও নেই আমার, আমাকে—

বিদ্যাসাগর। [অধীর ভাবে] না, আমি কিছু করতে পারব না। গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে লোককে ঘুষ দিয়ে দিয়ে এই হতভাগা সমাজের ভাল করবার চেষ্টা যতদিন পেরেছি করেছি। [সহসা উচ্চতর কণ্ঠে] আমার জন্যে আমার কাছে কেউ কখনও আসনি তোমরা, তোমরা বারবার এসেছ আমাকে দোহন করতে, শোষণ করতে। আর কিছু নেই, দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে, যাও এবার।

হরেন। আপনি তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাব বলুন?

বিদ্যাসাগর। উচ্ছন্ন যাও। তোমাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে এই তেপান্তর মাঠে পালিয়ে এসে সাঁওতালদের ভেতর বাস করছি, তবু আমায় রেহাই দেবে না তোমরা?—এ কি পাপ!

[হরেন একটু অপমানিত বোধ করিলেন, ঈষৎ বিচলিতও হইলেন।]

হরেন। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। ওই বিধবাটিকে নিয়ে আমি কি ক'রব বলে দিন।

বিদ্যাসাগর। ওর গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলগে যাও, আপদ চুকে যাক।

[হরেন নীরব। বিদ্যাসাগর বলিয়া চলিলেন।]

ও ছাড়া আর কিছু করবার নেই, ওদের ছেঁচে থেতলে দ'লে পিষে শেষ করে দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানগে যাও। অনেক রকম করে দেখলাম, ওদের বাঁচাবার উপায় নেই এ দেশে—এ পিশাচের দেশ।

[কুলিটি একটি অবগুণ্ঠিতা নারীকে লইয়া প্রবেশ করিল।]

অ্যাঁ, একেবারে এনে হাজির করেছ!

হরেন। [কাচুমাচু] আমি একে স্টেশনে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম।

কুলি। উনি কাঁদতে লাগলেন যে !

হরেন। তা হলে—

কুলি। আমার পয়সা দিন।

[হরেন কম্পিত হস্তে ব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিলেন। কুলি চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। নিদারুণ ক্রোধভরে কি একটা বলিতে গিয়া তিনি থামিয়া গেলেন, অবনতমুখী মেয়েটির দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে আর কি হবে, যাও নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাওগে।

[হরেন মেয়েটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রস্থানপথের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যাসাগর স্বগতোক্তি করিলেন।]

কোন্ পাপে এই হতভাগীরা এদেশে এসে জন্মেছে কে জানে !

[পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বিদ্যাসাগরের মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।]

বাঃ, চন্দ্রমুখী এম. এ. পাস করেছে !

[এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হরেন বাংলো হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।]

কি, খুঁজছ কি ?

হরেন। আমার টিকিটখানা কোথায় প'ড়ে গেল ! ও, এই যে।

[টিকিট কুড়াইয়া লইয়া ব্যাগ বাহির করিয়া সেটি যথাস্থানে রাখিলেন।]

বিদ্যাসাগর। রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছ বুঝি ! একে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পরের ট্রেনেই লম্বা দেবে ! [হরেন নিরুত্তর।]

দেখ এ সব তোলা থাকছে, সুদে আসলে কড়ায় ক্রান্তিতে সব শোধ দিতে হবে একদিন তোমাদের। মনে রেখো, ওরাও ছেড়ে কথা কইবে না, বুঝেছ ? [হরেন চুপ করিয়া রহিলেন] ওদেরও সুদিন আসছে, ওরাও লেখাপড়া শিখছে। আমি তখন বেঁচে থাকব না হয়তো। (সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া) তখন আর একবার আমি

জন্মাতে রাজি আছি এ দেশে, যেদিন আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা বাধা না হ'য়ে শক্তি হবে, সেদিন আবার যেন জন্মাই আমি এ দেশে—

[বলিতে বলিতে আবেগভরে তিনি থামিয়া গেলেন। দূর চক্রবালরেখায় স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি যেন সেই অনাগত ভবিষ্যৎকেই দেখিতে লাগিলেন। কয়েকটি নিবিড় মুহূর্ত নীরবে অতিবাহিত হইয়া গেল।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা। দীনময়ী ও দীনবন্ধু কথা কহিতেছেন।]

দীনময়ী। তুমি আমাকে কর্মাটাঁড়ে নিয়ে চল ঠাকুরপো, শুনছি সেখানে ওঁর শরীরটা ভাল নেই, আমি দুর্গা ঠাকুরপোকেও খবর দিয়েছি।

দীনবন্ধু। তা বেশ করেছ। কিন্তু তুমি নারায়ণকে নিয়ে যাও, আমার ছুটি কম।

দীনময়ী। নারায়ণকে নিয়ে যাবার হ'লে আগেই যেতুম।

[দীনবন্ধু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন।]

দীনবন্ধু। কেন, বাধাটা কি ?

দীনময়ী। বলেছেন, তার মুখদর্শন করব না।

দীনবন্ধু। কেন, হঠাৎ ?

দীনময়ী। দোষ নারায়ণেরই। [একটু থামিয়া] আমার কপালেরই দোষ।

দীনবন্ধু। বিধবা বিয়ে ক'রেই ওর মতি গতি বিগড়ে গেল, যে যাই বলুক, এই বিধবাগুলো অপয়া।

দীনময়ী। ও কথা ব'লো না, ও কথা বলতে নেই। [অস্ফুট স্বরে] কেউ অপয়া নয়, কেউ অপয়া নয়, সবাই ভাল।

দীনবন্ধু। এখানে এসেই আর একটি যা খবর পেলাম, তা তো ভয়ঙ্কর।

দীনময়ী। কি ?

দীনবন্ধু। এই পাড়াতেই আজ একটি বিধবা-বিয়ে হবে, বরপক্ষের লোকেরা নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপিয়েছে যে, দাদা নাকি বিয়েতে থাকবেন। বিরুদ্ধ

পক্ষের লোকেরা একদল গুণ্ডা ঠিক ক'রে রেখেছে যে, বিয়ে পণ্ড করে দেবে ; দাদা যদি তাতে বাধা দিতে যান, দাদাকে মারবে।

দীনময়ী। [শিহরিয়া উঠিলেন] ওমা, মারবে।

দীনবন্ধু। তাই তো শুনেছি, ভাগ্যে দাদা এখানে নেই , তা ছাড়া তুমি যখন যেতে চাইছ, তখন আসবারও কোন খবর নেই নিশ্চয়।

দীনময়ী। অনেকদিন কোন চিঠিপত্র পাইনি, তুমি আমাকে আজই নিয়ে চল ঠাকুরপো, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে, ডান চোখের পাতাটা ক্রমাগত নাচছে কাল থেকে।

দীনবন্ধু। দেখি, ছুটি তো বেশি নেই, এর মধ্যে বীরসিংহয় যাওয়া দরকার একবার।

দীনময়ী। আমাকে পৌছে দিয়েই চ'লে এসো তুমি।

দীনবন্ধু। দেখি।

[বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা সেই মহিলাটি, যাহাকে হরেন কর্মাটাঁড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।]

দীনবন্ধু। [প্রণামান্তে] আপনি চ'লে এলেন যে ?

বিদ্যাসাগর। আমাকে কি সুস্থির হয়ে থাকতে দেবে এরা ? হরেন একে নিয়ে গিয়ে হাজির, এর একটা ব্যবস্থা করবার জন্তে আসতে হ'ল, কি যে করব তাও জানি না [দীনময়ীকে] আপাতত এইখানেই থাক।

দীনময়ী। বেশ তো ! [মহিলাটিকে] এস।

[তাঁহাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। তোমার এখন ছুটি নাকি ?

দীনবন্ধু। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি, আজ বউঠানকে নিয়ে কর্মাটাঁড়ে যাব ভাবছিলাম, আপনার শরীরটা খারাপ শুনলাম, সেখানে—

বিদ্যাসাগর। তুমি একবার রাজকেষ্টকে খবর দাও দিকি, এ মেয়েটির একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলি।

দীনবন্ধু। ডেকে আনব তাঁকে ?

বিদ্যাসাগর। পারলে ভালই হয়।

দীনবন্ধু। যাচ্ছি।

[চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় ডাক্তার দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

দুর্গাচরণ। এই যে তুমিই এসে গেছ দেখছি, তোমার শরীর খারাপ শুনে বউঠান আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর, আছ কেমন ?

বিদ্যাসাগর। খাসা আছি।

দুর্গাচরণ। বিয়ের নিমন্ত্রণে এসেছ বুঝি ?

বিদ্যাসাগর। কার বিয়ে ?

দুর্গাচরণ। এ পাড়ায় আজ যে একটি বিধবা-বিবাহ হচ্ছে—এ খবর পাও নি তুমি ? নিমন্ত্রণ-পত্রে তো তোমার নাম ছাপা হয়েছে দেখলাম।

বিদ্যাসাগর। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। না, আমি সেজন্যে আসি নি, আমি এসেছি অন্য কাজে।

দুর্গাচরণ। ও বিয়েতে না যাওয়াই ভাল।

বিদ্যাসাগর। এসেছি যখন, যাব বই-কি।

দুর্গাচরণ। শুনছি, বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা একটা মারপিট ক'রে বিয়েটা পণ্ড ক'রে দেবার চেষ্টায় আছে, এমন কি, তোমাকেও মারবে ব'লে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিদ্যাসাগর। তা আর আশ্চর্য কি, বীরপুরুষের তো অভাব নেই দেশে।

দুর্গাচরণ। যত সব ছোটলোকদের কাণ্ড, যেও না ওখানে। কি দরকার ?

বিদ্যাসাগর। এই স্যাঁতসেঁতে দেশে পুতুপুতু ক'রে বেঁচে থাকারই বা কি দরকার ?

দুর্গাচরণ। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে—একজন দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে, নিয়ে আসি তাকে। ভারী আগ্রহ তার।

বিদ্যাসাগর। কে ?

দুর্গাচরণ। দাঁড়াও, নিয়ে আসি, এলেই দেখতে পাবে। তুমি কোথাও বেরিও না, আসছি আমি।

[চলিয়া গেলেন। বাহিরে দূরে একটা কোলাহল উঠিল। রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। এস, দীনো কোথা গেল ?

রাজকৃষ্ণ। আসছে, কার সঙ্গে কথা কইছে।

বিদ্যাসাগর। দীনোর মুখে শুনেছ বোধ হয়, আমি এসেছি হরেনের সেই—

রাজকৃষ্ণ। হ্যাঁ, শুনেছি সব। হরেনের ভাইটা সত্যিই আবার বিয়ে ক'রে পালিয়েছে। কি করা যায় বল তো? [বাহিরের কোলাহল নিকটবর্তী হইল।]

রাজকৃষ্ণ। এরা বিয়েটাকে সত্যিসত্যি পণ্ড করবে দেখছি। শুনেছ সব ঘটনা?

বিদ্যাসাগর। শুনেছি।

রাজকৃষ্ণ। কি কাণ্ড দেখ দিকি, আশ্চর্য!

বিদ্যাসাগর। এখনও আশ্চর্য হচ্ছ তুমি এইটেই আশ্চর্য! আমার নিজেরই এখন মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো আমিই ভুল করেছি, সারাজীবন সর্বস্ব ব্যয় ক'রে পুঁইগাছে আঙুর ফলাবার চেষ্টা করেছি। [সহসা] কিন্তু ভাই রাজু, সত্যি ক'রে বল তো, একটা বিধবার মুখেও কি হাসি ফোটাতে পারি নি আমি, একজনের জীবনেও কি সুখ ফিরিয়ে আনতে পারি নি, এতদিনের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

রাজকৃষ্ণ। সকলের খবর তো জানি না, তবে সুখী হয়েছে বই-কি কেউ কেউ।

বিদ্যাসাগর। (সাগ্রহে) হয়েছে?

রাজকৃষ্ণ। নিশ্চয়ই হয়েছে, হবার তো কথাই।

[বাহিরের কোলাহলটা আরও নিকটবর্তী ও স্পষ্টতর হইল। দীনময়ী বাহির হইয়া আসিলেন।]

দীনময়ী। কিসের এত গোলমাল?

[ব্যস্তসমস্ত হইয়া দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন ও তাড়াতাড়ি কপাটে খিল লাগাইয়া দিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কি হ'ল?

দীনবন্ধু। একদল গুণ্ডা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হল্লা করছে।

বিদ্যাসাগর। করলেই বা, কপাট বন্ধ করছিস কেন?

দীনবন্ধু। মানে, তারা বলছে—

বিদ্যাসাগর। আমাকে মারবে, এই তো?

দীনবন্ধু। তারা বিয়েটা পণ্ড ক'রে দিতে চায়।

বিদ্যাসাগর। কারও সাধ্য নেই বিয়ে পণ্ড করে, এ বিয়ে হবেই।

[কোলাহল আরও নিকটবর্তী হইল, বিদ্যাসাগর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।]

রাজকৃষ্ণ। কি দরকার এখন বাইরে যাবার ?

দীনবন্ধু। আপনাকে অনুনয় করছি, আপনি এখন বাইরে যাবেন না।

দীনময়ী। তোমার পায়ে পড়ছি, এখন বেরিও না তুমি।

[বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না, কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।]

দীনময়ী। ঠাকুরপো, তুমি যাও ওঁর সঙ্গে।

রাজকৃষ্ণ। আমি যাচ্ছি! [চলিয়া গেলেন।]

দীনবন্ধু। কোন ভয় নেই, দাদাকে দেখলেই ব্যাটারা পালাবে সব, ওদের মুখেই যত আস্ফালন। [জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

• ভৃত্য। যে মাঠাকরুণটি এখন এলেন, তিনি বড় কাঁদাকাটি করছেন, আপনাকে ডাকছেন। [দীনময়ী চলিয়া গেলেন।]

দীনবন্ধু। ছুটি নিয়ে এলাম একটু বিশ্রাম করতে, এ এক ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি।

[বাহিরের গোলমাল কমিয়া গেল। দীনবন্ধু ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় নারায়ণচন্দ্র আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

নারায়ণ। [চুপিচুপি] শুনলাম বাবা এসেছেন ?

দীনবন্ধু। হ্যাঁ তুই এতক্ষণ ছিলি কোথা ?

নারায়ণ। বাড়িতেই ছিলাম, তবে—

দীনবন্ধু। কি, ব্যাপার কি বল তো, হয়েছে কি, কি করেছিস তুই ?

নারায়ণ। তা আমি আপনাকে বলতে পারব না, কিন্তু আমি আমার অপরাধের জন্যে সত্যিই দুঃখিত, বাবার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে চাই, কিন্তু তাঁর কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না আমার। আপনি যদি একটু তাঁকে—

দীনবন্ধু। ও বাবা, সে আমি পারব না, তোমার মাকে গিয়ে ধর বরং তিনি যদি কিছু—[বাহিরের খোলা দ্বারের দিকে চাহিয়া] দাদা আসছেন, চল, আমরা ভেতরে যাই। [উভয়ের প্রস্থান। বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। হেরে গেলাম, ভেঙে চুরে পণ্ড ক'রে দিয়ে গেল সব।

[রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন।]

রাজকৃষ্ণ। শুনছি এর পরেই আর একটা লগ্ন আছে, দেখি যদি তাতে বিয়েটা হয়ে যায়, আমি একটু সামলে-সুমলে দিইগে ? আমি যাচ্ছি, বুঝলে ?

[বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না। রাজকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। উঃ, কি দেশ! [দীনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন]

দীনময়ী। ওগো, এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। কি?

দীনময়ী। মেয়েটি ঘ'ষে ঘ'ষে মাথার সিঁদুর তুলে ফেলেছে, বলছে আমাকে একটা থান দিন।

[মেয়েটি প্রবেশ করিল। সত্যই সে মাথার সিঁদুর ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। চুল আলুলায়িত।]

মেয়েটি। [দীনময়ীকে] কই, আমাকে একটা থান-কাপড় দিন।

বিদ্যাসাগর। তুমি অমন করছ কেন? তোমাকে তো বলেছি, তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আমি—

মেয়েটি। [তিক্তকণ্ঠে] আর আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে না। আপনার ব্যবস্থা আমি জানি, ও নোংরামি আমি আর করব না, বিধবা হয়ে—ছি ছি ছি ছি—আমারও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, তাই—

বিদ্যাসাগর। তুমি অমন কথা বলছ কেন? তুমি তো কোন অন্যায় কর নি মা, শাস্ত্রে—

মেয়েটি। আপনাদের শাস্ত্র থাক, হিঁদুর ঘরের বিধবা আমি, বামুনের মেয়ে—ছি ছি ছি—আমায় ছেড়ে দিন, আমি কাশী চ'লে যাই [কাশীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিল] আমার আর কোন গতি নেই, শাড়ি সিঁদুর আর চাই না আমি, আমাকে একটা থান দিন দয়া ক'রে।

[দীনময়ী বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিলেন! বিদ্যাসাগর নতমুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। দাও, তাই দাও, থানই দাও একখানা।

দীনময়ী। এস। [মেয়েটিকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।]

বিদ্যাসাগর। মাটির গুণ, কুসংস্কার সহজে ঘুচতে চায় না।

[নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

এই তো হ'ল! সারা জীবন ধ'রে কি করলাম! যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কেউ বুঝল না; শাস্ত্র ঘেঁটে বিধান বার করলাম, কেউ মানল না; আইন পাস করলাম, তাতেও কিছু হ'ল না, ঘুষ দিয়ে লোক ধ'রে ধ'রে বিয়ে দিলাম, তারা দু'হাত পেতে টাকাগুলো নিলে কিন্তু মেয়েগুলোকে ফেলে পালাল; আজ

দেখলাম, গুণ্ডা লাগিয়ে বিয়ে ভেঙে দিচ্ছে; যাদের দুঃখ মোচনের জন্যে এত করলাম, তারাও সুখী নয়—এই তো গাল দিতে দিতে সিঁদুর মুছে থান প'রে কাশী চলল। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন] আমিই হয়তো ভুল করেছি—ভুল, ভুল, মহাভুল—হয়তো রসিককৃষ্ণ-বঙ্কিমের কথাই ঠিক, জোর ক'রে কিছু করা যায় না; কিন্তু, অ্যাঁ—[আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন] হ্যাঁ, ভুলই করেছি—নিজের গোঁ নিয়ে যেতে ছিলাম, চোখ চেয়ে ভাল ক'রে দেখি নি হয়তো।

[দুর্গাচরণ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি মেয়ে, মাথায় চওড়া সিঁদুর, পরনে লালপেড়ে শাড়ি, কোলে সুন্দর একটি শিশু।]

দুর্গাচরণ, ব্যর্থ—ব্যর্থ—সব ব্যর্থ হয়ে গেল, হেরে গেলাম।

দুর্গাচরণ। কিসে হেরে গেলে?

বিদ্যাসাগর। সব দিক দিয়ে হেরে গেলাম ভাই! এ মেয়েটি কে?

দুর্গাচরণ। এটি তোমারই কীর্তি, বাল বিধবা ছিল, অতি কষ্টে দিন কাটছিল বেচারীর এর-ওর-তার দুয়ারে, আবার বিয়ে ক'রে সুখে ঘরকন্না করছে কেমন দেখ! কি চমৎকার ছেলেটি হয়েছে দেখ দিকি!

[মেয়েটি বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করিল।]

বিদ্যাসাগর। তাই নাকি! [সহসা উচ্ছ্বসিত] এই তো, এই তো, এই তো, এই তো দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মাঝখানে এই তো একটি সবুজ শিষ। ব্যস্—

● যবনিকা ●

বনফুল ও তাঁর রচনা

ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই। ডাক্তারি পরীক্ষাগারে টাইম-বাঁধা প্রায় একই ধরনের কাজ। রোগীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগও বেশী নেই। পারিবারিক জীবনেও নেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

বনফুলের কথা স্বতন্ত্র। সৃষ্টির নবত্বে, নিত্য নতুন আঙ্গিকের উদ্ভাবনায় বনফুলের বৈচিত্র্য সীমাহীন। উপন্যাস লিখতে বসেও উপন্যাসের প্রচলিত রূপ-রীতির দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন, গল্প লিখতে বসে গল্পের প্রকরণ ভেঙে তাকে না গল্প না প্রবন্ধ এক অদ্ভুত উপায়ে তিনি হিউমার সৃষ্টি করেন। গীতিকবিতার মধ্যেও কাহিনী-কাব্যের মীড নিয়ে আসেন।

তাঁর বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের অভিনবত্ব নিত্য নতুন রূপ পরিগ্রহ করে পাঠককে চমৎকৃত করে দেয়। নানা পত্র-পত্রিকার তাগিদ, বিশেষ করে 'শনিবারের চিঠি'র তাগিদ তাঁকে ক্লান্তিহীন এই নতুন সৃষ্টির নেশায় বুঁদ করে রাখে। অগণিত পাঠক সাধারণ এবং বনফুলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বনফুলের এই অভাবিত শক্তির প্রকাশ দেখে মুগ্ধ।

শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়া থেকে ১৫।২।৩১ তারিখে এক চিঠিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বনফুলকে লিখলেন :

"মণিহারির কোয়ার্টারে বসে তোমার বাবার সঙ্গে একদিন তোমার কথা হয়, তাঁকে বলেছিলুম—'বলাই, আপনার সাধারণ টাইপের এভারেজ ছেলে নয়, তাকে কোনো বিষয়ে বাধা দেবেন না, free hand দেবেন। সে আমাদের দেশের একজন হবে। আমি থাকব না—আপনি দেখে যাবেন,—তাতে আমি যে লক্ষণ পেয়েছি, তার প্রতি পূর্ণ confidence নিয়েই আজ সন্ধ্যায় আপনাকে এ কথা বললুম। আমার দীর্ঘ জীবন যদি বৃথাই না কেটে থাকে আর সাহিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা যদি লোক দেখানো না হয়, তাহলে আজকের একথাও ভগবান নিরর্থক করবেন না।" (যষ্টি মধু, চৈত্র, ৬৬)

নির্মোকের প্রায় সমকালেই 'মৃগয়া' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। আর 'আহবনীয়' কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় শ্রাবণ, ১৩৫০ সালে। ১৩৪৭ এর শেষ দিক থেকে ১৩৫০ এর প্রথম দিক পর্যন্ত এই সময়টা দেশে এবং বিদেশে এক বিপর্যয়ের কাল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন। (প্রায়শ্চিত্ত)

গুপ্ত গুহা থেকে কালনাগিনীরা বেরিয়ে এসেছে। তাদের বিষ নিঃশ্বাসের অগ্নিকণায় যুগ-যুগের তাপসদের অক্লান্ত সাধনায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা ধ্বংস হতে চলেছে। 'দানবপদদলনে' সারা বিশ্বে ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে ভারতবর্ষের যুবচিত্তও উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছেঁড়ার নেশায় তখন তারা উদ্দাম। দেখা দিল বিখ্যাত আগষ্ট আন্দোলন।

১৯৩৯ সালে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাটের এক কলমের খোঁচায় ভারতবর্ষকেও তার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া হোল। কংগ্রেস তখন চেয়েছিল কেন্দ্রে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করার সর্তে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেই সর্ত পূরণে অস্বীকার করে।

"But later on, in 1942, when Japan was knocking at the gates of India itself and the safety of India's own people was threatencd, Congress still rufused to join in the war effort. The idea that the Hindus would be prepared to accept Japanese occupation out of sheer resentment of the British was more than most British officials could stomach They shuddered at the idea of the Indian sub-continent in the hands of men like Gandhi, the Congress leader, who, in 1942, clamly contemplated a Japanese victory and sent a message to the British people expressing his abhorrence of German Nazism and Italian Fascism but hoping that they would submit without fighting to both." (The Last Days of the British Raj.)

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আর কোন সার্থকতা নেই দেখে গান্ধীজী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করলেন কংগ্রেস কমিটির ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবে। বললেন, "আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করব। স্বাধীনতা টুপ করে আকাশ থেকে পড়বে না। আর এই হবে আমার জীবনের

শেষ লড়াই।" দেশবাসীকে তিনি বললেন, "করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে" কর অথবা মর। ৯ই আগস্ট সকালে গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের নেতারা গ্রেপ্তার হোল। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হোল। সারা দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল। "As there was no definite organization and a complete lack of leadership, violent riots and assaults and sporadic disorders, such as the cutting of telegraph and telephone lines, damaging railway tracks, stations, etc.; occurred on a large scale in different parts of India. The government again adopted strong measures of repression including firing from aeroplanes. According to oficial estimates more than 60,000 people were arrested, 18,000 detained without trial, 940 killed, and, 1630 injured through police or military firing during the last five months of 1942." (An Advanced History of India.)

এই বিশৃঙ্খল বিক্ষোভ বিহারেও প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ল। বনফুল তখন ভাগলপুরে। বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে ভাগলপুর বা বিহারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। টেলিগ্রামের তার কাটা, রেল লাইন উপড়ানো। একমাত্র ভরসা রেডিও। তাও সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল। মালগুদাম লুঠ হোল। বনফুলের সঙ্গে এই বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। তিনি জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তবে এই বিক্ষোভের ঢেউ এসে তাঁকেও স্পর্শ করল। যারা দেশের মুক্তির জন্য মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের ত্যাগ এবং আদর্শকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি তাদের ভালোবাসেন। স্বভাবতই তিনি তাদের পরোক্ষে সাহায্য করতে লাগলেন। মাল-গুদাম যারা লুঠ করল তারা এসে আশ্রয় নিল বনফুলের বাড়ি। তিনি তখন বাঙলায় এবং ইংরেজিতে ওদের ইস্তাহার বা বুলেটিন রাত জেগে লিখে দিতেন। ওরা সেগুলো হিন্দী করে নিত এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিত।

সাধারণত সমকালীন ঘটনা নিয়ে বনফুল লিখতে চান না। তাতে তাঁর মনে হয় সাহিত্যের চিরকালীন মূল্য নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর এই মনোভাব সম্পর্কে প্রশ্ন আছে কিন্তু এটাই তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ। তবু আগস্ট আন্দোলনে তাঁর যে চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটেছিল তাকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে তিনি 'অগ্নি' নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন। ঐ উপন্যাসে কমরেড

মীনা দত্তের কাছে অন্তরার চিঠিতে যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে সেটা আসলে বনফুলেরই মনোভাব। এখনো তার কোন পরিবর্তন হয় নি।

এ সময়ে আরেকটা দিক ছিল। তা হোল কমিউনিস্ট আন্দোলন। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করলেও মার্কসবাদী মতবাদ এবং সমাজবাদী আদর্শ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। শ্রমিক কৃষকের উত্তাল বিক্ষোভে তার প্রমাণ আছে। ১৯৪১ সালের শেষদিকে জার্মান নাৎসীদের সোভিয়েত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি পাল্টে গেল। ১৯৪১ সালে নেহেরু ঘোষণা করলেন, "The progressive forces of the world are now aligned with the group represented by Russia, Britain, America and China." ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে ৮ বছর পরে বৈধ ঘোষণা করা হোল। কংগ্রেস তখন বে-আইনী। কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ল। তাদের আদর্শ সাম্যের আদর্শ, শ্রেণীভেদের অবসানের আদর্শ। দেশের লোকের মন দারুণ বিক্ষুব্ধ।

সমকালীন এই চেতনার স্পর্শ বনফুলকেও আলোড়িত করেছিল। অন্তরার চিঠিতে আছে তারই পরিচয়। অন্তরা লিখেছে, "আগস্ট—ডিস্টারবেন্সের তুমুল তুফানে সমস্ত মন এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, চুল বাঁধবার অবসর পর্যন্ত ছিল না। অথচ আমি প্রত্যক্ষভাবে ওতে যোগ দিই নি। ডেপুটি-গৃহিনীর ওসবে যোগ দেবার উপায় নেই।" বনফুলের যোগ দিতে কোন বাধা ছিল না। আসলে তিনি এসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকতে চান না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র অন্তরা একদিন কমিউনিষ্টদের দলে ছিল। তারপর ডেপুটিকে বিয়ে করে সরে পড়েছে। তার এই দলে যোগ দেওয়ার পেছনে কারণ স্বরূপ সে বলেছে, "তোমাদের দলে যতদিন ছিলাম, ততদিন বুঝিনি, এখন কিন্তু ভাল ক'রে বুঝতে পারছি যে, আমার অন্তত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা ছিল দেশপ্রেম নয়, আত্মপ্রেম। ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করার যে মুখস্থ বুলি আওড়াতাম, তা, পরশ্রীকাতরতার তাড়নায়, প্রোলেটারিয়েটদের প্রতি বেদনা-বোধের তীব্রতায় নয়।···যে পরশ্রীকাতরতাটা প্রকাশ করতে আগে লোকে লজ্জিত হ'ত, একটা বড় নামের মুখোশ প'রে তা'ই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করাটা গৌরবজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। কিন্তু ভেবে দেখ, ধনীমাত্রই পাজি, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জুয়াচোর—এই নীতি প্রচার করা অন্য যে-কোন দেশের পক্ষে শোভন হোক, ভারতবর্ষের পক্ষে নয়।···

প্রকৃত সাম্যবোধ আত্মানুসন্ধী হিন্দুধর্মেই আছে, অন্য কোন ধর্মে নেই, কারণ সাম্যবোধ জিনিসটা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, পশু-জগতে ওর স্থান নেই।......

"...কিন্তু ভুল বুঝো না আমাকে। মনে ক'রো না যে, আমি কমিউনিজমের উপর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। যে সাম্যের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমাদের দলে তার অভাব দেখে সে দলের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি, কিন্তু সাম্যের আদর্শ আমার ঠিক আছে। ওইটেই তো মানুষের চিরন্তন আদর্শ। তা ছাড়া কোন ইজমের উপরই আমার রাগ নেই, কারণ এটা বুঝেছি যে, সব নদীই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিশবে যদি তার গতি অব্যাহত থাকে। ইজ্‌মটা বাইরের জিনিস, আসল জিনিস মনুষ্যত্ব। আমরা অনেকেই বাইরের খোসাটার নকল ক'রে মরছি, অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের সাধনা করবার ধৈর্য আমাদের নেই—এইটেই আমার দুঃখ। চিরকালই আমরা এই ক'রে এসেছি। আর্য ঋষিদের যজ্ঞক্রিয়া পাঁঠা-খাওয়া-উৎসবে পরিণত হয়েছে, বুদ্ধসঙ্ঘ পরিপূর্ণ করেছে অনাচারী শ্রমণ-শ্রমণীর দল, চৈতন্যের ধর্ম নেড়া-নেড়ির ব্যাভিচার হয়ে দাঁড়াল, মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনকে মূলধন ক'রে কতকগুলো খদ্দরধারী গুণ্ডা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ক'রে বেড়াচ্ছে। কমিউনিজমের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কাস্তে হাতুড়ির লেবেল মেরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যা ক'রে বেড়াচ্ছে, তা মনুষ্যত্ব চর্চা নয়, আত্মবিনোদন।"

আলোচ্য পর্বে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল—তা গভীর দুঃখের এবং শোকের। তা হোল রবীন্দ্র-প্রয়াণ। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮, ইংরেজী ৭ই আগস্ট, ১৯৪১ বেলা ১২-১০ মিনিটে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রবীন্দ্রভক্ত বনফুলের কাছে এই সংবাদ আত্মীয়-বিয়োগের মতই শোকাবহ হয়েছিল। এই সম্পর্কে তিনি তার রবীন্দ্র-স্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন :

"হঠাৎ একদিন সজনীর একটা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় আনা হয়েছে। তিনি খুব অসুস্থ। এই বোধ হয় তাঁর শেষ অসুখ। আমাকে দেখে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি অবিলম্বে চলে' এস। আমি যাব-যাব করছি এমন সময় খবর এল সব শেষ হয়ে গেছে।

রেডিওর সামনে বসে' বন্ধুবর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মুখে সমস্ত দেশের বুক-ফাটা হাহাকার শুনতে লাগলাম।

সমস্ত দিন যে কি ভাবে কাটল তা বর্ণনা করতে পারব না। রাত্রে ঘুম হল না। সকালে উঠেই একটা কবিতা লিখে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আর একটা কবিতা (নাম 'সেদিন') লিখে পাঠালাম ভারতবর্ষে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমি একটিমাত্র কবিতা তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলাম 'দেশ' পত্রিকায়। আপসোস হতে লাগল কেন আরও বেশী লিখিনি। তারপর লিখলাম 'অন্তরীক্ষে', তবু তৃপ্তি হয় নি। বার বার মনে হয়েছে, যা করা উচিত ছিল তা যেন করিনি। তাঁর বিরাট প্রতিভা, বিরাট ব্যক্তিত্ব, বিরাট হৃদয়—আমাকে কিছুক্ষণের জন্য স্পর্শ করেছিল, তিনি আমাকে আপন জনের মতো কাছে টেনে বসিয়েছিলেন, হাসিমুখে আমার আবোল-তাবোল প্রগল্‌ভতা সহ্য করেছিলেন, এই আনন্দের উজ্জ্বল বর্ণ-বিচিত্র স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে কেবল। চিরকাল থাকবে।"

রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে আছে দুটো উপন্যাস। মৃগয়া এবং রাত্রি। মৃগয়া উপন্যাসের রচনাকাল নির্মোক উপন্যাসের অনতিপরেই। ১৯৪০ সালেই রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে তা প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা থেকে অনবরত তাগিদ আসছে লেখার জন্য। বনফুল যখন ভাবছিলেন কী নিয়ে লিখবেন সে সময় মুঙ্গের কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সরকার ভাগলপুরে আসেন। অধ্যাপক কালীকিঙ্কর ছিলেন খুব ধীমান এবং ছাত্র-বৎসল। অবিবাহিত এই মানুষটি সবসময় পড়াশুনো এবং ছাত্র নিয়েই থাকতেন। তিনি তাঁর আয়ের প্রায় সব টাকাই ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতেন। তাঁর ইংরেজী সাহিত্য এবং রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান এবং স্মরণ-শক্তি। অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। বনফুল তাঁর সম্পর্কে পরে লিখেছেন, "ও রকম কৃতবিদ্য রসিক লোক আমি খুব বেশী দেখিনি। তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। যে সব লেখকদের লেখা তাঁর ভালো লাগত তা মুখস্থ করে ফেলতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো বটেই, অনেক গদ্য রচনাও গড়গড় ক'রে বলে যেতে পারতেন। তাঁর মুখে বহু বিখ্যাত লেখকের লেখা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—স্বদেশী এবং

বিদেশী দুই-ই। ইংরেজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর।" (রবীন্দ্র স্মৃতি) বনফুল একদিন তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

এই কালীকিঙ্কর বাবুই বনফুলকে শিকার কাহিনী নিয়ে একটি উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করেন। তারই ফলশ্রুতি এই মৃগয়া উপন্যাস। মৃগয়া-র জন্ম ইতিহাসটাকে স্মৃতি হিসেবে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্যই বনফুল গ্রন্থটি কালীকিঙ্কর বাবুর করকমলে উৎসর্গ করেছেন। পরে কালীকিঙ্করের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কবিতাও লিখেছিলেন।

উপন্যাসটি তিনটি ভাগে বিভক্ত—গ্রামে, পথে এবং প্রান্তরে। 'গ্রামে'-র অংশে আছে হিরণপুর গ্রামের জমিদারদের শিকার অভিযানে যাবার প্রস্তুতি। এই অংশটুকু গদ্যকবিতায় লেখা। এ লেখারও একটা ইতিহাস আছে। ১৯৩৮ সালে বনফুল যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, গদ্য কবিতা কি ঠিক সেই জিনিস? লাইনগুলোকে ভেঙে লিখলেই কি কবিতা হবে? লাইনগুলো ভাঙবার নিয়ম কি? আপনার 'লিপিকা'র প্রত্যেকটি রচনাই কাব্য, কিন্তু সেগুলোকে তো আপনি লাইন ভেঙে লেখেন নি। গদ্যের মতো করেই লিখেছেন—" রবীন্দ্রনাথ বললেন, কয়েকটা কবিতা শোন তাহলেই বুঝতে পারবে। এই বলে তিনি কতগুলো কবিতা পড়ে শোনালেন। তখনো বনফুলের উপলব্ধিটা স্বচ্ছ হয় নি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "কি নিয়মে যে লাইনগুলো ভাঙা হয় এটা আমি পরে আবিষ্কার করেছিলাম ...ক্ষেত্রে, যখন 'মৃগয়া' লিখি। একসঙ্গে যতটা পড়লে ভালো শোনায় ততটাই ...ক লাইনে লিখতে হয়। এটা রবীন্দ্রনাথকে পরে জানিয়েছিলাম, খুব খুশী ...য়েছিলেন তিনি।" (রবীন্দ্র স্মৃতি)

'পথে'র অংশটুকু গদ্যে লেখা। শিকার-অভিযানে কলমিপুরের মাঠে যাবার ...হিনীটি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর তৃতীয় পর্বে 'প্রান্তরে' আছে প্রকৃত শিকার কাহিনী। এ শিকারও অদ্ভুত ধরনের। জমিদারির অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা যেন নিজেকে এবং পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কার করল। স্বভাবতই এর মধ্যে একটা নাটকীয়তা আছে সেজন্যই বোধ হয় বনফুল এই অংশটুকু বর্ণনা করেছেন নাটকের মাধ্যমে। আঙ্গিক কৌশলের দিক থেকেও এই উপন্যাসটি অভিনব। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় উপন্যাসটি ক্রমশ প্রকাশিত হয়।

'রাত্রি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। এবছরে বনফুলের একটি মাত্র গ্রন্থই প্রকাশ লাভ করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এ উপন্যাস প্রথমে পাটনার ঐতিহাসিক যোগীন্দ্র সমাদ্দারের পুত্র মণি সমাদ্দারের উদ্যোগে প্রকাশিত 'প্রভাতী' পত্রিকায় ক্রমশ ছাপা হয়। এই পত্রিকায় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অথৈ জল'ও প্রকাশিত হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পত্রিকায় উপন্যাস লিখেছিলেন।

মণি সমাদ্দারের অনুরোধেই বনফুল 'রাত্রি' উপন্যাসটি লেখেন। প্রভ.. পত্রিকায় সংখ্যা দুই বেরোবার পর তা সজনীকান্ত দাসের নজরে পড়ে তিনি উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং বনফুলকে লেখেন, 'রাত্রি প্রভাতীতে বেমানান।' তারপর থেকে এই উপন্যাস 'শনিবারের চিঠি'তেও পুনর্মুদ্রিত হয়। মোহিতলাল মজুমদার এই উপন্যাস পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সেজন্য বনফুল এই গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেন।

'রাত্রি' রাত্রিরই কাহিনী। এই রাত্রি অবশ্য অন্ধকার ঘুটঘুটে রজনী নয়, কাল মিশমিশে একটি মেয়ে। রঙটা তার কালো হলেও ওর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে যার জন্য বহু পুরুষ ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে; কিন্তু অন্ধকার রজনীতে পথিক যেমন ছিটকে পড়ে তেমনি এই পুরুষগুলোও ও নর্মসঙ্গী হয়েও জীবনসঙ্গী হতে পারে নি। রাত্রির রহস্যের কোন কূল কিনা করতে না পেরে তার থেকে দূরে দূরে ছিটকে পড়েছে। এ উপন্যাসের সব চরিত্রই অদ্ভুত। একটা জৈবিক তাড়না যেন তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

সাহিত্যে শ্লীল বা অশ্লীল বলে কিছু নেই। সবই নির্ভর করে পরিবেশনের উপর। আনন্দ সৃষ্টি করাই সেখানে বড় কথা। লেখকের ক্ষমতা থাকলে অশ্লীল বিষয়বস্তু নিয়েও উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করা সম্ভব। বনফুলের উপন্যাস তারই প্রমাণ। এটি একটি নতুন স্বাদের প্রেমের গল্প। মেয়েটি দিক দিয়েই খারাপ, morality বলতে কিছু নেই। তবু তার ভালো... আন্তরিক। সে তার ভালবাসার পাত্র artist-কে পায় নি বলেই নীড় বাঁধতে পারেনি।

ভুয়োদর্শন আর একটি ভিন্ন স্বাদের রচনা। প্রথম প্রকাশ ১০ ৬ ... প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড কলি, ৩৭।

'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ রচনা লিখতে লিখতে বনফুলের একঘেয়ে এসে গিয়েছিল। সেজন্য তিনি ঐ পত্রিকায়-ই একটু ভিন্ন স্বাদের রচনা লিখলেন। এখানে ব্যঙ্গ (Satire) নয়, প্রকৃষ্ট হাস্যরস Humour) সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। ব্যঙ্গরসের সঙ্গে হাস্যরসের একটা পার্থক্য আছে। ব্যঙ্গ রসিক moralist। তিনি বুদ্ধিদীপ্ত বিচারকের দৃষ্টিতে জীবনের অসঙ্গতিগুলো দূর করার চেষ্টা করেন। আর হাস্যরসিক creative artist। জীবনের অসামঞ্জস্যকে হাস্যরসিক সহৃদয়তা এবং সহানুভূতির সঙ্গে, চিত্রিত করেন "Humour may be defined as the kindly contemplation of the incongruities of life."

'ভূয়োদর্শন' এর রচনাগুলো সম্পর্কে ১৯।৫।৩৭ তারিখের এক চিঠি মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন, "আপনার ভূয়োদর্শন আমি বরাবর পড়িয়া থাকি; লেখাগুলি খুব উপভোগ্য হইতেছে। সাহিত্য সৃষ্টির উপাদানই experience—এই experience নানা ভঙ্গীতে মনকে...

যেখানে তাহা চিন্তালেশশূন্য ভাবাবস্থারূপে প্রত্যক্ষ গোচর হয়, সেইখানেই খাঁটি কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়—এই ভাবাবস্থাই 'রস'; vivid and actual experience হইতেই রসোদ্রেক হয়। যেখানে তাহা না হইয়া ভাব ও চিন্তা উভয়ের মিশ্রণ ঘটে, সেইখানে এই জাতীয় রচনার উদ্ভব হয়। এগুলিও রসসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত Essay বটে, কিন্তু critical নয় creative। ইংরাজী সাহিত্যে ইহার বিস্তর নিদর্শন আছে। ইহাও একটি literary form—এবং আমার মনে হয় আপনার সাহিত্যিক প্রকৃতির অতিশয় স্বাভাবিক প্রয়োজন বশে এইরূপ form ধরা দিয়াছে।" (যষ্টি-মধু, আষাঢ়, ৬৬)

মোহিতলাল পরে আবার ২৫।১১।৩৮ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, "ভূয়োদর্শন বেশ লাগিতেছে। নানা ভঙ্গিতে আপনি আপনার অভিজ্ঞতার 'রসগুণাবলিজারিত' বটিকাগুলি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। আমার মনে হয় ইহাতে যেন একটা প্রাচুর্যজনিত অপব্যয় আছে। যে সকল মাল-মশলা বৃহত্তর সৌধের ভিত্তিনির্মাণে ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহাই অজস্রতার চাপে কল্পনা বৃত্তির অধীরতায় খণ্ড খণ্ড ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। আপনি সেগুলিকে আপনার মনোভাণ্ডারে বেশিদিন ধরিয়া জমিতে দিতে ছন না—অস্বস্তি বোধ করেন। বড় কিছু করিবার ইচ্ছা আপনার আছে সে কথা আমাকে জানাইয়াছেন। কিন্তু বড় কিছু করিতে হইলে বড় Plan চাই একটা central কেন্দ্রকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া, কল্পনাকে তাহার চতুর্দিকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করাইতে হইবে—তাহা হইলে যত কিছু খণ্ড ভাব, খণ্ড চিন্তা, খণ্ড অভিজ্ঞতা সেই মণ্ডলের মধ্যে আপনি আকৃষ্ট হইয়া একটা সুডোল organic আকার ধারণ করিবে। ইহার জন্য ধৈর্য চাই, এবং ধ্যান চাই। এই খণ্ড রচনাগুলি অতিশয় সুখপাঠ্য বটে, কিন্তু মনে হয় এগুলিকে বৃহত্তর সৃষ্টির অঙ্গীভূত করিয়া আরও বড় সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে।" (যষ্টি-মধু, পৌষ, ৬৬)

অঙ্গারপর্ণী-র প্রকাশকাল ১৯৪০ সালের মে মাস। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। অঙ্গারপর্ণী-র অর্থ বামনহাটীর গাছ। এর ডাঁটা এবং পাতার শিরাগুলি লাল। চলতি কথায় বলে 'বামনলাঠি'। এর কবিতাগুলো সবই ব্যঙ্গাত্মক। বনফুল জাতে ব্রাহ্মণ। তিনি যষ্টি হস্তে সংসার ও জীবনের গলদগুলো সংশোধন করতে উদ্যত হয়েছেন। সেজন্য এই কবিতাগুলোর সংকলনের নাম তিনি দিয়েছেন অঙ্গারপর্ণী।

চতুর্দশপর্ণী একটি ছোট কাব্য গ্রন্থ। ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে ১৯৪০ সালে

প্রকাশিত। এই গ্রন্থের আঠাশটি কবিতাকে কৃষ্ণা এবং শুক্লা এই দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চোদ্দ লাইনে চোদ্দটি কবিতা এক একটি ভাগের মধ্যে আছে। এই কবিতগুলো বনফুল হাতে লিখে তাঁর স্ত্রী লীলাবতী দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাস সেগুলো নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপিয়ে দেন। জীবনের যেমন উত্থান এবং পতন দুটো দিক আছে তেমনি রোমান্টিক প্রেমের উদ্দাম আনন্দের পরেও বিষাদময়তা দেখা দেয়। 'কৃষ্ণা'পর্বের চোদ্দটি কবিতার মধ্যে সেই দুঃখের অনুভব ফুটে উঠেছে—প্রেমিক প্রেমিকা নিজেদের মনে করেছেন স্বপ্নহীন ঝরাফুল— "ঝরাফুলে অলি নাই, শ্রোতা নাই জীর্ণ গায়কের।" তবু 'আলো'-লুব্ধ পতঙ্গের এখনও যে মেটেনি পিপাসা।' তাই নির্বাপিত প্রদীপকে আবার প্রজ্বলিত করতে তারা চায়। 'শুক্লা' পর্বে আছে সেই বাসনারই প্রকাশ প্রেম তো অফুরন্ত। তার তো বিনাশ বা শেষ হতে পারে না। ছিন্ন বীণ তারেও আছে অনন্ত সুরের সম্ভাবনা।

আহ্বনীয় মাত্র পনেরটি কবিতার একটি ছোট্ট কাব্য সংকলন। ১৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময়ে দেশের যুবককে উদ্দেশ্য ক লেখা। এখানে আছে পুরানো ছন্দে 'নিপীড়িত মানবের সনাতন বিশ্বা গান।' এই বিশ্বাস যুবকদের মহত্ত্ব এবং যৌবনের উপরে আস্থা। নয়, অন্ধকার লাঞ্ছিত আকাশে সূর্যস্বপ্নই এখানে প্রধান।

বিদ্যাসাগর নাটকটি ১৩৪৮ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ ডি. এম. লাইব্রেরি।

মাইকেল মধুসূদনের জীবন অবলম্বনে নাটক সৃষ্টির সার্থকতাই বনফুলকে আর একটি মহৎ কার্যে অনুপ্রাণিত করেছিল। এবার তিনি লিখলে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য নিয়ে নাটক চরিত্রাঙ্কনের যে দক্ষতা বনফুল তার গল্পে উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন নাটকে আরও সার্থক হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য হলেও ছোট বড় তার পার্শ্ব চরিত্রগুলোও কম জীবন্ত হয় নি। এরে পর এক নাটক রচনা করে এ ক্ষেত্রেও বনফুল তার স্থায়ী কীর্তি রেখে সক্ষম হয়েছেন। বনফুলের ইতিহাস নিষ্ঠাও প্রশংসনীয়।

—সরোজমোহন

৩১ ১৯৭



বনফুল

রচনাবলী ০৩